শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শার্লোট মালিন্স

অনুবাদ: কাজী মাহবুব হাসান, আসমা সুলতানা

A Little History of Art

Charlotte Mullins

(Illustration: Mat Pringle)

শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শার্লোট মালিন্স

(মূল বইয়ের অলংকরণ: ম্যাট প্রিঙ্গল,
প্রতিটি অধ্যায়ে উপরে ব্যবহৃত লাইনোকাট ছাপচিত্র)

অনুবাদ

কাজী মাহবুব হাসান
আসমা সুলতানা

সুপ্রজ্ঞা অনুবাদ উদ্যোগ ২০২৪

সুপ্রজ্ঞা
অনুবাদ উদ্যোগ

সূচি

১ প্রথম আঁচড়
২ গল্পের শুরু
৩ জীবনের বিভ্রম
৪ অনুকর্তা
৫ পরলোকের পথ
৬ শিল্পকলা ও ধর্মের সখ্যতা
৭ অশনি সংকেত
৮ প্রচারণার শিল্পকলা
৯ রাজমিস্ত্রী, 'মোয়াই' এবং উপাদান
১০ রেনেসাঁর সূচনা
১১ উত্তরীয় আলো
১২ দেখার একটি উপায়
১৩ পশ্চিমের সাথে পূর্বের সাক্ষাৎ
১৪ রোমের প্রত্যাবর্তন
১৫ আগুন আর গন্ধক
১৬ বর্বরদের অনুপ্রবেশ
১৭ স্পেনে রাজত্ব
১৮ জীবনের মঞ্চ
১৯ দেখার নতুন উপায়গুলো
২০ ভূদৃশ্য
২১ স্টিল লাইফ এবং স্থবির জীবন
২২ রোকোকো পলায়নী প্রবৃত্তি এবং লন্ডনের জীবন
২৩ রয়্যাল অ্যাকাডেমি: দেশে এবং বিদেশে
২৪ স্বাধীনতা, সাম্যতা, ভ্রাতৃত্ব?
২৫ রোমান্টিসিজম থেকে ওরিয়েন্টালিজম
২৬ বাস্তবতার দংশন
২৭ ইম্প্রেশনিস্ট
২৮ শিল্পীদের প্রতিরোধ
২৯ পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্ট
৩০ খ্যাতিমানদের কাধে দাড়িয়ে
৩১ নিয়মের বই ছিড়ে ফেলা
৩২ রাজনৈতিক শিল্পকলা
৩৩ স্বাধীন মানুষদের দেশ?
৩৪ যুদ্ধের পরিণাম
৩৫ পরিণত হয়ে ওঠা আমেরিকার শিল্পকলা
৩৬ ছাঁচ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা ভাস্কর্য
৩৭ আমাদের আর কোনো বীরের প্রয়োজন নেই
৩৮ উত্তর-আধুনিক বিশ্ব
৩৯ বড় কিছু করো
৪০ শিল্পকলার প্রতিরোধ

ভূমিকার পরিবর্তে

'Great nations write their autobiographies in three manuscripts, the book of their deeds, the book of their words and the book of their art. Not one of these books can be understood unless we read the two others, but of the three the only trustworthy one is the last.'- John Ruskin

বইটি হাতে নেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ, আকারে বড় হলেও এটি শিল্পকলার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সাধারণ কৌতূহলী পাঠকদের জন্য লেখা বইটি এই বিষয়ে জানতে আগ্রহী যে-কারোর উপকারে আসবে। বইটির মোট চল্লিশটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে লেখক গুহার অন্ধকারে দেয়ালে আঁচড় থেকে শুরু করে একবিংশ শতকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হওয়া শিল্পকলার বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। বইটি ব্যতিক্রম কারণ এখানে শিল্পকলার ইতিহাসকে আরো সম্প্রসারণ করা হয়েছে, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বহু শিল্পী ও সংস্কৃতি, প্রথাগত শিল্পকলার বইয়ে সাধারণত যা উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা ছবি যুক্ত করেছি, যদিও সেগুলো পূর্ণাঙ্গ এবং রঙ্গীন চিত্র নয়, তবে অধ্যায়ের শেষে ব্যবহৃত ছবির একটি তালিকা যুক্ত করা হয়েছে, আগ্রহীরা ইন্টারনেটে সেই চিত্রগুলো দেখে নিতে পারেন। শিল্পকলার ইতিহাস নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সভ্যতারও ইতিহাস। মানব মনের সৃজনশীলতা আমাদের সামাজিক বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ একটি চালিকা শক্তি – আর শিল্পকলা হচ্ছে এর শুদ্ধতম একটি রূপ। ইতিহাসের এই অভিযাত্রায় আপনাকে স্বাগতম।

কাজী মাহবুব হাসান ও আসমা সুলতানা
টরন্টো, অক্টোবর, ২০২২

অধ্যায় ১ - প্রথম আঁচড়

১৭,০০০ বছর আগের একটি দিন। দুই ব্যক্তি বেশ সংকীর্ণ একটি গর্তের মুখ দিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে একটি গুহা-পদ্ধতির দীর্ঘ আঁকাবাঁকা করিডোরে প্রবেশ করেছিল। পাথরের মধ্য দিয়ে একগুঁয়ে ধাক্কায় এর পথ করে নিয়ে তাদের নীচেই মন্থিত হচ্ছিল একটি নদী। করিডোরটি ছিল গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বাইরের পৃথিবীর কোনো শব্দই তাদের কাছ অবধি প্রবেশ করতে পারেনি। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিটি হাতে একটি জ্বলন্ত মশাল এবং এর ধোঁয়াটে অগ্নিশিখার আলোর আঙ্গুল চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। দেয়ালে খোদাই করা বাইসন আর বলগা-হরিণের ছবিগুলো দেখতে দেখতে কিশোরটি পেছনে তাকে অনুসরণ করছিল । কখনো কখনো তাদের হামাগুড়ি দিয়ে আগাতে হচ্ছিল, যখন গুহার দেয়ালগুলো ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল, কখনো বহুদিন আগেই বিলুপ্ত গুহা-ভালুকের কঙ্কালগুলো পাশ কাটিয়ে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল, গুহার ইতিপূর্বের দর্শনার্থীরা যাদের ছেদক দাঁতগুলো খুলি থেকে টেনে বের করে নিয়ে গেছে , যেগুলো লকেট আর নেকলেসে পরিণত হয়েছিল।

একত্রে তারা এই গুহা-পদ্ধতির সবচেয়ে দূরবর্তী অংশ-অভিমূখে যাচ্ছিল, প্রবেশ মুখ থেকে আধা কিলোমিটারের চেয়েও বেশি দূরে। সেখানে, তাদের গোড়ালির উপর

ভারসাম্য রেখে, যেন তাদের পা কাদায় আটকে না যায়, তারা বসেছিল, এবং সাথে করে বহন করে আনা ধারালো একটি পাথরের টুকরো ব্যবহার করে গুহার ভেজা মেঝে থেকে তারা বেশ বড় একটি খণ্ড কেটে তুলেছিল। যখন কাদার ভারি খণ্ডটি তোলার সময় তাদের পাগুলো কাদায় আরো খানিকটা ডেবে গিয়েছিল, এরপর তারা সেটিকে বহন করে নিয়ে এসেছিল গুহার মেঝে থেকে খানিকটা বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা শিলাস্তরের একটি বর্ধ িতাংশের কাছে এবং কাজ করতে শুরু করেছিল। ক্রমান্বয়ে সেই নরম কাদা দুইটি বাইসনে রূপান্তরিত হয়েছিল, দৈর্ঘ্যে দুটোই প্রাপ্তবয়স্ক কোনো হাতের সমান। বাইসনগুলো পাথরের আকৃতি অনুসরণ করেছিল, কিন্তু এর পৃষ্ঠদেশ থেকে গর্বিত ভঙ্গিতে দাড়িয়ে, পুরুষ বাইসনটি ছিল স্ত্রী বাইসনটির পেছনে।

এই ভাস্কর্যের স্রষ্টারা দাড়িয়ে, মশাল উঁচু করে ধরেছিল। বাইসনটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, তাদের কেশরগুলো ঘাড়ের উপর দাঁড়িয়ে, বৈশিষ্ট্যসূচক পিঠের কুঁজ, এবং কম্পমান অগ্নিশিখায় লেজগুলো স্পন্দিত মনে হচ্ছিল ।

*

এইসব ভাস্কর্য কি উর্বরতা সংক্রান্ত কোনো আচারের অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল, জ ীবনের রহস্যময় সৃষ্টিকে উদযাপন করতে? কিংবা, সেই কিশোরকে গুহার গভীরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল প্রাপ্তবয়স্ক জীবন-অভিমূখে তার যাত্রার শর্ত হিসেবে কোনো আচার পালন করতে? আমরা শুধু অনুমান করতে পারি। ফ্রান্সের টুক দো'দুবেয়ার গুহায় বাইসন দুটি প্রাচীন প্রস্তরযুগে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এগুলো প্রাগৈতিহাসিক, লিখিত ইতিহাস শুরু হবার পূর্বেই যা নির্মাণ করা হয়েছিল, এমনকি লেখা উদ্ভাবন করারও বহু আগে। এই ভাস্কর্যটি আমাদের জানামতে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম 'রিলিফ' ভাস্কর্য (যে ভাস্কর্যগুলো এর পটভূমির সাথে যুক্ত থাকে, কিন্তু বাইরের দিকে খানিকটা বেরিয়ে থাকে) । সেই গুহায় ফেলে যাওয়া কিছু ইঙ্গিত আর চিহ্ন - কাদায় সংরক্ষিত গোড়ালির ছাপ, ভাস্কর্যের ওপর রেখে যাওয়া আঙ্গুলের ছাপ - থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক আর জীবাশ্মবিজ্ঞানীরা সমাধান করতে পেরেছেন, কীভাবে এবং কার দ্বারা এই ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছিল। এই চিহ্নগুলো দেখতে পাওয়া আসলেই অবিশ্বাস্য - মনে হয় যেন বাইসনগুলোকে কিছুক্ষণ আগে তৈরি করা হয়েছে, এবং যে শিল্পীরা কাদায় তাদের আঙ্গুলের ছাপ রেখে গেছেন তারা কেবলই এটি শেষ করে উঠে দাড়িয়েছেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবো না, 'কেন' এই ভাস্কর্যগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। আমাদের পূর্বসূরিদের কাছে এই ধরনের শিল্পকলার অর্থই বা কী ছিল, আর বর্তমানে তাদের এই শিল্পকলার আমাদের জ ন্য কী অর্থ বহন করছে? তারা কী তাদের এই কাজগুলোকে আদৌ শিল্পকলা হিসেবে বিবেচনা করেছিল?

এই বইটিতে আমরা বিশ্বব্যাপী অসংখ্য এবং বহু বিচিত্র ধরনের বস্তু পর্যবেক্ষণ করব, যেগুলো সব আজ শিল্পকলা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু 'শিল্পকলা' শব্দটি দিয়ে আমরা কী বোঝাতে চাইছি? 'শিল্পকলা' খুব পিচ্ছিল একটি শব্দ। এর অর্থ ও মূল্য সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল, কিন্তু পরিশেষে, এটি সৃষ্টি করা হয় এমন কিছু প্রকাশ

করতে, যা অনির্বচনীয়, যা শব্দের সীমানা অতিক্রম করে। সমকালীন শিল্পী আলি বানিসদর বলেছিলেন, গুহাচিত্র থেকে আজ অবধি, সব শিল্পকলাই মূলত জাদু-সংক্রান্ত। তিনি বলেন, 'গুহাচিত্রের শিল্পীরা সেই জাদু ব্যবহার করতে চেয়েছিল, দৃশ্যমান ভাষায় কিছু অনুবাদ করতে চেয়েছিল, যা আমরা আসলেই বুঝতে পারি না। এটি সবসময়ই জাদু সংক্রান্ত একটি বিষয়'। এর কী অর্থ হতে পারে? বানিসদর 'ছু মন্তর ছু' জাদু নিয়ে কথা বলছিলেন না, এটি টুপির ভেতর থেকে খরগোশ বের করে আনার জাদু নিয়ে নয়, বরং একটি রহস্যময় শক্তির কথা বলছিলেন, ব্যাখ্যাতীত একটি শক্তি। এই ধরনের জাদু কোনো বস্তু বা কোনো দেয়ালের ওপর একগুচ্ছ আঁচড়কে রূপান্তরিত করে, এবং এটিকে শক্তিশালী একটি ধারণা সংযোগ করার ক্ষমতা দেয়, যা মৌখিক ভাষার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কখনো এই ধারণাগুলো প্রকাশিত হয় দ্রুত অথবা শ্বাসরূদ্ধকর জটিলতাসহ। শিল্পীরা সরলতম চিহ্ন বা আঁচড় আর আটপৌরে বস্তুগুলোকে – কয়লা, পাথর, কাগজ, রং – শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করেন।

যখন শিল্পীরা কোনো প্রাণীর মূর্তি নির্মাণ অথবা কোনো অবয়ব বা ফিগার আঁকেন, তারা আবশ্যিকভাবে একটি সাদৃশ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন না, বরং তারা সেই প্রাণী বা ফিগারটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। আর সেই কারণে শিল্পকলা - বাহ্যিকভাবে এগুলো যতই ভিন্ন আর বৈচিত্র্যপূর্ণ মনে হোক না কেন - পরিশেষে একটি সাধারণ সূত্র ধারণ করে। ইতিহাসব্যাপী শিল্পীরা (এবং প্রাক-ইতিহাসে) সবসময়ই তাদের ধারণাগুলো প্রকাশ করার সবচেয়ে সেরা উপায় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। এটি হচ্ছে শিল্পকলার নিজস্ব 'জাদু', এর সেই উপাদানটি যা এটিকে আমাদের সাথে সংযোগ করার সুযোগ করে দেয়, আমাদের যা আবেগীয় স্তরে আন্দোলিত করে, এমনকি যদিও মাঝে মাঝে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না কেন। পৃথিবীকে ভিন্নভাবে দেখতে, অথবা এই পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান আরো খানিকটা বেশি সুস্পষ্টতার সাথে উপলব্ধি করতে শিল্পকলা আমাদের সহায়তা করতে পারে। এটি খুবই শক্তিশালী একটি জিনিস।

এই বইয়ে আমরা শিল্পকর্মের কিছু প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা থেকে বর্তমান যুগ অবধি আমাদের যাত্রা শুরু করব, অনুসন্ধান করব কীভাবে শিল্পকলা ও শিল্পীরা আমাদের পৃথিবীকে এর আকৃতি দিয়েছেন এবং প্রভাবিত করেছেন। পূর্ববর্তী বিবরণগুলো একটি সাধারণ পথের অস্তিত্ব দাবি করা সত্ত্বেও শিল্পকলার ইতিহাসে কিন্তু অনুসরণ করার মতো শুধু একটি মাত্র পথ নেই। এর পরিবর্তে সময়ের পরিক্রমায় আমাদের এই যাত্রায় আমরা একত্রে হাঁটব অনুসন্ধান করতে, কীভাবে একাধিক পথ পারস্পরিক সংযুক্ত হয়েছে। আমরা সেই শিল্পীদের সাথে সাক্ষাৎ করব, যারা আজ অজ্ঞাতনামা, সেই দুই ব্যক্তির মতো, বহু হাজার বছর আগে যারা সেই বাইসন দুটির ভাস্কর্য গড়েছিল। এবং আমরা তাদের সাথে সাক্ষাত করব যারা তাদের জীবদ্দশায় প্রশংসিত হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে যাদের শিল্পীজীবন উপেক্ষিত হয়েছে। সেই সব শিল্পীরাও থাকবেন যারা এখন ঘরে ঘরে পরিচিত নাম, এবং সেই শিল্পীরা যাদের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও মূলত অজানা। আমরা একই সাথে পৃথিবী ঘুরে বেড়াবো, বিস্মরিত

শিল্পীদের পুনপ্রতিষ্ঠা করব, শিল্পকলার ইতিহাসের প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গিটিকে আরো সম্প্রসারিত করব।

শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে ১০০,০০০ বছর আগে, যখন আধুনিক মানুষ লাল গিরিমাটি (রেড ওকার) গুঁড়া আর ধূলিকণা মিশ্রণে প্রথম রং (পিগমেন্ট) তৈরি করেছিল, যার সাথে যুক্ত করেছিল পোড়া হাড় থেকে বেরিয়ে আসা তৈলাক্ত বা চর্বিযুক্ত রস। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লমবোস গুহায় ১০০,০০০ বছর প্রাচীন রং ধারণ করা শঙ্খ খোলস আবিষ্কৃত হয়েছে। এখনো এত প্রাচীন কোনো শিল্পকলার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিন্তু খোলসের মধ্যে ধারণ করা এই রং সম্ভবত শরীর অলংকরণ অথবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কোনো আচার পালনের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছিল। তবে রং তৈরি করতে পারার ক্ষমতা, এবং সেই কারণে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে এবং সৃজনশীলতার সাথে পৃথিবীকে পরিবর্তন করার দক্ষতার তখন অস্তিত্ব ছিল।

প্রায় ৬০,০০০ বছর আগে, যে সময় নাগাদ আধুনিক মানবগোষ্ঠী ইউরোপ ও এশিয়া অভিমূখে আফ্রিকা থেকে অভিপ্রয়াণ শুরু করেছিল, তারা বস্তু এবং দেয়ালে অলঙ্কারসূচক আঁচড় বা চিহ্ন আঁকতে রং ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। অলংকরণ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে কোনো তলদেশকে নান্দনিক আর আবেদনময় করে তোলে, কিন্তু এখানে গভীরতর আর কোনো অর্থের উপস্থিতি নেই। একটি মৃৎপাত্রের গায়ে বিন্দু বা আড়াআড়ি করে আঁকা রেখাগুলো জীবন কিংবা মানব অস্তিত্বের মানে কী, সেই বিষয়ে আমাদের কিছু বলার চেষ্টা করে না। এর জন্য আমাদের শিল্পকলার প্রয়োজন। আপাতত প্রাগৈতিহাসিক কোনো গুহাচিত্র আফ্রিকায় পাওয়া যায়নি, কিন্তু পরবর্তীতে ইন্দোনেশিয়া ও ইউরোপীয় উদাহরণগুলোর সাদৃশ্য ইঙ্গিত দিয়েছে যে, চিন্তার করার সাধারণ একটি উপায়ের অস্তিত্ব ছিল, আমাদের মহাঅভিনিষ্ক্রমণ শুরু হবার আগে আফ্রিকায় যার সূত্রপাত ঘটেছিল।

প্রলুব্ধকরভাবেই আপাতত এটি একটি তত্ত্ব হিসেবে আছে।

আমাদের জানা আছে এমন প্রাচীনতম আঁচড়গুলো হচ্ছে লাল বিন্দু আর হাতের ছাপের গুচ্ছ, যেগুলো পাওয়া গিয়েছিল গুহার দেয়ালে আঁকা প্রাণীদের চিত্রের পাশে। লাল ওকার বা গিরিমাটি গুঁড়া করে তৈরি করা রং পাখির ফাপা হাড়ের মধ্যে নিয়ে ফুঁ দিয়ে ছিটিয়ে দেয়া হয়েছিল হাতের ওপর, যা হাতের একটি ছাপ দেয়ালের গায়ে সৃষ্টি করেছিল

. মুদ্রাঙ্কিত অনুলিপির মতো। ফ্রান্সের শভে গুহায় প্রাগৈতিহাসিক এক ব্যক্তির খানিকটা বাকানো একটি কেনে আঙ্গুল ছিল, এবং পুরো গুহার দেয়ালব্যাপী তাদের স্বাতন্ত্র্যসূচক হাতের ছাপের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বোর্নিওতে পূর্ব কালিমন্তনে দূর্গম গুহায় আদি হাতে ছাপের অস্তিত্ব আছে এবং সুলাবেসিতে হাতের ছাপ আমরা দেখি লিয়াং টিম্পুসেঙ গুহার চুনামাটির দেয়ালের ওপর। হাতের এইসব ছাপগুলো, আনুমানিক ৩৫,০০০ বছর আগে যা সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেগুলোর মধ্য বহু হাজার মাইলের ব্যবধান, কিন্তু তারা একই বার্তা বহন করছে : আমি এখানে ছিলাম, এটা আমার চিহ্ন। এই হাতের ছাপগুলো শিল্পকলা নয়, এগুলো বরং অনেকটাই স্বাক্ষরের মতো, হয়তো সেগুলো সৃষ্টি করেছিল সেই শিল্পীরা, গুহার দেয়ালে প্রাণীদের চিত্র আঁকার জন্য যাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। প্রাণীদের প্রাচীনতম চিত্রায়ন হচ্ছে প্রথম শিল্পকর্ম। এখন আসলেই আমাদের যাত্রা শুরু হতে পারে।

প্রাণীদের চিত্রগুলো আবির্ভূত হয়েছিল প্রায় একই সময় অথবা এমনকি হাতের-ছাপগুলো আবির্ভূত হবারও আরো আগে। সুলাবেসিতে হাতের ছাপের পাশেই ছিল একটি বাবিরুসা বা হরিণ-শূকর, এটি আঁকা হয়েছিল দীর্ঘ আঁচড় টেনে। এটি কমপক্ষে ৩৫,৭০০ বছর প্রাচীন। লিয়াং টেডোঙ্গগে গুহার গভীরে তিনটি বুনো শূকরের চিত্র আছে, অবিশ্বাস্যভাবেই যেগুলো ৪৫,৫০০ বছর প্রাচীন, এগুলো পৃথিবীর প্রাচীনতম ‘ফিগারেটিভ’ শিল্পকলার (যা শনাক্তযোগ্য কোনো রূপের চিত্রায়ন করে)। ইন্দোনেশিয়া এবং ইউরোপ, উভয় ক্ষেত্রেই প্রাণীদের আঁকা হয়েছে পাশ থেকে (প্রোফাইল) সাহসী বহিঃরেখা ব্যবহার করে। মূল মনোযোগটি ছিল এগুলোর ছায়াচিত্রের মত রূপরেখা এবং সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর: শিং, কেশর, শাখাযুক্ত শিং। গুহার অন্ধকার গভীরে মশালের আলোর প্রক্ষেপে প্রজ্বলিত এই চিত্রগুলো নিশ্চয়ই বিস্ময় অনুপ্রাণিত করার মতো দৃশ্য ছিল।

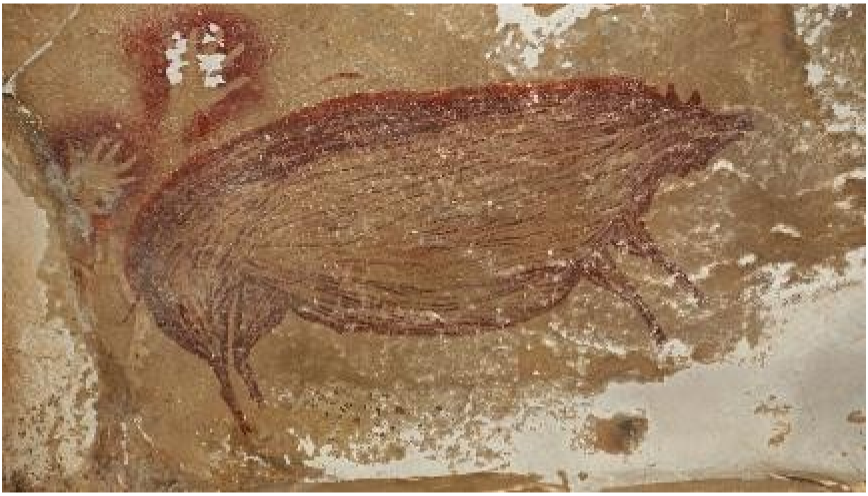

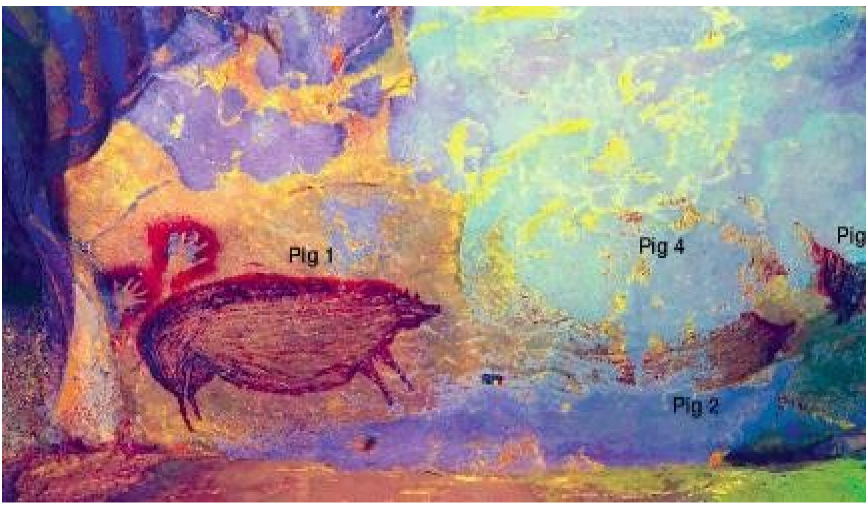

গুহার তলদেশে সমাহিত বহু ক্ষুদ্র ভাস্কর্য খুঁজে পাওয়া গেছে, যেখানে আধুনিক মানুষরা এক সময় বাস করতো। হাড়, ম্যামথের টাস্ক বা গজদন্ত, পাথর খোদাই করে রূপ দেয়া হয়েছে বিচিত্র প্রাণী, কিংবা মানব-প্রাণী সংকরদের, যেমন প্রায় ৪০,০০০ বছর প্রাচীন ‘ল ায়ন ম্যান’ বা সিংহ-মানব, ম্যামথ আইভরি ব্যবহার করে যা তৈরি করা হয়েছিল। অন্য ক্ষুদ্র মূর্তিগুলোকে সুবিশাল নিতম্ব আর স্তনসহ নারী শরীরের আকার দেয়া হয়েছে, তাদের পেট যেন গর্ভধারণের কারণে স্ফীত, যেমন ২৫,০০০ বছর প্রাচীন চুনাপাথর দিয়ে নির্মিত ‘ভিনাস অব ভিলেনডর্ফ’। এই ক্ষুদ্র মূর্তিগুলো তাবিজের মতো কিছু হতে পারে - ক্ষুদ্র বহনযোগ্য ভাস্কর্য, যাদের সুরক্ষা দেবার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হতো। এর মালিককে নিরাপদ কিংবা বহু সন্তানের জনক/জননী হতে সহায়তা করার জন্য এগুলো পরিকল্পিত হয়েছিল।

বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিকরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে এইসব ভাস্কর্য আর চিত্রকর্মগুলো কখন সৃষ্টি করা হয়েছিল সেটি নির্ণয় করতে পারেন। তারা বলতে পারেন ব্যবহৃত উপাদানগুলোর কত প্রাচীন, কিংবা তারা এর উপর স্তরীভূত খনিজের সময়কাল নির্ণয় করেন। তবে বিংশ শতাব্দীর আগে, মানুষ আপনার কথা শুনে হাসতো যদি আপনি দাবি করতেন যে এই শিল্পকর্মগুলো রোমানদের সময় থেকে আরো বহু সহস্র বছর আগে সৃষ্টি করা হয়েছে। ভিক্টোরিয় যুগে অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবী মাত্র কয়েক হাজার বছর প্রাচীন। এই শিল্পকর্মগুলোর সবচেয়ে প্রাচীনতম সময়কাল হিসেবে তারা সর্বোচ্চ ‘প্রাক-রোমান’ একটি পর্ব অবধি মানতে পারতেন। চার্লস লাইয়েল ও চার্লস ডারউইনের ভূতাত্ত্বিক সময় এবং প্রজাতির বিবর্তন নিয়ে যুগান্তকারী গবেষণা সেই ধারণাটি বিকশিত হবার সুযোগ করে দিয়েছিল, যা প্রস্তাব করেছিল, পৃথিবী এবং এর বাসিন্দরা অনেক বেশি প্রাচীন, বহু মিলিয়ন বছর বেশি প্রাচীন। লাইয়েল আর ডারউইনের তত্ত্বগুলো প্রকাশ হবার

পরেই কেবল প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রত্নবস্তু আর অবশিষ্টাংশগুলোকে তালিকাভুক্ত করতে শুরু করেছিলেন - ফ্লিন্টের কুঠার, প্রাগৈতিহাসিক মানব কঙ্কাল - এই ধারণাটিকে সমর্থন করতে।

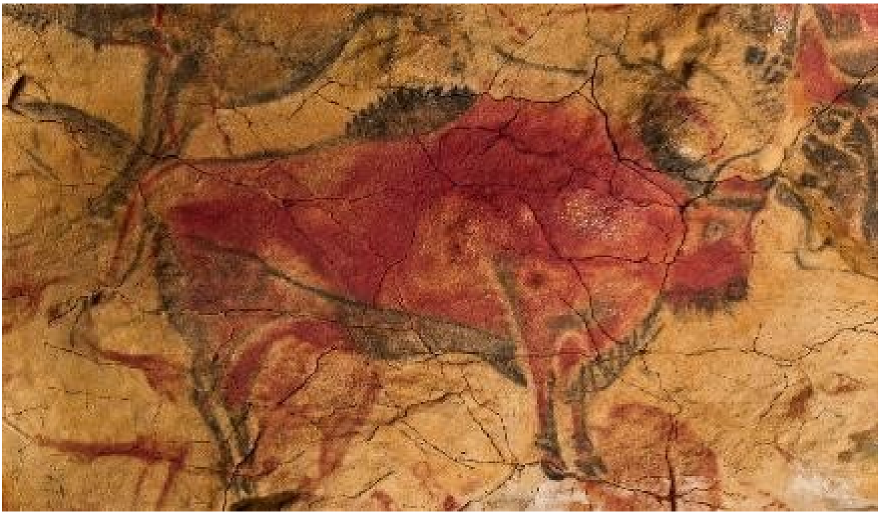

তবে প্রাচীন কঙ্কালগুলো ছিল ভিন্ন একটি বিষয়, কিন্তু ১৮৭৯ সালে যখন ৯ বছরের মারিয়া সান্জ ডে সাউতুওলা আর তার বাবা মারসেলিনো জানিয়েছিলেন, তারা প্রাচীন একটি গুহার ছাদে প্রাগৈতিহাসিক বাইসন আর ঘোড়ার চিত্র আঁকা দেখেছেন, বিদ্যায়তনিক বিশ্ব তাদের সেই দাবি অবিশ্বাস করেছিল, এবং বলেছিল এইসব চিত্রকর্মগুলো সব জালিয়াতি। তারা হেসেছিল, প্রাগৈতিহাসিক নারী আর পুরুষ কোনো ছবি আঁকতে পারে না, কারণ যথেষ্ট মাত্রায় তাদের সেই বুদ্ধিমত্তা আর সূক্ষ্মতা ছিল না। এই আলোচিত চিত্রকর্মগুলো ছিলো স্পেনের আলতামিরায় মারসেলিনোর নিজস্ব এস্টেটে, একটি গুহা-পদ্ধতির মধ্যে, যা তৈরি হয়েছিল করিডোর দিয়ে সংযুক্ত বেশ কিছু

বড় প্রকোষ্ঠ। সবগুলো কক্ষই অলংকৃত করা হয়েছিল চিত্রিত অথবা আঁচড় কেটে খোদাই করা প্রাণীদের ছবি দিয়ে, লাল গিরিমাটি গুঁড়ো দিয়ে তৈরি রং দিয়ে যাদের শরীর রঞ্জিত করা হয়েছিল এবং কয়লার দিয়ে বহিঃরেখা আঁকা হয়েছিল। মারসেলিনো ১৮৮৮ সালে মারা গিয়েছিলেন, তিনি প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকর্ম আবিষ্কার করেছেন, তার এমন দাবিটি তার জীবদ্দশায় শুধু উপহাসের শিকার হয়েছিল। তবে, ১৯০২ সালে অবশেষে এই প্রাণীগুলো আসলেই যা, সেটির স্বীকৃতি মিলেছিল। এখন আমরা জানি আলতামিরা গুহায় প্রাণীদের কিছু চিত্রকর্ম প্রায় ৩৬,০০০ বছর প্রাচীন।

গুহাচিত্র আবিষ্কার জীবন-রূপান্তরকারী একটি ঘটনা। সুলাবেসির লিয়াং টেডোঙ্গগে গুহায় বুনো শূকরদের চিত্র কেবল ২০২১ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং এছাড়াও আরো কিছু সাম্প্রতিক আবিষ্কার এখনো প্রক্রিয়াধীন আছে। ইউরোপের বহু উদাহরণ বহু দশক থেকেই পরিচিত, আর পরিণতিতে অধিকতর গবেষণা করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে। শভে গুহার চিত্রগুলোর সময়কাল প্রায় ৩৩,০০০ বছর প্রাচীন হিসেবে নির্ণীত হয়েছে। এগুলো আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৯৪ সালে, তিন জন অভিজ্ঞ গুহা-অভিযাত্রী যখন পাথরের স্তূপের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসা বাতাসের প্রবাহ অনুভব করে অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারা পৃথিবীর সবচেয়ে সুসংরক্ষিত গুহাচিত্রের উদাহরণগুলোর একটি আবিষ্কার করেছিলেন। সিংহের একটি পাল (প্রাইড) দেয়ালের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তাদের চোখ সতর্ক, দাগযুক্ত নাকমুখসহ তাদের নাসারন্ধ্র ঘ্রাণ ব্যবহার করে তাদের শিকার খুঁজছে। আরেকটি দেয়ালে এক পাল গণ্ডার যুদ্ধ করছে একদল ঘোড়ার নীচে, যাদের কালো কেশর খাড়া হয়ে আছে, কান সতর্ক। প্রতিটি প্রাণী পরের প্রাণীর জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, এই সবকিছু আকা হয়েছে সাহসী ও প্রত্যয়ী হাতে কয়লা দিয়ে আকা বহিঃরেখা ব্যবহার করে, যেখানে মাঝে মাঝে ঘন ছায়া সৃষ্টি করা হয়েছে বাড়তি ওজন যুক্ত করতে। কিছু ক্ষেত্রে পা একাধিকবার চিত্রে আবির্ভূত হয়েছে, য েন গতিকে ধারণ করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু আমাদের জানার কোনো উপায় নেই কীভাবে এইসব চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্য , যা কিনা শভের মতো গুহাগুলোয় আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলোর অভিজ্ঞতা নিয়েছিল সেই সময়ের মানুষরা। বহু গুহা আপাতদৃষ্টিতে ব্যবহৃত, পরিত্যক্ত এরপর পুনর্ব্যবহৃত হয়েছে বহু হাজার বছর ব্যবধানে, পুরানো চিত্রের পাশেই নতুন চিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। সময় নির্ধারণ করার পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখা গিয়েছে প্রাণীর প্রথম চিত্রটি আঁকার বহু হাজার পরে কিছু প্রাণীর চিত্র যুক্ত করা হয়েছে। বিষয়টি অনেকটা টুটানখামুনের সমাধিতে বতর্মানে কিছু চিত্র যুক্ত করার মতই ঘটনা!

শোভে গুহায় ভালুকের কঙ্কাল পাওয়া গেলেও কোনো মানব অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়নি, যা ইঙ্গিত করে এটি এমন কোনো জায়গা ছিল না যেখানে আদি মানুষরা বাস করতো, বরং এটি ছিল এমন একটি জায়গা, যা কোনো আচার বা উৎসবে ব্যবহৃত হতো। আপাতদৃষ্টিতে এটি কোনো পবিত্র স্থান, কিংবা এমনকি শিল্পকলার কোনো গ্যালারির চেয়ে খুব ভিন্ন কিছু নয়। এটি প্রাকৃতিকভাবেই সুবিশাল, এবং আকর্ষণীয় একটি স্থান, যেখানে একত্রে বহু মানুষ জড়ো হতে পারতো, হয়তো যখন শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক হতো,

অথবা ঋতুচক্রের সময়সূচীতে কোনো বিশেষ দিনকে উদযাপন করতে, অথবা পশুদের অভিপ্রয়াণ ঘটতো। দেয়ালের প্রাণীগুলো হয়তো এই গোষ্ঠীর নেতাদের দ্বারা কাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আমাদের পূর্বসূরিরা হয়তো বিশাল শিকারের কোনো কাহিনী বলতেন , অন্ধকার গুহার দেয়ালে প্রাণীদের আলোকিত করে নাটকীয়তা সৃষ্টি করে, অথবা শামানদের (আদি নিরাময়কারী) দ্বারা প্রাণী আত্মাকে জাগ্রত করার কোনো জাদুকরী কৌশলে হয়তো এই চিত্রকর্মগুলো ব্যবহৃত হতো - কিছু প্রাণী যাদের ছবি আঁকা হয়েছিল সেগুলো খাদ্যের জন্য শিকার করা হতো না, হয়তো সেগুলোকে শ্রদ্ধা এবং ভয় করা হতো।

একটি বিষয় শনাক্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ - যখন আমরা এইসব প্রাচীন চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্যগুলোকে দেখি, আমরা তখন একবিংশ শতকের চোখ দিয়ে সময়ের মধ্য দিয়ে অতীত অভিমুখে তাকিয়ে সেগুলো দেখি। যখন আমরা শোভে গুহার সিংহদের একটি প্রতিচিত্র, যা ওপরে প্রদর্শন করা হয়েছে, সেটি প্রথম দেখি, আমাদের ভাবনা কিন্তু এমন নয় যে, সেগুলো এখনই এই চিত্র থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের খেয়ে ফেলবে। আমরা এই চিত্রকর্ম নিয়ে বিস্মিত হতে পারি, কিন্তু ৩৩,০০০ বছর আগে মশালের আলোয় আদি আধুনিক মানুষ যেভাবে এগুলো দেখেছিল সেই একই অনুভূতি আমাদের মনেও জেগে ওঠার সম্ভাবনা খুবই কম। আর এই কারণে, এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে, আমরা প্রথমে অতীতে ফিরে যাবো দেখতে যে শিল্পকলা, যেভাবে এটি তৈরি করা হয়েছিল, এবং সেই মুহূর্তে এটির প্রভাব কেমন ছিল সেটি কল্পনা আর অনুভব করার চেষ্টা করব। আর এই জন্য সময়-ভ্রমণকারী সঙ্গী হিসাবে আপনাকে আমার দরকার। আমার সাথে আসুন। এরপরের গন্তব্য, মেসোপটেমিয়া।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Two sculpted bison in the Tuc d'Audoubert cave in France, around 17,000 years old
(২) Negative hand print, An ice age artist most likely created this image in Chauvet Cave by spitting red pigment over a hand pressed against the rock.
(৩) Handprints, Sulawesi, Indonesia, at a site called Leang Timbuseng
(৪) The painting at Leang Tedongnge in Sulawesi, Indonesia.
(৫) Stitched panorama view of oldest known cave paintings
(৬) Lion Man from three angles. Stadel Cave, Baden-Württemberg, Germany, 40,000 years old
(৭) Venus of Willendorf was found in a Paleolithic site near Willendorf, a village in Lower Austria.
(৮) Drawings of lions hunting bison in the End Chamber of Chauvet–Pont d'Arc, Ardèche, France.
(৯) Red bison from Altamira cave, Spain

অধ্যায় ২ - গল্পের শুরু

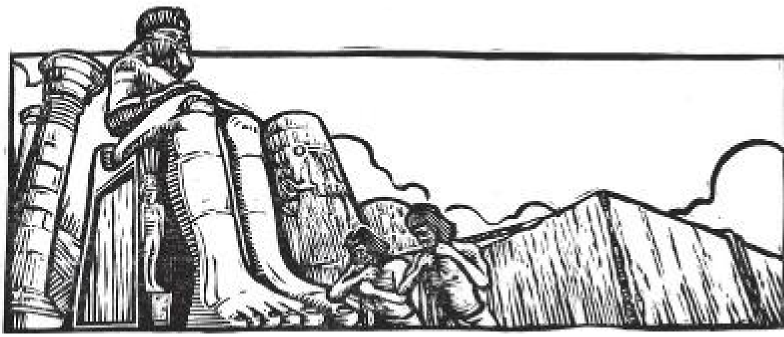

খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০০ সাল, মেসোপটেমিয়ায় উরুকে, উরুকের শাসক দেবী ইনানার প্রতি উৎসর্গীকৃত মন্দিরে দাড়িয়ে একটি দীর্ঘ অলংকৃত পাত্র মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। এটি উচ্চতায় এক মিটারের চেয়েও খানিকটা বেশি, এবং আলাবাস্টার পাথরের উপর খোদাই করা বহু শারীরিক অবয়ব এটির সম্পূর্ণ আবৃত করে আছে। এটি উপাসনা আর কৃতজ্ঞতার একটি গল্প বলছে। এর উপরিতলের পৃষ্ঠটি চারটি পৃথক 'ফ্রিজ' দ্বারা বিভক্ত, রিলিফ ভাস্কর্যের অনুভূমিক একটি বলয়,একটির উপর একটি যা সজ্জিত হয়ে পুরো পাত্রটিকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। উরুকের শাসক সেই ভাস্কর্যটি অনুসরণ করতে শুরু করলেন, নীচ থেকে উপর অবধি পড়তে।

এর ভিত্তির কাছে আঁকাবাঁকা একটি রেখা প্রবাহমান পানি ইঙ্গিত করছে, এর তীরে আমরা দেখি ফ্ল্যাক্স আর খেজুর গাছের সারি। উপরে, পাত্রের চারিদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে ভেড়া

এবং ছাগলের পাল : এটি উর্বর একটি দেশ, এবং এটি সমৃদ্ধ এবং এখন প্রাচুর্যের সময়। নগ্ন পুরুষদের একটি সারি পানীয় আর খাদ্য বহন করে নিয়ে যাচ্ছে উপরের ফ্রিজে। তারা ঝুড়ি আর অ্যাম্ফোরা (বড় কাদামাটির তৈরি পাত্র) ধরে আছে, যেগুলো কানায় কানায় পূর্ণ। উপরের ফ্রিজটি ব্যাখ্যা করছে তারা কী করছে – পুজার অর্পণ বহন করে তারা দেবী ইনানার মন্দির অভিমুখে যাচ্ছে তাকে সন্মান জানাতে। তিনি এই শহরের পৃষ্ঠপোষক দেবী, এবং শহরের নাগরিকরা তার দয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ, তিনি তাদের শস্য আর পশুদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। বড় পাত্রগুলো খাদ্যে পরিপূর্ণ, তার অনুগত অনুসারীদের নিকট থেকে আসা নৈবেদ্য। ইনানা নিজেই মন্দিরের বাইরে দাড়িয়ে সব কিছু তদারকী করছেন। তার পাশে দাড়িয়ে আছে কাপড়ে আবৃত একজন পুরুষ। তাদের নৈকট্য ইঙ্গিত করছে তারও দৈব ক্ষমতা আছে, এমনকি যদিও তিনি মরণশীল। এটি নিশ্চিত করতে পুরুষটির মাথার উপর 'পুরোহিত রাজা' শব্দটি খোদাই করা হয়েছে। উরুকের শাসক, এই পাত্রটির দিকে তাকিয়ে আছেন, তার মুখে স্মিত হাসি। নিজেকে এই পাত্রে অমর রূপে চিত্রায়িত হতে দেখে তিনি সন্তুষ্ট, যেখানে তিনি স্বয়ং ক্ষমতাশালী দেবী ইনানার পাশে দাড়িয়ে আছেন।

*

উরুক পাত্রটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম আখ্যানধর্মী শিল্পকর্মের উদাহরণগুলোর মধ্যে একটি। এটি একটি কাহিনী বর্ণনা করছে, যা আমরা বুঝতে পারি চিত্রের বিভিন্ন স্তরগুলোর দিকে তাকিয়ে, একের পর এক যা উন্মোচিত হতে থাকে, অনেকটা বর্তমান সময়ের কার্টুন স্ট্রিপগুলো যেমন করে। প্রাগৈতিহাসিক সময়ে একজন শামান অথবা একজন গোত্র-পিতা সম্ভবত গুহায় আঁকা ছবিগুলো জীবন্ত করে তুলতে সেগুলো নিয়ে গল্প বলতেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০০ সালে শিল্পীরা উরুক পাত্রের পৃষ্ঠদেশের মতো বিস্তারিত সূক্ষ্ম রিলিফ ভাস্কর্য খোদাই করার মাধ্যমে গল্প বলতে শুরু করেছিলেন। এরপর যে কেউই এই রিলিফ ভাস্কর্যের দিকে তাকিয়ে নিজেরাই এই 'গল্প' পাঠ করতে পারবেন।

রিলিফ ভাস্কর্য দিয়ে উরুক পাত্রটি (ভাস) আবৃত হয়ে আছে। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত বাইসেনের ভাস্কর্যটির ব্যতিক্রম, যা নির্মাণ করা হয়েছিল পাথরের উপর কাদা দিয়ে, এই পাত্রের উপরিতলের রিলিফ ভাস্কর্যটি পাথরের পৃষ্ঠদেশের ওপর খোদাই করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। একজন শিল্পী প্রথমে পাথরের পাত্রের উপর কয়লা বা গিরিমাটি ব্যবহার করে একটি চিত্র এঁকেছিলেন। তারপর পাথরের মিস্ত্রিরা হাতুড়ি আর ছানি ব্যবহার করে পাথর সরিয়ে সেই রেখাচিত্রটির ত্রিমাত্রিক রূপগুলো বের করে এনেছিলেন। তারা বাইসনের মতো কোনো প্রাণীদের ভাস্কর্য নির্মাণ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেননি, যা কিনা বাস্তব জীবনের যতটা সম্ভব ঘনিষ্ঠ কোনো কিছু। বরং তারা সেই দিকগুলোর উপর মনোযোগ দিয়েছিলেন, যা প্রতিটি প্রাণী অথবা মানুষকে স্বাতন্ত্র্যসূচক করে তোলে, গতিশীলতা প্রদর্শন করতে তারা মুখের পার্শ্বদৃশ্য বা অর্ধমুখ ব্যবহার করেছিলেন।

উরুক পাত্রের মতো জটিল একটি রিলিফ ভাস্কর্য খোদাই করতে নিশ্চয়ই প্রচুর সময় লেগেছিল। শুধু সুসংগঠিত ও সমৃদ্ধ কোনো সমাজই এই ধরনের কালক্ষেপণকারী

শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে। মেসোপটেমিয়ায় (বর্তমান ইরাক) ক্ষুদ্র গ্রামগুলো আকারে বড় হয়ে খ্রিস্টপূর্ব ৪,০০০ সাল নাগাদ নগরে পরিণত হয়েছিল। সবচেয়ে বড় শহরটি ছিল উরুক (বর্তমানে ওয়ার্কা), যেখানে সুশৃঙ্খল রাস্তার বিন্যাস, প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ বহিঃপ্রাচীর ছিল। একটি কেন্দ্রীয় কর্তপক্ষের মাধ্যমে (একটি সরকারের মতো) জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হতো, এবং এই লেনদেনের হিসাব রাখতেই লেখার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছিল । উরুক প্রাত্রটি একই সাথে আমাদের জানা আছে এমন কোনো প্রথম শিল্পকর্ম, যার মধ্যে লেখাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

উরুক ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর, এবং ইনানার মতো দেব-দেবীকে মহিমান্বিত করতে এর শিল্পকলা ব্যবহৃত হয়েছিল। উরুকের শাসকের জন্য এটি উপযোগী ছিল, সেই অজ্ঞাতনামা 'পুরোহিত-রাজা', যার সাথে এই অধ্যায়ের ভূমিকায় আমাদের দেখা হয়েছিল। কারণ, উরুক পাত্রে তাকেও ইনানার সমতূল্য রূপে মহিমান্বিত করা হয়েছে। আধুনিক গ্রিস, তুরস্ক থেকে ইরান, ইরাক এবং ভারতের উর্বর ভূখণ্ডের বিভিন্ন এলাকার শিল্পীরা রাজকীয় সমাধি, মন্দির আর প্রাসাদের জন্য একই ধরনের শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছিলেন। দেবতা ও শাসকদের শক্তিশালী গল্পগুলো খোদাই করে সৃষ্টি করতে এই শিল্পীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল । শাসকরা শিল্পীদের পারিশ্রমিক দিতেন, আর সেই কারণে তারা কাহিনী এবং বয়ান নিয়ন্ত্রণ করতেন।

অর্ধেক পৃথিবী দূরে মেসোআমেরিকায় (এখন যা মেক্সিকো) ওলমেক সভ্যতা তাদের নেতাদের সম্মান করতে ভিন্ন একটি উপায় নির্বাচন করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ সাল থেকে ব্যাসল্ট শিলা (এক ধরনের আগ্নেয় শিলা) ব্যবহার করে বিশাল আকারের মাথা খোদাই করে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এবং এই মাথাটিকে সুবিশাল একটি মাটির স্তূপের ওপর স্থাপন করা হয়েছিল। উদ্বৃত্ত খাদ্য ওলমেকদের সার্বক্ষণিক শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে সহায়তা করেছিল। এই মাথাগুলো খোদাই করতে তারা পাথরের হাতিয়ার ও উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন, যেগুলো উচ্চতায় প্রায় ৩ মিটার এবং ওজনের প্রায় ৮ টন কিংবা আরো বেশি ছিল। এই পাথরের খণ্ডগুলোকে সংগ্রহ করা হয়েছিল ১০০ কিলোমিটার দূরের একটি জায়গা থেকে, ভেলা আর কাঠের গুড়ির রোলার ব্যবহার করে এগুলোর পরিবহন কৃতিত্বপূর্ণ একটি অর্জন ছিল। এই ধরনের দশটি মাথা পাওয়া গিয়েছিল সান লরেন্জোর গুরুত্বপূর্ণ ওলমেক এলাকায়, যেখানে একটি বিশাল মাটির মঞ্চ মাটি থেকে ৫০ মিটার উচ্চতা অবধি উঠে গিয়েছিল।

উরুক পাত্রের গায়ে অবাস্তব আর আনুষ্ঠানিক শৈলীতে সৃষ্টি করা অবয়বগুলোর ব্যতিক্রম ওলমেক মাথার মূর্তিগুলো কিন্তু শারীরস্থান সংক্রান্ত সুস্পষ্ট উপলব্ধির উপস্থিতি ইঙ্গিত দেয়। প্রতিটি মাথার আছে মাংসল গাল, সতর্কভাবে সৃষ্ট স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, এবং সেগুলো সম্ভবত সুনির্দিষ্ট কোনো নেতাদের প্রতিনিধিত্ব করতো। প্রায়শই সেগুলো আঁটসাঁট শিরস্ত্রাণ পরিহিত, যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, তাদের চেহারায় খুব কঠোর একটি অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ করি, ভ্রূকুটি সৃষ্টি করা হয়েছিল ভ্রূ আর নাকের মধ্যে চামড়ার ভাজ সৃষ্টি করে। এখন তাদের চোখগুলো ফাঁকা, অনুভূতিশূন্য, কিন্তু এইসব মাথা শুরুতে রং দিয়ে রঞ্জিত ছিল, নিশ্চয় সেগুলো আতঙ্কে চমকে দেবার মতো স্থির দৃষ্টি নিয়ে মাটির উঁচু

মঞ্চের প্রান্ত থেকে তাকিয়ে থাকতো। আপনি যদি নতুন কোনো নেতা হতেন, তাহলে আপনি আপনার পূর্ববর্তীদের অর্জন ছাড়িয়ে যাবার তাগিদ অনুভব করতেন। এছাড়াও হয়তো আপনার পাশে তাদের পেয়ে আপনি নিজেকে ক্ষমতাবানও অনুভব করতেন। এই মাথাগুলো খোদাই এবং মাটির স্তূপের ওপর এর অবস্থানে উত্তোলন করার কাজটির নির্ভেজাল দুঃসাধ্যতা প্রদর্শন করছে কী পরিমান মর্যাদার সাথে এগুলোকে একসময় মূল্যায়ন করা হতো।

মিশরে জীবিত ফারাও বা দেবতা-রাজারা তাদের ক্ষমতার প্রদর্শন করতে একই ধরনের বিশাল আকারের ভাস্কর্য নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভাস্কর্যগুলো বাস্তবানুগ বা সত্যিকারের রূপ প্রদর্শন করবে এমন কোনো প্রত্যাশা ছিল না। মিসরের প্রাচীন রাজবংশীয় পর্বটি প্রায় মেসোপটেমিয়ার মতো প্রাচীন ছিল এবং এটি প্রায় ৩,০০০ বছর টিকে ছিল। সবচেয়ে প্রাচীনতম শাসক রাজবংশ থেকে মিসরীয় চিত্র ও ভাস্কর্য তৈরির শৈলী শনাক্তযোগ্য উপায়ে ও নির্ভরযোগ্যভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

মেসোপটেমিয়ানদের মতো মিসরীয় শিল্পীরা প্রকৃত চেহারা হুবহু আঁকা বা ভাস্কর্য সৃষ্টি করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেননি, তারা একটি ফিগার বা মানব-আকৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের সৃষ্টিতে ধারণ করতে চেয়েছিলেন, সেটি ফারাও, দেবতা কিংবা শস্যক্ষেতে কর্মরত কোনো নারী, যে-ই হোক না কেন।

প্রাচীন মিসর সমৃদ্ধ একটি রাজ্য ছিল, সুতরাং শুধুমাত্র প্রাসাদ, মন্দির আর রাজকীয় সমাধিসৌধই অলংকৃত করা হয়নি। 'নেবামুন হান্টিং ইন দ্য মার্শেস' (নেবামুন জলায় শিকার করছে) যেমন একটি দেয়ালচিত্রের উদাহরণ, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১,৩৫০ সালে , থিবসে (বর্তমান লুক্সোর) নেবামুনের সমাধিসৌধে যা সৃষ্টি করা হয়েছিল। নেবামুন ছিলেন আমুনের মন্দিরের একজন হিসাবরক্ষক, এবং তিনি শস্য উৎপাদনের হিসাব-নিকাশ করে তার দিন কাটাতেন। এই দেয়ালচিত্রে আমরা দেখি তিনি তার স্ত্রী হাটশেপসুট ও তাদের কন্যার সাথে পাখি শিকার করছেন। তিনি পার্শ্বমুখে দাড়িয়ে আছেন , তার পাগুলো একটি দিকে বরাবর হাঁটছে। তার শরীর এবং কাধ, যদিও আমাদের দিকে ফেরানো, যেন আমরা সরাসরি তাকে সামনে থেকে দেখছি। তার মাথাটি একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির মিশ্রণ: আমরা মুখটিকে পাশ থেকে দেখি, কিন্তু বাম চোখটি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন তার মাথাটি আমাদের দিকে ফেরানো। মিসরীয় শিল্পীরা কোনো ব্যক্তির সবচেয়ে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যটিকে শনাক্ত করে সেই খণ্ডাংশগুলো একত্রে যুক্ত করে সেই মানুষগুলোর প্রতীকী এবং অমর একটি প্রতিস্থাপন সৃষ্টি করতেন, যখন তারা তাদের অতিঅলংকৃত সমাধিসৌধ থেকে মৃত্যু পরবর্তী জীবন অভিমূখে যাত্রা করতেন। অধিকাংশ মিসরীয় শিল্পকলা মৃতদের সাথে পরকালে সঙ্গী হবার জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল। সমাধিসৌধের শিল্পকলা বিশেষভাবে মূল্যবান ছিল, কারণ এটি প্রাচীন মিসরীয়দের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করতো - এগুলো প্রদর্শন করতো পরকালে তারা কেমন জীবন কাটাবেন। 'জলায় শিকাররত নেবামুন' দেয়ালচিত্র ইঙ্গিত দিয়েছিল, নেবামুন তার পরিবারের সাথে শিকার করে দিন কাটাতে চান, কাজ করে নয়।

পিরামিড নির্মাণ করার এক হাজার বছর পরে, ফারাওরা একটি জায়গায় খাড়া পাহাড়ের গভীরে নতুন সমাধিকক্ষ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যে জায়গাটি এখন 'ভ্যালি অব কিংস' আর 'ভ্যালি অব দ্য কুইনস' নামে পরিচিত। প্রতিটি নতুন শাসক একটি সমাধি নির্মাণ করার উদ্যোগ নিতেন, যা এই পাথরের পাহাড়ের মধ্যে কেটে তৈরি করা হতো। কল্পনা করে দেখুন এমন কিছু অর্জন করা কত কঠিন একটি কাজ হতে পারে। সমাধি তৈরি হবার পরে সেটি অলংকরণ করা হতো। ফারাও প্রথম সেটির সমাধিটি - যিনি খ্রিস্টপূর্ব ১২৯০ থেকে ১২৭৯ সাল অবধি রাজত্ব করেছিলেন - ছিল প্রথম সমাধি, যেখানে মূল সমাহিত হবার কক্ষ অবধি প্রতিটি ঘর অলংকরণ করা হয়েছিল। এই ধরনের একটি সমাধিসৌধ তৈরি করতে ভাস্কর, শিল্পী, লিপিকার এবং জরিপকারী, শ্রমিকদের বিশাল একটি দল অপরিহার্য ছিল, যারা বিরতিহীনভাবে সেখানে কাজ করেছিলেন। ওলমেক আর মেসোপটেমিয়ানদের মতো, মিসরেও যথেষ্ট পরিমানে উদ্বৃত্ত খাদ্য ছিল, যা শিল্পীদের শুধু শিল্পকলা সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করার সুযোগ দিয়েছিল, তাদের শস্যক্ষেত্রে কোনো কাজ করতে হয়নি। ফারাওরা তাদের দক্ষতার মূল্য দিতেন, এবং শিল্পীদের জন্য নিবেদিত 'সেট মাট' (সত্যের প্রাসাদ, যা এখন দেইর এল-মেদিনা) গ্রামে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। যেখানে তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র এবং কাঠ সরবরাহ নিশ্চিৎ করা হয়েছিল, যেন তারা শুধুমাত্র সমাধিসৌধের কাজে মনোযোগ দিতে পারেন। এরকমই একজন শিল্পী ছিলেন সেনেডজেম।

আমরা সেনেডজেমের সম্বন্ধে জানি কারণ, যখন তিনি একের পর এক ফারাও-এর সমাধিসৌধে যখন কাজ করছিলেন না, তিনি তখন তার নিজের সমাধির জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি মারা গিয়েছিলে প্রথম সেটির রাজত্বকালে, এবং তার স্ত্রী আইনেফেরতির সাথে সেট মাটের কাছেই শিল্পীদের জন্য নির্ধারিত সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হয়েছিলেন। তার সমাধির দেয়ালচিত্রে আমরা দেখি তারা দুজন একটি জমিতে লাঙ্গল দিচ্ছেন, এবং ফসল কাটছেন, তাদের চারিদিকে জীবনদায়ী নীল নদের পানি। দুইজনের কেউই কৃষক ছিলেন না, এবং রাজ্য তাদের খাদ্য সরবরাহ করেছিল, সুতরাং এই চিত্রকর্মগুলো আক্ষরিক নয়। বরং এগুলো ছিল মিসরীয় ‘বুক অব দ্য ডেড’-এর একটি পর্বের চিত্রায়ন, যা নিশ্চিত করেছিল সমাহিত প্রতিটি শরীরের জন্য যেন সব সরবরাহ সংরক্ষিত থাকে, পরকালে তাদের যা দরকার হতে পারে। এটি ছিল আপনার নিজস্ব নিয়তি লেখার একটি রূপ - আপনার সমাধির দেয়ালে যদি আপনি নিজেকে এমনভাবে আঁকেন যে আপনি সমৃদ্ধশালী একটি দেশে সুখে জীবন কাটাচ্ছেন, পরকালে

ঠিক সেটাই বাস্তবায়িত হবে। আর সেই কারণে তুলি হাতে নিয়েই সেনেডজেম তার অবসর সময় কাটিয়েছিলেন।

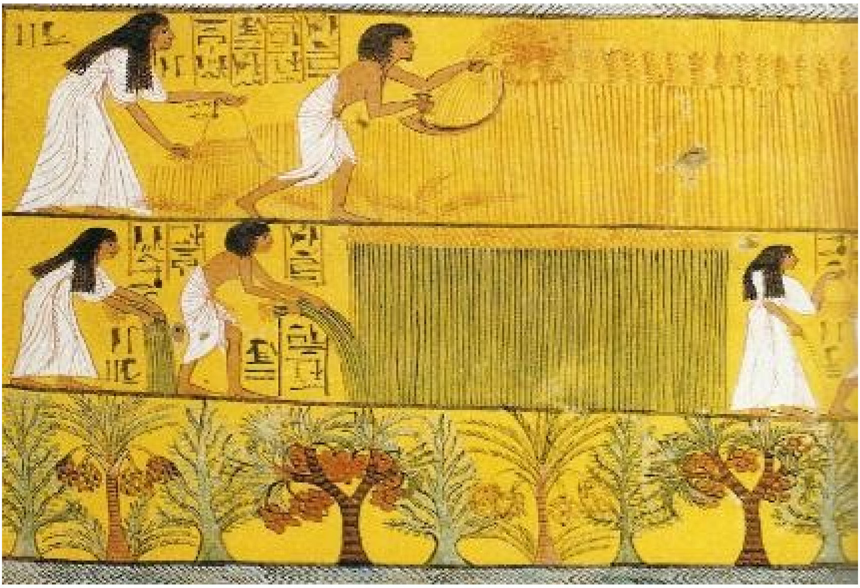

মিসরীয়রা ব্রোঞ্জ ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়নি - শিল্পকলাকে অগ্রগাধিকার দেয়া একটি সভ্যতা হিসেবে যে বিষয়টি বেশ বিস্ময়কর। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২,৮০০ সাল থেকে মেসোপটেমিয়া ও ভারতে ধাতব ভাস্কর্য নির্মাণে তামা আর টিনের সংকর ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছিল। কীভাবে ব্রোঞ্জ ঢালাই করে মূর্তি তৈরি করতে হয় সেই জ্ঞানটি প্রাচীন বাণিজ্য পথ অনুসরণ করে সঞ্চারিত হয়েছিল, এবং চীনে এটি সাদরে গ্রহন করে নেয়া হয়েছিল। চীনা সংস্কৃতিতে সেই ধরনের দ্রব্যগুলোর বিশেষ কদর ছিল, যা তৈরি করতে শ্রম আর সময়ের প্রয়োজন হতো। ব্রোঞ্জ ঢালাই সময়সাধ্য কিন্তু এটি খুবই জটিল ধাতব ভাস্কর্য ও বস্তু নির্মাণ করার সুযোগ করে দিয়েছিল, এবং খুব দ্রুত এটির শ্যাং রাজবংশীয় শাসনামলে শিল্পকর্ম নির্মাণে সবচেয়ে প্রচলিত একটি মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল। চীনা শিল্পীরা প্রথমে অপসারণযোগ্য একটি ছাচ তৈরি করতেন যে বস্তুটি পরিকল্পিত হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ একটি মডেলকে কাদামাটি দিয়ে আবৃত করে (মূল মডেলটিও কাদামাটি দিয়ে নির্মাণ করা হতো)। এই স্তরটি শুকিয়ে যাবার পরে কাদামাটির অপসারণযোগ্য ছাচগুলো থেকে মডেলের উপর থেকে সতর্কভাবে সরিয়ে নেয়া হতো। গলিত ব্রোঞ্জ এরপর এর ভিতরে ঢালা হতো, এবং স্থির হবার জন্য এটিকে সময় দেয়া হতো, এরপর ছাচটি খুলে ফেলা হলে ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যটি উন্মোচিত হতো। এভাবে নির্মিত একটি কাজের উদাহরণ হচ্ছে ‘ব্রোঞ্জে টাইগ্রেস’ পানপাত্র। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১,১০০ সালে শ্যাং রাজবংশীয় রাজত্বকালের শেষের দিকে এটি নির্মিত হয়েছিল। এটি সম্ভবত ব্যবহার করতেন কোনো পুরোহিত রাজা, তার পূর্বসূরিদের সন্মান জানাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে, এবং তার সাথে

এটি সমাহিত করা হয়েছিল, তিনি যেন পরকালেও এটি ব্যবহার করে তার নৈবেদ্য দান করা অব্যাহত রাখতে পারেন। এটি অতিঅলংকৃত একটি পানপাত্র যা নিতম্বের ওপর আসীন একটি বাঘিনীকে প্রদর্শন করছে, এটি তার শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে লেজ ব্যবহার করছে। তার সামনের পা একটি মানুষকে আলিঙ্গন করে ছিল, যে আটকে ছিল বাঘিনীর পেটের সাথে তার দাঁতালো চোয়ালের নীচে। এই ধরনের মূল্যবান একটি বস্তুকে কোনো সমাধিতে সমাহিত করার বিষয়টি সেই মৃত পুরোহিত-রাজা কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন সেটি ইঙ্গিত করে।

উত্তর মেসোপটেমিয়ায় আসিরিয়া রাজ্য সম্প্রসারিত হতে শুরু করেছিল যখন শ্যাং রাজবংশীয় শাসকরা উত্তর-পূর্ব চীন শাসন করেছিলেন, এবং একটি পর্যায়ে নব্য-আসিরিয় সাম্রাজ্য আধুনিক সময়ের সিরিয়া, ইজরায়েল ও ইরান অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। নেতারা শহরগুলো সুরক্ষিত করেছিলেন, সেচপদ্ধতি নির্মাণ করেছিলেন, এবং বহু মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। মানুষের মাথা আর ঈগলের ডানাসহ সিংহ আর ষাড়ের (লামাসু) বিশাল ভাস্কর্যগুলো শহর ও প্রাসাদের প্রবেশপথে পাহারা দিতো।

এই ভাস্কর্যগুলোর সুবিশাল আকৃতি ছিল পরিকল্পিত, যেন এই মূর্তিগুলো তাদের নীচ দিয়ে অতিক্রম করা ব্যক্তিদের ভীতিপ্রদর্শন করতে পারে। উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত অ্যালাবাস্টার রিলিফ ভাস্কর্য প্রাসাদের দেয়ালগুলো অলংকৃত করেছিল, যা পূর্ণ ছিল সেই সব দৃশ্যে, যেখানে রাজাকে আমরা বীরোচিত ভূমিকায় যুদ্ধ করতে এবং দেবতার সাথে আলাপরত অবস্থায় দেখি। এই শিল্পকলা ছিল প্রচারণার নিমিত্তে শিল্পকর্ম, ওলমেক মাথার ভাস্কর্য এবং মিসরীয় দানবীয় মূর্তির মতো।

আসুরবানিপাল খ্রিস্টপূর্ব ৬৬৮ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬২৭ সাল অবধি রাজত্ব করেছিলেন, এবং আসিরিয়ার নিনেভাহ শহরে ‘নর্থ প্যালেস’ (উত্তর প্রাসাদ) পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। এই প ্রাসাদের করিডোরের দুই পাশে সজ্জিত প্যানেলে একটি রাজকীয় সিংহ শিকারের দৃশ্যের রিলিফ ভাস্কর্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। রাজার শিকারের জন্য সিংহগুলো এদের খাচা থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যাদের আমরা এলোমেলো কেশর আর গর্জনরত মুখসহ দেখতে পাই। এই খোদাই আসিরিয় শিল্পীদের সিংহ সম্বন্ধে অনুপুঙ্খ শারীরস্থানিক জ্ঞান , এবং নাটকীয়তারপূর্ণ গল্প বলার প্রতি তাদের সুস্পষ্ট ঝোক প্রদর্শন করছে। প্রতিটি

দৃশ্যে আমরা রাজাকে বিজয়ী হিসেবে দেখি, যিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে শিকার করছেন, পায়ে হেঁটে কিংবা রথে আরোহী হয়ে, এবং বহু সিংহের মৃতদেহ চারপাশে ছড়িয়ে আছে । প্রতিটি ফিগার এখানে মিসরীয় রিলিফ ভাস্কর্যগুলোর মতো আনুষ্ঠানিক ও শৈলীভূত, কিন্তু আরো বেশি বিস্তারিত। রাজা ও তার কিছু রাজকীয় অনুচরদের টানটান করে সজ্জিত কুঞ্চিত দাড়ি আমরা দেখতে পাই, তারা সবাই খাটো আস্তিনযুক্ত বহির্বাস বা টিউনিক এবং বাঁকানো বাহুবন্ধনী ও কানের দুল পরিহিত। এই ভাস্কর্যের প্যানেলগুলো অভিভূত করার মতোই সুন্দর , প্রাচীন পৃথিবীর আখ্যানধর্মী শিল্পকর্মের শীর্ষবিন্দু, কিন্তু কল্পনা করুন, আসুরবানিপালে সত্যিকারের প্রাসাদের মধ্যে এগুলো দেখতে কেমন লাগতো। মশালের আলোয় আলোকিত, যেখানে প্রতিটি মানুষ ও পশু উজ্জ্বল রঙে বর্ণিল, আপনার চারপাশে প্রবলভাবে জীবন্ত হয়ে উঠছে সেই শিকারের দৃশ্য, কাকে আপনার বেশি ভয় পাবার কথা , সিংহ নাকি আসুরবনিপালকে?

খ্রিস্টপূর্ব ৬১২ সালে নব্য-আসিরিয় সাম্রাজ্য আকস্মিকভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল যখন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যগুলো সম্মিলিতভাবে এটি আক্রমণ করেছিল। এর বহু শহর ধ্বংস হয়েছিল, এবং দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় নতুন একটি ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এটিকে প্রতিস্থাপন করে, যে সাম্রাজ্যটি পরবর্তী শতাব্দীতে বিশাল একটি পারস্য সাম্রাজ্য দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু, আরো পশ্চিমে, মানব শরীরের ভাস্কর্য নির্মাণে একটি বৈপ্লবিক নতুন পদ্ধতি গ্রিসে আবির্ভূত হতে শুরু করেছিল।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Warka (Uruk) Vase, Uruk, Late Uruk period, c. 3500-3000 B.C.E.
(২) Olmec stone head
(৩) Colossi of Memnon: two massive statues of the Pharaoh Amenhotep III
(৪) excerpt from a mural in the tomb of Nabamun in Thebes-West

(৫) tomb of Pharaoh Seti I, Valley of the Kings, Egypt
(৬) Wall painting, Tomb of Sennedjem, Tomb of Sennedjem Deir el-Medina
(৭) A Shang dynasty bronze vessel to preserve drink; 11th century BC
(৮) Human-headed winged bull (lamassu), ca. 883–859 B.C
(৯) Relief depicting Ashurbanipal hunting a lion. Assyrian, 645–640 BC.
(১০) Detailed from "Lion Hunt of Ashurbanipal," Ashurbanipal

অধ্যায় ৩ - জীবনের বিভ্রম

গ্রিসের এথেন্স শহরে মৃৎশিল্পীদের এলাকা কেরামেইসে (কেরামুস - মৃৎশিল্পী) দুই ব্যক্তি গভীর মনোযোগের সাথে তাদের কাজ করছিলেন। তখন খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০ সাল, এবং মৃৎশিল্পী আমাসিস ছোট একটি লেকাথোস বা তেল রাখার পাত্রে তার শেষ প্রলেপ দিচ্ছিলেন। তাদের পরিবারের জন্য উলের কাপড় বানাতে নারীরা একটি তাঁত নিয়ে কাজ করছেন এমন একটি চিত্র এর উপর আঁকা হবে। তার এই মৃৎপাত্রের উপর চিত্র আঁকতে আমাসিস অন্য শিল্পীদের নিয়োগ দিয়েছিলেন, যেন তিনি মৃৎপাত্র নির্মাণে মনোযোগ দিতে পারেন। কুমোরের চাকের উপর তিনি আরো কাদামাটি উঠালেন এবং একটি অ্যাম্ফোরা (লম্বাটে সুচালো তলের মৃৎপাত্র) তৈরি করতে শুরু করলেন। তার চিত্রশিল্পী ইতোমধ্যেই এটির উপর কী আঁকা হবে তা পরিকল্পনা করে রেখেছেন, এটির উপর নগ্ন যোদ্ধাদের ছবি আঁকা হবে, যারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এবং একজন নারী একটি বর্শা হাতে দাড়িয়ে আছে।

এদিকে ভিন্ন একটি কুমোরশালায়, শিল্পী এক্সিকিয়াসও একটি অ্যাম্ফোরার ওপর ছবি আঁকছিলেন। এটি ট্রয়ের যুদ্ধ নিয়ে জনপ্রিয় গল্পগুলোর একজন নায়ক, তার প্রিয় চরিত্র অ্যাকিলিসকে প্রদর্শন করছে । এক্সিকিয়াস সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি অ্যাকিলিস আর

সহযোগী যোদ্ধা অ্যাজাক্সকে দেখাবেন, তারা পাশা খেলছেন, জুয়ার একটি খেলা, যখন তারা যুদ্ধ থেকে বিশ্রাম নিচ্ছেন। অ্যাকিলিসের তখনো শিরস্ত্রাণ পরে আছেন, দুজনেই সতর্ক, বর্শা হাতে প্রস্তুত ।

এক্সিকিয়াস কালো-অবয়ব চিত্রায়নে দক্ষ একজন শিল্পী ছিলেন, কিন্তু কেরামেইসে শিল্পীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল। এখান থেকে মৃৎপাত্রগুলো নিয়মিতভাবেই ভূমধ্যসাগরীয় রাজ্যগুলোয় রপ্তানী করা হতো, এবং সেরা মৃৎশিল্পী এবং চিত্রকরদের চাহিদাও ছিল প্রচুর। এক্সিকিয়াস জানেন তার বিশ্রাম নেবার সময় নেই। তিনি আবার হাতে তুলি নিলেন, এবং অ্যাকিলিসের ঢাল আঁকতে শুরু করলেন।

*

এক্সিকিয়াসের সময় এথেন্স ‘ব্ল্যাক-ফিগার’ বা কালো-অবয়বের চিত্রকর্মের কেন্দ্র ছিল। এই কৌশলটি আবিষ্কৃত হয়েছিল আরেকটি গ্রিক শহর করিন্থে, কিন্তু এক্সিকিয়াসের মতো শিল্পীদের কারণে, যারা এর মাত্রাটি বৃদ্ধি করেছিলেন, এবং গ্রিক পুরাণ আর কাহিনী চিত্রায়িত করতে শুরু করেছিলেন, খুব শীঘ্রই এথেন্স এই বাজারে প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করেছিল। শিল্পীরা তরল কাদামাটির দ্রবণ ব্যবহার করে আঁকতেন, যাকে বলা হতো ‘স্লিপ’। চিত্র আর ফিগারগুলো আঁকা হয়ে গেলে এরপর কাদামাটির ভিত্তি অবধি স্লিপের

মধ্য দিয়ে তাদের চিত্রগুলো খোদাই করতেন। এভাবে তারা শিরস্ত্রাণের উপর ঘুর্ণি আর আলখেল্লার জটিল নকশা আর বিন্যাসগুলো আঁকতেন। যখন চুল্লী বা ভাঁটিতে আগুনে পোড়ানো হতো স্লিপ আবৃত অংশটি কালো আর চকচকে হয়ে উঠতো, আর স্লিপ ছাড়া উন্মুক্ত জায়গাগুলো কমলা রঙের থেকে যেত।

আজ আমরা এই মৃৎপাত্রগুলোর বিশেষ মূল্য দেই এর ওপর চিত্রায়িত কল্পনাপূর্ণ উদ্ভাবনী ফিগারগুলোর জন্য, যা শিল্পীরা সৃষ্টি করেছিলেন শুধুমাত্র কাদামাটির 'স্লিপ' ব্যবহার করে। ফিগারগুলো সমতল এবং আনুষ্ঠানিক, শৈলীবদ্ধ ও অবাস্তব প্রকৃতির, কিন্তু সেরা উদাহরণগুলো, যেমন যেগুলো শিল্পী এক্সিকিয়াস তৈরি করেছিলেন, প্রায়শই খুবই বিস্তারিত এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তবে ২,৫০০ বছর আগে যে শিল্পীরা প্যানেল বা দেয়ালের ওপর কাজ করতেন, তারা পাত্রের ওপর আঁকা শিল্পীদের চেয়ে বেশি মর্যাদা পেতেন। দুই ধরনের শিল্পীদের মধ্যে এই সময় নাগাদ পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল, দেখার জন্য যারা দেয়ালে চিত্র আঁকেন, তাদের 'শিল্পী' হিসেবে চিহ্নিত করা শুরু হয়েছিল, আর যারা অ্যাম্ফোরার মতো উপযোগী পণ্যের ওপর অলংকরণ হিসেবে চিত্র আঁকতেন, সেই শিল্পীদের 'আর্টিজান' বা কারুশিল্পী হিসেবে দেখা হতো।

প্লিনি দ্য এলডারের মত প্রাচীন লেখকরা শিল্পীদের প্রশংসা করেছিলেন, যিনি লিখেছিলেন যে, শিল্পীরা নিয়মিতভাবে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করেন বাস্তব জীবনের সবচেয়ে সেরা মায়া বা বিভ্রমটি সৃষ্টি করতে, একটি কৌশল যা এখন ট্রোম্প ল'য় (বা চোখকে ধোঁকা দেয়া) নামে পরিচিত। অল্প কিছু দেয়াল চিত্র এখনো টিকে আছে, কিন্তু যেগুলো টিকে আছে সেগুলো প্রদর্শন করে, এই সময় নাগাদ শিল্পীরা অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। কারুশিল্পীদের ওপর নয়, এই বইটি মূলত শিল্পীদের ওপর, অলঙ্করিষ্ণু শিল্পকর্ম নয় বরং দৃশ্যমান শিল্পকলার ওপর মনোযোগ দেবে। তবে এক্সিকিয়াস ছিলেন এই দুই শিবিরেরই একজন দুর্লভ বাসিন্দা, কারণ তার চিত্রকর্ম এই পাত্রগুলোকে যখন আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতো, সেগুলো শুধু অলংকরণ থেকেও

আরো বেশি কিছু হতো। যদিও সেগুলো প্রচলিত চোখকে ধোকা দেবার কারসাজি বা কৌশল ব্যবহার করতো না। কিন্তু এগুলো নিজেরাই গল্প বলতো, নাটকীয়তা আর উত্তেজনাপূর্ণ গ্রিক পুরাণ থেকে সংগৃহীত কাহিনী। এস্কিকিয়াস কারুশিল্পীর অলংকরণের দক্ষতা চিত্রকলার সাথে যুক্ত করেছিলেন।

আজ যদিও গ্রিক চিত্রকর্ম অধ্যয়ন করার কাজটি কঠিন, কারণ এর বিশাল অংশই হারিয়ে গেছে। কিন্তু মূল কিংবা পরবর্তী সময়ে করা অনুলিপি হিসেবে গ্রিক ভাস্কর্যের বহু উদাহরণ আছে, যেগুলোর এখনো অস্তিত্ব আছে। অ্যাম্ফোরার মতো কোনো উপযোগী পণ্য হিসাবে ভাস্কর্য তৈরি করা হয়নি, বরং শিল্পকলা হিসেবে সেগুলো দেখতে , অধ্যয়ন এবং নান্দনিক বস্তু হিসেবে উপভোগ করতেই সেগুলো পরিকল্পিত হয়েছিল। শুরুর দিকে গ্রিক ভাস্কররা মিসরীয় মূর্তিগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে সেই শতাব্দীতে, যখন 'কালো-অবয়ব' চিত্রের মৃৎপাত্রগুলো খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, এইসব আড়ষ্ট পাথরের ভাস্কর্যগুলো ক্রমান্বয়ে শিথিল হতে শুরু করেছিল। শারীরিক অবয়বের অনুপাতগুলো আরো সুসম, এবং চেহারাগুলো আরো জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হতে শুরু করেছিল। এইসব ভাস্কর্যগুলো আর সময়ে হিমায়িত আদর্শায়িত তরুণদের মতো দেখতে ছিল না, বরং এগুলো দেখতে সত্যিকারের নারী ও পুরুষের মতো হতে শুরু করেছিল।

এখন আমরা যাকে 'ক্লাসিকাল' শিল্পকলা বলি, এটি ছিল তার সূচনা এবং ইতোপূর্বে যা কিছু ঘটেছিল এটি সেই সব কিছু থেকে একটি বৈপ্লবিক প্রস্থান ছিল। কিন্তু পৃথিবীর প্রথম গণতন্ত্র হিসেবে এথেন্সের রূপান্তরের কারণে কী এই পরিবর্তনগুলো ঘটেছিল? গণতন্ত্র মানে কোনো একক অনির্বাচিত নেতার পরিবর্তে জনগন যখন শহর শাসন করে, (সেই সময়ে এই জনগণে অবশ্য নারী, শিশু আর দাসরা অন্তর্ভুক্ত ছিল না)। সত্যিকারের মানুষরাই তখন নগর পরিচালনার আইন তৈরি করতে শুরু করেছিল, এবং শহরের ভাস্কর্যগুলো ক্রমশ আরো জীবন্ত ও বাস্তবানুগ হয়ে উঠতে শুরু করেছিল।

গ্রিক শিল্পকলা হচ্ছে সেই ভিত্তি যার ওপর পুরো পশ্চিমা শিল্পকলা নির্মিত হয়েছে। কিন্তু সেই সময়ে, গ্রিস কোনো একক দেশ ছিল না, বরং এটি তৈরি করেছিল স্বাধীন এক গুচ্ছ নগর-রাষ্ট্র। খ্রিস্টপূর্ব ৫০৮ সালে যখন এথেন্স একটি গণতান্ত্রিক নগর-র াষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল, তখন স্পার্টা নগর-রাষ্ট্র এই এলাকায় প্রধান শক্তি ছিল। এই দুটি শহর জোট বেঁধে যুদ্ধ করেছিল যখন খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ সালে পারসিকরা গ্রিস আক্রমণ করেছিল। পরিশেষে পারস্য সাম্রাজ্যের এই আগ্রাসন প্রতিহত করতে এথেন্স আরো দুইশত গ্রিক শহরের সাথে জোটভুক্ত হয়েছিল। প্রতিটি শহর একটি কেন্দ্রীয় তহবিলে এই লক্ষ্যে আর্থিক অনুদান জমা করেছিল, এবং এর পরিণতিতে এথেন্স খুবই সমৃদ্ধ আর শক্তিশালী নগর-রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই গ্রিক ভাস্কররা ব্রোঞ্জ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছিলেন কিন্তু গ্রিক-পারসিক যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ব্রোঞ্জ আসলেই গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল। আরো বিশাল, আরো প্রাণবন্ত ভাস্কর্যের ক্রমবর্ধমান একটি চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল, এবং এর জন্য ব্রোঞ্জ ছিল সবচেয়ে আদর্শ উপাদান। এটিকে পালিশ করে মসৃণ করে তোলা যায় যেন এর ত্বক আলো

প্রতিফলিত করতে পারে, শিল্পীরা কাচের চোখ আর রুপার দাত যুক্ত করতে পারতেন। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পুনর্ব্যবহারের লক্ষ্যে ব্রোঞ্জ খুব সহজেই গলিয়ে নেয়া যেতে পারে, পরিণতিতে বর্তমানে খুব সামান্যই গ্রিক ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের অস্তিত্ব আছে। যেগুলো টিকে আছে, সেগুলো হয় বহনকারী জাহাজের নিমজ্জিত হওয়ার স্থান অর্থাৎ সমুদ্রের তলদেশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, যেমন, 'রিয়াচে ওয়ারিয়রস', নয়তো ভূমিকম্পে সৃষ্ট ধ্বংস্তূপের নীচ থেকে এগুলো আবিষ্কার করা হয়েছিল, যেমন, 'চ্যারিওটিয়ার অব ডেলফি'।

এইসব ব্রোঞ্জগুলো আমাদের প্রদর্শন করেছিল ভাস্কররা তাদের সৃষ্ট মানবমূর্তিগুলোকে আরো বাস্তবানুগ আর জীবন্ত করে তুলতে ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করা অব্যাহত রেখেছিলেন।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৪ সালে নির্মিত ডেলফির সারথি (বা রথচালক) ছিল পূর্ণাঙ্গ বা প্রমাণ আকারের, তার পরণে ছিল খাটো আস্তিনযুক্ত বহির্বাস বা টিউনিক, রথচালকের উর্দি। তার হাতে ধরা ছিল একগুচ্ছ ঘোড়ার লাগাম বা রাশ, যে ঘোড়াগুলো হয়তো এক সময় মূল ভাস্কর্যের অংশ ছিল। এই ভাস্কর্যটি নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন একজন বিজয়ী ক্রীড়াবিদ, যিনি ডেলফিতে প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হওয়া পাইথিয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রথ চালনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিলেন। ব্রোঞ্জের এই সারথি এমনকি তার বিজয়ের মুহূর্তেও খুব গম্ভীর, তার তারুন্যময় মুখের চারপাশে ঘিরে রেখেছে কোকড়ানো চুল, যেগুলো তার মাথার বৃত্তাকার বন্ধনী থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে। তার কাচ আর অনিক্সের চোখ বিস্ময়করভাবেই বাস্তবানুগ, এর প্রান্তে তামা নির্মিত চোখের লোমও যুক্ত করা হয়েছিল। তবে তার পরণের টিউনিকটি ক্রীড়াবিদের শরীরকে আবৃত করে রাখা কোনো পরিচ্ছদের তুলনায় বরং স্থবির কোনো গ্রিক কলাম বা স্তম্ভের মতো অনুভূত হয়, এবং এই পর্যায়ে ভাস্কর্যটির স্বভাববাদ, এর স্বাভাবিক উপস্থিতি, হোঁচট খায়।

দুই দশক পরে, এই ধরনের অনশ্চিয়তার কোনো উপস্থিতি মেলেনি রিয়াচে যোদ্ধাদের ভাস্কর্য দুটিতে। প্রথমত তারা নগ্ন, সুতরাং তাদের মাংসপেশি এবং শারীরিক শক্তি আমরা দেখতে পারি। এই ব্যক্তিদ্বয় শুরুতে একটি স্মৃতিসৌধের অংশ ছিল, যা পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গ্রিক নগর-রাষ্ট্রগুলোর বিজয়ের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত ছিল। এগুলো উচ্চতায় প্রায় ২ মিটার, এবং এর মূল রূপে সম্ভবত কাঠ-নির্মিত ঢাল ধরে ছিল তাদের উচু করে ধরে রাখা বাম অগ্রবাহুতে, এবং ডান মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে ধরা ছিল দীর্ঘ একটি বর্শা। একটি মানব-মূর্তিকে আপাতদৃষ্টিতে অন্যটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত তরুণ অনুভূত হয়, তার পেশিগুলো সপ্রাণ, পেছনে টেনে ধরা কাধ, নীচে নয় বরং তার দৃষ্টি সামনে।

স্মৃতিসৌধগুলো সাধারণ যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হতো, তাদের জন্য সেটি মর্যাদাপূর্ণ একটি বিষয় ছিল, এবং প্রমাণ আছে যে, গ্রিক নারী ও পুরুষ, উভয়েই মূর্তি নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, কিন্তু স্পষ্টত তা করতে যথেষ্ট পরিমানে বিত্তশালী হওয়া প্রয়োজন ছিল। মন্দির নির্মাণ করা কোনো শহরের জন্য সমতূল্য একটি ব্যয়বহুল

কাজ ছিল, তবে সেটি মর্যাদাপূর্ণ একটি কর্মকাণ্ড ছিল। অলিম্পিয়ায় জিউসের মন্দির নির্মাণের কাজটি সমাপ্ত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৬ সালে। এর এক দশকের মধ্যেই এথেন্স শহর এর পৃষ্ঠপোষক দেবী এথিনার প্রতি নিবেদনে এর নিজস্ব প্রতিদ্বন্দ্বী মন্দির নির্মাণ করতে শুরু করেছিল, এবং অ্যাক্রোপলিসে উঁচু একটি পাহাড়ের উপর এই মন্দিরটি অবস্থিত ছিল, পুরো শহরের ওপর যে স্থাপত্য স্থাপনাটি প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল। পার্থেনন মন্দিরটি (খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৭ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪৩২ সাল) উদ্দেশ্যমূলকভাবেই অলিম্পিয়ার জিউসের মন্দির, অথবা গ্রিসের অন্য যে-কোনো মন্দিরের চেয়ে আকারে আরো বড় করে নির্মিত হয়েছিল, এবং এটি নির্মাণে সম্পূর্ণভাবে মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। এথেন্সের কর্তৃত্বাধীন শহর-রাষ্ট্রগুলোর আনুগত্যস্বরূপ প্রদত্ত কর থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহার করে শহরটির নেতা পেরিক্লিস ভাস্কর ফিডিয়াসকে পার্থেননের সার্বিক শৈল্পিক পরিকল্পনাটি তত্ত্বাবধান করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

আপনি যখন আক্রোপলিসের ওপরে উঠবেন (অ্যাক্রোপলিস, এথেন্সের নিকটে পাথুরে পাহাড়ের উপর নির্মিত একটি নগরদূর্গ) এবং প্রবেশদ্বার অতিক্রম করবেন, আপনি পার্থেননের দিকে অগ্রসর হবেন এর পেছন দিক থেকে। পুরো ভবনটির উপরের অংশ পরিবেষ্টিত করে রাখা মার্বেল প্যানেলের ওপর একটি ফ্রিজ খোদাই করা হয়েছিল, এর চারপাশে আপনার পরিদর্শনের সময়ে সঙ্গী হিসেবে একটি দৃশ্যমান আখ্যান হিসেবে যা পরিকল্পিত হয়েছিল। মূলত উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত এই ফ্রিজটি মহান প্যানঅ্যাথেনাইয়া - গ্রীষ্মকালীন ব্যয়বহুল একটি উৎসবের চিত্র প্রদর্শন করে, যে অনুষ্ঠানটি প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হতো। এই উৎসবটি সমাপ্ত হতো দেবী অ্যাথিনার উদ্দেশ্যে একটি নতুন পেপলোস (রোব বা আলখাল্লা) নিবেদন করার মাধ্যমে, যিনি এথেন্স শহরটির রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক দেবী। আপনিও সেই নারী আর পুরুষের শোভাযাত্রার অংশে পরিণত হবেন,

যারা অ্যাম্ফোরা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে এবং বিসর্জন দেবার উদ্দেশ্যে পশু নিয়ে এসেছে । এটি সেই উরুক পাত্রের গায়ে চিত্রিত শোভাযাত্রার মতো, তবে আরো বিশাল মাত্রায়। আপনি যখন পার্থননের মূল প্রবেশদ্বারের দিকে মোড় ঘুরবেন, ফ্রিজটি পরিবর্তিত হয়ে যায়, বড় আকারে উপবিষ্ট চরিত্রগুলো ইঙ্গিত দেয় আপনি এখন দেবতাদের উপস্থিতিতে আছেন।

পার্থেননের অভ্যন্তরে দেবী অ্যাথিনার একটি বিশাল ভাস্কর্য ছিল, যার উচ্চতা ছিল প্রায় ১২ মিটার, এবং এটি আইভরি আর স্বর্ণে সম্পূর্ণভাবে আবৃত ছিল । কল্পনা করুন - তিন তলা ভবন সমান উচ্চতার একটি ভাস্কর্য ! শুধু ব্যবহৃত স্বর্ণের পরিমান ছিল এক টনেরও

বেশি, এবং সেই সময়ে আইভরি ছিল সবচেয়ে ব্যয়বহুল উপাদান। হাতির গজদন্তের ভাজ উন্মুক্ত করে আইভরি পাতগুলোকে অ্যাথিনার ত্বকে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং শ্রমসাধ্য উপায়ে এটি তার গাল, গলা, হাত এবং বাহুর ছাঁচে যুক্ত করা হয়েছিল। এই একটি ভাস্কর্য পার্থননের বাকি সব কিছুর চেয়ে ব্যয়বহুল ছিল। এটি ছিল একটি শহরের পক্ষে সম্ভব হতে পারে এমন ক্ষমতা, মর্যাদা আর সমৃদ্ধির সুবিশাল একটি বার্তা ।

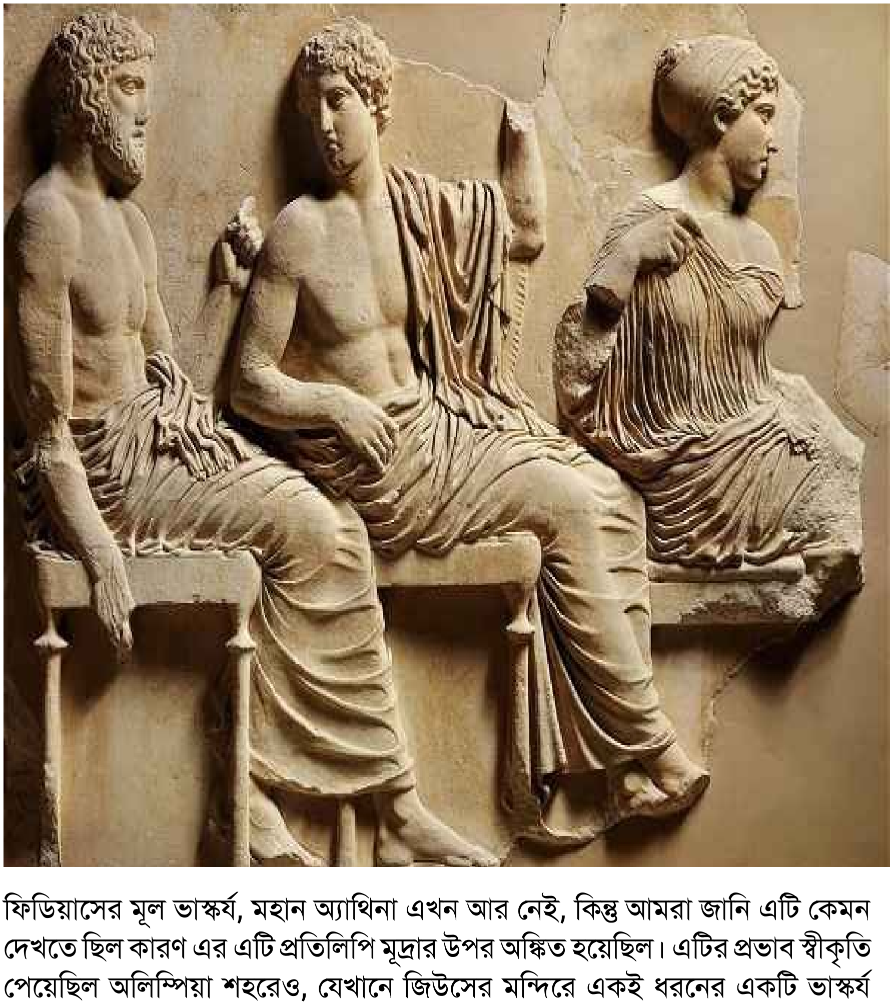

ফিডিয়াসের মূল ভাস্কর্য, মহান অ্যাথিনা এখন আর নেই, কিন্তু আমরা জানি এটি কেমন দেখতে ছিল কারণ এর এটি প্রতিলিপি মূদ্রার উপর অঙ্কিত হয়েছিল। এটির প্রভাব স্বীকৃতি পেয়েছিল অলিম্পিয়া শহরেও, যেখানে জিউসের মন্দিরে একই ধরনের একটি ভাস্কর্য নির্মাণ করার জন্য ফিডিয়াসকে পরবর্তীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল । খুবই দুঃখজনক এবং লজ্জার ব্যপার এই দুটি অসাধারণ ভাস্কর্যের কোনোটিরই আর অস্তিত্ব নেই, কারণ সেই সময়ে উপবিষ্ট জিউসের সেই ভাস্কর্যটিকে ফিডিয়াসে শ্রেষ্ঠতম কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল, এবং সেটিকে প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

এক সময় মন্দিরের প্রাঙ্গন বহু সংখ্যক ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য দিয়ে পূর্ণ ছিল, এবং ভবনগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে থাকা রাস্তার দুই পাশে সারি বাধা তাদের ভিত্তির অবশিষ্টাংশ এখনো আছে, কখনো দুই বা তিন মিটার মাটির গভীর অবধি। এইসব ভাস্কর্যের অধিকাংশই এখন হারিয়ে গেছে, পরবর্তী যুদ্ধের সময় যেগুলোকে গলিয়ে মূল্যবান ধাতু পুনর্ব্যবহার করা হয়েছিল। অলিম্পিয়ায় কমপক্ষে ১০০০ শূন্য বেদীমূল আবিষ্কার করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই সব ভাস্কর্যের কিছু ব্রোঞ্জ প্রতিলিপি দেখবো, যখন আমরা রোমে যাবো, কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগে গ্রিক ভাস্করদের কাছে মার্বেল প্রথম পছন্দ হিসাবে পুনপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, এবং সেটি ঘটেছিল প্র্যাক্সিটিলিসের সৃষ্টির মাধ্যমে।

অ্যাথেন্সের নাগরিক ও একজন ভাস্করের পুত্র প্রাক্সিটিলিস তার জীবদ্দশায় খুবই সফল একজন ভাস্কর ছিলেন, এবং আপাতদৃষ্টিতে আর্থিকভাবে বেশ স্বচ্ছল ছিলেন। তার ভাস্কর্যগুলোর ভিত্তি হিসেবে তিনি জীবন্ত মডেল ব্যবহার করতেন। প্রথমে তিনি ব্রোঞ্জ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তার কাজের মাধ্যম হিসেবে তিনি মার্বেল পাথর নির্বাচন করেছিলেন, এবং শক্ত পাথরকে পেলব ত্বকের রূপ দিতে পারার ক্ষমতায় দ্রুত সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তার সৃষ্টি করা ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে একটি, ‘অ্যাফ্রোদিতি অব নাইডোস’ বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ সালে খোদাই করা এই ভাস্কর্যটি নগ্ন কোনো নারীর পূর্ণাঙ্গ ও প্রমাণ আকারের প্রথম ভাস্কর্য এবং পাশ্চাত্য শিল্পকলার ইতিহাসে নারী ন্যুড বা নগ্নশিল্পের সূচনা বিন্দু। পুরুষ শিল্পীরা - পুরুষ পৃষ্ঠপোষক ও পুরুষ দর্শকদের জন্য - কাজ করার সময় পৌনঃপুনিকভাবে বিষয় হিসেবে নগ্ন নারী শরীরের নিকটে ফিরে এসেছিলেন, এটিকে দেখার মতো একটি বিষয়ে আর বস্তুতে রূপান্তরিত করেছিলেন।

প্র্যাক্সিটিলিস আফ্রোদিতিকে নিয়ে ঠিক সেটাই করেছিলেন। স্নান করবেন বলে দেবী আফ্রোদিতি কেবলই তার কাপড় খুলেছেন (পানির একটি কলস তার বাম দিকে অবস্থান করছে)। তিনি এখানে তার শরীর প্রদর্শন করছেন না, বীরোচিত শক্তির স্মারক হিসেবে, যেমন আমরা রিয়াচে যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম, অথবা পুরুষরা যেমন করে থাকে, যখন জিমনেশিয়ামে তারা নগ্ন হয়ে শারীরিক অনুশীলন করে। নারীরা নগ্ন হয় একান্তে, এবং আফ্রোদিতির সেই ব্যক্তিগত মুহূর্তটিকে বিঘ্নিত করা হয়েছে, তিনি হাত দিয়ে তার শরীর আবৃত করার চেষ্টা করছেন। 'কন্ট্রাপোস্টো' (একটি বঙ্কিম ভঙ্গিমা) প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রাক্সিটিলিস তার শরীরে একটি বাঁক যুক্ত করেছিলেন, তিনি একটি পায়ের উপর ভর করে দাড়িয়ে আছেন, একটি বেঁকে যাওয়া পা, খানিকটা উঁচু হয়ে থাকা কোমর, ঝুকে থাকা কাধ।

আফ্রোদিতিকে মূলত একটি মন্দিরের কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছিল, এবং ভাস্কর্যটিকে সব দিক থেকে দেখা যেত। পর্যটকদের জন্য ভাস্কর্যটি একটি আকর্ষণে পরিণত হয়েছিল, এবং এটির মালিক শহর, নাইডোস (আধুনিক তুরস্কের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি গ্রিক শহর) গর্বের সাথে এই ভাস্কর্যের চিত্রটি তাদের মূদ্রায় ব্যবহার করেছিল। আফ্রোদিতি এখানে শহরটির শক্তি প্রদর্শন করেনি, যেভাবে বিশালাকার অ্যাথিনার ভাস্কর্যটি করেছিল, বরং এটি শিল্পীর সৃজনশীল শক্তি প্রদর্শন করেছিল, সেই শিল্পী, যিনি শীতল মার্বেল পাথরকে জীবন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ন রক্ত-মাংস আর ত্বকে রূপান্তরিত করতে পারেন। মূল ভাস্কর্যটি এখন হারিয়ে গেছে, কিন্তু বহু সংখ্যক রোমান প্রতিলিপি, এবং পরবর্তীতে করা প্লাস্টারের অনুলিপি এর খ্যাতির স্থায়িত্ব আজ অবধি টিকিয়ে রেখেছে।

তার প্রজন্মে প্রাক্সিটিলিস নেতৃস্থানীয় ভাস্করদের মধ্যে একজন ছিলেন, এবং তার কাজের ব্যাপক চাহিদা ছিল। যে সময়ে তিনি অ্যাফ্রোদিতি সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি ছিলেন বেশ

কয়েকজন বিখ্যাত ভাস্করদের একজন, যারা মাউসোলুসের সুবিশাল সমাধিসৌধে কাজ করছিলেন। মাউসোলুস ছিলেন পারসিক একজন শাসক যিনি হ্যালিকারনাসোসে বাস করতেন (বর্তমানে তুরস্কের বডরুম)। ভাস্করদের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করতে হতো কমিশনের কাজ করতে গিয়ে, কারণ স্থানীয় বিত্তশালী নেতারা অমরত্ব অর্জনে শিল্পকলার গুরুত্ব অনুভব করতে পেরেছিলেন। মাউসুলোসের বিশাল সমাধিসৌধ গ্রিক ভাস্করদের নির্মিত বহু ভাস্কর্যে পূর্ণ ছিল। এটি এতো আকর্ষণীয় ছিল যে, এটি 'মউসোলিয়াম' শব্দটি সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত করেছিল, যা অর্থ সুবিশাল মহিমান্বিত সমাধিসৌধ।

গ্রিক মূল ভূখণ্ডের বাইরে গ্রিক শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক প্রভাব 'হেলেনিজম' নামে পরিচিত পেয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যখন ম্যাসিডোনের গ্রিক নেতা আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট মিসর থেকে ভারত অবধি পূর্ববর্তী পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকৃত এলাকাগুলো জয় করেছিলেন, হেলেনিজমও আরো বিস্তৃত হয়েছিল। এর একশ বছর পরে , এবং অর্ধেক পৃথিবী দূরে চীনে আরেকজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা তার নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছিলেন। তার মউসোলিয়ামটিও এর মাত্রায় ছিল অভূতপূর্ব, পৃথিবীর সর্বকালের সর্ববৃহৎ ভাস্কর্য প্রকল্প।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Women weaving on a loom. Black-figure lekythos attributed to the Amasis Painter (detail). Ca. 550-530 BCE.
(২) Exekias, Achilles and Ajax playing a dice game, detail from an Athenian black-figure amphora, ca.540-530BC
(৩) *The Spring* Fresco, from Akrotiri, Thera (Santorini)
(৪) Charioteer of Delphi, also known as Heniokhos, an example of ancient bronze sculpture
(৫) Riace Bronze Warrior. 460-450 BCE
(৬) Temple of Zeus at Olympia, interior view with statue by Pihidias, (artist Imagnation)
(৭) Youths leading a heifer to the sacrifice. from the South frieze of the Parthenon, ca. 447–433 BC.
(৮) Procession of Water Carriers (Parthenon, north frieze), 440-432 BCE
(৯) Poseidon, Apollo, and Artemis on the Parthenon east frieze
(১০) Statue of Athena inside the Parthenon in ancient Athens (Artist Imagination)
(১১) Cnidus Aphrodite. Roman copy after a Greek original of the 4th century.
(১২) The Mausoleum at Halicarnassus (Artist Imagination)

অধ্যায় ৪ - অনুকর্তা

খ্রিস্টপূর্ব ২১০ সাল, এবং নিষ্ঠুর চীনা সম্রাট চিন শি হুয়াংডি কেবলই মারা গেছেন। তাকে পরকালে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একটি সেনাবাহিনী জড়ো হয়েছে এবং বহু সহস্র সৈন্য এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ সারিতে দাড়িয়ে অপেক্ষা করছে। সেখানে তীরন্দাজ ও সেনা কর্মকর্তা, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য আছে, সবাই তাকিয়ে আছে সেই দেশটির দিকে যা চিন জয় করেছিলেন যখন তিনি পুরো চীনকে তিনি তার পতাকাতলে একত্রিত করেছিলেন। রাজকীয় প্রহরীরা প্রতিটি সারিতে চারজন করে আপাতদৃষ্টিতে প্রায় অন্তহীন দশটি কলামে হাতে বর্শা নিয়ে দাড়িয়ে আছে, যে-কোনো আক্রমণ প্রতিহত করতে তারা প্রস্তুত।

এই সেনাবাহিনী কখনোই ঘুমায় না, কারণ এরা সাধারণ কোনো সৈন্য নয়, বরং প্রমাণ আকারের রঙের প্রলেপে আবৃত টেরাকোটা (পোড়ামাটি) দিয়ে তৈরি অসংখ্য অনুলিপি।

এই সেনাবাহিনী সুবিশাল একটি ‘মউসোলিয়াম’ বা সমাধিসৌধের অংশ ছিল, যা সম্রাট নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যখন তেরো বছর বয়সে চিন রাজ্যের একজন আঞ্চলিক রাজা হিসেবে তিনি ক্ষমতা গ্রহন করেছিলেন।

অবশেষে ছত্রিশ বছর পরে তার সেনাবাহিনী চিন হুয়াং-এর রাজধানী শেনইয়াং-এর একটি পূর্ণাঙ্গ অনুলিপিকে এখন পাহারা দিচ্ছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে তার প্রাসাদ, যেখানে তার দেহ সমাহিত করা হয়েছে, এই সমাহিত প্রাসাদের সাথে প্রতিলিপি শহরটির বাকি অংশের সাথে যুক্ত করেছিল বহু মাইলব্যাপী দীর্ঘ আর বিস্তৃত করিডোর আর গলিপথ। সম্রাটকে নিয়ে ঘোরার জন্য সেখানে সমাহিত গর্তে ব্রোঞ্জের রথ পুরো লাগামসহ ঘোড়া আর সারথিসহ সর্বক্ষণ প্রস্তুত ছিল। টেরাকোটা সঙ্গীতশিল্পী এবং কর্মচারীরা নিকটেই অপেক্ষমান, তাদের সেবা দিতে সদা প্রস্তুত। কাদামাটির হাস আর রাজহাস ভূগর্ভস্থ হ্রদে ‘সাতার’ কাটছে, যেন সম্রাটের কখনো খাদ্যের অভাব না হয়।

*

পূর্ববর্তী শাসকরা তাদের মৃত্যুর সময় মানব বিসর্জন দাবি করেছিলেন যেন পরলোকে তাদের সেবকের কোনো অভাব না হয়, কিন্তু চিন জীবন্ত সৈন্যদের বিকল্প হিসেবে বহু সহস্র টেরাকোটা সৈন্য নির্মাণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তারা তাকে অনন্তকাল সেবা করতে পারে। এগুলো তৈরি করতে কাদামাটির সাথে বালি মিশ্রিত করা হয়েছিল যেন চুল্লীতে পোড়ানোর সময় যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, এবং রাজ্যের বিভিন্ন কুমোরশালায় এগুলোর নির্মাণকাজ বন্টন করা হয়েছিল গুণগতমান নিশ্চিত করতে। সহস্রাধিক শ্রমিক যদিও পোড়ামাটির এই শরীরগুলোকে হুবহু প্রতিলিপি হিসেবে নির্মাণ করেছিল, কিন্তু

সেগুলোর বাহ্যিক রূপে ভিন্নতা সৃষ্টি করা হয়েছিল, খচিত বর্ম পরিহিত কোনো একজন সৈন্যের হয়তো গোফ আছে যখন কিনা অন্য সৈন্যের নেই, মাথার ওপর উঁচু করে বাধা চুলসহ কোন সৈন্যের প্রতিবেশী সৈন্যটির চেয়ে হয়তো খানিকটা বেশি পুরু গলবস্ত্র আছে । এইসব ক্ষুদ্র পার্থক্যগুলো পোড়ামাটির এই সৈন্যদের আরো বেশি মানবিক করে তুলেছিল। কাদার ওপর এখনো রঙের অবশিষ্টাংশের চিহ্ন আমাদের ইঙ্গিত দেয় যে, শুরুতে এই মূর্তিগুলো বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রং দিয়ে রঞ্জিত ছিল। আমরা আজ 'টেরাকোটা' সেনাবাহিনী হিসেবে এই সৈন্যদের চিনি, ১৯৭৪ সালে এই সমাধিসৌধটি পুনরাবিষ্কৃত হবার পর সহস্রাধিক উদাহরণ খনন করে বের করে আনা হয়েছে।

চিন যখন তার সাম্রাজ্য নির্মাণ করছিলেন, সেই একই সময় পশ্চিম আফ্রিকায় নাইজার নদীর উত্তরে (বর্তমান নাইজেরিয়া) 'নোক' সংস্কৃতির সমৃদ্ধ বিকাশ ঘটেছিল, এবং বহু নোক ভাস্কর্য টেরাকোটা পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছিল, এবং সেগুলো এখনো টিকে আছে। নোক শিল্পীরা ছিলেন নারী, আচারিক পোষাকে সজ্জিত ফাপা মূর্তি নির্মাণ করতে তারা কাদার দড়ির কুণ্ডুলী তৈরি করতেন। এগুলোর কোনো কোনোটি মূল উচ্চতা ছিল এক মিটারেরও বেশি। ভাস্কর্যগুলো যখন শুকাতে থাকে, তখন বিস্তারিত অলংকরণগুলো কাদামাটির ওপর কেটে সৃষ্টি করা হতো, যেমন, বিশেষ বুনটসহ গলার মালা, বাহু বা গোড়ালি বন্ধনী, তাদের চুড়ি, অস্ত্র, চুলের বেনী এবং মুখের বৈশিষ্ট্যগুলো। ভাস্কর্যগুলোর মুখ অবাস্তব, শৈলীবদ্ধ এবং স্বাতন্ত্র্যসূচক। প্রতিটি মাথায় আমরা উঁচু হয়ে থাকা ভ্রূ, বড় ত্রিভূজাকৃতির চোখ, স্ফীত গোলাকার অক্ষিগোলক এবং ভিতরে খোদাই করে কাটা চোখের মণি দেখি। বড় ভাস্কর্যগুলোয় মুখ কান ও নাসারন্ধ্র তৈরি করা হতো ছিদ্র সৃষ্টি করে , চুল্লিতে পোড়ানোর সময় যেন এর ভিতর থেকে বাতাস বেরিয়ে আসতে পারে এবং ভাস্কর্যগুলোয় কোনো ফাটল সৃষ্টি না হয়।

নোক ভাস্কর্যগুলোর এখন মূলত অস্তিত্ব আছে খণ্ডাংশ আর অসম্পূর্ণ অংশ হিসেবে, মূলত মাথা, ধারণা করা হয় সেগুলো হয়তো ইচ্ছা করেই ভাঙ্গা হয়েছিল, এবং কোনো আচারের অংশ হিসেবে সেগুলো সমাহিত করা হয়েছিল, যেমন কোনো পূর্বসূরিকে সন্মান জানানোর অনুষ্ঠান বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। দুঃখজনকভাবে, লিখিত কোনো দলিলের অস্তিত্ব নেই, যা আমাদের নোক সংস্কৃতি সম্বন্ধে আরো কিছু বলতে পারে। ভাস্কর্যে দৃশ্যমান কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন, সামুদ্রিক প্রাণীর খোলস দিয়ে তৈরি মাথার সজ্জা,এবং একটি বাহুর অলঙ্কারে মিসরীয় ফারাও-এর ছড়ির (ক্রুক) অবস্থান ইঙ্গিত করে নোকদের উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত একটি বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল, যার পরিণতিতে আটলান্টিক সাগর থেকে মিসর অবধি সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটেছিল।

বাণিজ্যিক সংযোগ প্রতিষ্ঠা করার রোমান কৌশল ছিল পার্শ্ববর্তী সেই এলাকাগুলো আগ্রাসন করে দখল করা, এবং নিজেদের সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা বলয় ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারণ করা। ক্ষুদ্র শহর-রাষ্ট্র থেকে রোম বিশাল একটি সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি হয়ে

উঠেছিল, যা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরের চারপাশে বহু এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল। রোমে ভাস্কর্যের ক্ষুধা ছিল প্রায় অপ্রশম্য। মিলিয়ন সংখ্যক মানুষের আবাসস্থল রোমে ভাস্কর্য ছিল সর্বত্র: মন্দিরে দেব-দেবী, রাস্তার মোড়ে রোমান সেনাপতি, বাড়িতে গ্রিক দার্শনিকদের আবক্ষ ভাস্কর্য প্রতিকৃতি, এবং রাস্তার পাথে খোদাই করা সমাধিসৌধ। যুদ্ধের লুট হিসেবে প্রতিটি শহর থেকেই ভাস্কর্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, যে শহরগুলো তারা জয় করেছিল, এবং সেগুলো একটি বিশেষ জাকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার মাধ্যমের রোমের রাস্তায় সাড়ম্বরে প্রদর্শন করা হতো, যে অনুষ্ঠানটি 'ট্রায়াম্ফ' নামে পরিচিত ছিল।

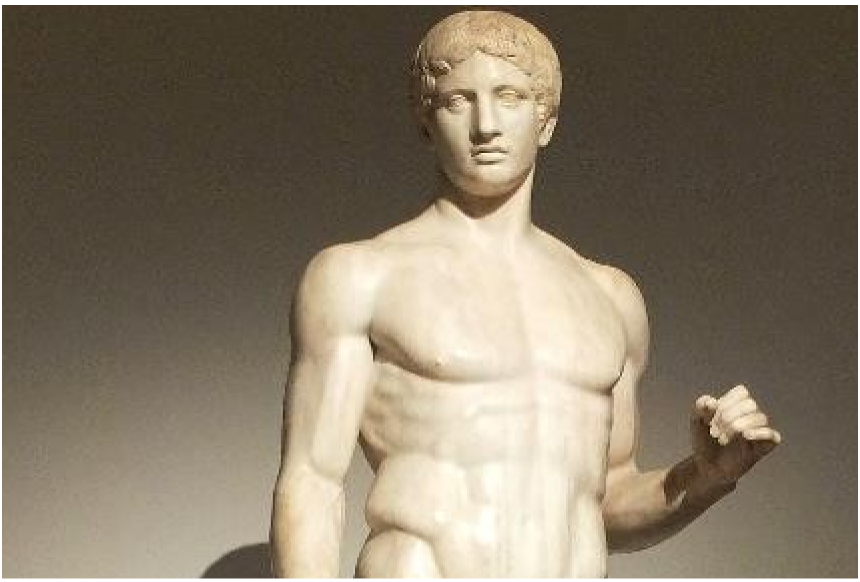

পলিক্লেইটোস এবং প্রাক্সিটিলেসের সৃষ্টি করা সুখ্যাত গ্রিক ভাস্কর্যগুলোর মার্বেল অনুলিপি নির্মাণ করতে ভাস্করদের দায়িত্ব দেয়া হতো, এরপর সেগুলো নৌপথে জাহাজ বোঝাই করে রোমে পরিবহন করে আনা হতো। বিখ্যাত সব ভাস্কর্যের প্লাস্টার অনুলিপিগুলো স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যেও সঞ্চালিত হতে শুরু করেছিল, যেন রোমান শিল্পীরা এগুলোর আরো অনুলিপি তৈরি করতে পারেন - আক্ষরিকভাবেই বহু হাজার দেবী আফ্রোদিতি আর ভিনাসের নগ্ন মূর্তি এখনো টিকে আছে, এবং খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত ভাস্কর পলিক্লেইটোসের ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য 'ডোরিফোরোস' অর্থাৎ বর্শা-নিক্ষেপকারীর প্রায় পয়ষট্টিটি মার্বেল অনুলিপি এযাবৎ খুঁজে পাওয়া গেছে। বিত্তশালী রোমানরা শুধু তাদের বাড়ির আট্রিয়ামে (বা প্রবেশ মুখের হলে) একটি বা দুটি ভাস্কর্য রাখতেন না, বরং প্রায়শই তাদের 'পেরিস্টাইল' বা উঠানে বহু ডজন ভাস্কর্য সারি বেঁধে দাড়িয়ে থাকতো।

রোম সাম্রাজ্য যখন সম্প্রসারিত হয়েছিল, কোনো ভাস্কর্যের সঠিক নির্মাণকাল নির্ণয় করার কাজটি বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কেন? কারণ, ভাস্কর্য অনুকরণ এবং পুরানো ধারণা পুনর্ব্যবহার করা রোমান শিল্পীদের প্রচলিত একটি শৈল্পিক অনুশীলন ছিল। প্রত্যেকেই কোনো না কোনো গ্রিক ভাস্কর্যের মালিক হতে চেয়েছিলেন, কারণ রোমের নাগরিকরা গ্রিক জীবনাচরণের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু এই চাহিদা মেটানোর মতো যথেষ্ট পরিমান ভাস্কর্যের সরবরাহ ছিল না। তাই সেগুলো অনুকরণ করা, এবং গ্রিক মূল ভাস্কর্যের অনুকরণে নতুন ভাস্কর্য নির্মাণই সাধারণ একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছিল।

একটি কাজ বিশেষ করে এই সমস্যার মূলে প্রবেশ করে: ‘লাওকুন’। এটি অসাধারণ একটি ভাস্কর্য, প্রাণশক্তিপূর্ণ এবং অত্যন্ত নাটকীয়। যন্ত্রণাক্লিষ্ট সংগ্রামরত তিনটি পুরুষ শরীর - যাজক লাইকুন এবং তার যমজ দুই ছেলে - তাদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখা ও কামড় দিতে উদ্যত মুখসহ একটি দানবীয় সাপ থেকে মরিয়া হয়ে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করছে। প্রতিটি পুরুষ শরীরই নগ্ন, তাদের মাংসপেশি আতঙ্কে সংকুচিত। কেন্দ্রীয়

চরিত্রটি হচ্ছে যাজক লাওকুন, প্রতিশোধপরায়ন এক দেবতা যাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল, কারণ তিনি গ্রিকদের সেই বিশাল কাঠের ঘোড়ার উপহারটি গ্রহন না করতে অবরুদ্ধ ট্রয় নগরবাসীকে সতর্ক করেছিলেন। যখন লাওকুন ও তার ছেলেদের সাপ আক্রমণ করেছিল, সেই কাঠের ঘোড়ার পেট উন্মুক্ত হয়েছিল, গ্রিক সৈন্যরা ট্রয় নগরীর মধ্যে প্রবেশ করেছিল, এবং তারা যুদ্ধ জয় করেছিল।

ট্রয়ের যুদ্ধের এই কাহিনী বহু শতাব্দী ধরেই পরিচিত (আপনি হয়তো মনে করতে পারবেন, গ্রিক মৃৎপাত্রের চিত্রশিল্পী এক্সিকিয়াস এইসব কাহিনীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন)। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে হোমারের ‘ইলিয়াড’ এই কাহিনী বর্ণনা করেছিল, এবং রোমের কবি ভার্জিল করেছিলেন তার ‘ইনিড’ (২৯-১৯ খ্রিস্টপূর্ব) মহাকাব্যে এটি হালনাগাদ করেছিলেন। নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে তিনি ইনিডে লাওকুনের কাহিনী যুক্ত করেছিলেন। গ্রিক দ্বীপ রোডসের তিনজন শিল্পী - আগেসান্ডার, পলিডোরাস এবং অ্যাথিনোডোরাস, লাওকুনের এই কাহিনীটি মার্বেলে অনুবাদ করেছিলেন, এবং উদ্বেল অভিব্যক্তিময়, অসাধারণভাবে মর্মস্পর্শী এই ভাস্কর্যটি সৃষ্টি করেছিলেন, যেখানে পাথর নিপীড়িত মানব শরীরে রূপান্তরিত হয়েছিল। বিত্তশালী রোমান সেনাপতি (পরবর্তীতে রোমান সম্রাট) টাইটাস এই ভাস্কর্যটি সংগ্রহ করেছিলেন। সমসাময়িক লেখক প্লিনি দ্য এলডার বলেছিলেন, ‘এটি যে-কোনো চিত্রকর্ম কিংবা যে-কোনো ব্রোঞ্জের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর একটি কাজ’।

ঠিক কখন লাওকুন আসলে নির্মিত হয়েছিল সেই বিষয়ে কেউ একমত নয়। আপাতদৃষ্টিতে এটি পারগামামে (বর্তমানে তুরস্কে, কিন্তু তখন গ্রিসের অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো) খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় দশকে নির্মিত ভাস্কর্যের মতো একই ধরনের শৈলী প্রদর্শন করছে। কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন এটির নির্মাণকাল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী। প্লিনি তিনজন ভাস্করের নাম উল্লেখ করেছিলেন, যারা রোডস দ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন, এছাড়াও এই তিনজন ভাস্কর আপাতদৃষ্টিতে ট্রয়ের যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে স্পেরলংগায়

রোমান সম্রাট টাইবেরিয়াসের সমুদ্র তীরবর্তী বিলাসবহুল ভিলার জন্য আরো কিছু নাটকীয় ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন। তবে, এটি লাওকুন ভাস্কর্যটির নির্মাণকাল প্রথম শতাব্দীতে নিয়ে যাবে। মূল ভাস্কর্যে সুস্পষ্ট কোনো কিছু খোদাই করে লেখা নেই, সুতরাং এমনকি অন্য কাজের সাথে যদি শৈলীগত তুলনাও করা হয়, তাহলেও আমাদের আসলেই জানার কোনো উপায় নেই, কারণ সেই সময়ে প্রাচীন শৈলী অনুকরণ খুব স্বাভাবিক ছিল।

তবে একটি ক্ষেত্রে রোমান শিল্পীরা অনুপ্রেরণা নিতে গ্রিক শিল্পকলার প্রতি ঝুঁকে পড়েননি, আর সেটি ছিল ভাস্কর্য প্রতিকৃতি, যা 'বাস্ট' বা আবক্ষ মূর্তি হিসেবে পরিচিত। ধ্রুপদী গ্রিক ভাস্কর্যগুলো পুরুষদের দাড়ি-গোফ কামানো সদ্যোযুবক, এবং কুঞ্চনহীন ত্বকের প্রতিসম মুখমণ্ডলসহ নারীদের উপস্থাপন করেছিল। তারা তাদের সময়ে সুপারমডেল ছিলেন। এর ব্যতিক্রম রোমানরা সেই ধরনের চেহারা পছন্দ করতো, যা বয়স আর অভিজ্ঞতার ছাপে সমৃদ্ধ, ব্যক্তিক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা সেখানে দেখতে পাই, যেমন, বাইরের দিকে খানিকটা বেশি বেরিয়ে থাকার কোনো কান, ঝুঁকে পড়া চোয়াল, কিংবা চর্বির ভারে ঝুঁকে পড়া চামড়া ইত্যাদি। 'দ্য হেড অব দ্য রোমান প্যাট্রিসিয়ান ফ্রম ওট্রিকোলি' - রোমান অভিজাত শ্রেণির এই ব্যক্তির আবক্ষ মূর্তিটির নির্মাণকাল আনুমানিক ৭৫ থেকে ৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, যা সেই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রদর্শন করছে: বাইরের দিকে প্রকট হয়ে থাকার চিবুক, ভেঙ্গে পড়া গাল। তার মুখে দৃঢ়তার ছাপ সুস্পষ্ট কিন্তু চিন্তা তার ভ্রূর মাঝে দাগ সৃষ্টি করেছে এবং তার চোখের নীচেও দাগ আছে। এই ধরনের ভাস্কর্য শৈলীকে বলা হয় 'ভেরিজম' - ল্যাটিন যে শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সত্য', কিন্তু এই প্রতিকৃতিগুলো গ্রিক মূর্তির মাথাগুলোর থেকে আরো অনেক বেশি জীবন ঘনিষ্ঠ ছিল কিনা সেটি আজ আমাদের আর জানার কোনো উপায় নেই। দুটোই আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করছে, তবে রোমানদের জন্য এটি তারুণ্য ছিল না, বরং অভিজ্ঞতা, নিষ্পাপতা নয় বরং প্রজ্ঞা ছিল কাঙ্ক্ষিত, উপরি সৌন্দর্যের চেয়ে শ্রেয়তর ছিল অভিজ্ঞতা আর চারিত্রিক দৃঢ়তা

। 'ভেরিজম' শুধু রোমান সিনেটর আর সেনা কর্মকর্তারাই শ্রেয়তর মনে করেননি, এটি ব্যবসায়ী ও কারুশিল্পীদের কাছে শ্রেয়তর ছিল, যারা তাদের মুখমণ্ডলের আচিলসহ যে-কোনো সাদৃশ্যতা খোদাই করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন তাদের সমাধি ফলকে।

'ভেরিজম' নিয়ে একমাত্র সমস্যা হচ্ছে যদি আপনি আসলেই তখনো তরুণ, এবং মন ও শরীরে কম অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন। এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন অক্টাভিয়ান , জুলিয়াস সিজারের দৌহিত্র এবং পালক পুত্র, যিনি বত্রিশ বছর বয়সে রোমের প্রথম সম্রাট অগাস্টাস হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কোনো বিশ্বাসযোগ্য উপায় ছিল না, যার মাধ্যমে তিনি তার মতো দেখতে কোনো মূর্তি নির্মাণ করাতে পারেন, সেখানে নিজেকে বৃদ্ধ এবং প্রাজ্ঞ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন, সুতরাং তিনি আদর্শায়িত তারুণ্যের গ্রিক মডেলে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তার একচল্লিশ বছরে রাজত্বকালে তার সব ভাস্কর্য প্রতিকৃতি ছিল চিরন্তনভাবেই তারুণ্যময়, তার চোয়াল সুস্পষ্ট, দাড়িহীন, তার ছোট মাংশল মুখ, বলিরেখা মুক্ত চোখগুলোর ওপরে ছিল ঘন ছোটো করে কাটা চুল। অগাস্টাসের আবক্ষ মূর্তগুলো পুরো রোমান সাম্রাজ্যবাপী আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ২৫ সালের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল আফ্রিকার সুদানে, এবং কিছু মিসরীয় আবক্ষ

মূর্তি আছে যেখানে তিনি একজন ফারাও-এর বিশেষ মাথার সজ্জা পরিহিত। এই মূর্তিগুলো তার বিকল্প ছিল, যা তার কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করতো যখন তিনি সেখানে অনুপস্থিত। তার মুখের পার্শ্বদেশের একটি সাদৃশ্য আবির্ভূত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২০ সালে স্পেনে তৈরি ডেনারিয়াস মুদ্রায়, সুতরাং আক্ষরিকভাবে সর্বত্র আপনি তাকে ও তার শক্তি ও সুরক্ষা বহন করতে পারতেন।

ঐতিহাসিকভাবে অভিজাত বিত্তশালী অথবা শাসক পরিবার, যেমন অগাস্টাসের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্টি করা ভাস্কর্যগুলো মার্বল আর ব্রোঞ্জ দিয়ে নির্মিত হয়েছিল, শক্তিশালী এইসব উপাদান ব্যবহার করে সৃষ্ট এই ভাস্কর্যগুলো এর পৃষ্ঠপোষকের চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারতো। আর এই কারণে হারকুলেনিয়াম ও পম্পেইয়ের মতো ইটালির শহরগুলো শিল্পকলার ইতিহাসবিদদের জন্য অপ্রচলিত, তবে অমূল্য তথ্য উৎস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। চার থেকে ছয় মিটার পুরু ছাই আর পামিস বা ঝামাপাথরের নীচে এই শহর দুটি সমাহিত হয়েছিল, ৭৯ খ্রিস্টাব্দে যখন শহর দুটির নিকটবর্তী ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতে বিস্ফোরিত হয়েছিল। পুরো নগর-জীবন, ধনী কিংবা গরীব, সেই সময়েই চিরতরে থমকে গিয়েছিল। দুটি শহরেই ১৭৩৮ সালে শুরু হওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক খনন এখনো চলমান। খনন করা বাড়িগুলোর অভ্যন্তর, গ্রিক চিত্রকর্মের ওপর ভিত্তি করে তাদের মোজাইক ও পুরাণের কাহিনি বর্ণনা করা দেয়ালের প্যানেলে চিত্রকর্ম, ভূদৃশ্য, স্থাপত্যসংক্রান্ত বিভ্রম ইত্যাদি এই শহর দুটির প্রাত্যহিক জীবনে সাথে শিল্পকলা কীভাবে জড়িয়ে ছিল, সেই বিষয়ে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি উপস্থাপন করেছে।

আমরা প্লিনির লেখা থেকে জানি, চিত্রকর্মগুলো আরাধ্য ছিল এর ‘ইল্যুশনিজম’ বা ভ্রমবাদীতার কারণে (শিল্পকলার ইতিহাসে ইল্যুশনিজমের অর্থ হতে পারে, সেই শৈল্পিক ধারাটি যেখানে শিল্পীরা এমন কাজ সৃষ্টি করেন, সেটি যেন মনে হয় দর্শকের সাথে একই পরিসর ভাগাভাগি করে নেয়, কিংবা, কোনো কিছুর প্রকৃত রূপটি সূক্ষ্মভাবে প্রদর্শন করার চেষ্টা করে)। পম্পেই শহরের শিল্পীরা ভিলার অভ্যন্তরীণ কক্ষগুলো “ট্রোম্প ল’য়” (লো’ইল) বা চোখকে ধোকা দেবার কারসাজি ব্যবহার করেছিলেন উদারভাবে (ট্রোম্প ল’য় - ফরাসী যে শব্দটির অর্থ চোখকে ধোকা দেয়া - এটি হচ্ছে শিল্পকলার একটি কৌশল যা বাস্তবানুগ চিত্র ব্যবহার করে একটি দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করে, যেন মনে হয়ে চিত্রিত বস্তুগুলো ত্রিমাত্রিক কোনো পরিসরে অবস্থান করছে)। তারা দেয়াল আবৃত করে রাখা প্লাস্টারের ওপর এমনভাবে রং করতেন যেন সেগুলোকে দেখে মার্বেল দিয়ে নির্মিত মনে হয়, কিংবা দুই প্রান্তের মধ্যে বক্রাকারে ঝুলানো কাপড়ের উপরে বসে থাকা পাখি অথবা জানালা দিয়ে বাইরের কোনো দৃশ্য। কেন্দ্রীয় অ্যাট্রিয়াম বা উঠানটি ছিল প্রথম কক্ষ, যা অতিথিরা দেখতেন এবং এটি মঞ্চসজ্জার মতো দেখতে হতো, শিল্পকলা এবং আনুসাঙ্গিক নানা উপাদান এমন করে সাজানো হতো যেন সেটি বাড়ির মালিকের রুচি আর তার আকাঙ্ক্ষাগুলোকে উত্তমভাবে প্রকাশ করতে পারে। ডাইওনাইসাসের মূর্তিগুলো

, আনন্দের গ্রিক দেবতা, ইঙ্গিত করতো, আপনার হাতে প্রচুর অবসর সময় আছে। গ্রিক দার্শনিক আর রোমান পূর্বসূরিদের প্রতিকৃতির গ্যালারি ইঙ্গিত করতো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর শিক্ষিত একটি মন। অ্যাট্রিয়াম পেরিয়ে কোনো উন্মুক্ত কক্ষে প্রায়শই পুরাণের দৃশ্য অথবা উৎসবের আচার চিত্রিত হতো।

পম্পেইয়ের বিখ্যাত 'ভিলা অব মিস্ট্রিজ' ভবনের একটি কক্ষ অসাধারণ কিছু ফ্রেস্কো বা দেয়ালচিত্র দিয়ে অলংকৃত, সেগুলো একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি প্রদর্শন করছে। ভালোবাসা আর উর্বরতার সাথে সংশ্লিষ্ট দেবতাদের - যেমন ডাইওনাইসাস এবং ইরোস - দিয়ে জনাকীর্ণ এই কক্ষে তরুণ-তরুণীদের শোভাযাত্রা। বড় চিত্রিত ফিগারগুলো ঘন এবং বিশ্বাসযোগ্য, গ্রিক ভাস্কর্যের মতোই যাদের অঙ্গভঙ্গিমা, আপাতদৃষ্টিতে যেন মনে হয় তারা উজ্জ্বল লাল রঙের একটি দেয়ালের সামনে অগভীর পরিসরে অবস্থান করছেন। এই ঘরে প্রবেশ করা অতিথিদের এটি যেন এর পাত্রপাত্রীদের দিকে এগিয়ে দেয়, তাদের চারিদিক থেকে আবৃত করে ফেলে, যেন তারাও এই অনুষ্ঠানটির অংশ।

'হাউস অব ফন' - পম্পেই শহরের সবচেয়ে বিশাল বাড়িগুলোর একটিতে, বাগান কক্ষের মেঝের মোজাইকে পারস্য সম্রাট ডারিয়ুসের সাথে যুদ্ধরত আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেটের একটি গ্রিক চিত্রকর্ম পুনসৃষ্টি করা হয়েছিল। মোজাইকটি দৈর্ঘ ও প্রস্থে যথাক্রমে ছয় ও তিন মিটার, এবং এর মূল অবস্থায় এটি প্রায় ৩ মিলিয়ন 'টেসেরি' দিয়ে নির্মিত হয়েছিল - টেসেরি হচ্ছে মোজাইক করতে ব্যবহৃত হলুদ, বাদামী, সাদা কিংবা ধুসর রঙের ক্ষুদ্র পাথরের ঘনক, যেগুলো ব্যবহার করে শিল্পী সেই গতিময় যুদ্ধের দৃশ্যটি পুনসৃষ্টি করেছিলেন। ডারিয়ুসের পরাজয়ের মুহূর্তের দৃশ্য ছিল এটি, এবং তিনি পেছন ফিরে আলেক্সান্ডারের দিকে তাকিয়েছিলেন, যখন তিনি ও তার বাহিনী পিছু হটতে শুরু করেছিল, তাদের বর্শা তখনো শত্রু দিকে ফেরানো। একটি ঘোড়া সৈন্যের হাত থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছে, যা আমাদের এই যুদ্ধক্ষেত্রের বিশৃঙ্খল উন্মত্ততার ঠিক কেন্দ্রে

স্থাপন করেছিল এবং শিল্পীর অসাধারণ সেই দক্ষতাও উন্মোচন করে, যাকে বলা হয় ‘ফোরশর্টেনিং’ (ফোরশর্টেনিং ছবি আঁকার একটি কৌশল, যা দর্শনানুপাতে ব্যবহৃত হয় একটি বস্তুর বিভ্রম সৃষ্টি করতে, যা দূরে বা প্রেক্ষাপটের দিকে দ্রুত অপসৃত হয়। কোনো একটি বস্তুকে বাস্তবের তুলনা ছোট করে দেখিয়ে সাধারণত শিল্পীরা এই বিভ্রমটি সৃষ্টি করেন, যেন মনে হয়ে এটি সংকুচিত হয়ে আছে।), আমরা এখানে ঘোড়ার পশ্চাদভাগ আর মাথাটিকে দেখছি যেন পেছন থেকে। মূল গ্রিক চিত্রকর্মটির একমাত্র অনুলিপির নিদর্শন হচ্ছে এই মোজাইকটি। মূল চিত্রকর্মটি হয়তো হতে পারে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর একটি বিখ্যাত যুদ্ধের চিত্রায়ন, মিসরের শিল্পী হেলেনার ‘ব্যাটল অব ইসোস’ অথবা অন্য একটি যুদ্ধের দৃশ্য, যা প্লিনি উল্লেখ করেছিলেন গ্রিক মাস্টারপিসগুলো সংক্রান্ত তার একটি তালিকায়। তবে যা-ই হোক না কেন এটি আজ টিকে আছে শুধুমাত্র এই মোজাইক রূপে, ঘটনাক্রমে আগ্নেয় ছাইয়ের দ্বারা যা সংরক্ষিত হয়েছিল ৭৯ খ্রিস্টাব্দ ।

ভিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাতের সময় নাগাদ, রোম সাম্রাজ্য ইংল্যান্ড থেকে আফ্রিকা, স্পেন থেকে তুরস্ক অবধি বিস্তৃত ছিল । পরবর্তী অধ্যায় যখন আমরা আবার সেখানে ফিরে যাবো ১১০ খ্রিস্টাব্দে, একটি তখন এটি এর ক্ষমতা শীর্ষবিন্দুর নিকটে অবস্থান করছে।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) collection of terracotta sculptures depicting the armies of Qin Shi Huang, the first emperor of China
(২) Qin bronze chariot at the Mausoleum of the First Qin Emperor, Qin Shi Huang
(৩) collection of terracotta sculptures depicting the armies of Qin Shi Huang, the first emperor of China

(৪) Nok sculpture, southern West Africa
(5) Nok sculpture, southern West Africa
(৬) Doryphoros, "Spear-Bearer" of Polykleitos is one of the best known Greek sculptures of Classical antiquity
(৭) Laocoön and His Sons, also called the Laocoön Group, Vatican museum
(৮) The central group at Sperlonga, with the Blinding of Polyphemus;
(৯) Head of a Roman Patrician from Otricoli, c. 75–50 BCE
(১০) Head of Augustus as pontifex maximus, Roman artwork of the late Augustan period, last decade of the 1st century BC
(১১) Fresco showing fruit bowl, jar of wine, jar of raisins, from the House of Julia Felix in Pompeii
(১২) Frescoes from the Villa of the Mysteries in Pompeii, Italy, Roman artwork dated to the mid-1st century BC
(১৩) Alexander Mosaic, c. 100 B.C.E., Roman copy of a lost Greek painting, House of the Faun, Pompeii
(১৪) Alexander Mosaic, c. 100 B.C.E., Roman copy of a lost Greek painting, House of the Faun, Pompeii((Detail)

অধ্যায় ৫ - পরলোকের পথ

১১০ খ্রিস্টাব্দ, এবং রোমের ফোরাম তখন নির্মাণ করা হচ্ছে। সম্রাট ট্রেজান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তিনি রোমের ইতিহাসে অভুতপূর্ণ, সবচেয়ে বিশাল একটি মিলন স্থান বা ফোরাম নির্মাণ করবেন, যেখানে সিনেট ও নাগরিকরা একত্রিত হতে পারবেন। এখানে থাকবে বিপনী বিতান, জনগণের জন্য উন্মুক্ত সভাকক্ষ, বিশাল কেন্দ্রীয় চত্বর এবং দুটি লাইব্রেরি (একটি গ্রিক ও অন্যটি ল্যাটিন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য)। আর এই সবকিছুর ঠিক কেন্দ্রে 'লুনা' মার্বেলের ২৯ টি স্বতন্ত্র চাকতি ব্যবহার করে ৩৫ মিটার উঁচু মার্বেলের একটি বিশাল স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছিল। যুদ্ধের লুট থেকেই এর নির্মাণব্যয় সংগ্রহ করা হয়েছিল, এবং পরবর্তীতে এর শীর্ষে ট্রেজানের একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত ভাস্কর্য প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছিল। খোদাই করা সর্পিলাকার একটি সিড়ি একটি পরিদর্শন মঞ্চ অবধি বিস্তৃত ছিল। এই মঞ্চ থেকে সম্পূর্ণ ফোরামটিকে দেখা যেত।

স্তম্ভের বহির্দেশে, ভাস্কররা ডাসিয়ানদের (বর্তমান রোমানিয়া) বিরুদ্ধে ট্রেজানের সাম্প্রতিক একটি সামারিক বিজয়ের বিবরণ খোদাই করে সৃষ্টি করেছিল। পৃষ্ঠদেশের ওপর বেশি নীচু করে সৃষ্টি করা রিলিফ ভাস্কর্যের দীর্ঘ এই ফ্রিজটি স্তম্ভটিকে পেচিয়ে বাঁকা হয়ে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে গেছে। দৃশ্যগুলো গতিময়, প্রাণবন্ত, এবং চিত্রিত সব চরিত্রগুলোই জটিল আর সূক্ষ্মতার সাথে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সৈন্যরা জীবন্ত হয়ে উঠেছে যখন তারা জঙ্গলের গাছ কাটছে, অথবা দূর্গের দেয়ালে হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকছে, তাদের হাতের শিরাগুলো ফুলে আছে, তাদের শরীরের বর্মের প্রতিটি টুকরো সেই পরিশ্রমের সাথে নড়ছে। এই ফ্রিজটি উচ্চতায় এক মিটার, এবং এর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে ২০০ মিটার। যদি এটিকে লম্বা করে মেলে ধরা হয়, এটি এথেন্সের পার্থেনন পরিবেষ্টিত করে থাকা সেই ফ্রিজটির মতোই দীর্ঘ।

*

সামরিক বিজয়ের এই ধরনের মহাকাব্যিক দৃশ্যায়ন রোমানরা আবিষ্কার করেনি, তবে তারাই এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছিল। ট্রেজানের কলাম বা স্তম্ভটি পরিকল্পনা করেছিলেন ফোরামের স্থপতি দামাস্কাসের অ্যাপোলোডোরাস, এবং ফ্রিজটি এই স্তম্ভটিকে প্যাঁচিয়ে মোট ২৩ বার আবর্তন করেছে। শুরুতে, ঘোড়া, ষাড়, ভেড়া, পতাকাবাহী, বাদ্যযন্ত্রী এবং বহু সৈন্য তাদের যুদ্ধ যাত্রায় শহরের প্রবেশদ্বার দিয়ে বের হচ্ছে। ট্রেজানকে দানিউব নদী অতিক্রম করতে দেখা যায়, সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় রসদে তার নৌকাগুলো পূর্ণ। তার দুটি সামরিক অভিযান বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, এবং ডাসিয়ান নেতা ডিসিবেলাসের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে ফ্রিজটি শেষ হয়েছে। সম্পূর্ণ ফ্রিজে বহু ধরনের দৃশ্যে ট্রেজান উনষাট বার আবির্ভূত হয়েছেন, প্রত ্যেকটি দৃশ্যেই বিশেষ গুরুত্বের সাথে তাকে উপস্থাপন করেছে, তার সৈন্যদের চেয়ে

খানিকটা দীর্ঘদেহী হিসেবে, যেন খুব সহজেই আপনি তাকে শনাক্ত করতে পারেন। পুরো ফ্রিজে অবিশ্বাস্য রকম খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ আছে, আর এত বেশি যে আধুনিক ইতিহাসবিদরা রোমান যুদ্ধবর্ম আর যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে জানতে এই ফ্রিজটি অধ্যয়ন করেন। তবে প্রত্যক্ষভাবে এই ফ্রিজটি অধ্যয়ন করা নিয়ে একটি বড় সমস্যা আছে: এটি সহজে দেখা যায় না। ট্রেজান যে লাইব্রেরিগুলো তৈরি করেছিলেন সেখানে বিশেষ জানালা ছিল যেখান থেকে স্তম্ভটি দেখা যেত, কিন্তু তারপরও পুরো রিলিফ দেখা অসম্ভব ছিল। এটি শুরুতে রং দিয়ে বর্ণিত ছিল, এবং যদিও স্তম্ভের উপরের অংশে রিলিফ প্যানেলগুলো আকারে খানিকটা প্রশস্ত ছিল, কিন্তু পরিশেষে এই কাহিনীর বড় অংশই মাটি থেকে অদৃশ্য। এটি আসলেই দুর্ভাগ্যজনক।

পম্পেই শহরে আমরা যেমন দেখেছিলাম, বিত্তবান রোমানরা তাদের বাড়ি সাজাতে মোজাইক এবং ভাস্কর্য নির্মাণ করতে শিল্পীদের নিয়োগ দিতেন, কিন্তু রোমান সম্রাটরা এর চেয়ে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়েছিলেন। অগাস্টাসের পর থকে প্রতিটি রোমান সম্রাট আরো বিশাল, আরো আকর্ষণীয় মন্দির, চত্বর আর সৌধ নির্মাণ করতে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা করেছিলেন। রোমের ঠিক কেন্দ্রে অগাস্টাস একটি ফোরাম তৈরি করেছিলেন, মার্বেল পাথরে আবৃত আর ভাস্কর্য দিয়ে পূর্ণ। ট্রেজানের ফোরামটি যা এর একশ বছর পরে নির্মিত হয়েছিল, সেটি আকারে এর চেয়ে তিনগুণ বড় ছিল। যখন এটি নির্মিত হয়েছিল তার স্তম্ভটি রোমের সবচেয়ে উঁচু স্থাপনা ছিল। কিন্তু কেন এই অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা? এই স্তম্ভটি ছিল একটি যুদ্ধে ট্রেজানের বিজয় এবং সম্রাট হিসাবে তার সফলতা বিষয়ক সুবিশাল একটি বার্তা। রিলিফগুলো তৈরি করতে বহু ঘন্টা ব্যয় করতে হয়েছিল, এবং যে পর্যায়ের বিস্তারিত সূক্ষ্মতা সেগুলো অর্জন করেছিল, সেটি (প্রায়) অসম্ভবকে সম্ভব করার রোমের ক্ষমতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই বিরোচিত আখ্যান, এবং ১,১ ০০ টন খোদাই করা মার্বেল একত্রে রোম সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও শক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছিল।

এছাড়াও অমরত্ব অর্জন করাও ছিল একটি প্রণোদনা। ট্রেজানের স্তম্ভ ট্রেজানের সমাধিসৌধে পরিণত হয়েছিল। তার দেহভস্ম এই স্তম্ভের ভিত্তিতে সমাহিত করা হয়েছিল এবং তার ডাসিয়া বিজয় যথাযথ একটি স্মারকে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তী সম্রাট হেড্রিয়ান সম্ভবত এই স্তম্ভটির নির্মাণ কাজ শেষ করেছিলেন, এবং তিনি সম্ভবত এই প্রকল্পে আনন্দের সাথে অর্থায়ন করেছিলেন, কারণ তিনি তখন ট্রেজানের শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান সাম্রাজ্যের দায়িত্ব পেয়েছিলেন, সুতরাং এই স্তম্ভটি তাকেও বিখ্যাত করেছিল।

হেড্রিয়ান নিজেও রোমে কিছু অসাধারণ ভবন নির্মাণ করেছিলেন - তার শাসনামলেই 'প্যানথিওন' মন্দিরের (রোমান সব দেবতার প্রতি উৎসর্গীকৃত) নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল। তবে শহরের বাইরে পাহাড়ের মধ্যে হেড্রিয়ানের গীষ্মকালীন প্রাসাদটি ছিল তার চূড়ান্ত শৈল্পিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। ১১০ থেকে ১৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত এই প্রাসাদটি এখন শুধু 'হেড্রিয়ান ভিলা' নামে পরিচিত। তার এই ভিলাটি এককভাবেই পম্পেই শহরের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমান জায়গা নিয়ে বিস্তৃত ছিল, এবং এটি তার পুরো প্রশাসন ও কর্মচারী আর সমপরিমান অতিথিদের অনায়াসে থাকার জায়গা দিতে পারতো। এছাড়াও এর খ্যাতির ভিত্তি হচ্ছে এখানে একত্রিত করা ভাস্কর্যগুলো। গ্রিক ও রোমান শিল্পকলার সেরা সৃষ্টিগুলো এখানে প্রদর্শিত হয়েছিল, কখনো একই ভাস্কর্যের একাধিক অনুলিপিসহ। ইতোপূর্বে যে ভাস্কর্যগুলোর সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে, সেগুলোও সেখানে ছিল, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত প্র্যাক্সিটিলিসের অ্যাফ্রোদিতি, তার সেই বৃত্তাকার মন্দিরে একটি প্রতিলিপির মধ্যে যা স্থাপিত ছিল। মূল স্থান ও কাল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বহু ভাস্কর্য সারি বেঁধে সজ্জিত ছিল, যেন আধুনিক সময়ের কোনো শিল্পকলার গ্যালারি, দেখতে আর উপভোগ করতে এগুলো সেখানে জড়ো করা হয়েছে।

লিক্লেইটোসের মাংশল বর্শা নিক্ষেপকারী ‘ডোরিফোরাস’ ভাস্কর্যটির প্রতিলিপি রাখা হয়েছিল ভিলার স্নানকক্ষে। মাইরনের জনপ্রিয় স্কোবোলাস’ (চাকতি নিক্ষেপকারী, মূল ভাস্কর্যটি নির্মাণকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) ভাস্কর্যটির একটি অনুলিপি ভিলায় প্রদর্শিত হয়েছিল, বিভিন্ন স্থান ও সময় থেকে আসা অন্য ভাস্কর্যগুলোর সাথে একত্রে। হেড্রিয়ান তার মূল্যবান গ্রিক ভাস্কর্যের অনুলিপিগুলোর সাথে তার তরুণ প্রেমিক অ্যান্টিনুসের সমসাময়িক ভাস্কর্য প্রতিকৃতি রেখেছিলেন। যেখানে অ্যান্টিনুস আবির্ভূত হয়েছেন নগ্ন হয়ে, এবং গ্রিক ও মিসরীয় দেবতাদের শৈলীতে তাকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। বয়স বিশ হবার আগেই অ্যান্টিনুস মিসরে নীল নদের পানিতে ডুবে প্রাণ হারিয়েছিলেন, এবং শোকে উন্মত্তপ্রায় হেড্রিয়ান তাকে দেবতা হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। পরিশেষে হেড্রিয়েনের ভাস্কর্য প্রদর্শনী ছিল অ্যান্টোনুসের প্রতি নিবেদিত একটি বিশাল স্মৃতিসৌধ।

স্মৃতিসৌধের আরেকটি রূপ ছিল প্রতিকৃতি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মপরম্পরার জন্য কোনো ব্যক্তির চেহারা ধারণ করে রাখা। প্রতিকৃতি ভাস্কর্য রোমান সাম্রাজ্য জুড়েই বেশ জনপ্রিয় ছিল, এবং প্রায়শই কোনো ভবন বা স্থাপনা প্রতিষ্ঠা উদযাপন করতে মূর্তি নির্মাণ করা হতো। ১২১ খ্রিস্টাব্দে প্লানকিয়া ম্যাগনার প্রমাণ আকারের চেয়েও বড় একটি মূর্তি স্থাপনা করা হয়েছিল রোমান শহর পেরগেতে (বা পেরগা, বর্তমানে তুরস্কে), মূল শহরের প্রবেশদ্বারগুলো সংরক্ষণে তার উদার আর্থিক সহায়তার স্মারক হিসাবে। ম্যাগনার পরিবার ছিল রোমের নাগরিক, যারা বেশ কয়েক প্রজন্ম আগে পেরগেতে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। যদিও তারা রোমের সিনেটে অংশগ্রহন করতেন, কিন্তু একই সাথে পেরগের অভিজাত শ্রেণিরও অংশ ছিলেন।

ভাস্কর্যটি অভিজাত পোষাক পরিহিত ম্যাগনাকে প্রদর্শন করছে, সূক্ষ্ম ভাজে যেগুলো একত্রিত হয়ে আছে, তার সম্পদের প্রতি যা তথ্য নির্দেশক। তিনি মাথায় একটি ডায়াডেম বা মুকুট পরে আছেন, রোমান সম্রাটদের ক্ষুদ্র আবক্ষ মূর্তি দিয়ে যা অলংকৃত। এটি ইঙ্গিত করছে যে, তিনি রাজকীয় কাল্টের একজন যাজিকা, রাষ্ট্রীয় ধর্মের একটি রূপ, যেখানে সম্রাটদের দেবতার মতো উপাসনা করা হতো। ভাস্কর্যের গায়ে খোদাই করে লেখা আছে - তিনি হচ্ছেন শহরের একজন কন্যা, এবং শহরবাসীদের কল্যাণে তিনি কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি উচ্চ পদস্থ একজন সরকারী কর্মকর্তা, এবং পেরগে শহরে একজন শক্তিশালী চরিত্র এবং এই ভাস্কর্যটি এই শহরে তার গুরুত্বের স্মারক।

দুর্ভাগ্যজনকভাবেই বহু নারী প্রসবের সময় অসময়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন, সেই সময়ে রোমে তরুণীদের মৃত্যুর যা প্রধানতম কারণ ছিল। সমাধি-ভাস্কর্যের মাধ্যমে তাদের স্মরণ করা হয়েছিল, যা শহরের সীমানা পেরিয়ে রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধ হয়ে সজ্জিত ছিল। সাম্রাজ্যব্যাপী ব্যবসায়ীদের সমাধিফলকে নারীদের প্রায়শই সক্রিয় ভূমিকায় উপস্থাপন করা হয়েছে, তারা সবজি বিক্রয় করছেন, ধাত্রী হিসেবে কাজ করছেন , সিন্দুক ভর্তি টাকার পাশে বসে আছেন, যা ইঙ্গিত করে সরাসরিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে তারা যুক্ত ছিলেন। উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডে পালমেইরা (বর্তমান সিরিয়া) থেকে আসা একজন ব্যবসায়ী বারাটেস তার প্রাক্তন ইংরেজ দাসি ও পরবর্তীতে স্ত্রী রেজাইনার ত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুর পর একটি সমাধিফলক নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রেজাইনা খোদাই করা একটি দেয়াল-কুঠুরির মধ্যে আসীন, তার হাত ভরা চুড়ি, তার আঙ্গুলগুলো

একটি ভারী বাক্স খুলছে, যা অলঙ্কার আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। তিনি এবং বারাটেস স্পষ্টতই খুব ধনী ছিলেন, যেভাবে এই পূর্ণ সমাধিফলকটি সাক্ষ্য দিচ্ছে। এর নীচে খোদাই করা লেখাটি ল্যাটিন এবং আরামায়িক ভাষায় লেখা হয়েছিল, যে ভাষাটি ছিল বারাটেসের মাতৃভাষা, এবং সেটি বলছে, 'রেজাইনা, বারাটাসের মুক্ত নারী, হায়'।

গ্রিকদের মতোই রোমানরাও বহু দেবতার উপাসনা করতেন , কিন্তু যখন তাদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল, অন্য বহু ধরনের বিশ্বাস কাঠামোর সংস্পর্শেও তারা এসেছিলেন। তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের অংশ মিশরের ফাইয়ুম সমাধিক্ষেত্রে মিসরীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে মৃতদেহগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে সমাহিত মৃতের প্রতিকৃতি প্রথাগত মমি- মুখোশকে প্রতিস্থাপিত করেছিল, যা কাঠের প্যানেলের উপর আঁকা হতো। ফাইয়ুম মমি প্রতিকৃতিগুলো আঁকা হয়েছিল 'এনকস্টিক' মাধ্যমে (মৌমাছির মোমে মিশ্রিত রঞ্জকপদার্থ) এবং শিল্পীরা স্বর্ণের কানের দুল আর গলার মালায় আলো দ্যুতি, গাঢ় লাল রঙের পোষাক, ফ্যাশনদুরস্ত কুচকানো চুল ইত্যাদি সুক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য তাদের এইসব চিত্রকর্মে সংরক্ষণ করতে পেরেছিলেন। ম্লান চেহারাগুলো প্রাণে আরক্ত, উষ্ণতা ছড়াচ্ছে, শিল্পীদের দ্রুত তুলির আঁচড় ঠোঁটেও রঙের স্পর্শ , টানা টানা চোখে হলদে আভা যুক্ত করেছে। রোমান পরিবারগুলোয় পূর্বসূরিদের গুরুত্ব হয়তো এই নতুন প্রতিকৃতি সৃষ্টির ঐতিহ্যের নেপথ্যে ভূমিকা পালন করেছিল, খ্রিস্টপূর্ব ৩০ সালে যা শুধুমাত্র মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যখন দেশটি রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই প্রতিকৃতিগুলো এখন শিল্পকলার ইতিহাসবিদদের কাছে খুবই মূল্যবান, কারণ এগুলো হচ্ছে একমাত্র প্যানেল চিত্রকর্মের উদাহরণ, যা প্রাচীন বিশ্ব থেকে এখনো টিকে আছে।

যে সময়ে ফাইয়ুম প্রতিকৃতিগুলো আঁকা হয়েছে, তখন টেওটিহুয়াকানে (বর্তমানে যে এলাকাটি মেক্সিকোতে) ‘পিরামিড অব ফেদার্ড সার্পেন্ট’ মেসোআমেরিকানদের নিজস্ব অধোলকটিকে প্রত্যক্ষভাবে তাদের জন্য অভিগম্য করে তুলেছিল। দানবীয় সাপের মাথাগুলো এই পিরামিডের সম্মুখভাগের বহিঃরেখাটি তৈরি করেছে, যাদের প্রত্যেকটি ওজন চার টনেরও অধিক, একদা উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত এই সাপগুলো সেদিকে অগ্রসর হওয়া যে-কারো মনে ভীতির সঞ্চার করতো। ২০০০ বছর আগে মেসোআমেরিকায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল টেওটিহুয়াকান, যেখানে সর্বোচ্চ জনসংখ্যা ছিল ১৫০,০০০। পরবর্তীতে অ্যাজটেকেরা এটির নাম দিয়েছিলেন: ‘দেবতাদের জন্মস্থান’, এবং শহরটির ধ্বংসাবশেষ তাদের নিয়মিত একটি তীর্থস্থান ছিল। তবে, ‘পালকে আবৃত সাপের’ এই পিরামিডের নীচে যা কিছু ছিল সেখানে অ্যাজটেকেরা কখনো প্রবেশ করতে পারেননি। কারণ, ২২৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভূগর্ভস্থ সেই কক্ষের প্রবেশদ্বারটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ২০০৩ সালে এই প্রবেশপথটি পুনরাবিষ্কৃত হয়েছিল। এই করিডোরটির দুই পাশে সারিবদ্ধ হয়ে ছিল দেবতাদের উদ্দেশ্য নিবেদিত বহু সহস্র পুজার অর্পণ, এবং যা বিস্তৃত ছিল একশ মিটার অবধি। এর একেবারে শেষ প্রান্তে ক্ষুদ্রাকৃতির একটি পার্বত্য দৃশ্য সৃষ্টি করা হয়েছিল পারদ পূর্ণ তিনটি ক্ষুদ্র হ্রদসহ। অভ্রের টুকরো সুড়ঙ্গের ছাদ আর দেয়ালে স্থাপন করা হয়েছিল। মশালের আলোয় অভ্র ঝলমল করে উঠতো, সুড়ঙ্গের ছাদটিকে রাতের আকাশে রূপান্তরিত করতো। এই পূর্ণ নিমগ্ন করার অভিজ্ঞতা কী পাতাললোকের একটি শক্তিশালী আহ্বান স্মারক ছিল, ‘অ্যাভিনিউ অব ডেড’ বা মৃতদের পথ দ্বারা যা যুক্ত ছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরের সাথে?

টেওটিহুয়াকানে আবিষ্কৃত হায়ারোগ্লিফগুলোর এখনোও মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, এই স্থানে বসবাসরত মানুষ এবং শিল্পীরা এখনো রহস্য হিসেবেই রয়ে গেছেন। আনুষ্ঠানিক শৈলীবদ্ধ রীতিতে আঁকা পাখি আর প্রাণীদের চিত্রের খণ্ডাংশ, যা একসময় বাসস্থান এবং জনগণের জন্য উন্মুক্ত চত্বর এবং দেবতাদের বহু সুবিশাল ভাস্কর্য পিরামিডগুলোকে অলংকৃত করেছিল। "গ্রেট গডেস" বা মহান দেবী আবিষ্কৃত হয়েছে "পিরামিড অব দ্য

মুনের” নিকটে, এই শহরে আবিষ্কৃত হওয়া এটাই সবচেয়ে বড় ভাস্কর্য। পানির দেবীর সরলীকৃত একটি মুখ ছিল, কিন্তু তার পরনের কাপড় ছিল খুবই সূক্ষ্মভাবে বিন্যস্ত, জটিল ও বিস্তারিত নকশার, যা ইঙ্গিত করে কাপড়টির সম্ভবত প্রতীকী মূল্য ছিল।

মেসোআমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় বস্ত্রশিল্প তাদের শৈল্পিক সংস্কৃতি কেন্দ্রীয় একটি উপাদান। পেরুর পারাকাসের কাপড় ছিল খুবই আরাধ্য, মূল্যবান এবং বিস্ময়করভাবে বিস্তারিত ও জটিল নকশায় পূর্ণ, যা তৈরি করতে বহু হাজার ঘন্টা ব্যয় করার প্রয়োজন হতো। নারীরা সমবেতভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চাদর অথবা কাপড় তৈরি করতেন, যা দশ মিটার অবধি দীর্ঘ হতো। বস্ত্রশিল্প আজ সবসময় শিল্পকলা হিসেবে চিহ্নিত হয় না, কিন্তু সেই সময়ে পেরুর বাসিন্দাদের জন্য সেগুলো ছিল সবচেয়ে মূল্যবান সাংস্কৃতিক সম্পদ। সমাজের নেতাদের শরীর এই ধরনের বহু চাদরে আবৃত করা হতো, যখন তারা মারা যেতেন। যত বেশি জটিল নকশা, তত বেশি আরাধ্য ছিল সেই কাপড়, কারণ মৃত নেতাকে সম্মান জানাতে আক্ষরিকভাবেই এর মধ্যে সময় বুনন করা হতো । ‘লিনিয়ার’ বা সরলরৈখিক শৈলী, যেখানে সরল রেখা এবং অল্প কিছু রং ব্যবহার করা হতো, যা ক্রমশ ‘‘ব্লক রং’ শৈলীতে রূপান্তরিত হয়েছিল, যেখানে অধিক্রমণ করা সেলাই ও বুনট রঙের ঘন এলাকা এবং আরো জটিল বক্র রেখা সৃষ্টি করেছিল। জনপ্রিয় উড়ন্ত শামান ডিজাইন আমাদের চোখে আজ দেখলে খুবই আধুনিক মনে হবে, শামান বা আদিম নিরাময়কারীদের মোটিফ পুনরাবৃত্তি হয়েছে খানিকটা ভিন্ন রংসহ যারা স্বাধীনভাবেই পুরো চাদর জুড়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে। প্রতিটি শামানের মাথা পেছন থেকে ঝুকে আছে, চুল বাতাসে উড়ছে, যেন তাদের পরিচালিত করছে বৃহত্তর কোনো শক্তি। কিছু পারাকাস

ডিজাইন উদ্দেশ্যপূর্ণভাবেই বিমূর্ত, যা পশ্চিমা বিমূর্ত ধারণার সহস্র বছরেরও বেশি সময় আগে আবির্ভূত হয়েছিল।

আরো দক্ষিণে, পেরুর নাসকায়, আরো পরীক্ষামূলক একগুচ্ছ শিল্পকর্ম সৃষ্টি করা হয়েছিল, যা বর্তমানে 'জিওগ্লিফ' বা ভূচিত্র নামে পরিচিত। প্রায় ৭০০ বছরব্যাপী, ভূখণ্ডের উপর আঁচড়ে দীর্ঘ রেখা সৃষ্টি করা হয়েছিল নাসকা আর ইনজেনিও নদীর মধ্যবর্তী এলাকায়। এই সমতল আবৃত করে রাখা কালো পাথরগুলোর নীচে অনেক হালকা রঙের একটি স্তর আছে, যা প্রায় পৃষ্ঠদেশ থেকে ৩০ সেমি নীচে অবস্থিত। এই দাগগুলো সৃষ্টি করা হয়েছিল কালো পাথরগুলোকে আঁচড়ে এর ওপর থেকে সরিয়ে, আর এই এলাকা বৃষ্টিপাত খুবই কম হবার কারণে আজ অবধি সেই দাগগুলো দৃশ্যমান। এর কোনো কোনোটি সরল রেখা হিসেবে প্রায় ২০ কিলোমিটার অবধি বিস্তৃত, অন্যগুলো বক্র , কখনো আঁকাবাঁকা হয়ে প্রাণী আর মানুষের আকৃতি নিয়েছে যারা বহু শত মিটার প্রশস্ত। এগুলো দেখা অসম্ভব, যদি না আপনি উড়োজাহাজ চড়ে ওপর থেকে দেখেন। কিন্তু কেন এগুলো তৈরি করা হয়েছিল? যা তারা কখনোই সেগুলো দেখতে পেত না সম্পূর্ণভাবে। হয়তো তারা সেগুলোকে দেখা নয়, বরং অনুভব বা অভিজ্ঞতায় ধারণ করতে হতো? প্রতিটি ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে একটি একক রেখা ব্যবহার করে, সেই কারণে ভাবা হয়ে থাকে এগুলো মধ্যে আচারিক কিছু বিষয় যুক্ত হয়ে আছে, একটি পথ, যেখানে দল বেঁধে হাঁটতে হবে হয়তো পানি কিংবা উর্বরতার কোনো উৎসব উদযাপন করতে গিয়ে। সমতলের উপর ছড়িয়ে থাকা শিলাস্তূপ থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া পথ মানুষকে নানা ধরনের মোটিফ বা প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে নির্দেশিত করে: একটি গিরগিটি, সর্পিলাকার লেজসহ একটি বানর, একটি হামিংবার্ড, যার ডানার প্রশস্ততা একটি জাম্বো জেটের চেয়েও বড়।

পরিশেষে আমরা হয়তো জানতে পারবো না এই নাসকা রেখাগুলোর কোনো আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ছিল কিনা, কিন্তু ধর্ম ক্রমশ আরো বেশি ইউরোপ, এশিয়া আর মধ্যপ্রাচ্যের শিল্পকলার কেন্দ্রে অবস্থান নিতে শুরু করেছিল, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তা দেখবো।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) The Emperor (fifth from the lower right) oversees construction (detail), Column of Trajan, dedicated 113 C.E.,
(২) The crossing of the Roman Army over the Danube River in the first Dacian War Column of Trajan
(৩) The suicide of the Dacian King Decebal on the Trajan Column
(৪) Discobolus (translated 'discus thrower'). Roman, 2nd Century AD, after a Greek original by the sculptor Myron of 450-440 BC.
(৫) Adjacent busts of Emperor Hadrian and Antinous (৬) Statue of Plancia Magna, a great benefactress of Perge, 2nd century AD, Turkey
(৭) Roman tombstone of a freed slave called Regina
(৮) Lime wood mummy portrait of a woman. Roman Period Egypt, AD 160–170.
(৯) The Temple of the Feathered Serpent at Teotihuacan, central Mexico. Detail of the pyramid, showing the alternating "Tlaloc" (left) and feathered serpent (right) heads.
(১০) Chalchiuhtlicue, goddess of horizontal waters, like lakes and rivers.
(১১) Color Block Mantle, Peruvian (Paracas), first century C.E., wool, plain weave, embroidered with wool,
(১২) Detail view of shaman figures from Color Block Mantle, Peruvian (Paracas), Wool plain weave, embroidered with wool in stem-stitch.
(১৩) Hummingbird, Nasca Geoglyph, over 300 feet in length, formed approximately 2000 years ago

অধ্যায় ৬ - শিল্পকলা ও ধর্মের সখ্যতা

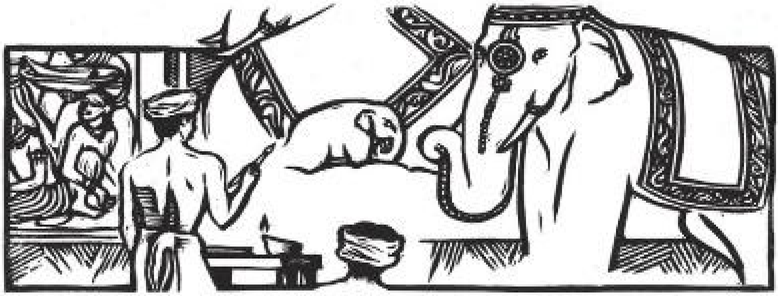

৩৩০ খ্রিস্টাব্দ, এবং রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী আবার একটি নির্মাণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এটি রোম ছিল না, এটি ছিল একটি গ্রিক শহর, বাইজেন্টিয়াম, সাম্প্রতিক সম্রাট কনস্টান্টিনোপল তার নিজের নামে শহরটিকে পুননামকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যখন কনস্টান্টিন রোম সাম্রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেছিলেন, তিনি তার রাজধানী শহরটিকে আরো পূর্বে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন, যেন তিনি রোম সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ আর লাভজনক পূর্বাঞ্চলীয় উপনিবেশ প্রদেশগুলোর ওপর সতর্ক নজর রাখতে পারেন। রোমের পূর্বাঞ্চলীয় এই প্রদেশগুলো বিস্তৃত ছিল আধুনিক তুরস্ক, সিরিয়া এবং মিসর অবধি, তিনি ভেবেছিলেন, কনস্টান্টিনোপল হবে দ্বিতীয় রোম।

যেসব নির্মাণ প্রকল্প তিনি বাস্তবায়ন করেছিলেন সেটি বাইজেন্টিয়াম শহরটির আয়তন চ ারগুণ বৃদ্ধি করেছিল। অগাস্টাস এবং সিজারসহ প্রাক্তন সম্রাটদের মূর্তি, এখন নতুন র

োজপথে কনস্টান্টিনের নিজের মূর্তির সাথে একই সারিতে স্থাপন করা হয়েছিল, এভাবেই তিনি অতীতের সেরা নেতাদের সাথে নিজেকে এক সারিতে দাড় করিয়েছিলেন। অন্য প্রাচীন ভাস্কর্যগুলো জোর করে সংগ্রহ করা হয়েছিল, যেমন, প্রাক্সিটিলিসের জনপ্রিয় ভাস্কর্য আফ্রোদিতি, অলিম্পিয়া থেকে ফিডিয়াসের সুবিশাল জিউস। রোমান দেবতাদের প্রতি নিবেদিত মন্দিরের পাশাপাশি বহু খ্রিস্টীয় চার্চও নির্মাণ করা হয়েছিল। কনস্টান্টিন চার্চে আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন, তারা প্রজাদের মধ্যে ক্রমশ বাড়তে থাকা খ্রিস্টের অনুসারীদের জন্য নতুন একটি বাইবেল সংকলন করারও নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিছু দিন আগ অবধি খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী হওয়া রোমে অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ ছিল, কিন্তু কনস্টান্টিন আইন পুনর্লিখন করেছিলেন, এবং এই ধর্মটিকে বৈধ ঘোষণা করেছিলেন।

*

কনস্টান্টিনের সময়, খ্রিস্ট ধর্ম অপেক্ষাকৃতভাবে নতুন একটি ধর্ম ছিল, মাত্র তিনশ বছর পুরানো। শিল্পীদের আঁকার জন্য বাইবেল একগুচ্ছ নতুন কাহিনী উপস্থাপন করেছিল। কিন্তু শৈলীগত দিক থেকে শুরুর দিকের খ্রিস্টীয় শিল্পকলাগুলো মূলত ক্ল্যাসিকাল চিত্রকর্মেরই অনুরূপ ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ছিল আরো অনেক প্রাচীন ধর্ম, এবং চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ ভারতে প্রতিটি বিশ্বাস কাঠামোকে ঘিরে একটি অগ্রসর ও জটিল, বিস্তারিত শিল্পকলার অনুশীলন ক্রমশ বিকশিত হতে শুরু করেছিল। গভীর খাড়া গিরিখাতের দেয়ালের পাথর কেটে খোদাই করে তৈরি করা হয়েছিল বৌদ্ধ বিহার (সন্ন্যাশ্রম) এবং চৈত্য (বৌদ্ধ প্রার্থনালয়), যেমন মুম্বাইয়ের উত্তরপূর্বে অজন্তায়। অজন্তায় ওয়াঘোরা নদীর তীরে ঘোড়ার পায়ের নালের আকৃতির আধা-কিলোমিটার খাড়া পাহাড়ে ত্রিশটি গুহা আছে। প্রায় ছয়শ বছরব্যাপী একটি সময় পর্বে পাথর কেটে এগুলো তৈরি করা হয়েছিল, এবং সবচেয়ে জটিল গুহাগুলোর সময়কাল ছিল পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। এই ধরনের

জানালাহীন পাথরের মন্দিরগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শুধুমাত্র এর মধ্যেই এই পর্বের ভারতীয় শিল্পকলাগুলো টিকে আছে।

অজন্তার বহু চিত্রকর্মে পানি ও বৃষ্টিপাতের সংশ্লিষ্ট উপদেবতা নাগারা বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছে। বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনীর সংকলন জাতকেও নাগারা আবির্ভূত হয়েছে (নাগারাজ সম্ভবত বৌদ্ধপুরাণের একটি চরিত্র, যা জাতকের গল্প থেকে এসেছে , অথবা সাপ-পুজারী স্থানীয় কোনো গোত্রের রাজা, যারা একই এলাকায় বসবাস করত অজন্তার প্রাচীন বৌদ্ধদের সাথে একই সময়ে এই বিশেষ গুহাটি নির্মাণ করার সময়)। একটি গুহায় খোদাই করা তথ্য ইঙ্গিত করছে এই জায়গায় নাগা রাজার বাসস্থান ছিল, এবং এই চিত্রকর্মগুলোর সম্ভবত যৌথ উদ্দেশ্য ছিল, স্থানীয় নাগাকে সন্তুষ্ট করা (বিরতিহীন পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে), এবং বুদ্ধের প্রশস্তি-বন্দনা।

অজন্তায় সতেরো নং গুহায় উপবিষ্ট বুদ্ধের একটি ভাস্কর্য দূরবর্তী দেয়াল দখল করে আছে । তার চারপাশে চিত্রিত ছাদ ও দেয়াল জাতকের নানা কাহিনী দিয়ে পূর্ণ। সাদা হাতি আর সিংহরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ফুলে আবৃত একটি মাঠে, যখন নারী ও পুরুষ মন্দির আর বাড়ীর মধ্যে একত্রে বসে আছেন বোধিসত্ত্ব রূপে (শিক্ষানবিশ বুদ্ধ) এবং বোধি লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনারত। এই চিত্রকর্মের শরীরগুলোকে আকৃতি দেবার জন্য দর্শনানুপাত, আলো আর ছায়ার উদ্দেশ্যপূর্ণ একটি ব্যবহার করা হয়েছে। স্তম্ভশ্রেণি আর প্রবেশপথগুলো গ্রিক স্থাপত্যের স্মৃতিবাহী, এবং গ্রিক শিল্পীরা সম্ভবত এই এলাকায় এই

শৈলীটির সূচনা করেছিলেন। গুহা জুড়ে আড়াআড়ি পা রেখে বসে থাকা বুদ্ধের মাথার পেছনে যে হেলো বা জ্যোতিশ্চক্র আমরা দেখি, সেটির উৎস সূর্য দেবতা অ্যাপোলোর গ্রিক ভাস্কর্য (খ্রিস্টীয় শিল্পকলা জ্যোতিশ্চক্র ব্যবহার করতে শুরু করেছিল স্বর্গীয় সত্তার একটি প্রতীক হিসেবে)।

এই সময় নাগাদ সুপ্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যপথ ভারত আর চীনকে যুক্ত করেছিল, যা বর্তমানে সমষ্টিগতভাবে 'সিল্ক রোড' নামে পরিচিত। ভারতীয় বৌদ্ধবাদ এইসব বাণিজ্যপথ ধরে ছড়িয়ে পড়েছিল, এই পথের বিভিন্ন বিরতিস্থানে বহু মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল।

মালামালের ক্যারাভানগুলো পূর্বে চিন, দক্ষিণে ভারত, পশ্চিমে কনস্টান্টিনের সাম্রাজ্য অবধি যাতায়াত করতো, মালামালের সাথে এই পথে প্রযুক্তি আর শিল্পকলার নানা ধারণাও বিনিময় হয়েছিল। চিন অবধি যে পথই আপনি নির্বাচন করুন না কেন, আপনাকে অবশ্যই টাকলা মাকান মরুভূমি অতিক্রম করতে হবে, যা প্রায় দুই মাসের পথ। এর অন্য দিকে ছিল ডুনহুয়াং, একটি সেনানিবাস কেন্দ্রীক শহর যা চীন সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তকে চিহ্নিত করেছিল।

চীনে চিত্রকর্মের একটি দীর্ঘ প্রসিদ্ধ অতীত আছে, কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর আগে ধর্মীয় চিত্রকর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়নি। চীন সাম্রাজ্য যখন বহু খণ্ডে বিখণ্ডিত, সেই অনিশ্চয়তাপূর্ণ সময়ে অস্থির মানুষ ধর্মের দিকে ঝুকে পড়েছিল, বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি। বৌদ্ধ শিল্পকলার সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ এই সময়ে এসেছিল ডুনহুয়াঙের মোগাও গুহা কমপ্লেক্স থেকে। এখানে মোট ৪৯২ টি গুহা আছে, এক কিলোমিটার দীর্ঘ খ াড়া পাহাড়ের গায়ে সেগুলো খোদাই করে নির্মাণ করা হয়েছিল। এই গুহাগুলো চীনে দেয়ালচিত্র আঁকার শ্রেষ্ঠতম সময়টিকে বর্ণনা করছে। পাথর খোদাই করে এইভাবে গুহা খনন এবং সেগুলো অলংকরণ করা শ্রম-নিবিড় একটি প্রক্রিয়া ছিল। সেই কারণে শিল্পীরা সাধারণত তাদের কাজ করার জায়গার নিকটে বসবাস করতেন, যেভাবে মিসরের শিল্পীরা করেছিলেন। শুরুতে ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব আমরা লক্ষ করতে পারি, এবং কিছু গুহায় আমরা জাতকের কাহিনীর চিত্রিত রূপ দেখি। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে নতুন উ পাদান সেখানে আবির্ভূত হতে শুরু করেছিল, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উপর থেকে দেখা কোনো ভূদৃশ্যচিত্র, পাখির চোখে দেখা সেই দৃশ্য, যা চীনের শিল্পকলার ইতিহাসে নতুন একটি উন্নয়নের ইঙ্গিত দিয়েছিল। অন্য গুহাগুলোয় বুদ্ধের চিত্র বার বার আঁকা হয়েছে,

তার ছবি দিয়ে গুহার দেয়াল পূর্ণ করা হয়েছে, যেমন গুহা ২৪৯, যেখান থেকে এই এলাকাটি এর নাম পেয়েছিল -‘কেভস অব থাউজ্যান্ড বুদ্ধাস’ (সহস্র বুদ্ধের গুহা)

এই পর্বে খ্রিস্টধর্ম মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপে সম্প্রসারিত হতে শুরু করেছিল। একটি নতুন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ছিল কনস্টান্টিনের উত্তরাধিকার, এবং এর মূল ভিত্তি ছিল খ্রিস্ট ধর্ম। সম্রাট কনস্টান্টিন কর্তৃক রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম থেকে কনস্টান্টিনোপলে স্থানান্তরিত করার একশ বছরের মধ্যেই রোমান সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পশ্চিমা অংশটি খুব দ্রুত দখল করে নিয়েছিল জার্মানিক গথরা (মধ্য ইউরোপ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় বসবাসকারী ঐতিহাসিক জার্মানিক জনগোষ্ঠী), কিন্তু পূর্বের অর্ধাংশ, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য আরো সমৃদ্ধ ও বিকশিত হওয়া অব্যাহত রেখেছিল। নব্য প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টীয় চার্চগুলো শিল্পীদের নিয়োগ দিয়েছিল জনপ্রিয় রোমান কৌশল, মোজাইক ব্যবহার করে বাইবেলের দৃশ্যাবলী সৃষ্টি করে এগুলোর দেয়াল আর ছাদ পূর্ণ করতে। কনস্টান্টিনোপলের শিল্পীরা আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের ‘গোল্ড’ (বা স্বর্ণ) মোজাইকের জন্য, এবং তাদের কাজ সিরিয়া থেকে সিসিলি অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল। মোজাইক নির্মাণ করতে যখন রোমান শিল্পীরা ক্ষুদ্র মার্বেলের টেসেরি (মোজাইকে ব্যবহার করা ক্ষুদ্র পাথর, কাচ, সিরামিক বা অন্য কোনো দ্রব্যের টুকরো, যার একটি নিয়মিত আকার আছে) ব্যবহার করেছিলেন, বাইজেন্টাইন শিল্পীরা এর পরিবর্তে রঙ্গীন কাচ ব্যবহার করেছিলেন। এটির আরো অনেক বেশি আলো প্রতিফলন করার শক্তি ছিল, এবং এর পেছনে স্বর্ণের পাতলা পাত যুক্ত করা যেত, যেন মোজাইকটি স্বর্গীয় আলোয় ঝলমল করে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাইজেন্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের ওপর তার অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠা করতে যুদ্ধ করেছিলেন। তার সফল সামরিক অভিযানের পূর্বে রাভেনা অস্ট্রোগথদের রাজধানী ছিল, সেই কারণে তার বিজয়ের স্মারক হিসাবে জাস্টিনিয়ান রাভেনার নতুন নির্মিত চার্চ সান ভিটালেতে তার নিজের ও তার স্ত্রী থিওডোরার একটি আকর্ষণীয় মোজাইক স্থাপন করেছিলেন। বিত্তশালী ব্যাঙ্কার জুলিয়াস আর্জেন্টারিয়াস এই চার্চটি নির্মাণ ও খ্রিস্ট এবং তার অনুসারীদের চিত্রিত করা স্বর্ণের মোজাইক দিয়ে পূর্ণ করতে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। 'জাস্টিনিয়ান' আর 'থিওডোরা' মোজাইকগুলো চার্চের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়েছিল, অল্টার বা বেদীর দুই পাশে পরস্পরের মুখোমুখি। জাস্টিনিয়ান এই মোজাইকে একটি স্বর্ণের পাত্র (প্যাটেন) হাতে দাড়িয়ে, যার মধ্যে আছে রুটি - খ্রিস্টীয় 'মাস' অনুষ্ঠানে যা খ্রিস্টের শরীরের প্রতিনিধিত্ব করে। বারো জন ব্যক্তি তার দুই পাশে দাড়িয়ে আছেন, যেন তারাই হচ্ছে তার বারো অনুসারী, এবং তিনি নিজেই হচ্ছেন ঈশ্বর পুত্র। তার বাম দিকে আছেন বিশপ এবং ডান দিকে আছেন সৈন্যরা, যারা চার্চ এবং রাষ্ট্রের ওপর তার শাসনের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

থিওডোরা জাস্টিনিয়ানের মুখোমুখি, মাথায় অতিঅলংকৃত বিশেষ মুকুট পরিহিত, এবং তিনি তার রাজকীয় পোষাকে সজ্জিত। তিনি চার্চের বাইরে একটি বাগানের মধ্যে দাড়িয়ে আছেন, ভিতরে প্রবেশের জন্য অপেক্ষমান। তার পরণের কাপড়ে প্রান্তে তিনজন ম্যাগাই (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি) নকশি কর্ম করে সেলাই করা, যা তাকে সরাসরি খ্রিস্টের জন্মের সাথে যুক্ত করেছে, তিনি একটি খ্রিস্টীয় আচারে ব্যবহৃত একটি পানপাত্র (বা চ্যালিস) হাতে নিয়ে দাড়িয়ে আছেন, খ্রিস্টীয় মাস অনুষ্ঠানের জন্য মদ ধারণ করে, য
ে মদ খ্রিস্টের রক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাস্টিনিয়ান আর থিওডোরার মাথার পেছনে জ্যোতিশ্চক্র তাদের এই সম্প্রসারিত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে শাসন করার স্বর্গীয় অধিকারের প্রতিনিধিত্ব করছে। এইসব মোজাইকগুলো প্রদর্শন করছে জাস্টিনিয়ান

কতটা ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু একই সাথে এর মাধ্যমে তিনি এই এলাকার ওপর নিজের ক্ষমতা স্থাপন করার বিষয়টিকে প্রদর্শন করেছিলেন। এছাড়াও এটি ছিল প্রথম চিত্রিত রূপ , যা পূর্বাঞ্চলীয় অর্থোডক্স খ্রিস্ট ধর্মের একটি কেন্দ্রীয় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল - একজন নেতার মধ্যে ধর্মীয় ও সেক্যুলার শক্তির সম্মিলন।

সান ভিটালের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছিল ৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে, কনস্টান্টিনোপলে (বর্তমান ইস্তাম্বুল) জাস্টিনিয়ানের সুবিশাল চার্চ হাগিয়া সোফিয়া পবিত্রকরণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবার দশ বছর পরে। সান ভিটালে আকারে অনেক ছোটো ছিল, একটি মাঝারি আকারের অষ্টভূজ চার্চ, যা এখন জাস্টিনিয়ান এবং থিওডোরার মোজাইকের জন্য বিখ্যাত। একটি বিষয় এখানে বলা গুরুত্বপূর্ণ, এই মোজাইকগুলো কিন্তু সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীর কারো চেহারার

নিকটবর্তী কোনো সাদৃশ্যতা প্রদর্শন করছে না - মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই, বেগুনী রাজ পোষাকের নীচে তাদের শরীর লুকিয়ে আছে, কাপড়গুলোর সজ্জা দাগকাটা স্তম্ভের মত। আর এটি কিন্তু শিল্পীর ব্যর্থতা নয়, এই প্রতিকৃতিগুলো বাস্তবানুগ নয়, বরং প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছে। জাস্টিনিয়ান কখনোই রাভেনায় আসেননি, সুতরাং এই সব বিস্তারিত মোজাইকগুলো হচ্ছে তার ‘প্রক্সি’, যেগুলো তার প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এগুলো স্বর্গীয় রাজকীয় উপস্থিতির একটি দৃশ্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করে, সাময়িক কোনো সদৃশ্যতা নয়, বরং এমন কিছু যা অনন্তকাল ধরে স্থায়ী হবে, যেমন ঈশ্বর, চার্চ, সাময়িক কোনো সাদৃশ্যতা নয়।

এই পর্যায় নাগাদ, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে খ্রিস্ট ধর্ম আরো বহু দূরে সম্প্রসারিত হয়েছিল, এবং এটি ইউরোপের শীতলতম প্রান্ত অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। প্রাকৃতিক আর স্বাভাবিক শরীরের প্রতি ক্ল্যাসিকাল পর্বের মোহাচ্ছন্নতা থেকে খ্রিস্টীয় শিল্পকলা সরে এসেছিল, এবং দৃশ্যমান কোনো সাদৃশ্যতার চেয়ে বরং ধর্মীয় বার্তা মূলত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। মানুষ নয়, ইউরোপের উত্তরে প্রাণীরা মূলত শিল্পকলায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। কেল্টিক-জার্মানিক শৈলী, যেভাবে এটি পরিচিত ছিল, সেটি স্ক্যান্ডেনেভিয়া থেকে জার্মানি এবং রাশিয়ার তৃণভূমি স্টেপ অবধি বিস্তৃত ছিল। উত্তর ইংল্যান্ড ৭০০ খ্রিস্টাব্দে ‘‘লিন্ডিসফার্ন গসপেলস’’ সমাপ্ত হয়েছিল, এটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ কীভাবে এই কেল্টিক-জার্মানিক শৈলী ব্যবহৃত হয়েছিল সন্ন্যাসীদের দ্বারা। তারা সন্ন্যাশ্রমে বড় স্ক্রিপটোরিয়ায় (লেখার কক্ষ) কাজ করতেন, বাইবেলের অনুলিপি তৈরি করে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন ।

লিন্ডিসফার্ন গসপেলসের শিরোনাম পাতাগুলো ‘কেল্টিক নট’ এর অতিঅলংকৃত সজ্জায় সজ্জিত, সেই সাথে আনুষ্ঠানিক শৈলীতে আঁকা প্রতীকী প্রাণী আর পাখিরা বড় অলংকৃত বর্ণগুলো পূর্ণ এবং খ্রিস্টীয় ক্রুশকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে।

ফ্লেমিঙ্গো এবং ঈগল, সাপ এবং ড্রাগন আপাতদৃষ্টিতে গতিময়তার সাথে এই ঈশ্বরের শব্দ ধারণ করা পৃষ্ঠাগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছে। এই বইয়ে আমরা পুরো পৃষ্ঠাব্যাপী স্বীকৃত গসপেলের চার সাধু লেখকদের প্রতিকৃতি দেখতে পাই: ম্যাথিউ, মার্ক, ল্যুক এবং জন। তাদের শরীরগুলো যেন ভাসমান, একমাত্রিক এবং অলঙ্করিষ্ণু। টানা টানা আয়তাকার চোখসহ তাদের চেহারাগুলো সুস্পষ্টভাবে সূত্রমাফিক আঁকা। ততদিনে শরীর বিশুদ্ধভাবে প্রতীকী রূপ ধারণ করেছিল। এই চিত্রগুলো সত্যিকারের মানুষ নয়, বরং ধারণা হিসেবে সাধুদের উপস্থাপন করেছিল। সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলো ছিল তাদের শনাক্ত করার প্রধান উপায় ছিল, যেমন মার্কের সাথে ডানাযুক্ত সিংহ। আর এই পদ্ধতির অনুসরণ একটি বই থেকে আরেকটি বইয়ে সেগুলো অনুলিপি তৈরা করার কাজটি সহজ করেছিল।

ধর্ম এই সময়ে শিল্পকলার মূল চালিকা শক্তি ছিল, এবং মধ্য প্রাচ্যে একজন নতুন ধর্মীয় নেতা, মুহাম্মদ, সেই সময় নাগাদ নতুন একটি ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। তার প্রবর্তিত সেই নতুন ধর্ম ইসলামের অনুসারীরা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছিল, এবং জেরুজালেম এবং আলেক্সান্দ্রিয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো দখল করে নিয়েছিল। ইসলামের বিধি অনুসারে, ধর্মীয় কোনো ব্যক্তি, যেমন, মুহাম্মদের কোনো চিত্র আঁকা নিষিদ্ধ ছিল। আর এর কারণ ছিল মূর্তি হিসাবে যেন কোনো ছবিকে উপাসনা করা না হয়, কারণ এই উপাসনা পাওয়ার অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত। তবে বহু ভিন্ন ধরনের ইসলামী শিল্পকলা বিকশিত হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান ইসলামী সাম্রাজ্যে বিভিন্ন এলাকা বহু মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল , এবং এর রাজধানী দামাস্কাসে (আধুনিক সিরিয়ায়), দামাস্কাসের উমাইয়াদ মসজিদের (দ্য গ্রেট মস্ক) নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে। মাত্র দশ বছরের মধ্যেই এটি নির্মাণ করা হয়েছিল, সিরিয়া থেকে সংগৃহীত রাজস্ব আর মিসর থেকে আসা শ্রমের

বিনিময়ে। কুর'আনে থেকে সংগৃহীত আয়াতের ক্যালিগ্রাফি বা চারুলিপি মূলত এর দেয়ালে খোদাই করা হয়েছিল, যে ঐতিহ্যটি আজ অবধি চলমান। আল্লাহ কিংবা মুহাম্মদের ছবি আঁকা না গেলেও 'আল্লাহ' শব্দ চিত্রিত করা যেতে পারে, এবং শিল্পকলার একটি রূপ হিসাবে ক্যালিগ্রাফি বা চারুলিপি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

উমাইয়াদ মসজিদে চারুলিপির খোদাইগুলো এখন আর নেই, তবে মোজাইকগুলো এখনো টিকে আছে, যা তৎকালীন শিল্পীদের আন্তঃসংযোগ সম্পর্কে আমাদের বিস্ময়কর কিছু তথ্য দেয়, বিশেষত অষ্টম শতাব্দীতে। কেন্দ্রীয় অঙ্গন বা উঠানের দেয়াল, আর আচ্ছাদিত হাঁটার পথে আমরা স্বর্ণের মোজাইক দেখতে পাই, বাইজান্টাইন শিল্পীরা যা সম্পূর্ণ করেছিলেন। এগুলো জনশূন্য শহরের দৃশ্য প্রদর্শন করে, যা প্রাচীন রোম আর গ্রিসের স্মৃতিবাহী। দীর্ঘ গাছের সারিবাধা নদীর তীর, যার পাশে দাড়িয়ে আছে সুবিশাল প্রাসাদ, গাছের ওপর দিয়ে দূরে পাহাড়ের খাড়া ঢালে শহর দেখা যাচ্ছে। সবুজ, নীল আর সোনালী ভবনগুলো সতর্কভাবে সজ্জিত করা হয়েছে মসজিদের দেয়ালগুলো পূর্ণ করার জন্য, এবং সবকিছুই প্রশান্ত শৃঙ্খলার চিহ্ন বহন করছে।

কিন্তু খলিফা প্রথম আল-ওয়ালিদ, যিনি এই মসজিদ নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেন মসজিদের মূল প্রাঙ্গনটিকে অলংকৃত করতে পশ্চিমা শহরের দৃশ্য নির্বাচন করেছিলেন, নামাজ পড়ার সময় মুসলমানরা যা হেঁটে অতিক্রম করতেন? তিনি কি ইসলামের নতুন ধর্মীয় সাম্রাজ্যকে আরো প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যগুলোর সাথে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন, যেমন রোম আর কনস্টান্টিনোপল কেন্দ্রীক সাম্রাজ্য? নাকি তাদের উপর আধিপাত্য প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে, কারণ ততদিনে ইসলামী সাম্রাজ্য উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন অবধি বিস্তৃত হয়েছিল? এই ডিজাইনকে কী তাহলে একটি মানচিত্র হিসেবে ভাবা যাবে, প্রাঙ্গনের চারপাশে প্রদর্শিত পৃথিবী, আর যার কেন্দ্রে আছে মসজিদটি ? মসজিদের দর্শনার্থীরা এই দৃশ্যকে জনাকীর্ণ করে তোলে ঠিক যেভাবে, তাদের সম্প্রসারণশীল সাম্রাজ্য বিশ্বকে জনাকীর্ণ করে তুলতে শুরু করেছিল।

এই মোজাইকের নেপথ্যে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, আল-ওয়ালিদ নিশ্চয়ই একটি আকর্ষণীয় মসজিদ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। প্রজাদের উদ্দেশ্যে দেয়া একটি ভাষণে তিনি মন্তব্য করেছিলেন: ‘দামাস্কাসের অধিবাসীরা, চারটি জিনিস বাকি বিশ্বের ওপর আপনাদের লক্ষণীয় মাত্রায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে: আপনাদের জলবায়ু, আপনাদের পানি , আপনাদের ফল এবং আপনাদের স্নানঘর। এই সবকিছুর সাথে আমি পঞ্চমটি যুক্ত করতে চেয়েছিলাম: এই মসজিদ’।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Colossus of Constantine, early 4th century AD statue depicting the Roman emperor Constantine the Great (c. 280–337)
(২) Ajanta caves, Maharashtra
(৩) Naga king with consort Ajanta in Ajanta caves
(৪) Sitting Buddha statue in Cave 16, Ajanta.
(৫) story of Chhaddanta Jataka, is found in Cave 17.
(৬) Mogao Cave 249. Dunhuang.
(৭) The spring landscape painted in ink-outlines, south wall (Mogao Cave 217).
(৮) Mosaic of Theodora - Basilica of San Vitale (built A.D. 547), Italy.
(৯) Christ enthroned flanked by Bishop Ecclesius and St Vitalis on the vault of the apse, Basilica of San Vitale, Ravenna, Italy
(১০) Court of Emperor Justinian with (right) archbishop Maximian and (left) court officials and Praetorian Guards; Basilica of San Vitale in Ravenna, Italy
(১১) Interior of the temple. Hagia Sophia mosaic of the Virgin and Child, Turkey, Istanbul
(১২) Matthew the Evangelist, Evangelist Mark, The Lindisfarne Gospels, c. 700 (Northumbria),
(১৩) The Great Mosque, Damascus
(১৪) original Umayyad-era mosaics, depicting landscapes and buildings, The Great Mosque, Damascus

অধ্যায় ৭- অশনি সংকেত

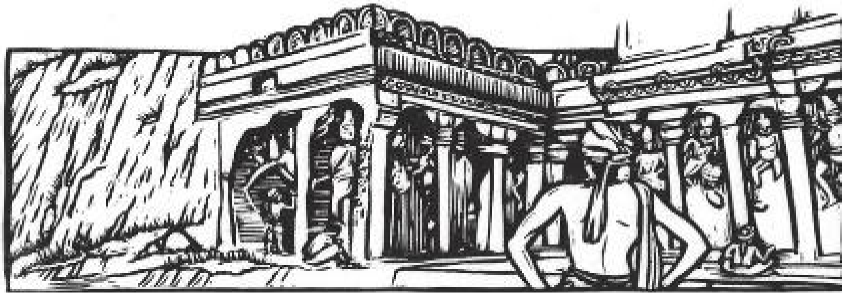

৭২৬ খ্রিস্টাব্দ, অন্ধকার হয়ে এসেছে, অনুষ্ঠান শুরু করার সময় এখনই। মায়া রাজা দ্বিতীয় শিল্ড জাগুয়ার তার প্রিয় স্ত্রী, লেডি ক'আব'আল সুকের প্রতি উৎসর্গীকৃত একটি নব্য নির্মিত মন্দিরে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। প্রায় ১৫০ বছরে ইয়াসচিলানে (আধুনিক মেক্সিকোয়) নির্মাণ করা এটাই ছিল প্রথম মন্দির। দ্বিতীয় শিল্ড জাগুয়ার আশা করছিলেন এই এলাকায় এটি নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে, এবং তার ক্ষমতা আরো দৃঢ় করে তুলবে। তিনি প্রায় পয়তাল্লিশ বছর ধরে রাজত্ব করছেন এবং ক'আব'আল সুক তার অনুগত সমর্থক ছিলেন, যখনই প্রয়োজন হয়েছে, রাজত্ব ও প্রজাদের জীবন রক্ষা করতে তিনি দেবতাদের তুষ্ট করেছিলেন। তার দেবতাদের বাঁচার জন্য রক্তের প্রয়োজন, তাই বন্দিদের নিয়মিত বলি দেয়া হতো।

কখনো শুধু রাজকীয় রক্তের দরকার হতো, ক'আব'আল সুক রক্তপাত করার আচারে অংশ নিতেন কাটার মতো অবসিডিয়ান (আগ্নেয় কাচ) টুকরো দিয়ে সজ্জিত একটি দড়ি তার জিহবার ওপর দিয়ে টেনে। এই কর্মটি এখন পাথরে সংরক্ষিত হয়ে আছে, তিনটি চুনাপাথরের জটিল প্যানেলে খোদাই হিসেবে, যা মন্দিরের দরজার ওপরেই স্থাপন করা হয়েছে। এই প্যানেলগুলো কাজ শেষ করতে ভাস্করদের তিন বছর সময় লেগেছিল, এবং উজ্জ্বল সবুজ, লাল আর হলুদ রং দিয়ে এটি বর্ণিত ছিল। কোনো সন্দেহ নেই ভাস্কররা অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন ক'আব'আল সুকের সমৃদ্ধ সুচীকর্মপূর্ণ রাজকীয় আচ্ছাদনের সব খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পাথরে সংরক্ষণ করতে গিয়ে, এছাড়া তার সূর্যদেব মেডালিয়ন বা পদক, এবং তার চিবুক দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত তারা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি কোনো আবেগ প্রদর্শন করছেন না, কারণ তিনি রাজকীয় দায়িত্ব পালন করছেন।

*

মন্দিরের এই প্যানেলগুলো যা আজ শুধু 'স্ট্রাকচার ২৩' নামে পরিচিত, বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং মেক্সিকো সিটির 'মুজেও নাসিওনাল ডে আনট্রোপোলোহিয়া' জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এই প্যানেল আবৃত করে রাখা এক সময়কার রং খসে পড়েছে, এবং এগুলো এখন আর পবিত্র কোনো মন্দিরের প্রবেশদ্বারকে চিহ্নিত করছে না, কিন্তু তারপরও সেই তীব্র ক্ষমতাটি এগুলো এখনো ধারণ করে আছে। প্রথম প্যানেলে আমরা দেখি, অতি-অলংকৃত একটি মস্তিষ্ক সজ্জা এবং অলঙ্কার পরিহিত রাজা ক'আব'আল সুকের মাথার ওপর একটি জ্বলন্ত মশাল ধরে আছেন দৃশ্যটিকে আলোকিত করতে, যিনি মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে তার প্রসারিত জিহ্বার উপর অবসিডিয়ানের ধারালো টুকরো বাধা দড়িটি টেনে ধরেছেন। পরের প্যানেলে আমরা দেখি তিনি মেঝের উপর বসে আছেন, অদ্ভুত একটি ঘোরে তার মাথা পেছন দিকে হেলে আছে, কাগজের একটি ঝুড়ি তার হাতে , যা তার জিহ্বা থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত শুষে নিচ্ছে (প্রচুর রক্তপাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায় , কারণ মেঝের ওপর আরেকটি ঝুড়ি নিকটেই অবস্থান করছে)। এই রক্ত থেকে জন্ম

নিয়েছে দুই মুখো একটি সাপ, এক প্রান্তে এটি ঝড়ের দেবতা চাক, আর অন্য মুখে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত একজন বিখ্যাত পূর্বসূরিকে উগরে দিচ্ছে। প্রতিটি প্যানেলে খোদাই করা মায়াদের হায়ারোগ্লিফ এই পূর্বসূরিকে দ্বিতীয় শিল্ড জাগুয়ারের সাথে সংযুক্ত করেছে, তার রাজকীয় রক্তের সাক্ষ্য দিয়ে, তার রাজত্ব ও আচারিক রক্তপাতের তারিখগুলো সরবরাহ করে। তৃতীয় প্যানেলে আমরা ক'আব'আল সুককে দেখি তার স্বামীর হাতে একটি ঢাল এবং জাগুয়ার মুখোশ তুলে দিচ্ছেন, যা তার নামের স্মারক, যার মাধ্যমে তিনি তার শাসন করার অধিকার বাস্তবায়ন করছেন।

অসাধারণ দক্ষতায় বিস্তারিত এবং সূক্ষ্ম এই খোদাই নিকটবর্তী বোনামপাকের দেয়ালচিত্রের শৈলীকে প্রভাবিত করেছিল। বোনামপাক ছিল মায়া সভ্যতার সর্বশেষ সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির চিহ্ন। এই দেয়ালচিত্রগুলো সমাপ্ত করা হয়েছিল এর পয়ষট্টি বছর পরে, এবং মাঝারি আকারে একটি মন্দিরের তিনটি কক্ষের দেয়াল আর ছাদে এই চিত্রগুলো বিস্তৃত হয়ে আছে । ইয়াসচিলানের চতুর্থ শিল্ড জাগুয়ারের প্রতি উৎসর্গীত ছিল এই মন্দিরটি। এলাকার পুর্বসূরি রাজাদের সেবায় বোনামপাক স্থাপিত হয়েছিল। এই চিত্রে শিল্পীরা ইন্ডিগো (একটি উদ্ভিদজ রঞ্জক) থেকে তৈরি করা মূল্যবান দ্যুতিময় রং উদারভাবে ব্যবহার করেছিলেন, যার সাথে তারা অ্যাজুরাইট (খুবই মূল্যবান একটি খনিজ) মিশ্রিত করেছিলেন, এবং চিত্রিত বহু চোখে এক সময়ে মূল্যবান পাথর বসানো ছিল।

প্রথম কক্ষের দেয়ালচিত্র প্রদর্শন করছে , কোনো একটি উৎসব চলমান, সাদা আলখেল্লা পরা বিত্তবান মায়া সদস্যরা সারিবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে আছেন রাজ পরিবারকে উপহার নিবেদন করতে। পালকসজ্জিত পরিচ্ছদে অভিজাত শ্রেণির তিনজন তরুণ কচ্ছপের খোলস দিয়ে তৈরি ঢোলের তালে নৃত্যরত। দ্বিতীয় কক্ষে একটি যুদ্ধের সূচনা হয়েছে, যুদ্ধের দৃশ্য পুরো ঘর দখল করে আছে। কে এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছে প্রবেশমুখের চারপাশে দেয়ালের চিত্র থেকে সেটি স্পষ্ট - চিতার চামড়ার আচ্ছাদনে ও মাথার মুকুট পরিহিত বিজয়ী মায়া যোদ্ধারা সিড়ির উচ্চতম ধাপে দাড়িয়ে আছেন, তাদের বন্দিরা মাটিতে শুয়ে আছে, তাদের মাথার তালু কেটে নেয়া হয়েছে, অথবা তাদের আঙ্গুল থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, তাদের সব নখ উপড়ে ফেলা হয়েছে। তিন নং কক্ষটি পুনরায় সেই উৎসবে প্রত্যাবর্তন, পালকের পোষাক পরা অভিজাত শ্রেণির সদস্যরা তাদের চমৎকার পরিচ্ছদ প্রদর্শন করছেন। কিন্তু ছাদের কাছে আমরা একজন রাজকীয় নারীকে দেখি নিয়ন্ত্রিত রক্তপাত করছেন, ক'বাল'সুক সুকের মতো তার জিহ্বায় অবসিডিয়ানের টুকরো বাধা দড়ি চালিয়ে, হয়তো কোনো বিজয়ের স্মারক ও দেবতাদের প্রতি নৈবেদ্য হিসেবে। এই ঘরে কোনো প্রাকৃতিক আলো নেই, দরজাগুলো সাধারণত আবৃত থাকে পর্দা দিয়ে। অন্ধকার বিষণ্নতায় আপনি অনুভব করতে পারবেন এই চরিত্রগুলো আপনার চারপাশে জড়ো হয়েছে, আপনি তাদের সাথে একীভুত হয়ে গেছেন: নৈবেদ্য দান, যুদ্ধ, দেবতার প্রতি সন্মান প্রদর্শন।

বোনামপাকে জীবনের পরিসমাপ্তি সম্ভবত দ্রুত ঘটেছিল। চিত্রকর্মগুলোর সময়কাল ৭৯১ খ্রিস্টাব্দ, কিন্তু হায়ারোগ্লিফের এক-চতুর্থাংশই অসমাপ্ত ছিল, যা ইঙ্গিত করে আকস্মিকভাবেই কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে পরবর্তী যুদ্ধের পরিণতি তাদের অনুকূলে যায়নি, এবং কাজ পরিত্যক্ত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে আকস্মিকভাবে পুনরাবিষ্কৃত হবার আগে পরবর্তী সহস্র বছর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চল এটি আবৃত করে ছিল ।

বিভিন্ন সভ্যতা বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাসের কাঠামো ও ধর্ম গ্রহন করেছিল, কিন্তু সবগুলোই তাদের ঈশ্বর বা দেবতাদের মহিমান্বিত করে তোলার একটি উপায় হিসেবে শিল্পকলার শরণাপন্ন হয়েছিল। ভারতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একাধিক দেব-দেবীকে হিন্দুরা উপাসনা করতেন। পাথরের মন্দির নির্মাণ অব্যাহত ছিল এবং ভারতের মহারাষ্ট্রের ইলোরায় গুহাগুলো বিভিন্ন হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন দেবতাদের প্রতি উৎসর্গীকৃত করা হয়েছিল। ইলোরার সবচেয়ে বিখ্যাত হিন্দু গুহাটিকে আদৌ গুহার মতো মনে হয় না। এটি বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ, উভয় দিকেই পাথর কেটে এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যে এটি গর্বিতভাবে খাড়ার পাহাড়ের মুখে পাথরের মন্দির হিসাবে দাড়িয়ে আছে, পাথর কেটে বানানো কোনো মন্দির রূপে নয়। ত্রিশ মিটারেরও বেশি উচ্চতার কৈলাস মন্দিরের নির্মাণ কাজ ৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল, এবং এটি প্রধান তিন জন হিন্দু দেবতাদের একজন - শিবের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছিল, (বিষ্ণু ও ব্রহ্মা হচ্ছেন অন্য দুইজন)। বিস্তারিত আখ্যানধর্মী রিলিফগুলো মহাভারত আর রামায়নের মহাকাব্যিক গল্পের চক্রগুলো বর্ণনা করেছে। বহু রূপে শিব এখানে আবির্ভূত হয়েছেন, প্রবেশ মুখে একটি বিশাল রিলিফে আমরা তাকে তিনটি নগরী ধ্বংস করতে, একটি দানবের উপর পা দিয়ে দাড়িয়ে থাকতে, এবং পার্থিব সব সুখ প্রত্যাখান করে কেন্দ্রীয় মন্দিরে একজন তপস্বী হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখি। শিবের বহুরূপী আবির্ভাব তার মর্যাদার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল (ঠিক যেভাবে রোমে তার স্তম্ভে সম্রাট ট্রেজান উনষাটবার আবির্ভূত হয়েছিলেন)। একটি সময় কৈলাস মন্দিরে সব ভাস্কর্য আর রিলিফ রঙে বর্ণিত ছিল, ধর্মপ্রাণ কারো দৃষ্টিতে অভিভূত করার মতোই একটি দৃশ্য।

ভারতের ধর্মগুলো দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বিস্তার লাভ করেছিল বাণিজ্যপথের মাধ্যমে এবং যা বহু বিশাল মন্দির কমপ্লেক্স নির্মাণে প্ররোচিত করেছিল। কেন্দ্রীয় জাভায় যোগকার্তায় অবস্থিত বোরোবুদুর হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ায় সবচেয়ে বৃহৎ ধর্মীয় স্থাপনা। ৮০০ খ্রিস্টাব্দের আশেপাশে কোনো একটি সময়ে নির্মিত এই মন্দিরটি মহাযান বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাগুলোর একটি দৃশ্যমান বিবরণ উপস্থাপন করেছে। একই সাথে এটি ক্ষমতাসীন বৌদ্ধ ধর্মবালম্বী শৈলেন্দ্র রাজবংশের ক্ষমতারও বার্তাবহ ছিল। মন্দিরটির বর্গাকার ভিত্তির প্রতিটি পাশ

১২৩ মিটার দীর্ঘ, এবং তিনটি স্তরে নির্মিত হয়েছিল, যা নির্বান অভিমূখে বৌদ্ধ ধর্মমতে মহাবিশ্বের তিনটি ভাগকে প্রতিনিধিত্ব করছে। রিলিফ ভাস্কর্যগুলো বিস্তৃত প্রায় আড়াই কিলোমিটার জায়গা ঘিরে ছাদবারান্দার আটটি স্তরের চারপাশে, যেখানে আমরা বুদ্ধের জীবন এবং তার প্রাক্তন পুনর্জন্মগুলোর বিবরণ দেখি। প্রায় ৪০০ আসীন কিংবা প্রার্থনারত বুদ্ধের ভাস্কর্য নীচের কেডু সমতলের দিকে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে, এছাড়াও উপরের স্তরে আরো বেশ কিছু ভাস্কর্য আছে, যা আবৃত করে আছে স্তূপ (ধর্মীয় বস্তুগুলোর ঘন্টাকৃতির আবরণ)।

বোরোবুদুর আর কৈলাস মন্দির আবৃত করা চিত্রকল্প ধর্মীয় বিশ্বাসকেই মহিমান্বিত ও দৃঢ়ীকরণ করেছে। তবে কনস্টান্টিনোপলে বাইবেল এবং এর চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলতে খ্রিস্টিয় প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে যারা বিশ্বাস করতেন এবং যিশু ও মেরির ‘আইকন’ বা ধর্মীয় চিত্রের অবিশ্বাসীদের মধ্যে একটি

বিভাজনের সূচনা হয়েছিল। দুই গোষ্ঠী যথাক্রমে ‘আইকনোফিল’ ও ‘আইকনোক্লাস্ট’ নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল । আইকনোফিলরা ছিলেন শিল্পকলা অনুরাগী ও উৎসাহী, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন আইকন-প্রিয় সন্ন্যাসী যাজকরা। আর আইকোনোক্লাস্টরা ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সকল চিত্র-বিরোধী ছিলেন, এবং তাদের নের্তত্ব দিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী বাইজেন্টাইন সম্রাট। অষ্টম শতাব্দী নাগাদ, ‘আইডল’ অর্থাৎ চিত্র বা মূর্তি ঈশ্বরের সমান মর্যাদায় উপাসনা করা হতে পারে এমন আশঙ্কায় সম্রাট তৃতীয় লিও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সর্বত্র ধর্মীয় চিত্র বা মূর্তি সৃষ্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। আইকোনফিলরা ভিন্নমত প্রকাশ করেছিলেন। তারা যুক্তি দিয়েছিলেন, এইসব ধর্মীয় দৃশ্য ও চরিত্রগুলোর প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্রকল্প ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের আরো গভীরতর উপলব্ধিতে পৌঁছাতে সহায়তা করে, এবং এগুলো ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যে সংযোগের একটি মাধ্যম। প্রায় একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ধর্মীয় চিত্রকল্প বিষয়ক পক্ষে ও বিপক্ষে এই যুক্তিগুলো পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। এই সময় পর্বে ধর্মীয় চিত্র-বিরোধী শিবির বহু শিল্পকলা ও ধর্মীয় প্রতীক ধ্বংস করেছিল, দেয়াল থেকে খ্রিস্টের মোজাইক চিত্র আঁচড়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, সাধারণ ক্রুশের চিত্র দিয়ে যা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। ৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে এই দুই অবস্থানের যুক্তির যুদ্ধে অবশেষে আইকোনোফিলরা বিজয়ী হয়েছিল, ধর্মীয় ছবি আর প্রতীক বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে আবার বৈধতা অর্জন করেছিল।

তবে ধর্মীয় প্রতীক বা চিত্রকল্প সংক্রান্ত বিতর্কে রোমের পোপ প্রবেশ করেননি। পোপ পবিত্র (হলি) রোমান সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব দিতে শার্লেমেনকে সম্রাট হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন, এবং যে সিদ্ধান্তটি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এবং কনস্টান্টিপোলের সাথে সম্পর্ক আরো ছিন্ন করেছিল। বর্তমান জার্মানির পশ্চিম সীমান্তবর্তী শহর আখেন থেকে শার্লেমেন তার রাজ্য শাসন করতেন, যে শহরটি এই এলাকায় চার্চের চিত্রকর্ম বাইজেন্টাইন ধর্মীয় চিত্র বিরোধীতায় বাধাপ্রাপ্ত হয়নি - বরং এর বিপরীতটাই ঘটেছিল। ক্রুশের উপরে খ্রিস্টের প্রমাণ আকারের ভাস্কর্য চার্চের অল্টার বা বেদির ওপর পদর্শিত হতে শুরু হয়েছিল। এই ভাস্কর্যগুলোর একটি উদাহরণ হচ্ছে ৯৬০ থেকে ৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে নির্মিত ‘গেরো ক্রুসিফিক্স’। এটি ওক কাঠ দিয়ে তৈরি যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হবার একটি দৃশ্যকল্প। আর্চবিশপ গেরো কোলোন ক্যাথিড্রালের জন্য এটি নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সোনালী রং দিয়ে গিলটি করা সাধারণ একটি কাঠের ক্রুশের উপর খ্রিস্টের শরীর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছে, কাধের চেয়ে খানিকটা উচ্চতায় তার দুই হাত দুই পাশে ছড়িয়ে আছে, এর নীচে তার শরীরের ভার আমরা অনুভব করি, তার ক্লান্ত কনুইগুলো ঝুলে আছে। এই সময় অবধি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ভাস্কর্যগুলো প্রদর্শন করেছিল যে, খ্রিস্ট মৃত্যুর সময়েও হাসছেন, কিন্তু এখানে আমরা খ্রিস্টের অবয়বে সুস্পষ্ট যন্ত্রণার ছাপ দেখি – তার মাথা নীচে ঝুকে আছে, চোখ বন্ধ, মুখ আনত। তাদের হাতের শিরাগুলো পরিশ্রমের ভারে স্ফীত, তার পেট ফুলে আছে। যদিও শারীরিক সাদৃশ্য গ্রিক ভাস্কর্যের মতো বাস্তবানুগ নয়, কিন্তু এই ব্যক্তির শরীরের প্রতিটি ইঞ্চির যন্ত্রণা আমরা অনুভব করতে পারি। তিনি স্বর্গীয় হতে পারেন, মাথার পেছনে চিত্রিত জ্যোতিশ্চক্র যার ইঙ্গিত দিচ্ছে,

কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষের মতোই মানব কষ্ট অনুভব করছেন। 'গেরো ক্রুসিফিক্স' অন্তিম ক্ল্যাসিকাল পর্বের পরে এই মাত্রায় নির্মিত হওয়া প্রথম নিরাবলম্ব (কোনো অবলম্বন ছাড়া দণ্ডায়মান) ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্য, এবং এটি অভিব্যক্তিময় চার্চ ভাস্কর্যের নতুন একটি যুগের সূচনা করেছিল।

সেই সময় অন্য সংস্কৃতিগুলোও মৃত্যু আর পুনর্জন্মের ধারণাটিকে কেন্দ্র করে শিল্পকলা সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান আমেরিকার ওহাইওতে 'গ্রেট সার্পেন্ট মাউন্ড', একটি বিশাল উত্তোলিত মাটির স্থাপনা, যার আকৃতি একটি সাপের মত। এটি আদিবাসী আমেরিকানদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত আচারের পটভূমি তৈরি করেছিলেন, এবং বহু দূর থেকে সামাজিক কিংবা বাণিজ্যিক কারণে আসা মানুষদের একটি মিলন ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করেছিল।

আফ্রিকার নাইজার উপত্যকায় বুরায় নারী মৃৎশিল্পীরা সমাধিচিহ্ন সৃষ্টি করেছিলেন, যা প্রথম ও দ্বিতীয় সহস্রাব্দ অবধি বিস্তৃত ছিল। সমাধিতে মৃতদেহের ভস্ম রাখার শতাধিক

ভস্মাধার আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলো অশ্বারোহী সৈন্য, এবং গোলাকার মাথা, ছিদ্রের মতো কাটা চোখ, দাগসহ গাল আর কপালসহ মানব- সদৃশ রূপে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই ফিগারগুলো প্রতীকী, বাস্তব বা প্রাকৃতিক নয়। এই একই অনুসরিত পদ্ধতি দৃশ্যমান হয়েছিল অলংকৃত বা 'ইলুমিনেটেড' পাণ্ডুলিপি আর মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান চার্চের রঙ্গীন কাচের শিল্পকর্মে।

এই সময়ে যদিও অধিকাংশ শিল্পকলা ধর্মবিশ্বাস থেকে এবং এটিকে মহিমান্বিত করতে সৃষ্টি করা হয়েছিল, কিন্তু ধর্মীয় নয় এমন অসাধারণ উদাহরণও টিকে আছে। শিল্পকলা সৃষ্টির উপাদান হিসেবে বহু শতাব্দী ধরেই আইভরি ব্যবহৃত হয়ে আসছিল, তবে মসুলমান স্পেন বা আল-আন্দালুসে সভাশিল্পীরা দশম শতাব্দীতে আইভরি ব্যবহার করে জটিল আর সূক্ষ্ম খোদাই কাজের রাজকীয় উপহার সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন। আল-আন্দালুসে শিল্পীরা আফ্রিকার হাতির দাঁত থেকে সংগৃহীত আইভরি ব্যবহার করেছিলেন , যেগুলো মোজাম্বিক এবং জিম্বাবুয়ে থেকে আমদানী করা হয়েছিল। আফ্রিকার পূর্ব উপকূল দিয়ে নৌপথে মূল্যবান এই হাতির দাঁতগুলো পরিবহন করে আনা হয়েছিল, তারপর স্থলপথে মিসরে, যেখানে কায়রো শহরে এগুলো বাণিজ্যের মাধ্যমে ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। ক্ষুদ্র বাক্স, গয়না রাখার বিশেষ বাক্স, সুগন্ধী রাখার বাক্স ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছিল এই শক্তিশালী, মসৃণ উপাদান ব্যবহার করে।

যদিও এই সময়ে সৃষ্ট এই ধরনের বহু বিলাসী আইভরি নির্মিত দ্রব্য প্রকৃত ‘শিল্পকলা’ নয়, বরং অলঙ্করিষ্ণু শিল্পকলা হিসাবে শ্রেণিবিন্যস্ত করা হয়েছে, কিন্তু বিস্ময়কর ‘‘আল-মুঘিরা পিক্সিস’’ (ক্ষুদ্র পেটিকা) প্রদর্শন করেছিল আইভরি খোদাই রিলিফ সৃষ্টিতে কী পরিমান দক্ষতা সেই সময়ের ভাস্কররা অর্জন করতে পেরেছিলেন। ৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে খোদাই করা এই পেটিকাটি ছিল গম্বুজের মত ঢাকনীসহ নলাকৃতির একটি বাক্স, যার মধ্যে রুপার সুগন্ধী পাত্র রাখা হতো। তৎকালীন খলিফার ছেলে আল-মুঘিরাকে তার আঠারোতম জন্মদিনে এটি উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছিল। রাজধানী কর্ডোবায় এটি খোদাই করা হয়েছিল এবং এটি অবিশ্বাস্যমাত্রায় জটিল একটি কাজ, এটি আবৃত করে ছিল বহু ক্ষুদ্র ফিগার ও প্রাণী, পাখি আর উদ্ভিদের পাতা। আইভরির ওপর খুব সতর্কভাবে

ড্রিল করে এমন খোদাইয়ের কাজ করা হয়েছিল যেন ক্ষুদ্রতম মানব শরীরগুলো সুস্পষ্টভাবে বাইরের দিকে প্রায় নিরাবলম্ব হয়ে বাইরের দিকে যেন বেরিয়ে আসে। একেবারে কেন্দ্রীয় প্যানেলে আমরা ঘোড়ার পিঠে আসীন দুই ব্যক্তিকে খেজুর গাছ থেকে খেজুর পাড়তে দেখি, যা এর কিশোর মালিককে আধুনিক সিরিয়ায় তার পূর্বসূরিদের উমাইয়াদ বাসভূমির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আল-মুঘিরার পিক্সিসের মত বাক্সগুলো "প্রিন্সলি সাইকেল" থেকে দৃশ্য চিত্রায়িত করেছিল - রাজসভার সভাসদদের অবসর-যাপন আর বিনোদন নিয়ে একটি গল্প - উমাইয়াদ খিলাফতের সময় যেগুলো প্রথম ইসলামি শিল্পকলায় ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছিল, যখন উমাইয়াদ রাজবংশ মুসলিম বিশ্ব শাসন করতো। দশম শতাব্দী নাগাদ, উমাইয়াদ খিলাফত দূরবর্তী একটি স্মৃতিতে পরিণত হয়েছিল, আব্বাসী রাজবংশ ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ দখল করেছিল। শুধুমাত্র আল-আন্দালুসে উমাইয়াদ রাজবংশ এর ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে পেরেছিল। পরের অধ্যায় আমরা এই 'প্রিন্সলি সাইকেল' আবার ব্যবহৃত হতে দেখবো, তবে আরো বিশাল মাত্রায়। যখন রাজা এবং বিজয়ীদের সেবায় শিল্পকলা ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Lady Xook pulls a thorned cord through her tongue (detail), Lintel 24, Structure 23, Yaxchilán (Maya)
(২) Lintels 24, 25 and 26 from Structure 23, Yaxchilan
(৩) Detail of Bonampak Murals: Room 1 East Wall, Procession of Musicians
(৪) Bonampak Murals, Room 2. King Chan Muwan and Captives
(৫) Bonampak Murals, Room 3: Royal Family Performing a Bloodletting Ritual. Preparations for war, Mayan Civilization, 9th Century
(৬) A panoramic view of kailash temple at the canter of Ellora caves revealing the details from roof to bottom. Roof With a pinnacle in canter and four lions facing in four directions can be seen. An entire temple with maan stambh carved out from top to bottom in a single rock from cliff can be demonstrated. A temple represents home to Lord Shiva mount kailash
(৭) Shiva killing demon, entrance to Cave No. 16 (Kailasa Temple), Ellora Caves
(৮) stupas on top terrace at Borobudur. (Central Java, Indonesia)
(৯) borobudur relief, (Central Java, Indonesia)
(১০) borobudur relief (Central Java, Indonesia)
(১১) Gero crucifix, late 10. century, Cologne Cathedral, Germany
(১২) Serpent Mound (also known as Great Serpent Mound) in Peebles, Ohio, US
(১৩) Bura Terracotta Sculpture
(১৪) Pyxis of al-Mughira, possibly from Madinat al-Zahra, AH 357/ 968 C.E., carved ivory with traces of jade,

অধ্যায় ৮-প্রচারণার শিল্পকলা

১০৭৭ খ্রিস্টাব্দ, এবং বিশপ ওডো উত্তর ফ্রান্সের বেইউতে তার নতুন ক্যাথিড্রালটি ঈশ্বর -সেবায় উৎসর্গ করতে পবিত্রকরণ আচারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি এই উপলক্ষ্যে একটি সূচীকর্মের কাজ সৃষ্টি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং এখন সেটি প্রদর্শিত হচ্ছে। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭০ মিটার বিস্তৃত, প্রায় পুরো ক্যাথিড্রালের দৈর্ঘ্যের সমান। এগারো বছর আগে হ্যাস্টিং-এর যুদ্ধে ওডো তার সৎভাই, ডিউক অব নরম্যান্ডির উইলিয়ামের পাশাপাশি যুদ্ধ করেছিলেন। এই সূচীকর্মটি ১০৬৬ সালের সেই যুদ্ধের মহাকাব্যিক কাহিনিটি বর্ণনা করছে, নরম্যান্ডির ডিউক উইলিয়াম এবং ইংল্যান্ডের রাজা হ্যারল্ডের মধ্যে সংঘটিত একটি যুদ্ধ, যার লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ড শাসন করার অধিকার। যখন ফরাসীরা যুদ্ধে জিতেছিল, ওডোকে পুরষ্কার হিসেবে ইংল্যান্ডের কাউন্টি কেন্ট প্রদান করা হয়েছিল। তিনি তার ক্যাথিড্রাল নির্মাণ করতে এই কেন্ট থেকে আসা রাজস্ব ব্যবহার করেছিলেন, এবং কেন্টের নানদের দিয়ে তিনি এই সূচীকর্মটি তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। দশটি ভিন্ন রং ব্যবহার করা হয়েছিল, 'ম্যাডার মূল' ব্যবহার করে লাল রং আর 'ওড' উদ্ভিদ ব্যবহার করে নীল রং তৈরি করে উল রঞ্জিত করা হয়েছিল।

ওডো পুরো সূচীকর্মের দৈর্ঘ্য বরাবর হেঁটে এর ওপর লেখা ল্যাটিন বিবরণীগুলো পড়েছিলেন, যা হ্যারল্ডের বিশ্বাসঘাতকতা এবং উইলিয়াম দ্য কনকেররের হাতে তার প্রাপ্ত শাস্তির নরমান সংস্করণটির বর্ণনা করেছিল। ওডো সেখানে দেখতে পাচ্ছিলেন

উইলিয়ামের নৌবহর তৈরি করতে বহু মানুষ গাছ কাটছে, এবং নৌকায় ওঠার সময় তারা মোজা খুলছে যেন ভিজে না যায়। তিনি দেখেছিলেন ফ্রান্স প্রান্তে নৌকায় তারা চেইনমেইল (ধাতব শৃঙ্খলনির্মিত বর্মবিশেষ) বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, এবং তারপর ইংল্যান্ড প্রান্তে অশ্বারোহী সৈন্যরা সেগুলো পরে যুদ্ধ যাচ্ছে। শরীরের জায়গাটি ভরাট করা সূচীকর্মের প্রতিটি বৃত্ত সতর্কতার সাথে সেলাই করা হয়েছিল শরীরের আকৃতি অনুসরণ করে। এখানেই সব কিছু আছে – যেভাবে হ্যারল্ড যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিলেন যখন তার চোখে একটি তীর প্রবেশ করেছিল। নরমান নৌকাগুলোর গলুই যেভাবে ভাইকিংদের মূর্তি দ্বারা সজ্জিত ছিল, যা তাদের বংশঐতিহ্য প্রদর্শন করেছিল। দুই পক্ষের বহু মৃত সৈন্য মূল সূচীকর্মের জমিন থেকে বাইরে ছিটকে পড়েছিল লিনেন চাদরের প্রান্তরে অলঙ্করিষ্ণু ফ্রিজের মধ্যে। সেখানে ৬০০ পুরুষ এবং নারী এবং ২০০ ঘোড়া ছিল। ওডো যখন এর দৈর্ঘ্য বরাবর অগ্রসর হচ্ছিলেন, বর্শা, তলোয়ার, তীর ধনুক, আহত হয়ে পড়ে যাওয়া ঘোড়া, মৃত্যুরত সৈন্যসহ যুদ্ধ প্রবলতর হয়ে উঠেছিল, তারা সবাই কৌনিকভাবে অগ্রসর হয়েছিল, যা সূচীকর্মটিকে একটি সত্যিকারের গতি দিয়েছিল এবং ওডো অনুভব করেছিলেন, তিনি আবারো সেই যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে দাড়িয়ে আছেন।

*

‘বেইউ ট্যাপেস্ট্রি’, এখন যে নামে এই সূচীকর্মের কাজটি পরিচিত, আসলেই প্রচারণামূলক শিল্পকলার শক্তিশালী একটি নিদর্শন ছিল। এটি পুরো যুদ্ধটিকে শুধুমাত্র নরমান দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছিল। প্রোপাগান্ডা বা প্রচারণা মানে হচ্ছে যে তথ্যগুলো আপনাকে দেয়া হচ্ছে সেখানে পক্ষপাতিত্ব আছে, সাধারণত সেটি রাজনৈতিক প্রকৃতির – একধরনের রাজনৈতিক মতপ্রচার বা রটনা। এই ক্ষেত্রে যুদ্ধের চিত্রকল্পটি সূচীকর্মের মাধ্যমে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল, যা ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে আগ্রাসনকারী নরমানদের বিশেষ সুনজরের সাথে উপস্থাপন করেছিল। এছাড়াও এটি মধ্যযুগীয় তথ্য এবং শৈল্পিক দক্ষতা ও নির্মাণের অসাধারণ একটি নিদর্শন, এবং

একাদশ শতাব্দীর একটি দুর্লভ ‘সেক্যুলার’ (যার বিষয়বস্তু ধর্মীয় নয়) সৃষ্টি, যা কিনা এখনো টিকে আছে।

জাপান থেকে আসা ধর্মীয় বিষয় নয় এমন শিল্পকলার আরেকটি উদাহরণও প্রদর্শন করেছিল, কীভাবে শিল্পীদের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলো শিল্পকর্মের চূড়ান্ত রূপ দিতে পারে। “দ্য টেলস অব গেনজি” লেখা হয়েছিল ১০১০ খ্রিস্টাব্দের আশে পাশে কোনো একটি সময়ে। এটি লিখেছিলেন লেডি মুরাসাকি শিকিবু। সাধারণত এটিকে পৃথিবীর প্রথম উপন্যাস হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এর চুয়ান্নটি অধ্যায় জাপানি রাজসভায় সমকালীন জীবন এবং রোমান্সের বর্ণনা দিয়েছিল, এবং এটি বহুবার অনুলিপি করা হয়েছে। সবচেয়ে প্রাচীনতম অলংকৃত সংস্করণটি মোট বিশটি স্ক্রল বা প্যাঁচানো কাগজে লেখা হয়েছিল, এবং সম্পূর্ণ কাজটি ১১৩০ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছিল। শুধুমাত্র কিছু খণ্ডাংশের এখন অস্তিত্ব আছে। এখানে ক্যালিগ্রাফি বা চিত্রলিপি লিখেছিলেন পুরুষরা, কিন্তু চিত্রকর্মগুলো সমাপ্ত করেছিলেন রাজসভার নারী শিল্পীরা। হেইয়ান পর্বে জাপানের সাংস্কৃতিক জীবনে যাদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। চিত্রকর্মে কোনো অভিব্যক্তির প্রকাশ ছিল না, কারণ আবেগ প্রকাশকে এই সময় রাজসভায় সুনজরে দেখা হতো না। এর পরিবর্তে কাহিনীর নানা উত্থান, পতন ও বাঁক বিবেচনায় চরিত্রগুলোকে মনে হয়েছে সুস্থির। এখানে শুধু সূক্ষ্ম কিছু বিষয় - পরণের কাপড়ের রং, একটি ঘরে পর্দার অবস্থান - এই চরিত্রগুলো আসলে কী অনুভব করছে, সে বিষয়ে পাঠককে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দিয়েছে ।

স্ক্রলগুলো ছিল অন্তরঙ্গ, ব্যক্তিগত শিল্পকর্ম। অবসরে সেগুলো নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে, যখন আপনি কোনো একটি টেবিলে বসে, একটি স্ক্রল আংশিকভাবে উন্মুক্ত থাকবে আপনার সামনে, আপনি যখন কাহিনী অনুসরণ করে অগ্রসর হবেন, আপনি তখন ডান দিকে স্ক্রলটি গুটাতে থাকবেন, এবং বাম দিকে একটু একটু করে উন্মোচন করবেন সেই গল্প অনুসরণ করে, দৃশ্যগুলো ক্রমশ আপনার সামনে উন্মোচিত হতে থাকবে। “দ্য টেইলস অব গেনজি” স্ক্রলে ব্যবহৃত চিত্রকর্মগুলো ওপর থেকে একটি পৃথিবীকে প্রদর্শন করে, যেন আপনি নীচের দিকে তাকিয়ে আছেন, যা কিছু সেখানে ঘটছে সেগুলো দেখছেন

, যা ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনে মোগাও গুহায় আঁকা ভূদৃশ্যচিত্র আঁকার নতুন কৌশলের স্মৃতিবাহী। জাপানি শিল্পকলা চীনের শিল্পকলা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। যদিও এর ইতিহাসের কিছু পর্বে, যেমন হেইয়ান পর্বে, আমরা অনেক বেশি শৈলীগত স্বাধীনতা দেখি। সেই সময় চীনে জনপ্রিয় এক রঙের ভূদৃশ্যচিত্রগুলোর থেকে ব্যতিক্রম ‘ দ্য টেলস অব গেনজি’ স্পষ্টতই রঙিন। যদিও, রং আরোপনের বিবিধ ধাপ, পুনরায় আরোপিত বহিঃরেখা, সোনার পাত ব্যবহার করে বিশেষ কিছু জিনিসকে সুস্পষ্ট করে তোলা, ইত্যাদি কারণে জাপানি চিত্রকর্ম সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াটি কষ্টসাধ্য ছিল।

আমরা যেমন ইতোমধ্যেই দেখেছি, শিল্পকলা এছাড়াও ধর্মগুলোকে তাদের মতবাদ,বা সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসগুলো দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও প্রদর্শন করতে সহায়তা করেছিল। কারণ আইকন-বিরোধীতার সুনির্দিষ্ট পরিসমাপ্তির পর থেকে আইকনগুলো পূর্বাঞ্চলীয় খ্রিস্টান ধর্মের অপরিহার্য একটি অংশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্টা করেছিল। বিশ্বাস করা হতো এইসব আইকনগুলোর মূল উৎস কুমারী মেরি এবং যিশুখ্রিস্টের প্রতিকৃতি, যা গসপেল লেখকরা নিজেরা তৈরি করেছিলেন। প্রথাগত পদ্ধতি ব্যবহার করে এরপর সেগুলো অসংখ্যবার প্রতিলিপি করা হয়েছে। সাধারণত মনে করা হয় যে, প্রতিটি চিরন্তন সংস্করণই মূল প্রতিকৃতির সাদৃশ্যটিকে পুনঃসৃষ্টি করেছে, ‘লিন্ডিসফার্ন’ গসপেলে চিত্রিত সেইন্টদের মতো। স্বর্ণের পাতলা পাত দিয়ে সৃষ্ট পটভূমি, ধর্মীয় মোজাইক চিত্রকল্প তৈরিতে যা ব্যবহৃত হয়েছিল, সেগুলো প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো আরো হ্রাস করেছিল এবং এই আইকনগুলোকে স্বর্গীয় আলোয় ঝলমল করে তুলেছিল। এছাড়াও এগুলো নিশ্চিত করেছিল, পবিত্র চরিত্রগুলো যেন উপরিপৃষ্ঠে অবস্থান করে, চার্চে যাতায়াতকারীদের জন্য লভ্য, যারা এই আইকনগুলো স্পর্শ এবং চুমু খেতে পারেন, কুমারি মা অথবা খ্রিস্টের সাথে যোগাযোগের একটি উপায় হিসেবে। চার্চের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই আইকনগুলো নিয়ে শোভাযাত্রাও করা যেতে পারে রাস্তায়

১১৩১ খ্রিস্টাব্দের ‘ভার্জিন অব ভ্লাদিমির’, বর্তমানে অস্তিত্বশীল সবচেয়ে বিখ্যাত একটি ‘আইকন’ চিত্রকর্ম। কুমারী মা মেরি ও শিশু যিশুর একটি চিত্র, যা বিশ্বাসীরা মনে করেন সেইন্ট ল্যুকের মূল সংস্করণটি ভিত্তি করে আঁকা হয়েছে। আদি আইকনগুলো প্রায়শই ‘এনকস্টিক’ মাধ্যমে আঁকা হয়েছিল, মিশরে ফাইয়ুমে রোমান অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রতিকৃতিগুলোর মতো, কিন্তু ‘ভার্জিন অব ভ্লাদিমির’ আকা হয়েছিল ‘টেমপেরা’ ব্যবহার করে। টেমপেরা তৈরি করা হয় রঞ্জক পদার্থের সাথে ডিমের কুসুম মিলিয়ে, যেন সেটি দ্রুত শুকিয়ে যায় এমন একটি রঙে পরিণত করা যায়। ক্ল্যাসিকাল সময় থেকে এটি ধীরে শুকানো ‘এনকস্টিক’ পদ্ধতির পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু এই পর্যায় নাগাদ প্রায় সব চিত্রকর্মই টেমপেরা পদ্ধতিতে আঁকা শুরু হয়েছিল।

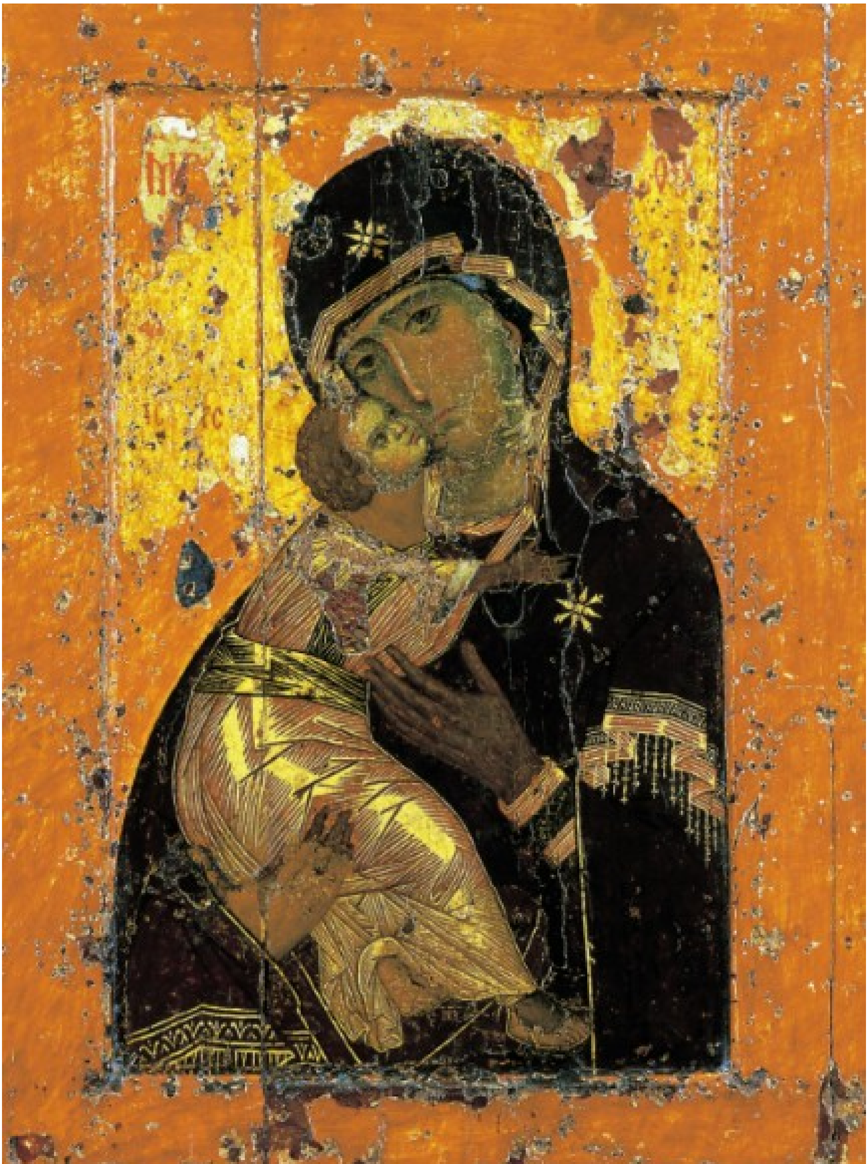

যে অজ্ঞাতানামা শিল্পী ‘ভার্জিন অব ভ্লাদিমির’ এঁকেছিলেন, স্পষ্টতই এখানে তিনি জীবন্ত বাস্তবানুগ নারী ও শিশুর মতো কিছু সৃষ্টি করার কোনো অর্থ খুঁজে পাননি। খ্রিস্টের মাথার আকারটি আনুপাতিকহারে খুবই ক্ষুদ্রাকার, এবং তার শরীরটি চৌকোনা কোনো খণ্ডের মতো, দুজনেই আবৃত হয়ে আছেন বিশেষভাবে আনুষ্ঠানিক কাপড়ে, কিন্তু তারপরও এই মা-শিশুর ঘনিষ্ঠতায় কোমলতা আছে, পরস্পরকে স্পর্শ করে থাকা গাল এবং কুমারী মা

মেরির বিষণ্ন অভিব্যক্তি আভাস দিচ্ছে, তার একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে। এই আইকনটি সেই কাহিনীর নিষ্কাশন পথ হিসাবে কাজ করে, এছাড়াও এটি একটি প্রবেশ পথ, আর সেই কারণে বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয়।

কনস্টান্টিনোপলে এটি তৈরি করা হয়েছিল, এবং উপহার হিসেবে রুশ শহর কিয়েভে এটি প্রেরণ করা হয়েছিল, যতটা রাজনৈতিক ঠিক ততটাই একটি ধর্মীয় উপহার হিসেবে, যার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্মকে রাশিয়ার রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে নির্বাচন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে। তবে খুব শীঘ্রই কিয়েভ থেকে এটি ভ্লাদিমির শহরে স্থানান্তর করা হয় এবং পরবর্তীতে বহু অনুলিপির একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। অর্থোডক্স মোজাইক সৃষ্টি করতে কিয়েভের ক্যাথিড্রাল সেইন্ট সোফিয়ায় কাজ করতে বাইজেন্টাইন শিল্পীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, যেভাবে ভেনিসে টোরচেলো ব্যাসিলিকায় কাজ করার জন্য তাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। শিল্পকলা, ধর্ম আর ক্ষমতা এবং পূর্বের অর্থোডক্স চার্চের উচ্চাভিলাষ একত্রিত হয়েছিল এইসব শিল্পীদের দক্ষতায়।
১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে অবশেষে পূর্বের অর্থোডক্স চার্চ, পোপ এবং ক্যাথলিক চার্চ থেকে 'মহাবিভেদের' মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল ।

যখন অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্ম রাশিয়ার ওপর এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছিল, মিশর, মাঘরেব (উত্তর আফ্রিকা), স্পেন এবং সিসিলিতে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী শহর প্রতিষ্ঠাসহ ইসলাম সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় এর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তবে নর্মানরা সিসিলি আর দক্ষিণ ইটালিকে ইসলামী শাসন থেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তারা ইসলামী ঐতিহ্যগুলো প্রত্যাখ্যান করেনি, বরং নিজস্ব অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতির সাথে তারা এটি যুক্ত করে নিয়েছিল। সিসিলির পালেরমো শহরে নরমান রাজা দ্বিতীয় রজার 'ক্যাপেলা প্যালাটিনা' ক্যাথিড্রাল নির্মাণ করেছিলেন, যা এই সংমিশ্রণের অসাধারণ একটি উদাহরণ। এই ক্যাথিড্রালটির নির্মাণ শুরু হয়েছিল ১১৩২ সালে এবং মাত্র আট বছর লেগেছিল এটি নির্মাণ করতে। সেইন্ট জন এবং চার্চের প্রতিষ্ঠাতা পিতাদের স্বর্ণ মোজাইক ক্যাথিড্রালের দেয়ালে যুক্ত করা হয়েছিল, সেই সাথে সেখানে রজার আর তার পরিবারের এক হাজার চিত্রকর্ম পুরো ছাদটিকে আবৃত করেছিল। যা এই ভবনটির বিস্ময়কর আর অনন্য করেছে, সেটি হচ্ছে এর ছাদটি ছিল একটি ইসলামী 'মুকার্নাস' ছাদ – কাঠের আকৃতি আর বহুপার্শ্বসহ জটিল আন্তঃসংযোগপূর্ণ মৌচাকের (মধুচক্রীয় ভল্টিং) জটিল রূপ সৃষ্টি করা কাঠামো (মুকার্নাসের উদ্দেশ্য কোনো খালি কাঠামোগত স্থানে উত্তরণের আলঙ্কারিক এলাকা তৈরি করা, এটি ভবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে পৃথক করা, কিংবা দেয়াল থেকে গুম্বুজ ছাদে রূপান্তর প্রদর্শনের ক্ষমতা দেয়) । এটি হচ্ছে সবচেয়ে জটিল ইসলামী ছাদ যা সেই পর্ব থেকে এখনো টিকে আছে। এই ক্যাথিড্রালটি উৎসর্গ করা হয়েছিল খ্রিস্টের প্রতি, এবং নর্মানদের ক্ষমতার একটি বিজয়স্মারক ছিল। দ্বিতীয় রজার, ইটালিয় ভাস্কর্যের সাথে আড়ম্বরপূর্ণ বাইজেন্টাইন মোজাইকের সম্মিলন করেছিলেন এবং এই মিশ্রণের চূড়ান্ত রূপটি দিতে সেখানে তিনি ইসলামী স্থাপত্যের বিশেষ নৈপূণ্য যুক্ত করেছিলেন।

এখানে ছাদটি বেশ উঁচুতে অবস্থিত, যদি আমরা শক্তিশালী বাইনোকুলার ব্যবহার করি, আমরা রাজা দ্বিতীয় রজার ও তার রাজসভার চিত্রকর্মগুলোকে এককভাবে শনাক্ত করতে পারবো - রজার তার সভাসদদের সাথে দাবা খেলছেন কিংবা শিকার করছেন কিংবা জাউস্টিং (দীর্ঘ বর্শা নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নাইটদের যুদ্ধ) আর কুস্তি লড়ছেন, এছাড়া নাচ এবং শোভাযাত্রায় অংশ নিচ্ছেন। বর্ণিল ফিগারগুলো যা কাঠের ছাদ আবৃত করে রেখেছে সেগুলো খ্রিস্টীয় রঙ্গীন কাচের কাজ আর অলংকৃত পাণ্ডুলিপির মতো, এবং একই সাথে ' সেক্যুলার' ইসলামী শিল্পকলার মতো - বড় টানাটানা চোখ আর আনুষ্ঠানিক শৈলীতে আঁকা শরীরসহ। চিত্রকর্মে প্রদর্শিত তাদের অংশ নেয়া নানা কর্মকাণ্ড এসেছে ইসলামী 'প ্রিন্সলি সাইকেল' থেকে, যা এর আগে আমরা স্পেনের আল-মুঘিরার পিক্সিসের ওপর দেখেছিলাম। ক্যাথিড্রালের জন্য রজারের এই সুপরিচিত ইসলামী ধারণাটির ব্যবহার বেশ বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ একটি পদক্ষেপ ছিল। এই চিত্রিত ছাদটির অস্তিত্ব আছে প্রদর্শন করতে যে, নরমান সিসিলি বহুসাংস্কৃতিক, যেখানে খ্রিস্ট ধর্ম আনুষ্ঠানিক ধর্ম হলেও, রাজসভায় ব্যবহৃত ভাষা ছিল আরবী। বিভিন্ন শৈলী আর ধারণার মিশ্রণ প্রস্তাব করে, রজার সব সংস্কৃতি এখানে একীভূত করেছেন এবং সব কিছু তার শাসনকে মহিমান্বিত ও যুক্তিযুক্ত করছে। খ্রিস্টান মোজাইক ধরে রেখেছে একটি ইসলামী ছাদ, যেন ইসলামের সাথে সহাবস্থান স্বীকার ও সমর্থন করার জন্য খ্রিস্টধর্ম যথেষ্ট শক্তিশালী।

একক ধর্মীয় ব্যক্তিরাও তাদের প্ররোচিত করার মতো নতুন ধারণাগুলো প্রকাশ করতে শিল্পকলা ব্যবহার করেছিলেন। খ্রিস্ট সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা চার্চ, ক্যাথিড্রাল এবং বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষকদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের জন্য বিরতিহীনভাবে 'ইলুমিনেটেড ' বাইবেলের পাণ্ডুলিপি অনুলিপি করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ 'ইলুমিনেটেড' বা অলংকৃত বই তৈরি করা শুরু হয়েছিল, যেগুলো মহাবিশ্ব আর অতিন্দ্রীয়বাদ সংক্রান্ত ধর্মীয় ধারণাপুষ্ট নতুন চিন্তাগুলো প্রকাশ করেছিল। একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে বিঙ্গেনের হিলডেগার্ড রচিত "স্কিভিয়াস"। ১১৫২ সালে সম্পূর্ণ হওয়া এই বইটি ছিল হিলডেগার্ডের মনশ্চক্ষে দেখা ছাব্বিশটি ভিশন বা স্বর্গীয় দৃশ্যকল্পের একটি অলংকৃত বিবরণ। হিলডেগার্ড জার্মানির রুপার্টসবার্গে তার নিজের প্রতিষ্ঠিত মঠের একজন প্রভাবশালী বেনেডিক্টাইন (ক্যাথলিক চার্চের অন্তর্ভুক্ত একটি ধর্মীয় অর্ডার বা প্রতিষ্ঠান সেইন্ট বেনেডেক্ট অর্ডারের একজন সদস্য) নান ছিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত একটি পরিবারের সদস্য ছিলেন, এবং অভিজাত শ্রেণির নানা স্তরে তার যোগাযোগ ছিল। তিনি ইংল্যান্ডের রাজা এবং গ্রিসের সম্রাজ্ঞীর সাথে চিঠিপত্র বিনিময় করতেন। এবং পোপ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, শৈশব থেকে যে কল্পদৃশ্যগুলো তিনি দেখেছিলেন বলে দাবি করেছিলেন সেগুলো সব অকৃত্রিম এবং স্বর্গীয়। 'স্কিভিয়াসে' তিনি খ্রিস্টধর্মকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন অতীন্দ্রিয়বাদের ভাষায়, এবং তার ইক্লেজিয়া, মাতৃ-চার্চ, সিনাগোগা বা সিনোগগের প্রতিনিধিত্বমূলক বিশাল ডানাসহ নারীর চিত্রকর্মগুলোয় তিনি নারীত্বের শক্তি অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি নিজেকে একজন নবী হিসেবে দেখেছিলেন, যিনি তার মনশ্চক্ষে দেখা স্বর্গীয় দৃশ্য দিয়ে সংযোগ করেছিলেন।

হিলডেগার্ডের চিত্রকর্মগুলো ফিগার চিত্রিত করার মিশরীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেনি, প্রচলিত অংশগুলোর একটি যুক্তকরণ, একটি চোখ, একটি পা, যার ভিত্তি ছিল মানব রূপ সংক্রান্ত পূর্বজ্ঞান। তিনি এছাড়াও গ্রিকদেরও অনুসরণ করেননি এবং প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অধ্যয়নও করেননি, এবং যা দেখেছেন সেটি সতর্কভাবে চিত্রায়ন করেননি। এর পরিবর্তে তিনি যা অনুভব করেছিলেন, যে অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছিলেন সেগুলো চিত্রিত করেছিলেন, এবং এভাবেই তিনি ঈশ্বরের জগতের একটি সংস্করণ তৈরি করেছিলেন যা অতিপ্রাকৃতিক, আমাদের এই পৃথিবীতে যার কোনো ভিত্তি ছিল না। শারীরিক আকৃতিগুলো প্রকৃত রূপের হবার দরকার নেই যতক্ষণ না যে আবেগ তিনি প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করছেন সেটি প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। স্কিভিয়াসে হিলডেগার্ড স্বর্গ থেকে আগুনের কর্ষিকার মতো অতিপ্রাকৃতিক কল্পনাগুলো তার মনের মধ্যে নেমে আসার দৃশ্য এঁকেছিলেন । তিনি নিজেকে এঁকেছেন ছবি আঁকার উপকরণসহ তিনি চার্চে বসে আছেন, দৃশ্যগুলো যখনই তার মধ্যে প্রবেশ করছে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তিগতভাবে সেটি আঁকছেন, যেন তাকে পরিচালিত করছে ঈশ্বরের হাত। তার স্ক্রাইব বা অনুলেখক ভোলমার, তার নিকটেই দাড়িয়ে আছেন,তার শব্দগুলো লিখে নিচ্ছেন যা এই ছবিগুলোর সঙ্গী পাঠ্যাংশ হবে।

স্কিভিয়াসের মোট পয়ত্রিশটি সংস্করণের এখনো অস্তিত্ব আছে এবং চার্চের মধ্যে হিলডেগার্ড শক্তিশালী একটি কণ্ঠ ছিলেন, যিনি বেশ কিছু বই লিখেছিলেন ও অলংকরণ করেছিলেন, এবং প্রায় ষাটটি স্তবসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। স্কিভিয়াস অনুলিপি হয়েছে এবং প্রচারিত হয়েছিল কিন্তু আবশ্যিকভাবে এই বইটির লভ্যতা সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ প্রতিটি বই যা তৈরি করা হতো, সেগুলো হাতে প্ররিশ্রমসাধ্য উপায়ে অনুলিপি করে তৈরি করা হতো। এর বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত পোপের নতুন ক্যাথিড্রালগুলো ছিল ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা বিষয়ক সুবিশাল গণবিবৃতি।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Scene from Baiyeux tapestry,
The Bayeux Tapestry is an embroidered cloth nearly 70 metres (230 ft) long and 50 centimetres (20 in) tall that depicts the events leading up to the Norman Conquest of England in 1066, led by William, Duke of Normandy challenging Harold II, King of England, and culminating in the Battle of Hastings
(২) Scene from Baiyeux tapestry, Death of Harold II, King of England
(৩) A scene of the Chapter "YADORI GI"(mistletoe) of Illustrated handscroll of Tale of Genji (written by MURASAKI SHIKIBU(11th cent.). The handscroll was made in about ACE 1130.
(৪) The Virgin of Vladimir, a 12th-century Byzantine icon depicting the Virgin and Child and an early example of the Eleusa iconographic type.
(৫) Two mosaics with Annunciation on the pillars of Saint Sophia Cathedral in Kiev, circa 1040
(৬) Detail of muqarnas ceiling, Cappella Palatina, c. 1130–43, Palermo, Sicily
(৭) Illumination from Hildegard's Scivias (1151) showing her receiving a vision and dictating to teacher Volmar

অধ্যায় ৯ - রাজমিস্ত্রী, 'মোয়াই' এবং উপাদান

উত্তর ফ্রান্সে ১২১৯ খ্রিস্টাব্দে কোনো একদিন ভোরে, বিশজন পাথর-কর্তনকারী রাজমিস্ত্রী তাদের সাময়িক বাসস্থানে একত্রিত হয়েছেন, যেখানে তারা খেয়ে কাজ শুরু করার আগে আগুনের চারপাশে জড়ো হয়ে বসে ছিলেন খানিকটা উষ্ণ হয়ে উঠতে। এই পাথর-কর্তনকারী রাজমিস্ত্রীরা ছিলেন ২০০ সদস্যের একটি দলের অংশ, যারা শার্ত্রের ক্যাথিড্রালে কাজ করছিলেন। নতুন একটি পরিকল্পনা আর শৈলী অনুসরণ করে তারা এটি পুনর্নির্মাণ করছিলেন। এই পরিকল্পনা আর শৈলীটি প্রথম দৃশ্যমান হয়েছিল প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে মঠাধ্যক্ষ (অ্যাবোট) সুজেরের সেইন্ট-ডেনিস (স্যঁ-ডনি) চার্চে। শার্ত্রের ক্যাথিড্রালের পুনর্নির্মাণ করতে পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় লেগেছে, এবং এখন এটি প্রায় শেষ পর্যায়ে, ক্যাথিড্রালের ভিতরে শ্রমিকরা নেভ (গীর্জার মূল অংশ) বরাবর বিশাল জানালাগুলো স্থাপন করছেন। বিভিন্ন রঙের কাচ ব্যবহার করে তারা চিত্র সৃষ্টি করছেন, স্বর্গে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য নীল রং, খ্রিস্টের রক্তের জন্য লাল রং। সমাপ্ত হয়ে যাওয়া জানালার মধ্যে দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে প্রবেশ করা আলো বেগুণী আভায় চার্চের ভিতরটি আলোকিত করে তুলেছে, একই সাথে আলোকিত করেছে সেখানে সৃষ্ট চিত্রকল্পের কাহিনীগুলোকে - সাধু, খ্রিস্ট, কুমারী মেরির জীবনের কাহিনী। অন্য কর্মীরা চার্চের ভিতরের দেয়ালে রং করছেন, উজ্জ্বল সূর্যমুখি হলুদ রং, বিষণ্ন একটি মেঘলা দিন সত্ত্বেও কাথিড্রালটিকে যা স্বর্গীয় দ্যুতিতে আচ্ছাদিত করে রেখেছে।

পাথর কাটার মিস্ত্রীরা উত্তরের পোর্টাল বা দরজায় কাজ করছিলেন। সেখানে তারা ভাস্কর্য খোদাই করছিলেন এই অতিঅলংকৃত প্রবেশপথটি আরো অলংকৃত করে তুলতে। সব মিলিয়ে এই ক্যাথিড্রালে ১৮০০ টি ভাস্কর্য থাকবে, কিছু এতই ওপরে রাখা হয়েছিল যে, পাথর কাটার মিস্ত্রীরা যারা সেগুলো তৈরি করেছিলেন, সেগুলো আর তাদের কাছেও দৃশ্যমান ছিল না। মানুষের দেখার জন্য নয় বরং ঈশ্বরের জন্য এই ভাস্কর্যগুলো খোদাই করা হয়েছিল। সার্বিকভাবে যেগুলো এই ভবনের সংগঠনে অবদান রেখেছে, খ্রিস্ট ধর্মের উপস্থিতি আর ক্ষমতা বিষয়ক একটি বিবৃতি। যারা এই ক্যাথিড্রালের জন্য ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন তাদের অবদানের স্মারক একটি চিত্র এখন চার্চের জানালাগুলোর একটিতে আমরা দেখতে পাই। সাধু শেরোকে স্মরণ করা সেই জানালার

নীচে পাথর কাটার রাজমিস্ত্রীদের দেখা যায়, হাতুড়ি ও ছেনি হাতে নিয়ে যারা পাথর কাটছেন আর ভাস্কর্য নিয়ে কাজ করছেন।

*

যদি দ্বাদশ শতাব্দীর খ্রিস্টীয়-শিল্পকলা ঈশ্বর ও তার সাধু ও ফেরেশতাদের প্রতীকী এবং অতিপ্রাকৃত শক্তি প্রকাশ করা বিষয়ক হয়ে থাকে, তাহলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শিল্পকলা রক্ত মাংস চিত্রিত এবং শারীরিক অবয়বের ভিত্তিকে বাস্তব পৃথিবীতে পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছিল। ঈশ্বরকে নিয়ে আতঙ্কের আর কিছু নেই, তাকে উপলব্ধি করতে হবে। শার্ত্র ক্যাথিড্রাল নব্য গথিক শৈলীর শ্রেষ্ঠ উদাহরণগুলোর একটি। এই শৈলীতে ভাস্কর্য, রঙ্গীন কাচ এবং স্থাপত্য একত্রিত হয়ে হৃদয় উদ্দীপ্ত করে তোলার মতো একটি ভবন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, যা ঈশ্বরের মহিমার গুণকীর্তন করেছিল। এইসব সুবিশাল আলোকিত চার্চগুলো তাদের রোমানেস্ক পূর্বসূরিদের ঘন পাথুরে ভার পরিত্যাগ করেছিল কাচ-নির্মিত দেয়াল এবং সুচালো খিলান নির্বাচন করে, যা চোখকে স্বর্গ অভিমুখে নির্দেশিত করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গথিক ভাস্কর্য পুরো ইউরোপে বিস্তৃত হয়েছিল, যা ক্রমশ আরো উচ্চতর গথিক ক্যাথিড্রালের জন্ম দিয়েছিল। ক্রমশ আকারে বাড়তে থাকা সেইন্ট আর নবীদের ভাস্কর্যগুলো জীবন্ত করে তুলেছিল পাথর-কর্তনকারী রাজমিস্ত্রী শিল্পীরা, ক্রমবর্ধমান হারে যারা দেয়াল বা স্তম্ভ থেকে মুক্ত ও নিরাবলম্ব দাড়িয়ে থাকার মতো ভাস্কর্য সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন, যেমন শার্ত্র ক্যাথিড্রালের দরজায় আমরা দেখি।

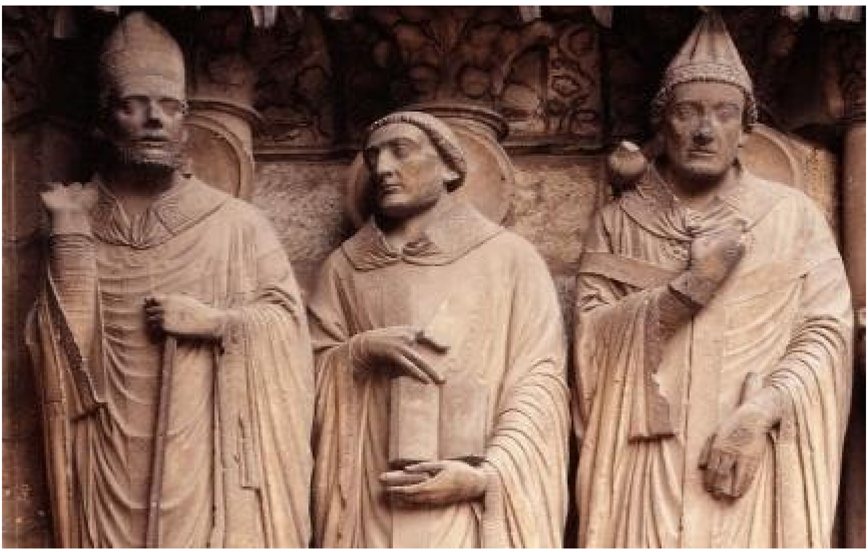

শার্ত্রের সব ভাস্কর্যই স্বর্গীয় ব্যক্তিদের নয়। উত্তর দরজা অর্থাৎ নর্থ পোর্টালের বাইরের প্রান্তে বারোজন নারীর ভাস্কর্য আছে। প্রবেশ পথের খিলানের দুই পাশে ছয়টি করে এবং যা প্রদর্শন করছে নারীরা প্রার্থনার বই পড়ছেন, এছাড়া উল বাছাই, ধোয়া, পৃথক আর সুতা তৈরি করছেন। কর্মরত নারীদের জীবন্ত এই ভাস্কর্যগুলোয় আমরা উলকে সুতায় পরিণত করার শ্রমটি দেখতে পাই। একজন নারী তার পা খানিকটা ছড়িয়ে বসে আছেন ভারসাম্য রাখতে, যার হাত শক্তির সাথে উলের মধ্য দিয়ে চিরুনী টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এই পরিশ্রমের কারণে তার শরীরও খানিকটা বেঁকে আছে। এইসব নারীরা ঈশ্বরের অনুসারীদের প্রতিনিধিত্ব করছে, যাদের এখানে নীরব ভক্তিপূর্ণ ভঙ্গিমায়, এবং কর্মরত হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তারা এই স্থাপত্য থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে আসছে, মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করে, যেমন করে তাদের সুচালো প্রবেশদ্বারে খিলান ঘিরে খোদাই করা হয়েছে। আমরা জানি না কে বা কারা এইসব ভাস্কর্য খোদাই করেছিলেন কারণ গথিক শিল্পকলা সৃষ্টি প্রক্রিয়া কদাচিৎ কোনো একক নামের ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট, এটি সম্পূর্ণ করেছিল অজ্ঞাতানামা ব্যক্তিদের একটি বড় দল।

শার্ত্র একটি অতুলনীয় গথিক সৃষ্টি, যা এখনো এর মূল ভাস্কর্যগুলো এবং রঙ্গীন কাচের কাজের অধিকাংশই ধারণ করে আছে। শিল্পীদের জন্য শ্রেষ্ঠ উপাদান দিয়ে কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপে শিল্পকলা খুব সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরের সেবায় নিবেদিত ছিল, এবং এগুলো সৃষ্টি করতে শ্রেষ্ঠতম উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছিল: ইটালির পাথর খনি থেকে মার্বেল, পশ্চিম আর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আইভরি ও স্বর্ণ। বাইজানটাইন মোজাইকের জন্য স্বর্ণ দীর্ঘ দিন ধরেই ব্যবহার করা হয়েছে ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে, এবং এটি ইউরোপে প্রবেশ করেছিল মিশরীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে, সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করা উটের ক্যারাভান অথবা মোজাম্বিক বা তানজানিয়া থেকে নৌপথে স্বর্ণ নিয়ে আসা হতো মিশরে। আফ্রিকার জাতিগুলো প্রয়োজনীয় উপাদান (যেমন লবন) আর বিলাসী দ্রব্যের (কাজের পুতি) বিনিময়ে স্বর্ণ বাণিজ্য করতো। কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব শিল্পকলাতেও এটি ব্যবহার করেছিল।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো কীভাবে ভিন্ন সমাজগুলো তাদের শিল্পীদের জন্য স্থানীয় আর আমদানীকৃত উপাদান সংগ্রহ করতো। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাংশে স্বর্ণ মূল্যবান ছিল, কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকায় আরো শক্তিশালী ধাতু তামা সংগ্রহ করতে এটি বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পলিনেশিয়ায় রাপা নুই দ্বীপে তাদের সেই দানবীয় দাড়িয়ে থাকা মুর্তিগুলো সৃষ্টি করতে দ্বীপবাসীরা দ্বীপটির দুটি ভিন্ন প্রান্ত থেকে রঙ্গীন পাথর খনন করে সংগ্রহ করেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে পাণ্ডুলিপির চিত্রিত করতে স্বর্ণ এবং মূল্যবান রঞ্জক ব্যবহার করতো, এদিকে চীনে পরিমিতি বা অল্প আসলেই ছিল বেশি, যে শূন্য পাতায় শিল্পীরা কাজ করতেন সেটি এর উপরে আকা ড্রইঙের মতো সমপরিমানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে এবং বোতসোয়ানার আধুনিক সীমান্তের নিকটে মাপুনগুবওয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খুবই সমৃদ্ধ একটি শহর ছিল। চুনাপাথর দিয়ে যে সময় শার্ত্র ক্যাথিড্রাল নির্মাণ শেষ হচ্ছিল মাপুনগুবওয়ের শিল্পীরা তখন উচ্চ মর্যাদার প্রাণী ভাস্কর্য তৈরি করতে স্বর্ণ ব্যবহার করেছিলেন, যেমন ষাড়, বুনো বিড়াল এবং গণ্ডার। প্রতিটি নির্মিত প্রাণীর একটি কাঠের অভ্যন্তরীণ কাঠামো ছিল, যার চারিদিকে পিটিয়ে পাতলা করা সোনার পাত দিয়ে মোড়ানো হয়েছে এবং পিন ব্যবহার করে এর জায়গায়

স্থায়ী করে দেয়া হয়েছিল। এগুলো রাজকীয় সমাধিতে সমাহিত করা হয়েছিল স্বণের মুকূট এবং রাজদণ্ডসহ, সবকিছুই শাসকের ক্ষমতা আর সম্পদের বিবৃতি হিসেবে।

ইয়োরুবা জনগোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক রাজধানী পশ্চিম আফ্রিকার ইফেতে (বর্তমানে নাইজেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত) শিল্পীরা টেরাকোটায়, তামা আর পিতলে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য সাহারা বাণিজ্যপথের মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকা থেকে শক্তিশালী ধাতু আমদানী করার উদ্দেশ্যে তারা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত স্বর্ণ বিনিময় করেছিল। ধারণা করা হয় 'উনি' অর্থাৎ শহরের আধ্যাত্মিক নেতাকে প্রতিনিধিত্ব করছে এইসব আবিষ্কৃত বহু সংখ্যক পিতলের মাথা, যেগুলো মাপুনগুবওয়ের প্রাণী ভাস্কর্যগুলোর সমসাময়িক ছিল। বেশ কিছু ভাস্কর্যের মুখে আমরা আচারিক ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাই, সংকীর্ণ কাটা উল্লম্ব রেখা, যা কপাল, চোখ আর গালের আকৃতি অনুসরণ করে নাক ও ঠোঁটের নীচে জড়ো হয়েছে। এই রেখাগুলো তার পূর্ণ, প্রতিসম ঠোঁটের উপর গুরুত্বারোপ করে, আমাদের দৃষ্টিকে উনির মুখের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, উনির চোখগুলো বহির্মূখি তাদের শান্ত অবিচল দৃষ্টিসহ। একটি অতিঅলংকৃত মুকূট, যা মূলত লাল রঙে রঞ্জিত ছিল, একটি ভাস্কর্যের উচু কপালের উপর স্থাপিত ছিল। অন্য উদাহরণগুলোয় আমরা সারি বাধা ছিদ্র দেখি চুলের সীমানায়, যা ইঙ্গিত করে পুতিসহ চুল সেখানে যুক্ত করা হতো। কিছু মাথায় নিয়মিত বিরতিতে ছিদ্র আছে মুখ আর গালেও, হয়তো পুতিসহ দাড়ি অথবা স্বর্গীয় নেতার মুখকে একটি পর্দা আবৃত করে রাখতো।

আফ্রিকা থেকে বহু সহস্র কিলোমিটার পশ্চিমে, একটি ক্ষুদ্র, দূর্গম পলিনেশিয়ান দ্বীপ রাপা নুইয়ে (যা ইষ্টার আইল্যান্ড নামেও পরিচিত) আরেকটি সংস্কৃতিও তাদের গুরুত্বপূর্ণ নেতা আর পূর্বসূরিদের ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিল। তবে সেগুলো ধাতুতে ঢালাই করা সূক্ষ্ম সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো সৃষ্টি ছিল না, বরং সুবিশাল চৌকোনা ফিগার, 'মোয়াই' নামে যেগুলো পরিচিত। এগুলো আগ্নেয় শিলার পাথরের খনি থেকে খোদাই করে কেটে আনা হয়েছিল এবং তারপর পাহাড়ের উপর দিয়ে এই মূর্তিগুলোকে দড়ি ব্যবহার করে এপাশ

থেকে ওপাশে সতর্কভাবে দুলিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল তাদের জন্য নির্বাচিত নানাবিধ উপকূলীয় স্থানে। পাথরের বিশাল এই মূর্তিগুলো, যাদের কোনোটি এর উচ্চতায় প্রায় ১০ মিটার, ওজনে প্রায় ৮০ টন। বিশেষভাবে নির্মিত মঞ্চে সেগুলোকে টেনে তোলা হতো। সমুদ্রের দিকে ফেরানো পিঠসহ এইসব ধুসর পাথরের দানবগুলো দ্বীপ অভ্যন্তরে তাকিয়ে থাকতেন। কয়েকটির মাথার উপর একটি সুবিশাল লাল পাথরের নির্মিত চুলের কুণ্ডলী ছিল, ভিন্ন একটি পাথরের খনিতে যা খোদাই করা হয়েছিল, এবং যখন মূল মূর্তিটি নির্মিত হয়েছিল তারপরে সেটি যুক্ত করা হয়েছিল। ছয় শতাব্দীব্যাপী একটি সময়পর্বে এ ইসব মূর্তিগুলো তৈরি করা হলেও বিস্ময়করভাবে এগুলোর শৈলী অপরিবর্তিত ছিল, বাইরের দিকে সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে থাকা চিবুক, গভীরভাবে খোদাই করা চোখ, দীর্ঘ কানের লতি, প্রশস্ত নাক। বেরিয়ে থাকা স্তনবৃন্ত আর নাভিসহ তাদের শরীরগুলো উচ্চমাত্রায় সরলীকৃত, তাদের হাতগুলো তাদের শরীরের দুই পাশে সংযুক্ত, পেটের নীচে হাতগুলো বিশ্রাম নিচ্ছে।

সবমিলিয়ে ১২৫টি মোয়াই রাপা নুই দ্বীপের উপকূলে দাড়িয়ে আছে, কিন্তু আর বহু শত মোয়াই অসমাপ্ত অবস্থায় পাথরের খনি এলাকার আশে পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সব মিলিয়ে প্রায় ৯০০। প্রবাল দিয়ে তৈরি করা সাদা চোখ আর অবসিডিয়ান দিয়ে বানানো চোখের মনি মূর্তিতে যুক্ত করা হতো এদের জীবন্ত করে তোলার জন্য, সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ কোনো উৎসবের সময়। যখন মানুষ এই মূর্তিগুলোর সামনে জড়ো হতো তারা হয়তো অনুভব করতো সুবিশাল সমুদ্র আর ঢেউয়ের প্রেক্ষাপটে মোয়াই দাড়িয়ে আছে। মূল দ্বীপবাসীরা সম্ভবত দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সাগর পেরিয়ে আরো ১০০০ বছর আগে এই দ্বীপে এসেছিল, বিশাল পাথর খোদাই করার জ্ঞান আর ঐতিহ্য বহন করে।

মূল্যবান উপাদান ব্যবহার করেছিলেন সেই শিল্পীরাও, যারা মসুল আর বাগদাদে (আধুনিক ইরাক) বই অলংকরণ করার কেন্দ্রগুলোয় কাজ করতেন। ১২৫৮ সালে মঙ্গোলদের হাতে বাগদাদ ধ্বংস হবার আগে ইসলামী কর্মশালাগুলো বহু সুখ্যাত চ িত্রিত ‘সেক্যুলার’ পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিল, যেমন, মাকামাহ (সমাবেশ)। একাদশ শতাব্দীতে হাস্যরসাত্মক বহু গল্পের এই সংকলনটি লিখেছিলেন আবু মুহাম্মাদ আল কাসিম ইবন আলি আল-হারিরি, যা সাহসী এবং বেপরোয়া আবু জাইদের নানা অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করেছিল।

সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অলংকৃত সংস্করণটি চিত্রিত করেছিলেন শিল্পী ইয়াহিয়া ইবন আল-ওয়াসিতি, এবং পাণ্ডুলিপিটি সৃষ্টির সময়কাল ছিল ১২৩৭ খ্রিস্টাব্দ। আল-ওয়াসিতি পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি পার্চমেন্টের ওপর উজ্জ্বল রং আর মূল্যবান স্বর্ণ পাত ব্যবহার করে চিত্রকর্মগুলো সৃষ্টি করেছিলেন। মোট নিরানব্বইটি চিত্রকর্ম - কিছু এতো বড় যে দুই পৃষ্ঠা জুড়ে বিস্তৃত ছিল - পুরো কাহিনীটি জীবন্ত করে তুলেছিল। আমরা মসজিদের ছাদের উপর মুরগী, কামড়াতে উদ্যত একটি উটের দাঁত দেখি। কিংবা ছায়ায় কিছু মানুষ জড়ো হয়েছে , যারা সঙ্গীত শুনছে ও পান করছে, অন্যরা ভীড় করে আছে একটি সেতুর ওপর, প্লেগে আ ক্রান্ত এক ব্যক্তির সমাহিত হবার দৃশ্যের সাক্ষী হবার প্রচেষ্টায়। ক্রীতদাসদের বাজার,

তাঁবুর ছাউনি, মক্কা অভিমূখে হাজীদের কাফেলার দৃশ্যও সেখানে আছে। এখানে যুদ্ধ, আলোচনা ও দাম্পত্য কলহের বিবরণ আছে। সূক্ষ্ম জিনিসগুলোর প্রতি তার সতর্ক মনোযোগ, তার সৃষ্ট সমকালীন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইসলামী চরিত্রগুলোর কারণে আজও এই বইটিকে আজ বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ একটি সৃষ্টি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে, সেই সময় বইটির নির্মাণে ব্যবহৃত ব্যয়বহুল উপাদান, চিত্রকর্মের সংখ্যা এটিকে সুস্পষ্টভাবে একটি বিলাসবহুল সংস্করণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

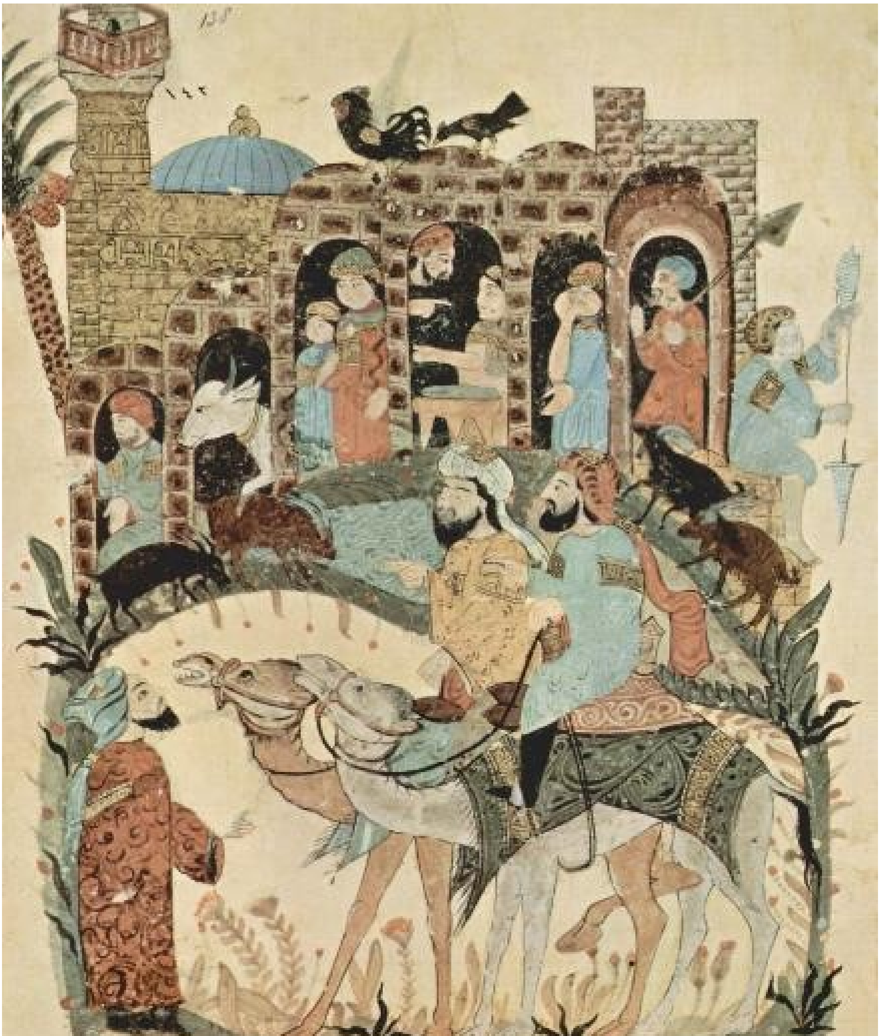

মঙ্গোলিয়া থেকে মঙ্গোলরা মধ্যপ্রাচ্য আর চীন আক্রমণ করেছিল, এবং যা কিছু তাদের সামনে এসেছিল অধিকাংশই তারা ধ্বংস করেছিল, বাগদাদের মতো শহর তারা

আসলেই মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল, সেই সাথে বহু সহস্র মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। মঙ্গোলদের এই নির্বিচার গণহত্যা থেকে প্রায়শই শিল্পীদের রেহাই দেয়া হতো। যেমন তাদের নতুন প্রভুর অধীনে কাজ করতে বাগদাদের শিল্পীদের জোরপূর্বক মঙ্গোলিয়া স্থানান্তর করা হয়েছিল। ১২৭০ এর দশকে চীন মঙ্গোলদের শাসনের কাছে নতি স্বীকার করেছিল। নতুন রাজসভায় চিত্রকর্মের সুদিন এসেছিল, চীনা শিল্পীদের সহ্য করা হয়েছিল, কিন্তু শুরুতে চীনা লিটেরাটি বা শিক্ষিত সমাজের প্রশান্ত ধ্যানমগ্ন এক বর্ণের ভূদৃশ্যের চেয়ে বরং বর্ণিল প্রতিকৃতি এবং অতিঅলংকৃত ভাস্কর্যের প্রতি মঙ্গোলদের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছিল।

যখন মঙ্গোলরা চীন দখল করেছিল, সেই সময় নাগাদ চীনা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজ ইতোমধ্যেই সহস্র বছর প্রাচীন, কিন্তু অদ্ভুতভাবেই মঙ্গোল শাসনামলে এই আন্দোলনটি চীনা চিত্রকলায় প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করেছিল। অত্যন্ত সন্মানিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সদস্যরা সুশিক্ষিত ছিলেন, এবং প্রায়শই সরকারী আমলা হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং অবসরে তারা কবিতা, ক্যালিগ্র্যাফি বা লিপিকলা আর চিত্রকর্মে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন। সম্ভবত সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণ কিছু বুদ্ধিজীবী তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শুধুমাত্র কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে চিত্রকর্ম সৃষ্টি করতে, যেমন ফুলে ভরা প্লুম গাছ, স্থানীয় কোনো পাখি, কিংবা বাশ ঝাড়।

এই শিক্ষিত শ্রেণির অনেকেই শুরুতে মঙ্গোল শাসনের অধীনে তাদের সরকারী চাকরী হারিয়েছিলেন। তারা তাদের গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন, যেখানে কোনো বিঘ্নতা

ছাড়াই তারা ছবি আঁকতে পেরেছিলেন। এরকমই একজন শিল্পী ছিলেন ঝাও মেঙ্গফু (১২৫৪- ১৩২২), মঙ্গোলদের বিজয়ের পরবর্তী দশ বছর যিনি তার জন্ম শহর উসিং (এখন হুঝু) এলাকার ভূদৃশ্য চিত্র নিয়ে কাজ করেছিলেন। ১২৮৬ সালে, যদি ঝাওকে ইউয়ান (মঙ্গোল) প্রশাসনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিতে রাজী করানো হয়েছিল , এরপর থেকেই তাকে প্রশাসনিক দায়িত্ব আর ছবি আঁকা ও কবিতার প্রতি তার তীব্র আকাঙ্ক্ষাগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করতে হয়েছিল। তিনি শিল্পী ও গবেষকদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিলেন এবং তার নিজেই একটি শিল্পকলা সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন। এমনকি ইটালির ব্যবসায়ী এবং অভিযাত্রী মার্কো পোলোর সাথে হয়তো তিনি শিল্পকলা নিয়ে কথা বলেছিলেন, কুবলাই খানের মঙ্গোল রাজসভায় চার বছর ঝাও ও তার সময় অধিক্রমণ করেছিল।

যে বছর ঝাও রাজসভায় ফিরে এসেছিলেন তিনি দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছিলেন, তার নতুন স্ত্রী ছিল গুয়ান ডাওশেং (১২৯২-১৩১৯), একজন সফল শিল্পী যিনি মঙ্গোল রাজসভার নারী ও পুরুষদের সহায়তা এবং পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিলেন। এই দুই শিল্পী প্রায়শই একত্রে কবিতা, ক্যালিগ্রাফি এবং চিত্রকর্মে কাজ করেছিলেন, এবং গুয়ান বিখ্যাত তার ভূদৃশ্যচিত্রের জন্য, যেমন, ব্যাম্বু গ্রোভস ইন মিস্ট অ্যান্ড রেইন - কুয়াশা আর বৃষ্টিতে বাঁশঝাড়, যা আঁকা হয়েছিল ১৩০৮ সালে। এই স্ক্রল চিত্রকর্মে পালকের মতো বাশের অঙ্কুর আর ঝাড় একটি নদীর তীরে অঙ্কুরিত হয়েছে। মাটির কাছাকাছি ভেসে থাকা কুয়াশা অর্ধেক বাশঝাড়কে অদৃশ্য করে রেখেছে, যা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন স্ক্রলের একটি বড় অংশ শূন্য রেখে, যা ইঙ্গিত করছে সাদা কুয়াশা নদীর উপর ভেসে বেড়াচ্ছে।

গুয়ান নদীর তীরে বাশঝাড় আঁকা এবং কালো কালিতে খুব সংযত আঁচড়ে বাশঝাড়, পানি আর আবহাওয়ার দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার ঐতিহ্যবাহী প্রথাটি উদ্ভাবন করেছিলেন, যা ক্রমশ দর্শকের সামনে উন্মোচিত হয়, যখন কেউ ডান থেকে বামে প্যাচানো স্ক্রলটি খুলতে থাকেন। বুদ্ধিজীবীরা তাদের এই সুক্ষ্ম ও সংযত একরঙ্গা চিত্রকর্মে প্রচুর অর্থ যুক্ত করেছিলেন, এবং গুয়ানের পৌনঃপুনিকভাবে বাঁশঝাড়কে মূল বিষয় হিসেবে ব্যবহার

করার বিষয়টি দেখা হয়েছিল কুনফুসিয় সহিষ্ণুতার অঙ্গীভূত চিত্রকল্প হিসেবে, না ভেঙ্গেই বেঁকে যাবার ক্ষমতা, বিশেষ করে মঙ্গোল আগ্রাসনের কঠিন শাসনামলে।

গুয়ানের শৈলী বিংশ শতাব্দী অবধি এর প্রভাব ধরে রেখেছিল। চীনা শিল্পকলার শিকড় তাদের ঐতিহ্যের গভীর প্রোথিত, এবং খুব সাম্প্রতিক কালের আগে মূলত শৈলী আর বিষয়বস্তুর নিয়ে কাজ করার ধারাবাহিকতার ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হতো। ইউরোপে, মধ্যযুগীয় প্রতীকীবাদ প্রায় সহস্র বছর এর প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। কিন্তু এই সব কিছুরই পরিবর্তন আসন্ন ছিল, যখন শিল্পীদের একটি প্রজন্ম ক্ল্যাসিকাল গ্রিস আর রোমের সেই প্রকৃতিবাদে পূর্ণমাত্রায় ফিরে যাবার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Stone masons and sculptors from a stained-glass window ,13th cent. A D Chartres Cathedral in France
(২) Six women, in various stages of working wool with their hands, are found on the outer North porch of the Chartres Cathedral in France
(৩) Saints Martin, Jerome, and Gregory, jamb statues from Porch of the Confessors, Chartres Cathedral, ca. 1220-1230.
(৪) The golden rhinoceros of Mapungubwe, the defining symbol of precolonial civilisation in South Africa,
(৫) The Bronze Head from Ife, or Ife Head, is one of eighteen copper alloy sculptures that were unearthed in 1938 at Ife in Nigeria, the religious and former royal centre of the Yoruba people.
(৬) Bodies of Easter Island Heads, Moai, Rapa ui cililization
(৭) Maqāma of Al-Hariri, illustration by Yahya ibn Mahmud al-Wasiti from the 1237 manuscript
(৮) Maqāma of Al-Hariri, illustration by Yahya ibn Mahmud al-Wasiti from the 1237 manuscript
(৯) Zhao Mengfu. Man Riding a Horse, (central part) dated 1296
(১০) Zhao Mengfu. Elegant rocks and sparse trees
(১১) Detail of Guan Daosheng's scroll painting Bamboo Groves in Mist and Rain, 1308 CE

অধ্যায় ১০ - রেনেসাঁর সূচনা

১৩০৫ খ্রিস্টাব্দ, ইটালির পাদুয়া (পাদোভা) শহর, এবং জটো (জত্তো) আজ নতুন করে বানানো প্লাস্টার চ্যাপেলের দেয়ালে কোথায় লাগাতে হবে সেটি তার সহকারীকে দেখাচ্ছিলেন। শুকিয়ে যাবার আগেই ভেজা অবস্থায় 'বুয়োন ফ্রেস্কো' নামে পরিচিত একটি কৌশল ব্যবহার করে তিনি এর ওপর ছবি আঁকবেন, যেন তার রং প্লাস্টারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে দ্যুতিময় দেয়ালচিত্র সৃষ্টি করতে পারে। বেশ কঠিন একটি কাজ. প্রথমেই জানতে হবে ঠিক কী পরিমান প্লাস্টার দেয়ালের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ তাকে সেই পুরো অংশে একদিনের মধ্যেই কাজ করতে হবে, নতুবা এটি শুকিয়ে যাবে, তার রং আর প্লাস্টারের মধ্যে বন্দি হতে পারবে না, বরং নিষ্প্রাণ একটি আস্তরণ হিসেবেই এর ওপর রয়ে যাবে। কিন্তু তিনি জানতেন তিনি আসলেই কী করছেন, প্রায় দুই বছর ধরে তিনি এনরিকো স্ক্রোভেনির ব্যক্তিগত চ্যাপেল বা গীর্জায় (কাপেলা দেইলি স্ক্রোভেনি – অ ্যারেনা চ্যাপেল) ফ্রেস্কো আঁকছেন। খুব শীঘ্রই এই চ্যাপেলের কাজ শেষ হবে, এর দেয়ালগুলো আবৃত করে আছে বহু ফ্রেস্কো, আর নীল স্বর্গীয় আকাশের প্রেক্ষাপটে স্বর্ণের নক্ষত্রে এর ছাদটি ঝলমল করছে ।

পিতা রেজিনাল্ডোর কাছ থেকে জটোর পৃষ্ঠপোষক এনরিকো তার সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। কিন্তু রেজিনাল্ডো একজন সুদ-ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং তৎকালীন চার্চ বিশ্বাস করতো, লাভের জন্য টাকা ধার দেয়া ক্ষমার অযোগ্য ও গুরুতর একটি পাপ, এবং এনরিকো এটি সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তার উত্তরাধিকারের একটি বড় অংশ ঈশ্বরের সন্মানে এই ব্যয়বহুল চ্যাপেল নির্মাণে ব্যয় করেছিলেন। তিনি জটোকে কোনো একটি ফ্রেস্কোতে তার প্রতিকৃতিও যুক্ত করতে বলেছিলেন। 'লাস্ট জাজমেন্ট' হচ্ছে জটোর বিশাল সেই ফ্রেস্কোটি - যা এখন চ্যাপেলের দূরবর্তী দেয়ালে শোভা পাচ্ছে - যেখানে পূণ্যবানদের নেতৃত্ব দিয়ে স্বর্গ অভিমূখে নিয়ে যাওয়া এনরিকোকে আমরা কুমারী মা মেরিকে তার চার্চের একটি মডেল উপহার দিতে দেখি। এছাড়া, এনরিকো জটোকে তার বাবার একটি প্রতিকৃতি আঁকতেও বলেছিলেন, যে খানে তাকে নরকের একটি ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যাবে। তিনি একটি বিষয় স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন, তিনি দেবদূতদের দলে, তার পিতা রেজিনাল্ডোর বিপরীত একটি অবস্থান।

জটো খানিকটা পেছনে এসে তার কাজ নিয়ে ভাবছিলেন। কাঠের বিশাল একটি মাচা চ্যাপেলের প্রায় পুরোটাই দখল করেছিল, কিন্তু তিনি তারপরও এর পেছনে ও চারপাশের দেয়ালে তার ফ্রেস্কোগুলো দেখতে পাচ্ছেন। তার উচ্চাভিলাষী 'লাস্ট জাজমেন্ট' ছাড়াও তিনি কুমারী মাতা মেরি ও যীশু খ্রিস্টের জীবন থেকে নানা দৃশ্য এঁকেছিলেন। এগুলো বাইবেলের দৃশ্য হতে পারে, কিন্তু জটো সেই কাহিনীগুলোকে চতুর্দশ শতাব্দীর পাদুয়ায় স্থাপন করেছিলেন, এবং প্রতিটি চরিত্রের সেই অভিব্যক্তি ধারণ করতে চেয়েছিলেন যেন তারা সবাই, শ্বাসপ্রশ্বাসরত, অনুভূতিসহ জীবন্ত মানুষ।

*

জটো (জটো ডি বনডোনে, ১২৬৬/৭৬-১৩৩৭) কাজের সন্ধানে ইটালির বহু শহর ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি নেপলস, রোম, পাদুয়া, আসিসি এবং, তার নিজের শহর ফ্লোরেন্সে চার্চে অল্টারপিস (খ্রিস্টীয় চার্চের বেদির পেছনে স্থাপিত চিত্রকর্ম বা ভাস্কর্য) আর ফ্রেস্কো এঁকেছিলেন । এই সময়ে ইটালি কোনো একীভূত একটি দেশ ছিল না, বরং এটি তৈরি করেছিলে একগুচ্ছ শহর রাষ্ট্র আর রাজ্য। প্রত্যেকটি এলাকারই নিজস্ব আইন ছিল, এবং জটোর মতো শিল্পীদের এইসব নিয়মকানুন মেনে কাজ করতে হতো, যখন তারা তাদের অস্থায়ী কর্মশালাগুলো নির্মাণ এবং তাদের প্রতিটি কমিশন সম্পূর্ণ করতে তারা স্থানীয় শিল্পীদের নিয়োগ করতেন। কীভাবে এটি করতে হয় জটো সম্ভবত সেটি শিখেছিলেন প্রভাবশালী শিল্পী চিমাবুয়ের নিকট থেকে (চেনি ডি পেপো, আনুমানিক ১২৪০-১৩০২), তার কৈশোরে যিনি তাকে ছবি আঁকার প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, এবং প্রথমবারের মত তাকে রোমে নিয়ে গিয়েছিলেন।

রোমে জটো এবং চিমাবুয়ে পিয়ত্রো কাভালিনির চিত্রকর্ম দেখেছিলেন (আনু. ১২৫০ - ১৩৩০)। আইকন কিংবা অলংকৃত পাণ্ডুলিপি থেকে অনুকরণ নয়, কাভালিনি বাস্তব জীবন থেকেই মানব শরীর আঁকার অনুশীলনে প্রত্যাবর্তন করার একজন আদি সমর্থক ছিলেন। কিন্তু কেন? দর্শনের নতুন যে শাখাটির দ্বারা ইটালির মানুষ ক্রমশ প্রভাবিত হতে শুরু করেছিল - সেটি ছিল 'হিউম্যানিজম' বা মানবতাবাদ। পরবর্তীতে সৃষ্ট যে-কোনো কিছুর চেয়ে মানবতাবাদীরা প্রাচীন গ্রিস ও রোমের শিল্পকলা এবং দর্শনকে বিশেষ মূল্য দিয়েছিলেন। মানবতাবাদীরা আরো বিশ্বাস করতেন, পরবর্তীতে স্বর্গে নয়, মানুষের মূল দায়িত্ব হচ্ছে এই পৃথিবীতে ভালো ও পুণ্য একটি জীবন কাটানো। তারা প্রাচীন ল্যাটিন আর গ্রিক বই খুজে বের করেছিলেন, দুর্গম দুরবর্তী নানা সন্ন্যাশ্রমে যে বইগুলোর

অনুলিপি টিকে ছিল, এবং রাত জেগে তারা প্লেটোর মতো গ্রিক দার্শনিকদের উপযোগিতা নিয়ে বিতর্ক করতেন। ইটালির শহরগুলোয় বুদ্ধিজীবী চক্রে মানবতাবাদ বিশেষ জনপ্রিয় ছিল, এবং পাঠে আগ্রহী সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিরা তাদের সময়ে নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদ হিসেবে ক্রমশ মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসীদের প্রতিস্থাপিত করতে শুরু করেছিলেন। মানবতাবাদের প্রভাবে শিল্পীরাও মানব শরীরকে আড়ষ্ট আর আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা শৈলী প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছিলেন, যেমন আমরা দেখেছি 'ভার্জিন অব ভ্লাদিমির' আইকনের মধ্যযুগীয় চিত্রকর্মে। তারা আবার ধ্রুপদী শিল্পকলা এবং সত্যিকারের শরীর অধ্যয়ন করতে শুরু করেছিলেন, যেমন, রোমে সান্টা সেসিলিয়া চার্চে (এখনো যা আংশিকভাবে টিকে আছে) কাভালিনি তার 'লাস্ট জাজমেন্ট' ফ্রেস্কোয় সেই ধরনের ফিগার যুক্ত করেছিলেন, হাটু আর কনুই আবৃত করে রাখা কাপড়, এর নীচে প্রকৃত শরীরের ইঙ্গিত বহন করছে। এখানে মানব শরীরগুলো সমানুপাতিক এবং অভিব্যক্তিময় প্রায় জীবন্ত মুখমণ্ডল প্রদর্শন করেছে।

ত্রয়োদশ শতকের শেষে সমাপ্ত কাভালিনির এই ফ্রেস্কোটির বেশ কিছু সাধারণ উপাদান আমরা জটোর 'লাস্ট জাজমেন্ট' ফ্রেস্কোর মধ্যেও আবিষ্কার করতে পারবো। সম্ভবত কাজটি জটোকে প্রভাবিত করেছিল। তবে, যে কাহিনীর চক্রটি স্ক্রোভেনি চ্যাপেলের ভিতরের দেয়াল ও ছাদে উন্মোচিত হয়েছিল, সেখানে অভিব্যক্তিময় নাটকীয়তাপূর্ণ দৃশ্য সৃষ্টি করে জটো এই ধারণাগুলোকে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং আসলেই তিনি বাইবেলকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। উদ্বাহু, হাঁ করে থাকা মুখ, অশ্রুপাত - 'ল্যামেন্টেশন' ফ্রেস্কোয় সেই নারীদের দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমরা সমব্যথী হই, যারা মৃত খ্রিস্টের পরিচর্যা করছেন তাদের কাধ খানিকটা কুঁজো করে, মুষ্টিবদ্ধ হাত আর নত মস্তিষ্কে। মাধ্যকর্ষণ অনুসরণ করে তাদের পরণের কাপড় শরীর বেয়ে নীচে নেমেছে, যা তাদের শোকে বেঁকে থাকা পিঠ আর মজবুহদেহী বাহুর ইঙ্গিত দিচ্ছে।

কাভালিনি এবং জটোর কাজেই আমরা ইটালিতে প্রথম ধ্রুপদী প্রকৃতিবাদের পুনর্জাগরণ পর্যবেক্ষণ করতে পারি। ষোড়শ শতাব্দী থেকে জিওর্জিও ভাসারির মতো জীবনীকাররা এই শিল্পীদের ‘প্রকৃতির বিষয়বস্তুগুলো প্রত্যক্ষকরণ’ করার জন্য প্রশংসা করেছিলেন। ‘ সত্যের দরজা’ উন্মুক্ত করে দেবার জন্য ভাসারি জটোকে চিহ্নিত করেছিলেন। তাদের পূর্ববর্তী শিল্পীদের মতো মধ্যযুগীয় ধর্মীয় শিল্পকলার পরিবর্তে এই চিত্রশিল্পীরা মানবতাবাদী চোখে পর্যবেক্ষিত ও তাদের পরিবেষ্টিত করে রাখা পৃথিবীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ইটালিতে সেই সময়ের প্রথম সারির বহু শিল্পী আসিসির সান ফ্রানচেস্কোয় ফ্রান্সিসকান অর্ডারের যাজকদের মূল চার্চেটির জন্য কাজ করেছিলেন, চিমাবুয়ে, জটো, কাভালিনি সবাই সেখানে তাদের শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছেন, এছাড়াও করেছিলেন সিমোন মার্টিনি (১২৪৮-১৩৪৪) এবং লোরেনজেটি পরিবার। জটোর কর্মশালার শিল্পীরা খ্রিস্টের একটি জীবনচক্র এঁকেছিল, কিছু জায়গায় স্ক্রোভেনি চ্যাপেলের দৃশ্য পুনরায় সৃষ্টি করে। জটোর মত সফল শিল্পীরা কর্মশালা পরিচালনা করতেন যেন চাহিদার সাথে তাল মেলাতে পারেন। জটো হয়তো ফ্রেস্কোর মূল পরিকল্পনাটি আঁকতেন, কিন্তু অনেকাংশেই সেটি রং করতেন তার সহকারী শিল্পীরা - শিশু শিক্ষানবীশ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ শিল্পী থেকে অভিজ্ঞ শিল্পী। জটো হয়তো চেহারাগুলো আঁকতেন এবং খুঁটিনাটি বিষয়গুলো যুক্ত করতেন।

চার্চের (সেইন্ট ফ্রানচেসকো) অসাধারণ সেইন্ট ফ্রান্সিস কাহিনী চক্রটি এই সেইন্টের জীবনের মোট আঠাশটি দৃশ্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। মূল মনোযোগ ছিল কাহিনী বর্ণনা এবং বাস্তবানুগ মানব ফিগার, যেগুলো দেখতে কাভালিনি আর জটোর সৃষ্ট ফিগারগুলোর মতো। যদিও আমরা জানি না আসলেই কে এগুলো এঁকেছিলেন। চার্চের সদস্যদের জন্য এই চিত্রকর্মগুলো পরিকল্পিত হয়েছিল, যেন তারা সেটি পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন করতে পারেন, এবং জটোর স্ক্রোভেনি চ্যাপেলের মতো যা সরাসরি দর্শকদের সাথে কথা বলে ও তাদের অনুভূতিগুলো প্রতিফলিত করে তাদেরও এই কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করে। ক্রিসমাস বা বড় দিনের একটি দৃশ্যে সেইন্ট ফ্রান্সিস একটি শিশুকে আশীর্বাদ করছেন, আর আমরা দর্শক হিসেবে কোয়াইআর বা গির্জার ধর্মসঙ্গীত গায়কদের সাথে একগুচ্ছ মানুষের মধ্যে দাড়িয়ে আছি। ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসীরা খ্রিস্টের জন্ম বা নেটিভিটি উদযাপন করে স্তবসঙ্গীত গাইছেন। নারী তীর্থযাত্রীদের জন্য এটি একটি নতুন অভিজ্ঞতা ছিল, কারণ সত্যিকারের ধর্মসঙ্গীত গাওয়ার এলাকায় সেই সময় তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

ইটালির বাইরেও শিল্পীরা প্রকৃতিবাদ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) শহরে গ্রিক অর্থোডক্স চার্চ অব হলি স্যাভিয়রে 'রেজারেকশন' বা সমাধি থেকে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের একটি দৃশ্য আছে, যা জটোর 'লাস্ট জাজমেন্ট' ফ্রেস্কোটির মতো একই মাত্রায় নাটকীয়। এই 'আনাস্টাসিস' (গ্রিক এই শব্দটির অর্থ যিশুর পুনরুত্থান) ফ্রেস্কোটি সৃষ্টি করেছিলেন অজ্ঞাতনামা এক শিল্পী, এবং এটি লাস্ট জাজমেন্টের মতো প্রায় একই সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এবং এটি খালি পায়ে প্রাণবন্ত একজন যিশু খ্রিস্টকে প্রদর্শন করেছিল, যিনি আদম ও হাওয়াকে তাদের কবর থেকে টেনে তুলছেন, যেন তারা স্বর্গে তার সঙ্গী হতে পারেন। শয়তান পরাজিত হয়েছে এবং খ্রিস্টের পায়ের নীচে নরকের ভেঙ্গে যাওয়া দরজার পাশে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। এই ফ্রেস্কোটি অবস্থান করছে খ্রিস্টীয় সাধুদের চিত্রিত করা বাইজেন্টাইন মোজাইকে অলংকৃত একটি আধা গম্বুজের দেয়ালে। নীচের মোজাইকে তাদের নিষ্প্রাণ পোষাকের নীচে সাধুরা আড়ষ্ট ও অনড়, আইকন-চিত্র সদৃশ। ভিন্ন শৈলীর এই ধরনের বিস্ফোরক সম্মিলন আমাদের কল্পনা করতে সহায়তা করে, চিন্তায় ও দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে তখন কত বিশাল একটি পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল।

ইটালিতে এই সব নতুন, উত্তেজনাপূর্ণ প্রকৃতিবাদের বহু আদি উদাহরণ পাওয়া যায়। বর্ধিত সম্পদ, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর মানবতাবাদের প্রতি ক্রমবর্ধিষ্ণু আগ্রহের কারণে বিশেষ একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। শহর চার্চ এবং ধনী পৃষ্ঠপোষকরা সেরা শিল্পীদের আকর্ষণ করতে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং অসাধারণ বহু শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এই শিল্পকর্মগুলো প্রাকৃতিক বিশ্বের উপর ক্রমশ আরো বেশি মনোযোগ দিয়েছিল, এবং ক্ল্যাসিকাল পর্বের সব কিছুই, গ্রিক পুরান থেকে ক্রমশ জীবন-সদৃশ মানব-শরীরের ভাস্কর্যের প্রতি পুনর্নবায়িত একটি আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

আর প্রাকৃতিক বিশ্ব সম্বন্ধে পুনর্বায়িত এই আগ্রহ কীভাবে রেনেসাঁর (শিল্পকলার ‘পুনর্জন্ম’) দিকে পরিচালিত করেছিল সেটি দেখতে একটি নির্দিষ্ট পথ আমাদের আরো খানিকটা সময় অনুসরণ করতে হবে। আমি আপনাদের রেনেসাঁর বিস্তৃতি এবং ব্যাপকতা দেখাতে চাই, কারণ এটি ২০০ বছরের অধিক সময় স্থায়ী হয়েছিল, এবং এখনো এটি বিশ্বব্যাপী শিল্পীদের প্রভাবিত করা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু সেটি করতে হলে, আমাদের পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে সারা পৃথিবীর প্রতি আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিটিকে অবশ্যই সাময়িকভাবে স্থগিত করতে হবে। লক্ষণীয়ভাবে বহু দিন ধরেই এই সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি খুব বেশি উদ্বেগের কারণ হয়নি: পাশ্চাত্যের শিল্পকলা ইউরোপের সীমানার বাইরে সব শিল্পকলাকে কেবল উপেক্ষা করেছিল। শিল্পকলার ইতিহাসবিদরা এমনকি সেগুলো শিল্পকলা হিসেবে বিবেচনাই করেননি। আজ, একবিংশ শতাব্দীতে, বিশ্বজুড়ে বহু বিচিত্র ধরনের শিল্পীদের শিল্পকর্ম বিশেষ মর্যাদাসহ মূল্যায়ন, সমর্থন আর উদযাপন করা হয়। ইতোমধ্যেই এই বইয়ে আমরা বহু উদাহরণ লক্ষ করেছি, এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোয় আমরা আরো উদাহরণ দেখবো।

কিন্তু পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে, যদিও আমরা ইউরোপীয় রেনেসাঁর জন্য দায়ী শিল্পী এবং শিল্পকলার প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষকদের সাথে পরিচিত হবো, যাদের কারণে চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে শিল্পকলা অভূতপূর্ব ও অতুলনীয় একটি সমৃদ্ধিপর্ব অর্জন করতে পেরেছিল। বিজ্ঞানী, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, শিল্পীরা গভীরভাবে কৌতূহলী আর উদ্ভাবনী একটি সমাজ নির্মাণ করেছিলেন। তারা পার্সপেক্টিভ বা দর্শনানুপাত আর অপটিক্স বা আলোকবিজ্ঞানের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সাথে শারীরস্থান সম্বন্ধে চিকিৎসাবিজ্ঞানসংক্রান্ত জ্ঞান, প্রকৃতি এবং জীবন্ত মডেল থেকে চিত্রাঙ্কনের প্রচলন পুনরায় শুরু হয়েছিল। রেনেসাঁর দীর্ঘমেয়াদী

উত্তরাধিকার - জার্মানী, বেলজিয়াম, এবং নেদারল্যান্ডসে উত্তরাঞ্চলীয় রেনেসাঁসহ – হচ্ছে যে শিল্পকর্মগুলো এই পর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এবং পরবর্তী ৪০০ বছর ধরে এটি যেভাবে পাশ্চাত্যে শিল্পকলার প্রশিক্ষণ আর অনুশীলনকে প্রভাবিত করেছিল ।

প্রারম্ভিক রেনেসাঁ চার্চ নির্ভর শিল্পকলায় একটি নতুন বিষয় সংযোজন করেছিল: ‘অল্টারপিস’ – চার্চের বেদির পেছনে স্থাপিত চিত্রকর্ম কিংবা ভাস্কর্য। এটি সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়েছিল যাজকরা যখন তাদের খ্রিস্টীয় আচারের কিছু অংশ চার্চে অংশগ্রহনকারীদের দিকে পেছন ফিরে পরিচালনা করতে শুরু করেছিলেন। উপস্থিত সবার মনোযোগ স্থির রাখতে সহায়ক হিসেবে বিশালাকৃতি বহু প্যানেল বিশিষ্ট চিত্রকর্ম অল্টার বা বেদীর উপরে স্থাপন করা শুরু হয়েছিল, যেন মানুষ সেগুলো দেখতে পায়। অল্টারপিসের একটি আদি উদাহরণ হচ্ছে শিল্পী ডুচ্চিওর সৃষ্টি ‘মায়েস্টা’ (ইটালির ভাষায় রাজসিক) (ডুচ্চিও ডি বুয়োনিনসেইনয়া, সক্রিয়কাল ১২৭৮-১৩১৯), ১৩০৮ থেকে ১৩১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো একটি সময়ে সৃষ্টি করা কুমারী মাতা মেরির একটি রাজসিক চিত্রকর্ম। এখানে মেরি একটি সিংহাসনে আসীন, শিশু খ্রিস্টকে ধরে আছেন, এবং তাকে ঘিরে আছেন খ্রিস্টীয় সাধু আর দেবদূতরা। যদিও বহুদিন আগেই এটি বহু অংশে বিখণ্ডিত করা হয়েছে, কিন্তু এক সময় মায়েস্টা অবিশ্বাস্যভাবে মোট সত্তরটি প্যানেলে সংগঠিত ছিল, এবং ইটালির সিয়েনা ক্যাথিড্রালে কেন্দ্রীয় বেদির পেছনে এটি অবস্থিত ছিল।

ডুচ্চিও জটোর মতোই চিমাবুয়ের একজন ছাত্র ছিলেন। কুমারী মা এবং খ্রিস্টকে ঘিরে মায়েস্টায় তিনি বহু সংখ্যক দর্শনার্থীকে এঁকেছিলেন। তারা নানা ধাপে যেন ক্রমশ উপরে উঠছিলেন, মনে হতে পারে যেন কোনো স্কুলের ছবিতে বেঞ্চের ওপর তারা দাড়িয়ে আছেন। অভিভূত করার মতো সুবিশাল পরিমানে এখানে স্বর্ণ ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু একই সাথে বাস্তবানুগ বহু সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি বিষয়ও যুক্ত করা হয়েছে। সেইন্ট জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট একটি লোমশ চামড়ার টিউনিক পরে আছেন, এবং অতিঅলংকৃত বুটিদার রেশমী কাপড়ের পোষাকে সেইন্ট ক্যাথেরিন দাড়িয়ে আছেন। এছাড়া জটো

যেভাবে তার কাজে ভার যুক্ত করেছিলেন, ডুচ্চিও তার মানব-শরীরগুলোয় সেই ভাবে কোনো ভার যুক্ত করেননি, এবং ডুচ্চিও কুমারি মায়ের লম্বা নাক আর লম্বাটে চোখে এখনো আমরা বাইজেন্টাইন আইকন চিত্রকর্মের অতিরঞ্জিত বৈশিষ্ট্যায়ন লক্ষ করি। তবে সেগুলো অবশ্যই তার শিক্ষক চিমাবুয়ের কুমারী মা অপেক্ষা অনেক বেশী জীবনসদৃশ, চি মাবুয়ের কাজগুলো সেই তুলনায় দেখতে দ্বিমাত্রিক, এবং তুলনামূলকভাবে আনুষ্ঠানিক।

তার মায়েস্টা অল্টারপিসে কাজ করতে সিয়েনার ক্যাথিড্রাল বোর্ড ডুচ্চিওকে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছিল। ক্যাথিড্রাল তাকে আঁকার সব উপকরণ সরবরাহ করবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য পরিমান প্রয়োজনীয় স্বর্ণ। আর সেই চুক্তি মোতাবেক শিল্পী ডুচ্চিও ও তার কর্মশালার সহকারীদের শুধুমাত্র এই চিত্রকর্ম ছাড়া অন্য কোনো কাজ হাতে নেবার অনুমতি দেয়া হয়নি।

বিশ বছর পরে যখন সিয়েনা ক্যাথিড্রাল সংস্কারের জন্য ব্যাপক নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল , ডুচ্চিওর মায়েস্টার দুই পাশে আরো চারটি বাড়তি অল্টারপিস তৈরি করার জন্য নতুন শিল্পীদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। যার প্রতিটি শহরের পৃষ্ঠপোষক কোনো সেইন্টের উদ্দেশ্য উৎসর্গীকৃত ছিল। সেইন্ট আনসানোর অল্টারপিসটি তৈরি করতে শিল্পী সিমোন মার্টিনিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। মার্টিনি তার নিজের কর্মশালা নিজে পরিচালনা করতেন, এবং এই অল্টারপিস তৈরি কতে তিনি তার শ্যালক লিপো মেমির (আনু ১২৯১ -১৩৫৬) সাথে একত্রে কাজ করেছিলেন। মার্টিনি কুমারি মেরির খ্রিস্টকে গর্ভধারণ করার মুহূর্তটি আঁকতে চেয়েছিলেন, যা পরিচিত ‘অ্যানানসিয়েশন’ নামে, যেখানে মেরিকে তার ঈশ্বর প্রদত্ত গর্ভধারণের সংবাদ জানাতে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত জিবরাইল/গ্যাব্রিয়েল স্বর্গ থেকে উড়ে এসেছিলেন। মেরি খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে আছেন, আকস্মিক এই অনুপ্রবেশে আতঙ্কিত, যেভাবে গ্যাব্রিয়েলের কাপড়টি বাতাসে ভাসছে সেটি দেখে আমরা বুঝতে পারি তিনি কেবলই মাটিতে নেমে এসেছেন। তার উচ্চারিত শব্দগুলো স্বর্ণপাতার প্রেক্ষাপটে খোদাই করা আছে, এবং সেটি বিস্তৃত তার মুখ থেকে কুমারী মেরির মাথার

পেছনে উজ্জ্বল জ্যোতিশ্চক্র অবধি। সেইন্ট আনসানো পার্শ্ববর্তী প্যানেল থেকে তাকিয়ে দেখছেন, তার হাতে সিয়েনা শহরের সাদা-কালো পতাকা।

মার্টিনির শৈলী চিত্রকলায় আমরা আপাতত যা কিছু দেখেছি, সেই সব কিছু থেকে ভিন্ন - তার আঁকা মানব-শরীরগুলো সংকীর্ণ কাধসহ লম্বাটে এবং তাদের গাল ফ্যাকাসে। দেখতে গথিক ভাস্কর্যের মতো মনে হয়, এবং এই অল্টারপিসে আমরা সামগ্রিকভাবে একটি গথিক অনুভূতি অনুভব করতে পারি। পরবর্তীতে মার্টিনি নেপলসের ফরাসীভাষী রাজসভায় কাজ করেছিলেন, এবং অবশেষে তিনি ফ্রান্সে স্থায়ী হয়েছিলেন। ম ার্টিনির মতো শিল্পীদের মাধ্যমে, গথিক শৈলী, যা আমরা প্রথম শার্ত্রে ক্যাথিড্রালে দেখেছিলাম, সেটি চিত্রকর্মে অনূদিত হয়েছিল, যা এখন 'আন্তর্জাতিক গথিক' শৈলী নামে পরিচিত। এই আড়ম্বরপূর্ণ শৈলী উজ্জ্বল রং আর স্বর্ণ পাত ব্যবহার করেছিল, এবং রাজসভাগুলোয় বেশ জনপ্রিয় ছিল। আন্তর্জাতিক গথিক চিত্রকর্মগুলো বিস্ময়করভাবেই বিস্তারিত, এবং প্রায়শই দৃশ্যগুলো এর অনুপাতে বাস্তবানুগ নয়। এই শৈলীটি আরো সমৃদ্ধি পেয়েছিল উত্তর ইউরোপে, আমরা পরের অধ্যায়ে যা দেখবো।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Giotto's frescoes in the Scrovegni Chapel, Padua, 1305.
(২) Giotto, Last Judgment, detail with Enrico Scrovegni Presenting Chapel to the Three Marys, Arena Chapel, Giotto, Arena (Scrovegni) Chapel, 1305-06, fresco, Padua
(৩) Giotto, Last Judgment, detail, 1305-06, fresco, Padua
(৪) Pietro Cavallini - The Last Judgement (detail)
(৫) Giotto, Lamentation (The Mourning of Christ), Scrovegni Chapel
(৬) Simone Martini - The Death of St Martin (scene 9)
(৭) Pietro Lorenzetti - Deposition of Christ from the Cross, Detail
(৮) St. Francis of Assisi Preparing the Christmas Crib at Grecchio
(৯) Late Byzantine fresco of Anastasis, Chora Church in Constantinople (modern Istanbul).
(১০) Maestà, or Maestà of Duccio is an altarpiece composed of many individual paintings commissioned by the city of Siena in 1308 from the artist Duccio di Buoninsegna
(১১) Annunciation was painted around 1333 by Simone Martini and his brother-in-law Lippo Menni for the altar of Sant'Ansano in the Cathedral of Siena.

অধ্যায় ১১ - উত্তরীয় আলো

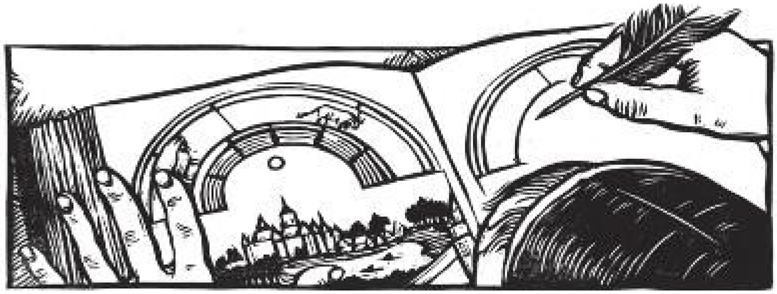

১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দ, শীতের একটি দিন। ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড লন্ডনে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে প্রবেশ করলেন, নেইভ বা চার্চের মূল অংশের শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র চ্যাপেল হচ্ছে তার গন্তব্য। কেবল একজন প্রার্থনা করতে পারার মতোই চ্যাপেল এটি প্রশস্ত। সেই কারণে খুব ব্যক্তিগত একটি পরিসর। তিনি সেইন্ট এডমন্ড, সেইন্ট এডওয়ার্ড দ্য কনফেসর এবং সেইন্ট জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের চ্যাপেল অতিক্রম করলেন তার ব্যক্তিগত এই চ্যাপেলে ঢোকার আগে। ভিতরে তার নিজের অল্টারপিসটি মোমের আলোয় ঝলমল করছে। এটি খুব বেশি বড় না, খানিকটা বড় আকারের একটি বইয়ের মতো, মাঝখানে দুটি প্যানেলকে যুক্ত করেছে একটি কবজা। তিনি হাসি মুখে এটির দিকে অগ্রসর হলেন, এই চিত্রকর্মে তিনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন , ভক্তিতে তিনি নতজানু হয়ে আছেন তিনজন সেইন্টের সামনে, যাদের চ্যাপেলের পাশ দিয়ে তিনি কেবলই হেঁটে আসলেন।

এই চিত্রকর্মে তিনি কুমারী মা ও শিশুর প্রতি তার প্রার্থনা নিবেদন করছেন। চমৎকারভাবে যাদের চিত্রিত করা হয়েছে মুখোমুখি প্যানেলে, আর তাদের পরিবেষ্টিত করে আছে লম্বা পালকের ডানাসহ সূক্ষ্মভাবে আঁকা দেবদূতরা। এই ‘ডিপটিক’ অর্থাৎ মাঝে কবজা লাগানো দুই প্যানেলের কোনো শিল্পকর্মটি অত্যন্ত মূল্যবান, এটি তৈরি করা হয়েছে স্বর্ণের পাত আর মূল্যবান আলট্রামেরিন রং ব্যবহার করে, প্রতিটি চরিত্র এখানে এতো সতর্ক আর সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, তিনি সেইন্ট এডওয়ার্ডের ধূসর দাড়িতে কুঞ্চিত হয়ে থাকা চুল দেখতে পারছেন। দেবদূতরা ফুলের গালিচার উপর দিয়ে হাঁটছেন , এবং তারা সবাই রাজকীয় প্রতীক পরে আছেন, শাখাবিশিষ্ট শিংসহ সাদা চমৎকার একটি হরিণ। তিনিও তার স্বর্ণের সূতায় তৈরি করা আচ্ছাদনে সাদা হরিণে প্রতীক ধারণ করে আছেন। এছাড়া তিনি ব্রুমকডের তৈরি একটি মালা পরে আছেন, ব্রুম গাছের বীজাধার দিয়ে যা তৈরি, দেবদূরতারাও সেটি পরে আছেন, এটি তাকে ফ্রান্সের সাথে যুক্ত করেছিল, কারণ ব্রুমকড ফরাসী রাজার লিভারি বা উর্দির অংশ, ঠিক যেভাবে সাদা হরিণ তার উর্দির অংশ। রিচার্ড ফ্রান্সে জন্মগ্রহন করেছিলেন, এই অল্টারটপিসটি আঁকার জন্য তিনি একজন ফরাসী শিল্পীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, এবং ফ্রান্স ছিল তার তরুণী স্ত্রীর জন্মস্থান, সুতরাং তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যখন ব্রুমকড যুক্ত হয়েছিল।

*

আনুমানিক ১৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে অজ্ঞাতনামা এক শিল্পী এই চিত্রকর্মটি সৃষ্টি করেছিলেন, যা এখন 'উইলটন ডিপটিক' নামে পরিচিত। এটি আন্তর্জাতিক গথিক শৈলীর চমৎকার একটি উদাহরণ। রিচার্ড ও কুমারী মেরির অভিজাত মুখমণ্ডল ও লম্বাটে আঙ্গুল আমাদের সিমোন মার্টিনির 'অ্যানানসিয়েশন' অল্টারপিসটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এবং খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর প্রতি অপরিমিত মনোযোগ ও এর মূলব্যান কাচামাল এটিকে বিলাসবহুল 'বুক অব আওয়ারর্স'-এর (বুক অব আওয়ার খ্রিস্টীয় ধর্মীয় প্রার্থনা ও অন্যান্য পাঠাংশের বই, যা মধ্যযুগে ব্যবহার করা হতো খ্রিস্টীয় চার্চ নির্ধারিত সময়গুলোয় প্রার্থনা করার জন্য) পূর্বসূরিতে পরিণত করেছে, যে বইটি লিমবোর্গ ভাইরা ডিউক অব বেরির জন্য সৃষ্টি করেছিলেন।

লিমবোর্গ ব্রাদার্স নামে একত্রে পরিচিত তিন ভাই - পল, হেরমান এবং জ্যঁ দ্য লিমবোর্গ - সবচেয়ে সেরা আল্ট্রামেরিন (আল্ট্রামারিন গাঢ় নীল রঙের রঞ্জক, যা মূলত ল্যাপিস লাজুলি পাথর পিষ্ট করে পাউডারে পরিণত করে তৈরি করা হতো) ব্যবহার করছিলেন, যখন তারা আনুমানিক ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে বিস্তারিত অলংকরণ আর চিত্র সমৃদ্ধ 'বুক অব আওয়ার্স' বইটির কাজ শুরু করেছিলেন। চিত্রগুলো আঁকা হয়েছিল সবচেয়ে সেরা সাদা ভেলামের উপর, যা তৈরি করা হয়েছিল বাছুরের চামড়ার ঠিক মাঝখান থেকে , কোনো ভাজ বা কুঞ্চন যেন না থাকে সেটি নিশ্চিত করতে। এবং বইটি আকারে আধুনিক সময়ের কোনো শক্ত বাধাইয়ের বইয়ের মতো। বইটিতে মোট বারোটি পৃষ্ঠা ছিল যা বছরের বারোটি মাস প্রদর্শন করেছিল, রাজসভার নানা কর্মকাণ্ডের খুঁটিনাটি বিষয় দিয়ে যা পূর্ণ করা হয়েছিল। যদিও প্রার্থনার পুরো একটি বই পরে যুক্ত ছিল, কিন্তু এই বারোটি

বর্ষপঞ্জির পৃষ্ঠাই আজ বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দৃশ্যগুলো চমৎকার, আড়ম্বরপূর্ণ, কিন্তু বাস্তবানুগ নয় বরং অলঙ্করিষ্ণু । এই চরিত্রগুলো তাদের আকার ও মাত্রায় উল্লেখযোগ্যমাত্রায় বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে, মধ্যযুগীয় 'ইলুমিনেটেড' পাণ্ডুলিপিগুলোর মতোই। কিন্তু তারপরও মাসের নানা বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিস্তারিত, নভেম্বর মাসে যে শূকরগুলোর পরিচর্যা করতে হবে, সেগুলোর গায়ের লোম থেকে এপ্রিলে সভাসদদের পালকযুক্ত টুপি অবধি। 'আন্তর্জাতিক গথিক' মধ্যযুগ আর রেনেসাঁর শিল্পকলার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছিল। মূলত এইসব চিত্রকর্ম এই দুটি শৈলীর সংকর ছিল। দুটোই রাজসভা কেন্দ্রিক 'ইলুমিনেশন', একটি উত্তরীয় রেনেসাঁ ঐতিহ্যের সূচনা, যা প্রকৃতির প্রতি আরো ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ প্রদর্শন করেছিল।

ডিউক অব বেরি এবং দ্বিতীয় রিচার্ড দুজনেরই এই সব মূল্যবান অলংকৃত বই এবং ব্যক্তিগত অল্টারপিস তৈরি করিয়ে নেবার মতো হয়তো পর্যাপ্ত পরিমান সম্পদ ছিল, তবে পঞ্চদশ শতকের শুরুতে, ডিউক অব বেরির বড়ভাই বারগুন্ডির ডিউক ফিলিপ দ্য বোল্ডের রাজসভাটি ছিল ইউরোপের সবচেয়ে বিত্তশালী। ফিলিপ পারিবারিক সমাধির জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা নির্মাণ করতে তার রাজধানী ডিজোঁর নিকটে শঁমলে একটি পূর্ণাঙ্গ সন্ন্যাশ্রম নির্মাণ করেছিলেন। এই আশ্রমের 'ক্লোয়েস্টার' (আচ্ছাদিত উদ্যানপথ) ছিল ১০০ মিটার প্রশস্ত এবং ফিলিপ তার রাজসভার প্রধান ভাস্কর, নেদারল্যান্ডের শিল্পী ক্লাউস স্লুটারের (১৩৪০-১৪০৫) ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন এর মাঝখানে আকর্ষণীয় কিছু তৈরি করতে। কাজটি খুব সহজ ছিল না কারণ ক্লোয়েস্টারটি চারিদিকে ছিল জলাভূমি। স্লুটারের সমাধান ছিল চার মিটার গভীর একটি পাথরের ভিত্তি স্থাপন এবং প্রতিস্থাপিত পানিগুলো ব্যবহার করে একটি কুয়া তৈরি করা, যা পরিখার মত এটিকে ঘিরে থাকবে। এই ভিত্তির উপর তিনি পাথরের কাঠামো এবং এটিকে ঘিরে ছয়টি প্রমাণ আকারের

প্রোফেট বা নবী ও ক্ষুদ্রাকার কিছু দেবদূতের ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন। এর ওপর থেকে বেরিয়ে এসেছিল স্বর্ণে আবৃত সরু পাথরের একটি স্তম্ভ যা ক্রুশের উপর খ্রিস্টকে ধরে রেখেছিল।

১৩৯৫ থেকে ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত 'দ্য গ্রেট ক্রস' বা 'ওয়েল অব মোজেস' নামে পরিচিত ভাস্কর্যটির এর উচ্চতায় ছিল ১১ মিটার। যদিও পরবর্তী ৩০০ বছর এটি এর মূল অবস্থানেই ছিল, কিন্তু আজ শুধু ভাস্কর্যের বেদি আর নবীদের ভাস্কর্য অংশটি টিকে আছেন। বাইবেলের এই নবীদের রং দিয়ে চিত্রিত করেছিলেন রাজসভার অন্য একজন শিল্পী - জ্যাঁ মালুয়েল (আনু. ১৩৬৫-১৪১৫)। ডেভিডের মাটি অবধি আলখেল্লার উপর নীল আর সাদা ডোরাকাটা রঙের দাগগুলো এখনো অস্পষ্টভাবে দেখা যেতে পারে । বাইবেলে বর্ণিত এই নবীরা সবাই প্রাণবন্ত ভঙ্গিমায় দাড়িয়ে আছেন, তার পা সংকীর্ণ প্রান্তে বাঁকা হয়ে আছে যেন যে-কোনো মুহূর্তেই তারা সেখান থেকে নেমে দাড়াবেন। যদিও মূল ভিত্তির সাথে ভাস্কর্য্যগুলোর পিঠ যুক্ত হয়ে আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলো শার্ত্রের গথিক ভাস্কর্যগুলোর চেয়ে আরো সাহসী ও আরো মুক্ত।

'গ্রেট ক্রস' ভাস্কর্যে স্লুটার ও ম্যালুয়েল উদারভাবে নীল রং ব্যবহার করেছিলেন। নবীদের পরিচ্ছদে প্রথম স্তরের জন্য তারা সস্তা আজুরাইট রঞ্জক ব্যবহার করেছিলেন, তার উপর মূল্যবান আলট্রামেরিন রঙের প্রলেপ ব্যবহার করেছিলেন। ছোট একটি কৌটা মাত্র ২৫ গ্রাম আল্ট্রামেরিন রঞ্জক ধারণ করতো, একটি ডাবল এ ব্যাটারি সমপরিমান ওজন। আর এর দাম ছিল স্লুটারের সাত দিনের বেতনের সমতূল্যে। সমপরিমান অর্থ দিয়ে সেই সময় আপনি ৮ কেজি সীসার সাদা রং কিনতে পারতেন। মূল্যবান খনিজ লাপিস লাজুলি পিষ্ট করে গাঢ় নীল আল্ট্রামেরিন রঞ্জক তৈরি করা হতো। বাডাকশানের (বর্তমানে আফগানিস্থান) খনি থেকে বাগদাদ ও ভেনিস হয়ে লাপিস

লাজুলি আমদানী করা হতো। এর চেয়ে দশ গুণ পরিমানে সস্তা আজুরাইট রঞ্জক জার্মানী ও স্লোভাকিয়ার খনি থেকে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা হতো।

বারগুন্ডি আর বেরির ডিউকদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীরা সেই ধরনের একটি জীবন কাটাতে পারতেন, যা সেই সময় অভিজাত শ্রেণির সদস্যদের জন্য সাধারণত সংরক্ষিত ছিল। ডিউক অব বেরি পল লিমবোর্গকে (আনু. ১৩৮৬ -১৪১৬) একটি বিশাল বাড়ি উপহার দিয়েছিলেন, এবং মাসিক ভাতা ছাড়াও লিমবোর্গ ভাইরা নিয়মিত কাপড় এবং উপহার পেতেন। বারগুন্ডির ডিউক স্লুটার এবং মালুয়েলকে বাড়তি আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন যখন তারা দুরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে পারছিলেন না। অধিকাংশ শিল্পী অবশ্যই এই ধরনের নিরাপত্তায় বাস করার সুযোগ পাননি। তাদের নিজেদের অর্থায়নে কর্মশালা পরিচালনা করতে হয়েছে, এবং বিভিন্ন জায়গায় কাজ খুঁজতে হয়েছে। উপাদানের মূল্য ও খোলা বাজারে সম্ভাব্য বিক্রয় করার সুযোগ নিয়ে তাদের নিরন্তর ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়েছে। সেই কারণে বিস্ময়কর নয়, শিল্পীরা সাধারণত শহরে ভীড় জমাতেন, যেন বিত্তশালী ব্যবসায়ী আর অভিজাত শ্রেণির সদস্যরা তাদের কাজ কিনতে পারেন।

বর্তমান বেলজিয়ামে এই ধরনের একটি শহর ছিল টুরনাই, কিন্তু সেই সময় এটি ডিউক অব বারগুন্ডির নিয়ন্ত্রিত একটি এলাকা ছিল। এই এলাকায় যে চিত্রকর্মগুলো সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেগুলো এখন সামগ্রিকভাবে ‘নেদারল্যান্ডিশ’ শিল্পকলা নামে পরিচিত। রবার্ট ক্যাম্পা (আনু. ১৩৭৮-১৪৪৪) টুরনাইতে বসবাস ও কাজ করতেন, এবং এখানে তিনি একটি বড় কর্মশালা পরিচালনা করতেন। তার ‘অ্যানানসিয়েশন’ ট্রিপটিক (তিনটি যুক্ত প্যানেলসহ চিত্রকর্ম) (১৪২৭-৩২) এখন ‘মেরোড অল্টারপিস’ নামে পরিচিত। এর কেন্দ্রীয় প্যানেল আমরা দেখি কুমারী মা মেরি একটি ফায়ারপ্লেসের সামনে

বসে পড়ছেন, এবং দেবদূত গ্যাব্রিয়েল স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন ঈশ্বরের বার্তা নিয়ে। বহু খুঁটিনাটি বিস্তৃত প্রতীকী উপস্থাপনে এই চিত্রকর্মটি পূর্ণ। যেমন, নীল আর সাদা পাত্রে রাখা লিলিগুলো কুমারী মায়ের বিশুদ্ধতার প্রতিনিধিত্ব করছে। বাম পাশের প্যানেলে চিত্রকর্মটির পৃষ্ঠপোষকদের আমরা প্রার্থনা করতে দেখি (যারা অল্টারপিস তৈরি করতে অর্থ প্রদান করেছিলেন)। ডান দিকের প্যানেলে আমরা জোসেফকে দেখি, কাঠমিস্ত্রির কর্মশালায় নানা উপকরণ যাকে ঘিরে আছে। তার পেছনে, খোলা জানালা দিয়ে আমরা শহরের চত্বরে ক্ষুদ্র মানুষগুলো দেখতে পারি । ক্যাম্পা ছিলেন প্রথম শিল্পী যিনি তার চিত্রকর্মে এইসব বিস্তারিত দৃশ্যাবলী যুক্ত করেছিলেন। লিমবোর্গের আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ ‘বুক অব আওয়ার্স’ থেকে এখানে পার্থক্য কত সুস্পষ্ট। মনে হচ্ছে যেন আমরা আসলেই সত্যিকারের একটি জানালা দিয়ে বাইরে দূরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি, এবং এটি আসলেই আমাদের কুমারী মায়ের জগতে প্রবেশ করার অনুভূতি দেয়। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ মেরোডে অল্টারপিসকে উত্তরীয় রেনেসাঁ শিল্পকর্মের একটি অসাধারণ আদি উদাহরণ হিসেবে স্বতন্ত্র করেছে।

‘নেদারল্যান্ডিশ’ শিল্পকলায় পরস্পর কবজা দিয়ে যুক্ত অলটারপিস প্রচলিত একটি রূপ ছিল, এর ব্যতিক্রম, ইটালিতে অল্টারপিস হিসেবে আমরা স্থায়ী প্যানেলের চিত্রকর্ম দেখেছিলাম। এছাড়াও ইটালিতে শিল্পীরা যখন ‘টেমপেরা’ মাধ্যমে কাজ করছিলেন, নেদারল্যান্ডিশ শিল্পীরা তখন এর পরিবর্তে তৈল রং ব্যবহার করেছিলেন। ইউরোপে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরেই লিনসিড তেলের সাথে পিগমেন্ট আর রঞ্জক গুড়া মিশ্রিত করে ব্যবহার করার প্রচলন ছিল, কিন্তু কেবল পঞ্চদশ শতাব্দীতে এসে এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল। এই মাধ্যমটি প্রায় সব প্রধান নেদারল্যান্ডিশ শিল্পীরা ব্যবহার করেছিলেন। তাদের কাজ যখন ইটালিতে রপ্তানী করা হয়েছিল এবং ইটালির শিল্পীরাও শীঘ্রই তৈল রং নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে শুরু করেছিলেন, যা আমরা পরের অধ্যায়ে দেখবো। দ্রুত শুকানোর ক্ষমতাসহ টেমপেরার ব্যতিক্রম, যা উজ্জল স্থিতিশীল একটি সমতল চূড়ান্ত রূপ দিতে পারতো, তৈল রং শুকাতে বেশি সময় নিতো, এবং পাতলা

আস্তরণ হিসেবে এগুলো প্রয়োগ করা যেত। নতুন একটি আস্তরণ পূর্ববর্তী স্তরের ওপর প্রয়োগ করার আগে, প্রতিটি আস্তরণকে আগে শুকিয়ে নিতে হতো, সেই কারণেই তৈল রং ধীর একটি প্রক্রিয়া ছিল, কিন্তু নানা গভীরতা আর সূক্ষতা দিয়ে রঙের তারতম্য সৃষ্টি করতে এটি শিল্পীকে অসাধারণ একটি স্বাধীনতা দিয়েছিল, যা টেমপেরা মাধ্যমে সম্ভব ছিল না।

ঘেন্ট (বর্তমানে বেলজিয়াম) শহরে পঞ্চদশ শতাব্দীর সবচেয়ে সুন্দর 'নেদারল্যান্ডিশ' অল্টারপিসটি তৈল রং ব্যবহার করে তৈরি করেছিলেন দুই ভাই। ১৪২৬ থেকে ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে সৃষ্টি করা 'ঘেন্ট অল্টারপিসের' কাজ প্রথমে শুরু করেছিলেন হিউবার্ট ভ্যান আইক (আনু. ১৩৮৫-১৪২৬), আর পরে এটি সমাপ্ত করেছিলেন ইয়ান ভ্যান আইক (আনু. ১৩৯০-১৪৪১)। যদিও 'মেরোড' অল্টারপিসটি ব্যক্তিগত ধর্মভক্তির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল, কিন্তু 'ঘেন্ট অল্টারপিস' চার্চ অব সেইন্ট জনের (বর্তমানে সেইন্ট বাভোস ক্যাথিড্রাল) জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সামনে ও পেছনে চিত্রিত ডানাসহ এই অল্টারপিসে সর্বমোট চব্বিশটি প্যানেল ছিল।

সম্পূর্ণভাবে এর পার্শ্ববর্তী অংশগুলোর ভাজ খুললে আড়াআড়িভাবে ঘেন্ট অল্টারপিসটি দৈর্ঘ্যে ছিল প্রায় ৫ মিটার। এর কেন্দ্রের প্যানেলে ছিল প্রমাণ আকারের চেয়ে বড় লাল পোষাক পরা যিশু খ্রিস্ট, যিনি আশীর্বাদের ভঙ্গিমায় হাত তুলে স্বর্ণের সিংহাসনে আসীন। অ্যাডাম ও ইভ (আদম ও হাওয়া) পার্শ্ববর্তী দুটি প্যানেল থেকে দেখছেন, তাদের নগ্নতা

সন্দেহাতীতভাবে সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে চমকে দেবার মতো। যদিও জননেন্দ্রিয় আবৃত করতে তারা পাতা ধরে আছেন, কিন্তু তারপরও আমরা এর ওপরে কুঞ্চিত হয়ে থাকা যৌনকেশ দেখতে পাই। যখন অল্টারপিসটি বন্ধ করা হয়, তখন অ্যানানসিয়েশনের (মেরিকে যখন দেবদূত গ্যাব্রিয়েল জানিয়েছিলেন যে তিনি কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র যিশুকে জন্ম দেবেন) কাহিনীটি আমরা কেন্দ্রীয় প্যানেলগুলোয় বর্ণিত হতে দেখি।

অল্টারপিসটি নির্মাণ করতে যারা আর্থিক অনুদান দিয়েছিলেন, এলিসাবেথ বোরলুট এবং তার স্বামী ইউস ভিড, তাদের দুজনকে আমরা নীচের দুটি প্যানেলে প্রার্থনা করতে দেখি। তারা বয়সে তরুণ নয়, এবং ভ্যান আইক বয়স কমিয়ে তাদের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেননি। সুতরাং আদর্শায়িত কোনো রূপে নয়, বাস্তব চরিত্র হিসেবে তারা আমাদের সামনে নতজানু - ভ্যান আইক তাদের এঁকেছিলেন অগভীর একটি স্থাপত্য-কুঠুরির পটভূমিতে অথবা, তাদের নিকটে ছিল দুটি ভাস্কর্য যারা একই অগভীর একটি স্থাপত্য-কুঠুরির পটভূমিতে অবস্থান করছে। এই ভাস্কর্যগুলো অবশ্যই রং দিয়ে তৈরি - এখানে ভ্যান হাইক তার শৈল্পিক দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন, যা প্রদর্শন করেছে রং চোখকে ধোকা দিতে পারে, এবং আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারে যে আপনি সত্যিকারের

মানুষ এবং সত্যিকার কক্ষে সত্যিকার কোনো ভাস্কর্য্য দেখছেন। স্মরণ করুন অধ্যায় তিনে প্লিনি কীভাবে "ট্রোম্প ল'য়" সৃষ্টিতে তাদের দক্ষতার জন্য প্রাচীন গ্রিকদের প্রশংসা করেছিলেন? রেনেসাঁর শিল্পীরা গ্রিকদের উদ্ভাবিত এই কৌশলে তাদের অতিক্রম করে যেতে শুরু করেছিলেন।

ইয়ান ভান আইক ১৪৩১ সালে ব্রুজেসে স্থায়ী হয়েছিলেন। অবিশ্বাস্য প্রকারের বিভ্রম সৃষ্টি ও বুটিদার রেশমী কাপড়ের ভার থেকে আমদানী করা কমলালেবুর বহু ক্ষুদ্র গর্তসহ ত্বকের মতো বিচিত্র ধরনের পৃষ্ঠদেশ পুনঃসৃষ্টি করতে পারার দক্ষতার কারণে তার চিত্রকর্মগুলো বিশেষভাবে মূল্যায়িত হয়েছিল। তার 'আর্নোলফিনি প্রোর্ট্রট' চিত্রকর্মে (১৪৩৪) ইটালির একজন বিত্তবান ব্যবসায়ী জিওভানি আর্নোলফিনি এবং তার স্ত্রী কসন্টানজা ট্রেন্টার বাড়ির জানালার ধারির ওপর আমরা কমলালেবুগুলো দেখতে পাই। এই দম্পতি একত্রে দাড়িয়ে আছেন, যেন কোনো অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। খোলা দরজা আর জানালা দিয়ে দিনের আলোর ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, আর সামঞ্জস্যপূর্ণ আলো আমাদের একটি জোড় প্রতিকৃতির বিভ্রমে বিশ্বাস করায়, যদিও সেই বাস্তবতা সত্ত্বে যে, যুগলের মাথাগুলো সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন আকারে আঁকা হয়েছে। এছাড়াও এটি হয়তো আমাদের মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করায়। জিওভানির কালো টুপি আর তার মাথার ওপর অতিঅলংকৃত পিতলের মোমদানীতে একটি মাত্র জ্বলন্ত মোমবাতি ইঙ্গিত দেয় তিনি তার তরুণী স্ত্রীর জন্য শোক প্রকাশ করছেন, যিনি এই প্রতিকৃতিটি আঁকার এক বছর আগে মাত্র বিশ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন।

ক্যাম্পার একজন প্রাক্তন ছাত্র রোখিয়ের (রোজিয়ের) ভ্যান ডার ভেইডা (১৪০০-১৪৬৪) ব্রাসেলসে (বর্তমান বেলজিয়াম) স্থায়ী হয়েছিলেন, এবং নিজের একটি কর্মশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খুঁটিনাটি সুক্ষ্ম বিষয়গুলোর ওপর বিস্তারিত নজর দেবার জন্য ভ্যান ডার ভেইডার প্রতিকৃতিগুলো ভ্যান আইকের প্রতিকৃতির সাথে পাল্লা দিতে পারে, কিন্তু আবেগ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তার প্রতিকৃতিগুলো স্পষ্টতই আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল। 'ড

িসেন্ট ফ্রম দ্য ক্রস' অল্টারপিসে (আনু. ১৪৩৫) অভিব্যক্তি প্রকাশের এই গভীরতাটি আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি, যা তিনি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্রাসেলস শহরের নিকটে ল্যুভেনে আওয়ার লেডি আউটসাইড দ্য ওয়ালস চ্যাপেলের প্রধান বেদির জন্য এই কাজটি করতে তিনি দায়িত্ব পেয়েছিলেন, এবং ক্রসবোম্যান বা আড়ধনুক পরিচালনাকারীদের পেশাজীবী সংগঠনের নিকট থেকে এটি নির্মাণ করার আর্থিক অনুদান এসেছিল। সমসাময়িক পোষাকে সজ্জিত দশটি চরিত্র স্বর্ণ পাতে আবৃত পটভূমির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন। এই স্বর্ণের পটভূমি কিন্তু পৃষ্ঠদেশটিকে আইকন চিত্রকর্মের মতো একমাত্রিক করে দেয়নি। এটি চিত্রকর্মের পাত্র-পাত্রীদের পেছনে অবস্থান করছে, যে ন সবাই এর সামনেই অগভীর একটি মঞ্চে দাড়ানো অভিনেতা। কাঠের প্যানেলেটির আকৃতি এমনভাবে করা হয়েছিল যেন এটি খ্রিস্টের ক্রুশের উপরের একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত করে। ক্রুশে পেছেন মইয়ের উপর দাড়িয়ে আছে একজন ব্যক্তি, তার হাতের চিমটাটি সু স্পষ্ট স্মারক যে তার কাজটি ছিল পেরেকগুলোকে টেনে বের করা, যেন সমাহিত করতে খ্রিস্টের শরীরটিকে ক্রুশ থেকে নামানো যায়। তিন জন ব্যক্তি প্রাণহীন দেহটিকে ধরে আছেন, তাদের চেহারা বিষণ্ন, দুঃখে আনত, চোখ অশ্রুসিক্ত। খ্রিস্টের মা মেরি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন, তার দেহভঙ্গিমা তার পুত্রের দেহভঙ্গিমাকে অনুকরণ করছে, মৃত্যু আর শোকের শক্তিশালী এই দ্বৈত প্রতিকৃতে তাদের হাত প্রায় পরস্পরে স্পর্শ করেছে । তাদের হাতের আকার ধনুকের বক্রতার কথা মনে করিয়ে দেয়, এই কাজটির পৃষ্ঠপোষক তীরন্দাজদের সমিতির প্রতি দৃশ্যমান একটি স্বীকৃতি।

এই ধরনের তৈলচিত্রের কারণে নেদারল্যান্ডিশ শিল্পকলার ব্যাপক চাহিদা ছিল। বর্তমান বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প এবং অন্যত্র আন্তর্জাতিক বাজারে তখন পূর্বনির্দেশিত নয় এমন কাজও বিক্রয় হয়েছে এবং ইটালির বহু উৎসুক সংগ্রাহকদের জন্য রপ্তানিও করা হ য়েছিল। ভ্যান ডার ভেইডা ও ভ্যান আইককে তাদের প্রজন্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই শিল্পী হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাদের পূর্ববর্তী প্রাচীন গ্রিক শিল্পীদের মতো দৃষ্টি বিভ্রম সৃষ্টি করায় তারা অতুলনীয় ছিলেন। ইটালিতে পার্সপেকটিভ বা আলোকবিজ্ঞানের দর্শনানুপাত সংক্রান্ত (বিষয়বস্তুর উচ্চতা, দৈর্ঘ, গভীরতা, দূরত্ব অবস্থান অনুযায়ী চিত্রাঙ্কন) নতুন কিছু উন্নয়নের কল্যাণে শিল্পীরা এই বিভ্রমবাদকে আরো অগ্রসর একটি অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন ।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) The Wilton Diptych by an anonymous artist, around 1395
(২) Les Très Riches Heures of Duc de Berry April (detail) by The Limbourg brothers - were famous Dutch miniature painters (Herman, Paul, and Johan) from the city of Nijmegen.
(৩) Les Très Riches Heures du duc de Berry Novembre (detail) by The Limbourg brothers
(৪) Claus Sluter (1350-1406) , a Netherlandish master worked in the service of the Dukes of Burgundy. his greatest creation was the Well of Moses (Moses Fountain)
(৫) The Mérode Altarpiece (or Annunciation Triptych) is an oil on oak panel triptych, attributed to Early Netherlandish painter Robert Campin
(৬) The Adoration of the Mystic Lamb central interior oil paint on wood panel from the Ghent Altarpiece by Jan van Eyck (c. 1390-1441 CE). An inscription on the reverse also credits Hubert van Eyck (d. 1426 CE). Completed in 1432 CE.
(৭) Ghent Altarpiece by Jan van Eyck, details (Adam and Eve)
(৮) Ghent Altarpiece by Jan van Eyck, details (Donors and Saints)
(৯) The Arnolfini Portrait is a 1434 oil painting on oak panel Jan van Eyck. believed to depict the Italian merchant Giovanni di Nicolao Arnolfini and his wife, presumably in their residence in the Flemish city of Bruges.
(১০) Rogier van der Weyden's Descent from the Cross altarpiece, around 1435

অধ্যায় ১২ - দেখার একটি উপায়

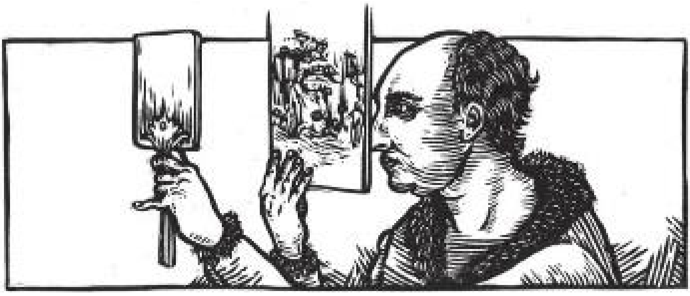

১৪৪৪ সাল, ইটালির ফ্লোরেন্সের ভায়া লারগার কাছে জমির একটি প্লটে, কসিমো ডে'মেডিচি স্থপতি মিকেলোৎসো-এর পাশে দাড়িয়ে আছেন। তারা কসিমোর উচ্চাভিলাষী নতুন প্রাসাদের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, এটি বেশ কয়েক তলার ধ্রুপদী শৈলীর একটি ভবন যার একটি কেন্দ্রীয় কোর্টইয়ার্ড বা প্রাচীর বিশিষ্ট ছাদবিহীন অঙ্গন থাকবে। কসিমো প্রসিদ্ধ স্থপতি ব্রুনেলেস্কিকে মূল পরিকল্পনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন প্রথমে, কিন্তু তিনি পরে সেই পরিকল্পনাটি বাতিল করেছিলেন, কারণ ব্রুনেলেস্কির মূল পরিকল্পনাটি তার কাছে খানিকটা বেশি আড়ম্বরপূর্ণ মনে হয়েছিল। প্রভাবশালী মেডিচি ব্যাংকের প্রধান হিসেবে কসিমো নিঃসন্দেহে খুবই বিত্তশালী ছিলেন, কিন্তু সম্পদের কোনো প্রদর্শনী না করতে সবসময়ই তার বাবা তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন । সুতরাং তিনি মিকেলোৎসোর সংযত পরিকল্পনাটিকে নির্বাচন করেছিলেন, যে ভবনের পরিকল্পনায় তখনো সেই বিশেষ জায়গাটি অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে তিনি তার ক্রমবর্ধমান চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্য এবং বইয়ের সংগ্রহ সাজাতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় অঙ্গনটি আকর্ষণীয় করে তুলতে কসিমো সেই সময়ের নেতৃস্থানীয় ভাস্কর, ডোনাটেলোকে দায়িত্ব দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি তাকে বাইবেলের কাহিনি থেকে মেষপালক ডেভিডের একটি ভাস্কর্য নির্মাণ করতে বলবেন, যা এই অঙ্গনের কেন্দ্রে একটি স্তম্ভপীঠের উপর দাড়িয়ে থাকবে। এটি খুব সাহসী একটি সিদ্ধান্ত ছিল - সাধারণত সেই সময় ভাস্কর্যগুলো সাধারণ কোনো ভবনের দেয়ালে মধ্যে নির্মিত বিশেষ কিছু স্থান, বা কুঠুরিতে স্থাপন করা হতো, সেগুলো কখনো মূল মঞ্চ দখল করতো না। ডেভিড আর গোলাইয়াথের কাহিনীটি ছিল নিষ্ঠুরতা ও প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে ধূর্ততা আর কৌশলের বিজয়-কাহিনী। আর এই কারণে দীর্ঘদিন আগে গর্বিত ফ্লোরেন্টাইন বা ফ্লোরেন্সের বাসিন্দরা ডেভিডকে তাদের শহরের প্রতীক হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন, এই শহরটিও পোপ এবং প্রতিবেশী শক্তিশালী ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলোর থেকে এর নিজের স্বাধীনতা ধরে রেখেছিল। ডোনাটেলো ইতোমধ্যেই ডেভিডের এই ধরনের একটি ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন, যা ফ্লোরেন্স সরকারের কেন্দ্রীয় কার্যালয় পালাৎসো ডেলা সিনোরিয়ায় স্থাপন করা হয়েছিল। তিনি তার রাজকীয় বৈশিষ্ট্য নয়, ডেভিডের তারুণ্য আর সৌন্দর্য্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এবং তাকে আঁটোসাঁটো টিউনিকের পরিচ্ছদ

পরিয়েছিলেন, আর তার গায়ে জড়ানো জামাটি উরু কাছ থেকে কাটা ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে নির্মিত কোনো ভাস্কর্যের তুলনায় এটি দেখতে মূলত একটি গ্রিক ভাস্কর্যের মতোই ছিল। কসিমো ভাবছিলেন ডোনাটেলো এই নতুন ভাস্কর্যটি কীভাবে নির্মাণ করবেন। তিনি জানতেন এই নতুন ডেভিড স্বতন্ত্র হবে, কারণ এটি ব্রোঞ্জ দিয়ে ঢালাই করা হবে, এটি এমন কিছু, শুধুমাত্র বিত্তশালী কোনো ব্যাংক মালিক পরিবারের - হয়তো শুধু মেডিচি - পক্ষেই হয়তো এর নির্মাণের খরচ বহন করা সম্ভব ছিল।

*

১৪৪০ এর দশকে ডোনাটেলো (ডোনাটেলা ডি নিকোলো ডি বেটো বারডি, আনু ১৩৮৬ -১৪৬৬) ব্রোঞ্জের যে ডেভিড সৃষ্টি করেছিলেন, সেটি ছিল পুরুষ তারুণ্য আর সৌন্দর্য্যের একটি উদযাপন। ডেভিড এখানে প্রায় সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাড়িয়ে আছেন শুধুমাত্র পায়ে আঙ্গুল খোলা হাটু অবধি দীর্ঘ বুট জুতাটি ছাড়া। তার শিরস্ত্রাণটি দেখতে অনেকটাই বড় কোনো টুপির মত, যার শীর্ষের চারদিকে পাতার একটি মুকুট পেচিয়ে আছে এবং তার ঘন কুঞ্চিত চুল তার ঘাড় অবধি ঝুলে আছে। তার বাম হাত বিশ্রাম নিচ্ছে কোমরের ওপর এবং তার বাম পা গলিয়াথের ছিন্ন মস্তকের ওপর রাখা। ডেভিডের লোমহীন শরীর জ্বলজ্বল করছে কারণ তার পালিশ করা ব্রোঞ্জের ত্বক আলো প্রতিফলিত করে। এখানে সে একাই নিরাবলম্ব দাড়িয়ে আছে, কোনো স্থাপত্য বা ভবনের দেয়ালে সাথে যুক্ত নয়, এবং দাবি করছে যেন তার দিকে তাকানো হয়। প্রায় সহস্র বছরব্যাপী, এর আগে এই ধরনের কোনো ভাস্কর্য কেউ তৈরি করেননি । সর্বশেষ নগ্ন পুরুষের ভাস্কর্যটি যখন স্তম্ভপীঠের

উপর যখন স্থাপন করা হয়েছিল, তখন রোমানদের রাজত্ব ছিল। যদিও ভাস্কর্যটির উৎস বাইবেলের একটি কাহিনী, কিন্তু এর সত্যিকারের বিষয়বস্তু ছিল পুরুষ সৌন্দর্য, এবং ধ্রুপদী শৈলীতে এর শরীর মূল্যায়ন।

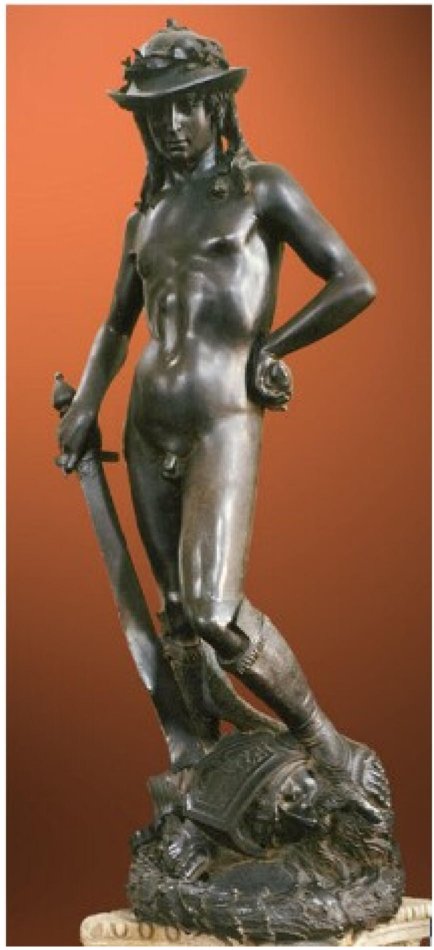

কসিমো ডে'মেডিচি মানবতাবাদী ছিলেন, এবং ক্লাসিকাল পর্বের দর্শন এবং শিল্পকলায় সুশিক্ষিত ছিলেন। বাসস্থান, খাদ্য এবং নিয়মিত কাজের ব্যবস্থা করে তিনি ডোনাটেলোর সম্পূর্ণ পেশাগত জীবনের আদ্যোপান্ত পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এটি ছিল এমন একটি সময় যখন ইটালিতে অধিকাংশ শিল্পকর্ম সরাসরি পৃষ্ঠপোষকদের অনুদানে ও তাদের চাহিদামাফিক সৃষ্টি করা হতো । শহরের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী সংগঠন বা গিল্ডগুলো ডোনাটেলোর মত শিল্পীদের কাছে ভাস্কর্য নির্মাণের চাহিদাপত্র প্রেরণ করতেন করতেন মূলত চার্চ অলংকরণের জন্য। ধনী পরিবারগুলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চ্যাপেল নির্মাণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় চার্চগুলোর মধ্যে জমি কিনেছিলেন, এবং সেগুলো সজ্জিত করতে

শিল্পীদের পারিশ্রমিক দিতেন। এই প্রতিযোগিতায় পরস্পরকে ধনী পরিবারগুলো পরস্পর পরাজিত করার চেষ্টা করতো ।

পরের তিনটি অধ্যায় আমরা দেখবো কীভাবে ইটালির তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী নগর রাষ্ট্র - ফ্লোরেন্স, ভেনিস এবং রোম - শিল্পীদের সহায়তা এবং রেনেসাঁয় অবদান রেখেছিল । পঞ্চদশ শতাব্দীর রোম ক্যাথলিক চার্চের কেন্দ্র হিসাবে নিজের দাবি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং শহরটি পোপের অসীম সম্পদের কারণে দারুণভাবে উপকৃত হয়েছিল। ভেনিসের সম্পদ ও সমৃদ্ধি ভিত্তি ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, এবং ফ্লোরেন্স ছিল একটি প্রজাতন্ত্র, যা শাসন করতো সফল ব্যবসায়ীদের একটি পরিচালনা পর্ষদ, যারা নিজেদের স্বাধীনতা বিষয়ে আপোষ করতে নারাজ ছিলেন। প্রতিটি শহরে শিল্পকলা এমন একটি মাত্রা অবধি সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল, যা 'ক্লাসিকাল' যুগের পরে আর কখনোই দেখা যায়নি।

ফ্লোরেন্সে সবচেয়ে বিত্তশালী এবং ক্ষমতাধর পরিবার ছিল - মেডিচি পরিবার, এবং বহু শিল্পী তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উপকৃত হয়েছিলেন। ফ্রায়ার বা খ্রিস্টান ভিক্ষু ও শিল্পী ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকো (গিডো ডি পিয়েট্রো, আনু. ১৩৯৫-১৪৫৫) ছিলেন তাদের একজন। কসিমো ডে' মেডিচি শহরের সান মার্কো কনভেন্ট বা মঠে সতেরো জন ডমিনিকান ফ্রায়ারকে স্থানান্তরণে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন। তিনি তাদের জন্য নতুন একটি সন্ন্যাশ্রম এবং চমৎকার একটি গ্রন্থাগার নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থাগারটি তিনি নিজের অর্থায়নে ধ্রপদী এবং ধর্মতাত্ত্বিক বই দিয়ে পূর্ণ করেছিলেন। ডমিনিকানরা দরিদ্র থাকার ব্রত গ্রহন করলেও, তাদের সন্ন্যাশ্রম শিল্পকর্ম দিয়ে সজ্জিত করতে তারা কখনো কার্পন্য করেননি। বিশেষ করে যখন ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে প্রতিভাবান শিল্পীরা তাদের সাথেই বাস করছিলেন। ফ্রা আনজেলিকো ১৪৪০-এর দশকে তার সহকারীদের

নিয়ে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে পুরো সান মার্কো সন্ন্যাশ্রমটি বহু ফ্রেস্কো দিয়ে পূর্ণ করেছিলেন। যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হবার দৃশ্যটি ছিল আশ্রমের চ্যাপটার হাউজ বা মূল সভাকক্ষে প্রধান দেয়ালচিত্র, এবং একচল্লিশটি একান্ত অনাড়ম্বর বর্গাকার শয়নকক্ষ যা 'সেল' বলে পরিচিত ছিল, সেগুলো নানা আধ্যাত্মিক দৃশ্যের চিত্র দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছিল।

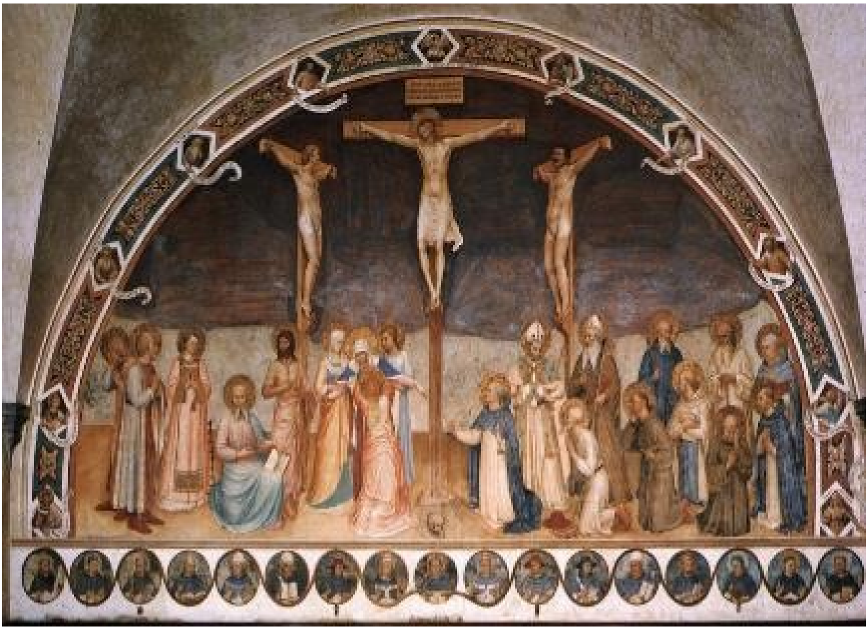

সিড়ির উপরে ধাপে একটি বড় আকারের চিত্রকর্ম 'আনানসিয়েশন' বর্ণিল ডানাসহ চমৎকার গ্যাবরিয়েলকে প্রদর্শন করছে, তার মেরুদণ্ডের দুই পাশে উন্মোচিত ডানাগুলো গাঢ় লালচে বেগুনি, নীলচে-সবুজ, হলদে-কমলা, হলুদ আর সাদা দাগে দাগাঙ্কিত। আরেকটি অ্যানানসিয়েন দৃশ্য যা আমরা একটি সেল কক্ষের মধ্যে দেখি, সেটি বেশ সংযত। সাধারণ খিলানযুক্ত যে কক্ষে কুমারী মেরি নতজানু হয়ে আছেন, সেটির দেয়ালের রঙ সেলের প্লাস্টারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেন তার সেই স্থানটি খ্রিস্টান ভিক্ষুর এই শয়নকক্ষেরই একটি সম্প্রসারণ। শিল্পকলা, জীবন এবং ধর্মবিশ্বাস ওতোপ্রতোভাবে পরস্পর জড়িত, এবং ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকোর চিত্রকর্মগুলো ছিল সর্বোপরি ধর্মনিষ্ঠা অর্জনে দৃশ্যমান একটি সহায়ক। কসিমো তার বিত্ত ব্যবহার করেছিলেন তার ধর্মনিষ্ঠা সুদৃঢ় করতে, ইতোপূর্বে ঠিক যেভাবে এনরিকো স্ক্রোভেনি এবং ফিলিপ দ্য বোল্ড করেছিলেন। সান মার্কোয় কসিমোর এমনকি নিজের একটি সেল ছিল, যেখানে তিনি একাকী গোপনে প্রার্থনা করতে পারতেন।

নতুন একটি কৌশল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে শিল্পীরা মেডিচি এবং চার্চের চাহিদাগুলো ব্যবহার করেছিলেন, যা খুব শীঘ্রই রেনেসাঁ শিল্পকলার মেরুদণ্ডে পরিণত

হয়েছিল: পার্সপেক্টিভ বা দর্শনানুপাত (বিষয়বস্তুর উচ্চতা, দৈর্ঘ্য, গভীরতা, অবস্থান ও দূরত্ব অনুযায়ী চিত্রাঙ্কনবিদ্যা)। লোরেন্তসো গিবের্টি (আনু. ১৩৭৮-১৪৫৫) ফ্লোরেন্সের ব্যাপ্টিস্ট্রির জন্য বাইবেলে কাহিনী বর্ণনা করা ব্রোঞ্জের রিলিফ দিয়ে আবৃত দুই জোড়া বিস্তারিতভাবে অলংকৃত দরজা তৈরি করতে প্রায় পঞ্চাশ বছর ব্যয় করেছিলেন। ১৪৫২ সালে অবশেষে কাজটি তিনি শেষ করেছিলেন। প্রথম জোড়া দরজা তৈরি করার সময় ডোনাটেলো তার সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি দর্শনানুপাতের নতুন গাণিতিক ধারণাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে সিয়েনায় চলে গিয়েছিলেন, গিবার্টি দ্বিতীয় জোড়া দরজায় দর্শনানুপাতের নতুন ধারণাটিকে ব্যবহার করতে তার আগের পরিকল্পনাগুলো সংশোধন করেছিলেন।

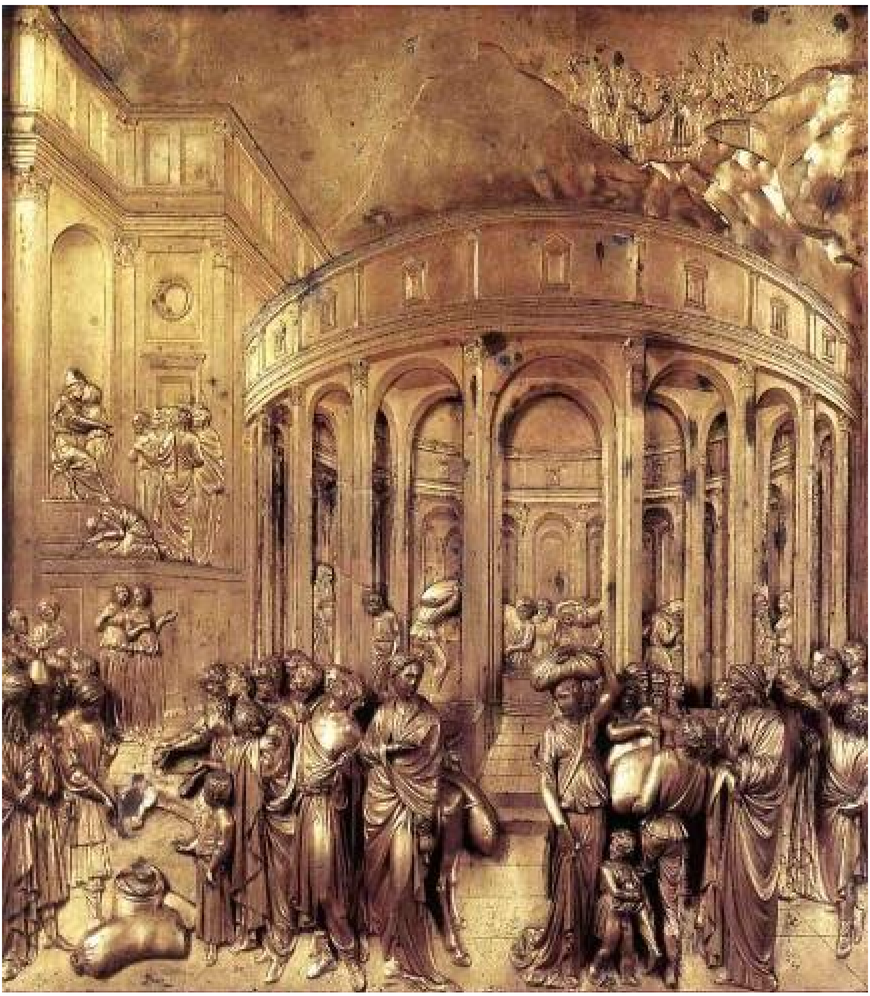

কিন্তু এই পার্সপেক্টিভ আসলে কী? এটি একটি উপায় যার মাধ্যমে একমাত্রিক সমতল পৃষ্ঠদেশে বাস্তবানুগ ত্রিমাত্রিক দৃশ্য পুনঃসৃষ্টি করা যেতে পারে, কোনো বস্তুকে অন্য বস্তুদের চেয়ে আপাতদৃষ্টিতে নিকটে অবস্থিত এমন দৃশ্য সৃষ্টি করার মাধ্যমে। ১৪৩৫ সালে লিওন বাতিস্তা আলবের্টি এই ধারণাটির ভিত্তিমূলক মূলনীতিগুলো তার 'অন পেইন্টিং' বইয়ে প্রকাশ করার আগে ফ্লোরেন্সে ব্রুনেলেস্কি ও মাসাচ্চিও (টমাসো ডি সের জিওভানি দি সিমোন, ১৪০১-১৪২৮) এই পার্সপেক্টিভ নিয়ে কাজ করেছিলেন। যদিও পার্সপেক্টিভ চিত্রকর্মের ক্ষেত্রে প্রধানত বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল, কিন্তু আমাদের জন্য এর মৌলিক বিষয়গুলো অনুধাবন করা সহজতর হবে যদি আমরা গিবার্টির করা দুই সেট দরজার পাশাপাশি রেখে তুলনা করি। প্রথম সেট, উত্তর দরজা (যেখানে নিউ টেস্টামেন্ট থেকে আঠাশটি দৃশ্যের রিলিফ আছে)। প্রতিটি দৃশ্যে তলদেশ বা ভূমিটিকে মনে হয় যেন একটি শেলফ বা তাক, যা প্রতিটি দৃশ্য থেকে বাইরের দিকে বের হয়ে আসছে। দ্বিতীয় সেটে, পূর্ব দরজা (ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের দশটি দৃশ্য সম্বলিত) প্রতিটি দৃশ্যের ভূমি যেন মনে হয়ে পেছনে ঢালু বা অপসৃত হয়ে গেছে দৃশ্যের ভিতরে। এই দ্বিতীয় সেটে গিবার্টির চরিত্রগুলো যত দূরে অবস্থান করছে ততই তারা আকার ক্ষুদ্রতর হয়েছে, এবং ভবনগুলো সেই অনুপাতে আকারে হ্রাস পেয়েছে।

একটি স্থির দিগন্ত এবং ভ্যানিশিং পয়েন্ট বা অপসৃয়মান বিন্দু - ঐ দিগন্তের ওপর একটি স্থির বিন্দু - ব্যবহার করে প্রতিটি দৃশ্যের প্রতিটি রাখা এই বিন্দুর অভিমুখে অভিগমন প্রতিটি দেয়ালের অবস্থান, ছাদের উচ্চতা ও মেঝের টাইলের কোণগুলো সম্বন্ধে আমাদের তথ্য জ্ঞাপন করে । এটি এমন একটি দৃশ্য সৃষ্টি করে, বাস্তবে যেভাবে সেটি দৃশ্যমান হয়, শিল্পকর্মেও সেভাবে আবির্ভূত হয়, যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে দৃশ্যটি

দেখা হয়। এই পুরো দেখার অভিজ্ঞতার মূলে আছে জ্যামিতি, যা শৃঙ্খলা আর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে এনেছিল। সমতল পৃষ্ঠদেশের উপর বাস্তব জীবনের সবচেয়ে নিকটবর্তী সাদৃশ্য সৃষ্টি করার ধাঁধার সর্বশেষ ধাপটি ছিল পার্সপেক্টিভ - চুড়ান্ত "ট্রোম্প ল'য়" – চোখকে ধোকা দেয়া।

পিয়েরো ডেলা ফ্রানচেস্কা (আনু. ১৪১৫/২০ - ১৪৯২) চিত্রকর্মে এইসব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনগুলো নিয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, এবং তিনি পার্সপেক্টিভ এবং জ্যামিতিক আকৃতি নিয়ে একটি বইও লিখেছিলেন। পাওলো উচেল্লো (পাওলো দি ডোনো, ১৩৯৭-১৪৭৫) একইভাবে পার্সপেক্টিভ নিয়ে মোহাবিষ্ট হয়েছিলেন। তার রেখাচিত্রগুলো দেখতে ত্রিমাত্রিক গাণিতিক মডেলের মতো ছিল, এবং তিনিও তার দায়িত্ব পাওয়া কাজগুলোয় তার গবেষণা প্রদর্শন করেছিলেন। ১৪৩৮-৪০ খ্রিস্টাব্দে তার 'দ্য ব্যাটল অব সান রোমানো' চিত্রকর্মে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে মাটির ওপর পড়ে থাকা ভেঙ্গে যাওয়া ল্যান্স বা দীর্ঘ বর্শা দেখতে পাই, যেগুলো পার্সপেক্টিভের গাণিতিক রেখাগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল, চিত্রকর্মটিকে গভীরতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছিল।

'দ্য ফ্লাড', ফ্লোরেন্সের সান্টা মারিয়া নোভেলা চার্চে একটি লুনেট (অর্ধ-চন্দ্রাকার) ফ্রেস্কো , ১৪৪৭ সালের আশে পাশে কোনো একটি সময় উচেল্লো এটি এঁকেছিলেন। মহাপ্লাবনে প্রাণ বাঁচাতে আমরা কিছু মরিয়া মানুষকে একটি সুবিশাল আর্ক বা নৌকার প্রান্ত আঁকড়ে ধরে থাকতে দেখি। ভাসমান কোনো জলযানের চেয়ে বরং এই আর্কটি দেখতে অভেদ্য একটি দেয়াল মনে হয়। কিন্তু এটি পার্সপেক্টিভের সূত্রগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করার উচেল্লোর ইচ্ছা পূরণ করেছিল। এটি পেছনে একটি ভ্যানিশিং পয়েন্ট বা অপসৃয়মান বিন্দু অবধি বিস্তৃত হয়ে আছে, যা চিহ্নিত করা হয়েছে একটি লাল বজ্রপাত ব্যবহার করে। উচেল্লো এমন কিছু উপাদান যুক্ত করেছিলেন যা শুধু রেখাচিত্র আঁকার অনুশীলনে দেখা যায়, যেমন মাথার পরিচ্ছদ বা পাগড়ি রাখার গোলাকার ফ্রেম বা মাৎসোচ্চি, উচেল্লো

দুইজন ব্যক্তির গলা ও মাথায় এটি স্থাপন করেছিলেন, পার্সপেক্টিভের জ্যামিতি ব্যবহার করে দেখিয়েছিলেন এগুলোকে যেন ত্রিমাত্রিক মনে হয়। ডান দিকে একটি মৃতদেহের চোখ উপড়ে নেবার চেষ্টা করছে একটি কাক, অথবা আর্কের নাটকীয়ভাবে অপসৃয়মান দেয়ালগুলো মাৎসোচ্চির মতো এভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। পার্সপেক্টিভ হচ্ছে এই বিস্ময়কর চিত্রকর্মের প্রকৃত বিষয়।

ফ্লোরেন্সের বহু প্রসিদ্ধ শিল্পী সান্টা মারিয়া নোভেলা চার্চের জন্য শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছিলেন, যেমন মাসাচ্চিও, উচেল্লো, সান্দ্রো বতিচেল্লি (আলেসান্দ্রো দি মারিয়ানো ফিলিপেপি, আনু. ১৪৪৫-১৫১০) এবং ডোমেনিকো গিরলান্ডিও (ডোমেনিকো দি টমাসো বিগোরডি, ১৪৪৯-১৪৯৪)। বতিচেল্লি ১৪৭৬ সালে গাসপারে ডি জানোবি ডেল লামার নতুন সমাধি চ্যাপেলের বেদির জন্য 'অ্যাডোরেশন অব ম্যাজাই' এঁকেছিলেন। ততদিনে পার্সপেক্টিভ চিত্রকর্মের অপরিহার্য একটি অংশে পরিণত হয়েছিল, অর্থাৎ এটি আর এমন কিছু ছিল না যে সেটিকে আলাদাভাবে প্রদর্শন করতে হবে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ যা 'অ্যাডোরেশন অব ম্যাজাই' চিত্রকর্মটির প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে সেটি দর্শনানুপাতের নিয়ম অনুসরণ করেছে, কিন্তু প্রকটভাবে বিষয়টি প্রদর্শিত হয়নি। এর পরিবর্তে মেডিচিদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সুনজরে আসতে বতিচেল্লি এই চিত্রকর্মটি ব্যবহার করেছিলেন। ডেল লামা ব্যাংক মালিক গিল্ড বা সমিতির একজন সদস্য ছিলেন, এটি হয়তো একটি কারণ যে, তিনি তাদের অনেকের প্রতিকৃতি এই চিত্রকর্মে ব্যবহার করেছিলেন।

চিত্রকর্মে কসিমো ডে মেডিচি অমর হয়ে আছেন প্রাচ্য থেকে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের একজন (ম্যাজাই) হিসেবে, যিনি কেন্দ্রে কুমারী মা ও শিশুর সামনে নতজানু হয়ে আছেন। এই সময় নাগাদ কসিমো জীবিত ছিলেন না, যেমন মৃত ছিলেন তার পুত্র, পিয়েরো (চিত্রকর্মে আরেকজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বা ম্যাজাই)। কসিমোর নাতি জুলিয়ানো ডে মেডিচি হাল ফ্যাশনের পোষাকে সজ্জিত হয়ে সর্ব বামে আবির্ভূত হয়েছেন, তার বুক ফুলে আছে তারুণ্যের গর্বে। ডান দিকে দুই ম্যাজাই-এর ঠিক পেছনে খানিকটা খাটো কালো একটি রোব বা গাউন পরে দাড়িয়ে আছেন লোরেঞ্জো ডে মেডিচি। তিনি জুলিয়ানোর বড় ভাই, এবং বতিচেল্লি তাকে এঁকেছিলেন যেন তিনি এরপরেই খ্রিস্ট শিশুর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অপেক্ষা করছেন। একজন তরুণের জন্য যথার্থ অবস্থান, যিনি সম্প্রতি পারিবারিক ব্যবসা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। এটি লরেঞ্জোকে মহিমান্বিত করা চমৎকার একটি প্রতিকৃতি এবং বহু বছর ধরে তিনি বতিচেল্লির স্থায়ী একজন পৃষ্ঠপোষকের পরিণত হয়েছিলেন। এই চিত্রকর্মে বতিচেল্লি নিজেকেও স্থাপন করেছিলেন সর্বডানে, তিনি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন তাদের জিজ্ঞাসা করছেন, ‘বেশ, আপনাদের কী মতামত’?

লরেঞ্জোর বয়স ছিল তখন বিশ, তার উপর আন্তর্জাতিক মেডিচি ব্যাংকের দায়িত্ব ন্যস্ত করে যখন তার পিতা পিয়েরো মারা গিয়েছিলেন, এবং কার্যত তিনি ফ্লোরেন্সের নগরপিতা ও নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। ১৪৭৮ সালে এপ্রিল মাসে প্রতিদ্বন্দ্বী একটি ফ্লোরেন্টাইন পরিবার, পাৎসি, লোরেঞ্জোকে হত্যা করা চেষ্টা করেছিল যখন তিনি খ্রিস্টীয় মাস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চার্চে এসেছিলেন। পাৎসিরা যদিও তার ভাই জুলিয়ানোকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু লরেন্জো প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন ও পরে ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার করেছিলেন। তিনি তাদের সিনোরিয়ার (ভেনিসের মূল সরকারী কার্যালয়) জানালা থেকে নীচে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এরপর তিনি সেখানে তাদের ফাসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, যতক্ষণ না তারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। সিনোরিয়ার পাশে জেলখানার দেয়ালে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রমাণাকার প্রতিকৃতি আঁকতে বতিচেল্লিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এই প্রতিকৃতিগুলোর এখন আর অস্তিত্ব নেই কিন্তু অবশ্যই সেগুলো ভয়ঙ্কর একটি দৃশ্য ছিল, জনগণের প্রতি একটি সতর্কবার্তা, মেডিচিদের সাথে শত্রুতা করলে বিনাশ নিশ্চিত।

বিরতিহীন রাজনৈতিক টানাপোড়েন, শহর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ এবং তার ব্যাংক সাম্রাজ্যের নানা সমস্যা সত্ত্বেও লোরেঞ্জো শিল্পী আর কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করা অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি ফ্লোরেন্সের একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং তুর্কীদের হাতে পতন হওয়া কনস্টান্টিনোপল থেকে পালিয়ে আসা বাস্তুচ্যুত গ্রিক পণ্ডিতদের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পদ সৃষ্টি করেছিলেন। মানবতাবাদের প্রতি লোরেঞ্জোর আগ্রহেরই একটি সম্প্রসারণ ছিল এটি, বুদ্ধিজীবী ফ্লোরেন্সে তখনো যা একটি প্রধান চালিকা শক্তি ছিল। লোরেঞ্জোর নিজের মন্ত্র ‘লো টম্প রোভিয়া’ (সময় ফিরে আসে) ক্ল্যাসিকাল গ্রিস ও রোমের প্রতি তার বিরতিহীন আগ্রহের ইঙ্গিত দিয়েছিল, একই সাথে এই সময়টাকে চিহ্নিত করতে বর্তমানে আমাদের ব্যবহৃত শব্দটির প্রতিও এটি ইঙ্গিত করে: রেনেসাঁ বা পুনর্জন্ম।

ফ্লোরেন্সের শিল্পীরা প্রাচীন শিল্পকর্ম আর ধারণার প্রতি অপ্রশম্য তৃষ্ণার প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন সেই অসাধারণ নিরাবলম্ব ভাস্কর্য সৃষ্টি করে, যেমন ডোনাটেলোর অসাধারণ ডেভিড, গ্রিক পুরাণের দৃশ্য চিত্রিত করে যেমন বতিচেল্লির 'বার্থ অব ভিনাস' (১৪৮৫-৬)। এর ব্যতিক্রম ভেনেশিয়ান, অর্থাৎ ভেনিসের শিল্পীরা তাদের নিজেদের সময়ে বসবাস করছিলেন, একটি উত্তেজনাপূর্ণ শহরের অংশ, যা জনাকীর্ণ করে রেখেছিল সারা বিশ্ব থেকে আসা বণিক-নাবিকরা। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখবো, যখন ভেনেশিয়ান শিল্পীরা ফ্লোরেন্টাইন পার্সপেক্টিভ ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন, তারা তাদের কাজে রঙের পরিমাণও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাদের মহাকাব্যিক আখ্যানধর্মী চিত্রকর্মগুলো সমৃদ্ধ এই নগর রাষ্ট্রের বাসিন্দা, এখানে কর্মরত আর বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা গোষ্ঠীর সদস্যদের জীবনের ওপর আলোকপাত করেছিল।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Inner courtyard of the Palazzo Medici Riccardi, designed by Michelozzo di Bartolomeo for Cosimo de Medici (1444-84), in Florence, Tuscany, Italy.
(২) Donatello , The marble David, 1409 ((left)
(৪)Donatello , The bronze David, 1440
(৫) Fra Angelico, Crucifixion, detail; Chapter House of the Convent of San Marco in Florence
(৭) Fra Fra Angelico, Annunciation, 1437-46
(৮) Annunciation by Fra Angelico, Cell 3,
(৯) Lorenzo Ghiberti, Story of Joseph (Gate of Paradise (East gate), Battistero di San Giovanni, Florence
(১০) Lorenzo Ghiberti Last Supper, north gate Battistero di San Giovanni,

Florence
(১১) The Battle of San Romano is a set of three paintings by the Florentine painter Paolo Uccello depicting events that took place at the Battle of San Romano between Florentine and Sienese forces in 1432. They are significant as revealing the development of linear perspective in early Italian Renaissance painting, and are unusual as a major secular commission.
((১২) Paolo Uccello, Flood and Waters Subsiding FrescoSanta Maria Novella, Florence
(১৩) Botticelli - Adoration of the Magi (Zanobi Altar),1476
(১8) Masacio, “The Tribute Money,” 1425
(১৫) Sandro Botticelli - La nascita di Venere –The Birth of Venus ,1485

অধ্যায় ১৩ - পশ্চিমের সাথে পূর্বের সাক্ষাৎ

জেনটিলে বেলিনি হাতে তুলি নেবার আগে হাতগুলোকে উষ্ণ করতে দুই হাতে বেশ জোরে কয়েকবার ফুঁ দিলেন। এরপর সুলতান দ্বিতীয় মেহমেটের বাদামী দাড়িগুলোকে আরো ঘন করে তুলতে তিনি ক্যানভাসের ওপর ক্ষুদ্র আর সংযত আঁচড় টানতে শুরু করলেন। কনস্টান্টিনোপলে তখন বসন্ত, কিন্তু তারপরও বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছিল। মাস ছয়েক আগে, ১৪৭৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে, বেলিনি দুই সহকারীকে নিয়ে তার জন্মশহর ভেনিস থেকে একটি গ্যালি বা জাহাজে চড়ে কনস্টান্টিনোপলে এসেছিলেন। অটোমান সুলতান তার রাজ্য আর ভেনিসের সাথে চলমান শান্তি চুক্তি বিষয়ক আলোচনার অংশ হিসেবে একজন দক্ষ প্রতিকৃতি আঁকিয়ে শিল্পীকে তার রাজসভায় প্রেরণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। এই দুটি এলাকা - একটি দ্রুত সম্প্রসারণশীল সাম্রাজ্য এবং অন্যটি বিত্তশালী ইটালিয় শহর-রাষ্ট্র প্রায় পনেরো বছর ধরে যুদ্ধ করেছিল এবং এটি ভেনেশিয়ান অর্থনীতির মেরুদণ্ড - শহরটির বৈদেশিক বাণিজ্য ও শহরে কোষাগারের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল। বেলিনিকে কনস্টান্টিনোপলে প্রেরণ করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল, ভেনিসের জন্য যা বেশ বড় একটি বিসর্জন, কারণ বেলিনিকে তার প্রজন্মের নেতৃস্থানীয় শিল্পী হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

অটোমান রাজধানীতে বেলিনি ইসলামী সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিলেন, ইতোপূর্বে যার সাথে তার পরিচয় হয়েছিল শুধু ভেনিসে লেনদেন হওয়া বিলাসী সামগ্রীগুলো মাধ্যমে - যেমন, কার্পেট, বই, ভেলভেট। তিনি স্থানীয় বহু মানুষের রেখাচিত্র এবং কর্মরত স্ক্রাইব বা অনুলেখকের চিত্র এঁকেছিলেন। মেহমেটের রাজসভা পূর্ণ ছিল বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারা, যারা প্রাচীন গ্রিক ও পারস্যের দার্শনিকদের লেখা অনুবাদ করেছিলেন। এইসব প্রাজ্ঞরা বেলিনিকে বলেছিলেন, মেহমেট কবিতা লিখতেন ও বেশ কিছু ভাষায় পারদর্শী। বেলিনির নিজের অবশ্য সুলতানকে বেশ স্বল্পভাষী মনে হয়েছিল, এবং গুজব ছিল যে তিনি অসুস্থ।

বেলিনি সুলতানের বেশ কিছু রেখাচিত্র এঁকেছিলেন এবং এখন তিনি একটি তৈল রং মাধ্যমে প্রতিকৃতি নিয়ে কাজ করছেন। প্রতিকৃতিতে তিনি সুলতানকে একটি

অলংকৃত স্থাপত্য খিলানের নীচে ও প্যারাপেটের (নীচু দেয়াল) পেছনে স্থাপন করেছেন, পর্যাপ্ত পরিমানে রত্নখচিত একটি কাপড় যা আবৃত করে রেখেছে। প্রতিকৃতিতে সুলতার একটি গাঢ় লাল কাফতান পরে আছেন, যা আঁটসাট তার বুকের ওপর পেচিয়ে আছে, এবং মোটা হাতাহীন একটি ফার (লোমসহ পশুচর্মের পোষাক) কোট তিনি পরে আছেন। তার মাথায় একটি পাগড়ি, যা সব অটোমান পুরুষরা পরে থাকেন, একটি লাল ফেল্টের (পশম জমাট করে তৈরি বস্ত্র) টুপি, যার চারদিকে পেচিয়ে আছে দীর্ঘ সাদা কাপড়। বেলিনি সচেতন ছিলেন যে এই চিত্রকর্মটি শান্তি চুক্তি আলোচনার একটি অংশ, সুতরাং তিনি সুলতানের পঞ্চাশ বছর বয়স্ক চেহারায় কোনো কুঞ্চনের ওপর গুরুত্বারোপ করেননি। যদিও তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল সুলতানের চেহারা ক্যানভাসে ধারণ করার জন্য, সেই কারণে তিনি তার সামনের দিকে খানিকটা উঁচু হয়ে থাকা দাঁত এবং তার নাক ও চিবুকের স্বাতন্ত্র্যসূচক বক্রতাকে এড়াতে পারেননি, যদি তিনি সেটি অনেকটাই মসৃণ করে উপস্থাপন করেছিলেন।

*

দ্বিতীয় মেহমেট নিশ্চয়ই তার প্রতিকৃতি দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কারণ তিনি জেনটিলে বেলিনিকে বিশেষ খেতাবে ভূষিত করেছিলেন ও বেশ ভারী একটি স্বর্ণের হার উপহার দিয়েছিলেন। মেহমেট ১৪৫০-এর দশক থেকেই তার রাজসভায় আমন্ত্রিত ইটালিয় শিল্পীরা আসতে শুরু করেছিলেন, তিনি ইটালির জীবন্ত আর বাস্তবানুগ প্রতিকৃতি চিত্রকর্মগুলোর অনুরক্ত ছিলেন, বিশেষ করে যেভাবে এটি চিত্রকর্মের পাত্রপাত্রীকে,

এমনকি মৃত্যুর পরেও জীবন্ত করে রাখতে পারে,। ইটালির শিল্পীদের প্রতিকৃতি আঁকার দায়িত্ব দিয়ে বিশ্ব নেতা হিসেবে তিনি তার অবস্থান ও আন্তর্জাতিক সংযোগগুলোরও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই চিত্রকর্মে তিনি যদিও অটোমান পোষাক পরে আছেন, কিন্তু তাকে রেনেসাঁ পর্বের একজন ব্যক্তি হিসেবে আঁকা হয়েছিল। এটি সত্যের নিকটবর্তী ছিল কারণ তিনি মানবতাবাদের মূল্য অনুধাবন করেছিলেন, এবং নিজেকে গ্রিক, মুসলমান ও ইটালির বিদ্বানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রেখেছিলেন যারা প্রাচীন কালের নানা বই ও কর্মকাণ্ড বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৪৫০-এর দশকে তিনি গ্রিস জয় করেছিলেন এবং এথেন্সে কিছু সময় কাটিয়েছিলেন, যেখানে পার্থেনন তাকে বিস্মিত আর মুগ্ধ করেছিল, অ বশ্য তিনি সেটিকে একটি মসজিদে রূপান্তর করেছিলেন। বেলিনির প্রতিকৃতি শেষ হবার এক বছরের মধ্যে যদি দ্বিতীয় মেহমেট না মারা যেতেন, তিনি সম্ভবত অতীতের সমীহ উদ্রেককারী রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ এলাকাগুলো একীভূত করার উদ্দেশ্যে ইটালি জয় করার চেষ্টা করতেন।

পূর্ববতী রোমান সম্রাটদের মতো, মেহমেটের প্রতিকৃতি ব্রোঞ্জ মেডালের উপর পুনঃসৃষ্টি করা হয়েছিল, এবং ব্যাপকভাবে যা প্রচার করা হয়েছিল। এইসব মেডালের বেশ কিছু ইটালিতেও তৈরি করা হয়েছিল, এবং কুটনৈতিক উপহার হিসেবে সেগুলো মেহমেটের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। লোরেঞ্জো ডে মেডিচি মেহমেটকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে একটি প্রেরণ করেছিলেন, যখন তিনি তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করা পাৎসি পরিবারের একজন ষড়যন্ত্রকারীকে তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

মেহমেট পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের প্রাক্তন বাইজেন্টাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে তার রাজসভার পারসিক ও তুর্কী শিল্পীদেরও তার প্রতিকৃতি আঁকার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। একই সাথে ইটালিয় ও তুর্কী শৈলীতে প্রতিকৃতি আঁকার নির্দেশ দিয়ে তিনি প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, তার প্রভাব পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় দিকেই বিস্তৃত। সেই সময়ে সৃষ্টি করা মুষ্টিমেয় কিছু মিনিয়েচার এখনো টিকে আছে। সেখানে আমরা স্থানিক গভীরতা সংক্রান্ত সীমিত ধারণার উপস্থিতি লক্ষ করতে পারি, যে-ধরনের গভীরতা সাধারণত ইউরোপীয় প্রতিকৃতিতে দৃশ্যমান ছিল, কিন্তু সেগুলো সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি বিষয় এবং অলংকরণে সমৃদ্ধ ছিল। একটি জলরং মাধ্যমে আঁকা প্রতিকৃতি, ধারণা করা হয় যা এঁকেছিলেন তুর্কী শিল্পী সিনান বেগ (১৪৭০ ও ১৪৮০ র দশকে সক্রিয়)। যে প্রতিকৃতিতে মেহমেটকে পাশ থেকে তার তিন-চতুর্থাংশ প্রদর্শন করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাই সুলতানের বাম কানের উপরের অংশটি ঈষৎ বেঁকে আছে তার মাথার পাগড়ির ভারে। এই প্রতিকৃতিগুলো ইটালিয় প্রকৃতিবাদের বেশ কিছু দিক অন্তর্ভুক্ত করেছিল, এবং সেগুলো পারসিক ও তুর্কী মিনিয়েচার চিত্রকর্মের কৌশলগুলোর সাথে মিশ্রিত হয়েছিল। এটি একটি নতুন সংকর কৌশল সৃষ্টি করেছিল, যা মেহমেটের বহুসাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছিল, এবং ষোড়শ শতাব্দীতে এই কৌশলটি প্রভাবশালী ছিল।

রাজসভায় শিল্পীদের মিথস্ক্রিয়ার প্রমাণও আমরা দেখি। কালি, কলম ও জলরঙে মাধ্যমে আসীন অনুলেখকের একটি চিত্রকর্ম - যা কনস্টান্টিনোপল রাজসভায় বেলিনির থাকাকালীন সময়ে আঁকা হয়েছিল (আর সেই কারণে প্রায়শই এটিকে তার কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়) - প্রদর্শন করে কীভাবে মেহমেটের পৃষ্ঠপোষকতা এই প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যে শৈলীর মিশ্রণ উৎসাহিত করেছিল। ভেলভেটের পোষাক ও পাগড়ি পরিহিত একজন অনুলেখক এখানে পা আড়াআড়ি করে বসে আসেন । তার শরীরে ঘন উপস্থিতি আমরা টের পাই, স্থানিক পরিসরে একটি শরীর হিসাবে এটি অস্তিত্বশীল, যা ইঙ্গিত করে কোনো ইউরোপীয় শিল্পী তাকে এঁকেছিলেন, সম্ভবত জীবন্ত মডেল অনুসরণ করে। কিন্তু তারপরও অলঙ্করিষ্ণু নানা সজ্জা, এবং ডান দিকে আরবী চারুলিপির উপস্থিতি, এবং কাগজে কালির উপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় শিল্পী পারসিক ও তুর্কী মিনিয়েচার চিত্রকর্ম সম্বন্ধেও জ্ঞান রাখতেন। ঐতিহ্যগুলো আর অস্পষ্ট করে দিয়ে বেগ একই ধরনের একটি চিত্রকর্ম সৃষ্টি করেছিলেন, তবে এবার একজন আসীন চিত্রশিল্পীর। বেগ আরো সমতল ও আলঙ্কারিক একটি শৈলী ব্যবহার করেছিলেন, মিনিয়েচার চিত্রকর্মের ঐতিহ্য অনুসারে। এখানে চরিত্রটির শরীর স্থানিক পরিসরে ভাসমান, কিন্তু কোনো অংশেই কম বিস্তারিত নয় , এবং মুখের চেহারাটি প্রকৃতিবাদ অনুসারে সৃষ্ট, ইটালির কোনো প্রতিকৃতির মতো। প্রায়শই এই চিত্রকর্মটিকে আসীন অনুলেখক বা ‘দ্য সিটেড স্ক্রাইব’ চিত্রকর্মটির একটি ঘনিষ্ঠ অনুকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু এমন কী হতে পারে না, একই রাজসভার দুইজন সফল শিল্পী একই সময়ে ছবি দুটি এঁকেছিলেন, পরস্পরের কৌশল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে?

স্বদেশে ফিরে আসার পর বেলিনি হয়তো কনস্টান্টিনোপল আর ভেনিসের সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, উভয় শহরই তখন সুবিশাল বাণিজ্যিক সংযোগে জড়িত এবং বহুভাষী বহু সংস্কৃতির মানুষে জনাকীর্ণ। গ্রিক কার্ডিনাল বেসারিয়ন ভেনিসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন যখন তিনি এটিকে আরেকটি 'বাইজেন্টিয়াম' নামে চিহ্নিত করেছিলেন, যা কনস্টান্টিনোপলের সমতূল্য। ফরাসী কূটনীতিবিদ ফিলিপ দে কোমিনে ভেনিসকে বর্ণনা করেছিলেন 'আমার দেখা সবচেয়ে বিজয়দৃপ্ত শহর, এবং যে শহরটি রাষ্ট্রদূত আর ভিনদেশীদের সন্মান করে'। কনস্টান্টিনোপল আর সিল্ক রোডের মাধ্যমে আসা বিলাসী সামগ্রী কিনতে আগ্রহী ব্যবসায়ীরা পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রদূতদের সাথে ওঠাবসা করতেন, শহরে কেন্দ্রীয় চত্বর ছিল মুসলমান, ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের মিলনমেলা, ভবনগুলো ছিল ইউরোপীয় গথিক এবং ইসলামী স্থাপত্যের একটি মিশ্রণ এবং যেখানে বাইজেন্টাইন গুম্বজ আর মোজাইক আবৃত করেছিল সেইন্ট মার্ক (সান মার্কো) ক্যাথলিক চার্চ। ভেনিসে বসবাসরত জার্মান ও ডালমেশিয়ানদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমান ছিল যে তারা একটি ভ্রাতৃত্ব সংগঠন তৈরি করতে পেরেছিল, যে সংগঠনগুলোকে বলা হতো- 'স্কুওলে'। শহরে মধ্যে এই ধরনের প্রতিটি গোষ্ঠীর (অথবা স্কুওলা) নিজস্ব প্রধান কার্য্যালয় ও তাদের নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক এলাকা ছিল।

বেলিনি আখ্যানমূলক চিত্রকর্ম সৃষ্টিতে বিশেষায়িত ছিলেন, যা এইসব বিত্তশালী স্কুওলে ও ডোজের (তৎকালীন ভেনিসের প্রধান প্রশাসক) বাসভবনসহ নানা সরকারী ভবনের দেয়ালে শোভা পেত। ভিত্তোরে কারাপাচ্চিওর (আনু. ১৪৬৫-১৫২৫) মতো শিল্পীদের সাথে বেলিনি তার চিত্রকর্মে সমকালীন শহরের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় শোভাযাত্রা, অলৌকিক ঘটনা ও বাইবেল-নির্ভর কাহিনী ইত্যাদি দৃশ্য উপস্থাপন করেছিলেন ভেনিসের দৈনন্দিন জীবনকে উদযাপন ও শহরের বিচিত্র বাসিন্দাদের প্রদর্শন করতে। এইসব চিত্রকর্মগুলো বিস্ময়করভাবে বিস্তারিত, যেন তিনি সত্যিকারের শোভাযাত্রা কিংবা অলৌকিক ঘটনার

চাক্ষুষ সাক্ষ্য দিচ্ছেন। বেলিনি 'প্রসেশন ইন দ্য পিয়াৎসা সান মার্কো' (১৪৯৬) এঁকেছিলেন স্কুওলা গ্রান্ডে ডি সান জিওভান্নি ইভানজেলিস্টার জন্য, আমরা এই স্কুওলার সদস্যদের সান মার্কোর বাইজেন্টাইন চার্চ, গথিক ও ইসলামী স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত ডোজের প্রাসাদের সামনেই চত্বরের চারপাশে শোভাযাত্রা করতে দেখি। তাদের ঘিরে শহরের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড চলমান: কালো বড় প্রান্তের টুপি পরিহিত চারজন গ্রিক বণিক চত্বরের বাম দিকে ব্যবসা নিয়ে কথা বলছেন, যখন ব্যাসিলিকার সামনে পাগড়ি পরিহিত তিন ব্যক্তি দাড়িয়ে আছেন।

কারাপাচ্চিওর 'মিরাকল অব রেলিক অব দ্য ট্রু ক্রস অন দ্য রিয়ালটো ব্রিজ' (১৪৯৪) একই স্কুওলার জন্য আঁকা হয়েছিল, এই শিরোনামের ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সর্ব বামে একটি দোতলা লজ্জিয়ায় (আচ্ছাদিত বারান্দা)। আমাদের চোখ, যদিও আকর্ষিত হয় গ্রান্ড ক্যানালে ঘটতে থাকা কর্মকাণ্ডের প্রতি, ভেনিসে যাতায়াত করার মূল পথ। আমরা আর্মেনিয়ার বণিক ও তুর্কীদের রিয়ালটো ব্রিজের উপর দরদস্তুর করতে দেখি - ভেনিসের বাণিজ্যিক কেন্দ্রে এবং শহরের ব্যস্ত খালের মধ্য দিয়ে একজন আফ্রিকার গন্ডোলাচালক একটি গন্ডোলা পরিচালনা করছেন । নানা ধরনের স্কুওলা, যারা

আখ্যানমূলক চিত্রকর্মগুলোকে শ্রেয়তর মনে করতেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংযোগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই শহরের বৈচিত্র্যময়তাকে তারা সাদরে গ্রহন করে নিয়েছিলেন। এই বাণিজ্যিক সংযোগ বিস্তৃত ছিল উত্তর ইউরোপ থেকে কনস্টান্টিনোপল এবং এশিয়া ও আফ্রিকা অবধি।

যদিও জেনটিলে বেলিনি তার জীবদ্দশায় প্রধান ভেনেশিয়ান শিল্পী হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তার ছোট ভাই জিওভানি (আনু. ১৪৩০-১৫১৬) আঁকা চিত্রকর্মগুলো আজ বিশেষভাবে মর্যাদাপূর্ণ। দুই ভাই তাদের পিতা জ্যাকোপো'র ফ্লোরেন্টাইন পার্সপেক্টিভ আর ভেনেশিয়ান রং নিয়ে প্রারম্ভিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে তাদের শিল্পকর্ম সৃষ্টি করছিলেন। তবে এর সাথে জিওভানি উজ্জ্বলতা যুক্ত করেছিলেন, জীবনের স্পন্দনে চিত্রকর্মগুলো যেন দীপ্তি ছড়াতে পারে, সেই কৌশলের প্রচেষ্টায় তিনি সরু তৈল রঙের প্রলেপ ব্যবহার করেছিলেন রং গড়ে তুলতে। আমরা প্রথম এই কৌশল ব্যবহৃত হতে দেখেছিলাম ইয়ান ভ্যান আইকের মতো উত্তরীয় রেনেসাঁর শিল্পীদের কাজে, কিন্তু পঞ্চদশ শতকের শেষ নাগাদ সেগুলো ক্রমবর্ধমান হারে ইটালিতে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল।

জিওভানি বেলিনি, কাঠের প্যানেলের ওপর তৈল রং নিয়ে কাজ করে ভেনেশিয়ান প্রতিকৃতি আর ধর্মীয় দৃশ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। ১৫০১ সালে তিনি নতুন দায়িত্ব নেয়া ডোজ (ভেনিসের নগরপিতা) লিওনার্ডো লোরেডানের প্রতিকৃতি

আঁকার দায়িত্ব পেয়েছিলেন, এবং তার সৃষ্ট এই প্রতিকৃতিতে আমরা লোরেডানকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদাপূর্ণ বিশেষ পরিচ্ছদ পরিহিত দেখি, পাথরের একটি প্যারাপেট বা নীচু দেয়ালের পেছনে প্রাণবন্ত নীল রঙের একটি পটভূমির সন্মুখে তিনি দাড়িয়ে আছেন। জিওভানি বেলিনি তার পরণের মূল্যবান সাদা আর সোনালী রেশমী দামাস্ক কাপড়ের উজ্জ্বলতা ধারণ করতে পেরেছিলেন, এটিকে ঠিক সঠিক পরিমাণে ভার দিয়েছিলেন যখন রোবের সামনে একটি বিশেষ বন্ধনীর চারপাশে এটি মোটা ভাজ সৃষ্টি করে মিলিত হয়েছিল। আলো এমনভাবে পড়েছে যেন এটি ডোজের ডান দিক থেকে প্রক্ষেপিত হচ্ছে, এবং যা তার ক্রমশ বাড়তে থাকা বয়সের ত্বক শোষণ করে নিয়েছে। ডোজের চেহারা বৈশিষ্ট্যগুলো গম্ভীর, যদিও তার দৃষ্টি দূরবর্তী কোনো কিছুর ওপর আটকে আছে, তার প্রশস্ত মুখ সংকল্পবদ্ধ। এটি একটি সময় ডোজের প্রাসাদে কাউন্সিল চেম্বারের দেয়ালে ঝোলানো হতো, জেনটিলে বেলিনির আঁকা কোনো আখ্যানমূলক ঐতিহাসিক চিত্রকর্মের ওপরে, যেখানে লোরেডান নেতাদের সেই দীর্ঘ ধারার সাথে যোগ দিতেন, যারা বহু শতাব্দী ধরে ভেনিসে স্বাধীনতা সুরক্ষা করেছিলেন এবং এর সম্পদ ব্যবস্থাপনা করেছিলেন।

যখন আমরা জেনটিলে বেলিনি আঁকা সুলতানের প্রতিকৃতির সাথে ডোজের প্রতিকৃতিটি তুলনা করে দেখবো, আমরা তার ভাই, জিওভানির অসাধারণ প্রতিভা আর দক্ষতাকে মূল্যায়ন করতে পারবো। সুলতান বাস্তবানুগ এবং তিনিও একটি প্যারাপেটের পেছনে বসে আছেন, একই কথা বলা যেতে পারে ডোজের ক্ষেত্রেও। কিন্তু ডোজকে দেখে মনে হয় যেন তিনি যে-কোনো মুহূর্তে নড়ে উঠবেন, এবং তার ইস্পাত-শীতল চোখ আমাদের দিকে ফেরাবেন। আমরা ভুলে যাই যে আমরা একটি চিত্রকর্মের দিকে তাকিয়ে আছি এবং অনুভব করি যেন আমরা এমন কোনো ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে আছি, যিনি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে একই কক্ষে অবস্থান করছেন।

জার্মান শিল্পী আলব্রেখট ডুরার (১৪৭১-১৫২৮) ভেনিসে এসেছিলেন এবং সেখানকার সবচেয়ে ‘সেরা শিল্পী’ হিসেবে জিওভানি বেলিনির প্রশংসা করেছিলেন। শহরটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিল্পীদের চুম্বকের মতোই আকর্ষণ করতো, এবং ডুরার দুই বার কিছু সময়ের জন্য ভেনিসে অবস্থান করেছিলেন। তিনি হাতে কলমে রেনেসার শিল্পকর্ম অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলেন, এবং একই সাথে তিনি বিত্তশালীদের পৃষ্ঠপোষকতাও অনুসন্ধান করেছিলেন। ভেনিসে তার দ্বিতীয় অবস্থানকালে তিনি তার পেশাগত জীবনের শুরুর দিককার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এঁকেছিলেন - ‘ম্যাডোনা অব দ্য রোজ গারল্যান্ডস’ (১৫০৬)। কর্তৃপক্ষের সাথে নানাবিধ সমস্যা, এবং ঈর্ষাকাতর প্রতিদ্বন্দ্বীদের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও এই চিত্রকর্মটি ভেনিসে তার সুনাম প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভেনিসের প্রশাসক অর্থাৎ ডোজ এবং ক্যাথলিক চার্চের প্রধান দুইজনই ডুরারের স্টুডিওতে এসেছিলেন চিত্রকর্মটি দেখতে এবং ডুরার পরে লিখেছিলেন, ভেনিসের প্রশাসক তাকে ভেনিসে থাকতে ও শহরের জন্য কাজ করতে অনুরোধ করেছিলেন (তিনি এই প্রস্তাবে রাজী হননি)। ‘ম্যাডোনা অব দ্য রোজ গারল্যান্ড’ স্থাপন করা হয়েছিল সান

বার্টোলোমেও চার্চে, যা যুক্ত ছিল 'ফনডাকো দেই টেডেস্কির' সাথে, যা ছিলে শহরের একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ও ভেনিসে বসবাসরত সব জার্মান বণিকদের বাসস্থান।

এর স্বচ্ছ নীল আর উজ্জ্বল হলুদ রংসহ 'ম্যাডোনা অব দ্য রোজ গারল্যান্ড' চিত্রকর্মটি স্পষ্টতই জিওভানি বেলিনির ভেনেশিয়ান রং ব্যবহার করার শৈলীর প্রতি ডুরারের একটি অনুরক্ত নিবেদন ছিল। উভয় শিল্পীই প্রকৃতিবাদ ও উত্তরীয় রেনেসাঁ পর্বে সৃষ্ট প্রারম্ভিক শিল্পকর্মগুলোয় দৃশ্যমান খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবার কৌশল থ েকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন। তবে জিওভানির প্রশান্ত দৃশ্যের ব্যতিক্রম ডুরারের এই চিত্রকর্ম ছিল কর্মচাঞ্চল্যে পূর্ণ। নতজানু শ্রদ্ধা প্রদর্শনরত উপস্থিত সবাইকে কুমারী ম া, খ্রিস্ট এবং দেবদূত গোলাপে মালা বিতরণ করছেন। এখানে উপস্থিত আছেন পোপ এবং হলি রোমান সম্রাট। কোনো না কোনো একভাবে - বাতাসে অবাস্তব মেঘের উপর ভেসে বেড়ানো দেবদূত এবং কুমারী মায়ে হাত সম্রাটের মাথা স্পর্শ করে থাকা সত্ত্বেও – ডুরার উন্মুক্ত একটি স্থানে আয়োজিত অসম্ভাব্য এই অনুষ্ঠানকে আপাতদৃষ্টিতে বাস্তবসম্মত করে তুলতে পেরেছিলেন। এখানে ব্যবহৃত রূপগুলোর কেন্দ্রীয় পিরামিড – সোনালী পরিচ্ছদে পোপ, লাল পোষাকে সম্রাট, এবং নীল পোষাকে কুমারী মা – সম্পূর্ণভাবেই স্বাভাবিক অনুভূত হয়। মূলত এর কারণ ছিল ডুরার তাদের হাঁটুর নীচে ঘাস , দৃশ্যটির সীমানা তৈরি কার গাঁটযুক্ত গাছগুলো এবং দূরবর্তী পর্বতমালা এতো

নিখুঁতভাবে এঁকেছিলেন যে আমরা সেখানে উপস্থিত আরো কৃত্রিম উপাদানগুলোকে উপেক্ষা করতে পারি।

ভেনিস ছিল বহু বিচিত্র জাতি ও সংস্কৃতির একটি মিলনস্থান, এবং শহরের বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষকরা কালজয়ী বহু শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। অধিকাংশ ভেনেশিয়ান শিল্পীরা কাজের জন্য অন্য কোনো শহর রাষ্ট্রে যাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কিন্তু ইটালির সর্বত্র পরিস্থিতি এমন ছিল না। ক্রমশ ইটালির সবচেয়ে উচ্চাকাংক্ষী শিল্পীরা রোমে স্থানান্তরিত হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পোপের জন্য কাজ করার প্রচেষ্টায়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা রেনেসাঁ পর্বের তিনজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে অনুসরণ করব, লোভনীয় কাজ পাবার প্রচেষ্টায় যারা সবাই ফ্লোরেন্স ত্যাগ করেছিলেন। এই শিল্পীরা আজ আমাদের কাছে এতো পরিচিত যে আমরা আজ শুধু তাদের প্রথম নামেই চিনি: মাইকেলেঞ্জেলো, লিওনার্ডো, রাফায়েল।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Portraits of Sultan Mehmet II by Gentile Bellini (left) and Sinan Beg, 1480
(২) Seated Scribe, 1479-81 by Gentile Bellini and Portrait of a Painter, Ottoman period, probably reign of Mehmet II, late 15th century
(৩) Procession in piazza San Marco by Gentile Bellini
(৪) Vittore Carpaccio's tempera painting Miracle of the Relic of the True Cross on the Rialto Bridge, 1494
(৫) The Portrait of Doge Leonardo Loredan (Italian: Ritratto del doge Leonardo Loredan) is a painting by Italian Renaissance master Giovanni Bellini, dating from c. 1501–02
(৬) Albrecht Dürer - Feast of Rose Garlands

অধ্যায় ১৪ - রোমের প্রত্যাবর্তন

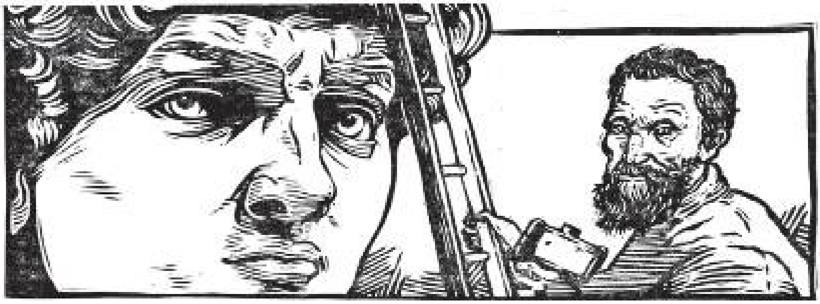

১৫০৪ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ মে, মধ্যরাত, ফ্লোরেন্সের মানবশূন্য নীরব রাস্তা দিয়ে বিশালাকারের একজন নগ্ন পুরুষ তার গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছিল। এই ব্যক্তিটি হচ্ছে 'ড েভিড' - সেই সময় অবধি মাইকেলেঞ্জেলোর সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী ভাস্কর্য। মার্বেল খোদাই করে এই ভাস্কর্যটি সৃষ্টি করতে তার দুই বছর সময় লেগেছিল, আর এই ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষক ফ্লোরেন্সের ক্যাথিড্রাল বোর্ড কোথায় এটিকে স্থাপন করলে ভালো হবে সেটি নির্ধারণ করতে প্রায় সমপরিমান সময় ব্যয় করেছিল। মাইকেলঞ্জেলো ক্যাথিড্রালের সম্মুখভাগে দেয়ালের জন্য একটি বিশাল ভাস্কর্য নির্মাণ করবেন বলে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, কিন্তু পরিশেষে বোর্ড এটিকে আরো উন্মুক্ত কোনো স্থানে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এখন এটিকে ফ্লোরেন্স সরকারে কার্যালয় পালাৎসো ডেলা সিনোরিয়ার সামনে স্থাপন করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

চার্চ মাইকেলেঞ্জেলোকে কাজটি করতে মার্বেল পাথরের যে দীর্ঘ আর সংকীর্ণ খণ্ডটি সরবরাহ করেছিল সেটি ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য আদর্শ ছিল না। এর আগে আরো দুই জন ভাস্কর কাজটি করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মার্বেল ব্লকটি ব্যবহারের উপযুক্ত নয় বলে ক্যাথিড্রাল প্রাঙ্গনে পরিত্যক্ত হয়ে ছিল। নতুন একটি ভাস্কর্য সৃষ্টি করতে মাইকেলেঞ্জেলোকে প্রতি মাসে ছয় স্বর্ণের ফ্লোরিন (বর্তমান হিসাবে ১০০০ পাউন্ড) পারিশ্রমিক, নির্মাণ উপাদান, যন্ত্রপাতি এবং কয়েকজন সহকারী দেয়া হয়েছিল। এখন দানবীয় 'ডেভিড' গ্রিক দেবতার মতো নগ্ন দাড়িয়ে আছে, তার কাধের উপর গুলতিটি শুধুমাত্র একটি চিহ্ন, যা বাইবেলের ডেভিড আর গোলাইয়াথের কাহিনীটিতে তার ভূমিকার কথা দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

মাইকেলেঞ্জেলো চেয়েছিলেন, রোমে যে প্রাচীন গ্রিক আর রোমান ভাস্কর্যগুলো তিনি দেখেছিলেন, 'ডেভিড' সেগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠুক, বিশেষ করে ক্যাস্টর আর পোলাক্সের সেই দানবীয় মূর্তিগুলোর সাথে এটি প্রতিযোগিতা করুক, যেগুলো তিনি সম্রাট কনস্টান্টিনের প্রাসাদের স্নানঘরে দেখেছিলেন। এলোমেলো কুঞ্চিত চুলসহ ডেভিডের মুখমণ্ডলটি ধ্রুপদী সৌন্দর্যমণ্ডিত। তার শরীর মেদহীন, মাংসল, তার হাতে শিরাগুলো স্পষ্ট, ভাস্করের হাতের মতোই যার শক্তি। ডেভিড খোদাই করা হয়েছিল বেশ নীচ থেকে এটিকে দেখার জন্য, আর সেই কারণে যতটা হওয়া উচিত তার চেয়ে এটির

হাত আর মাথা অপেক্ষাকৃত আকারে বড় ছিল। স্থানান্তরের এই পর্যায়ে ডেভিডের হাত আর শরীর ঘিরে আছে দড়ি, ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়েছিল একটি মঞ্চের উপর, যে মঞ্চটি এরপর ঠেলে মাইকেলেঞ্জেলোর ভাস্কর্যের কর্মশালা থেকে পালাৎসো দেলা সিনোরিয়ায় নিয়ে আসা হয়েছিল । চল্লিশ জন ব্যক্তি এই কাজটি করেছিলেন, দড়ির ধরে টেনে ধীরে ধীরে, ডেভিড তার গন্তব্য অভিমূখে যাত্রা শুরু করেছিল।

*

কৈশোরে মাইকেলেঞ্জেলো বুওনারোতি (১৪৭৫-১৫৬৪) ফ্লোরেন্সে লোরেঞ্জো ডে'মেডিচির প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর্যের নতুন স্কুলে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। লোরেঞ্জো শিল্পীদের তাদের পেশাগত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সহায়তা করেছিলেন, এবং পনেরো বছর বয়সে অস্থির চিত্তের মেজাজী মাইকেলেঞ্জেলো তার পরিবারের অংশে পরিণত হয়েছিলেন, এবং দুই বছর তিনি মেডিচি প্রাসাদে বাস করেছিলেন। মেডিচি প্রাসাদের কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গনে দাড়িয়ে থাকা ডোনাটেলোর ব্রোঞ্জের 'ডেভিড' ভাস্কর্যটি তিনি নিশ্চয়ই অধ্যয়ন করেছিলেন। তার 'ডেভিড' ছিল এর চেয়ে তিন গুণ বড়। উচ্চতায় এটি ছিল পাঁচ মিটার, একটি ডবল ডেকার বাসের চেয়েও যার উচ্চতা বেশি, রোমান সময়ের পরে নির্মিত হয়েছে এমন কোনো ভাস্কর্যের মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে বড়।

তরুণ মাইকেলেঞ্জেলো উচ্চাভিলাষী একজন শিল্পী ছিলেন, তিনি যেমন ভাস্কর্য নির্মাণ করতে জানতেন, তেমনি আঁকতেও পারদর্শী ছিলেন। যখন তিনি 'ডেভিড' নির্মাণ সমাপ্ত করেছিলেন, পালাৎসো ডেলা সিনোরিয়ার গ্রেট কাউন্সিল হলে তাকে দুইটি যুদ্ধ দৃশ্যের একটির দেয়াল চিত্র আঁকার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। লিওনার্ডো দা ভিন্চি (১৪৫২

-১৫১৯) যুদ্ধের অন্য দৃশ্যটি আঁকতে মিলান থেকে ফ্লোরেন্সে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু পরিশেষে দুটোর কোনোটাই শেষ করা হয়নি। মাইকেলেঞ্জেলো রোমে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, এবং লিওনার্ডো একজন ধনী রেশমী কাপড়ের ব্যবসায়ীর স্ত্রী লিসা ডেল জোকোন্ডোর প্রতিকৃতি আঁকতে শুরু করেছিলেন। আমরা সেই চিত্রকর্মটি আজ মোনা লিসা নামে চিনি।

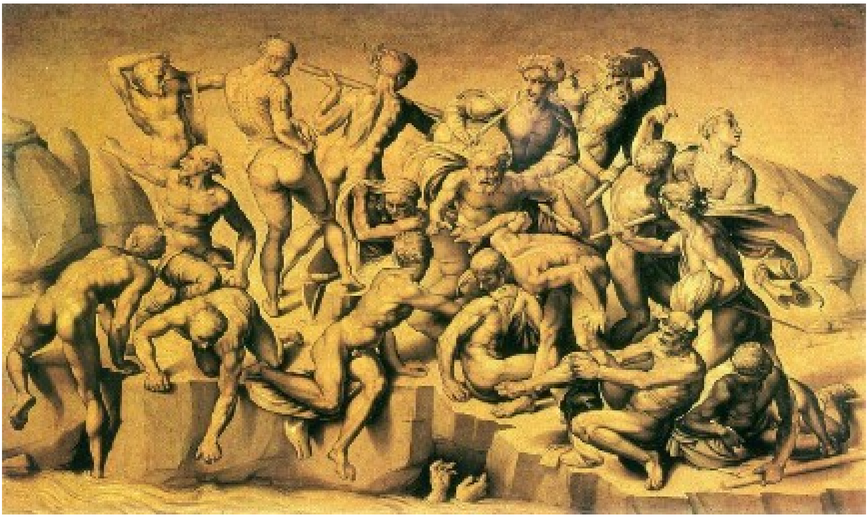

লিওনার্ডোর তৈল রঙের মিহি স্বচ্ছ প্রলেপ দেয়ার কৌশল , আর তার সূক্ষ্ম তুলির আঁচড় তাকে এমন একটি মাত্রা অবধি রঙ মিশ্রণের সুযোগ করে দিয়েছিল যে, কোথায় একটি রঙ শেষ হয়েছে আর অন্যটি কোথায় শুরু হয়েছে, সেটি নির্ধারণ করা অসম্ভব ছিল। এই

কৌশলটি ‘স্ফুমাটো’ নামে পরিচিতি পেয়েছিল, যার অর্থ, ধোঁয়াটে অথবা অস্পষ্ট। মোনা লিসা চিত্রকর্মে ব্যবসায়ীর স্ত্রী লিসা বসে আছেন, হাত দুটি একত্রে একটির ওপর একটি রাখা, স্বর্ণের সুতায় সূচীকর্ম করা একটি পোষাকে, স্বচ্ছ একটি পর্দার নীচে তার চুল খোলা। তার শরীর খানিকটা অন্যদিকে বেঁকে আছে, কিন্তু তার মাথাটি সামনে দিকে ঘোরানো, তার চোখগুলো সরাসরি বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। হালকা প্রায় অস্পষ্ট একটি স্মিতহাসি তার ঠোঁটের উপর পলায়নপর, যেন খেলছে, এবং তার চোখ শান্তভাবে আমাদের দৃষ্টির সাথে মিলিত হয়। তার পেছনে আমরা কল্পিত একটি ভূদৃশ্য দেখি, যা দূরে ক্রমশ ম্লান হয়ে হারিয়ে গেছে, পুরো চিত্রকর্মটিকে যা স্বপ্নসুলভ একটি বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে।

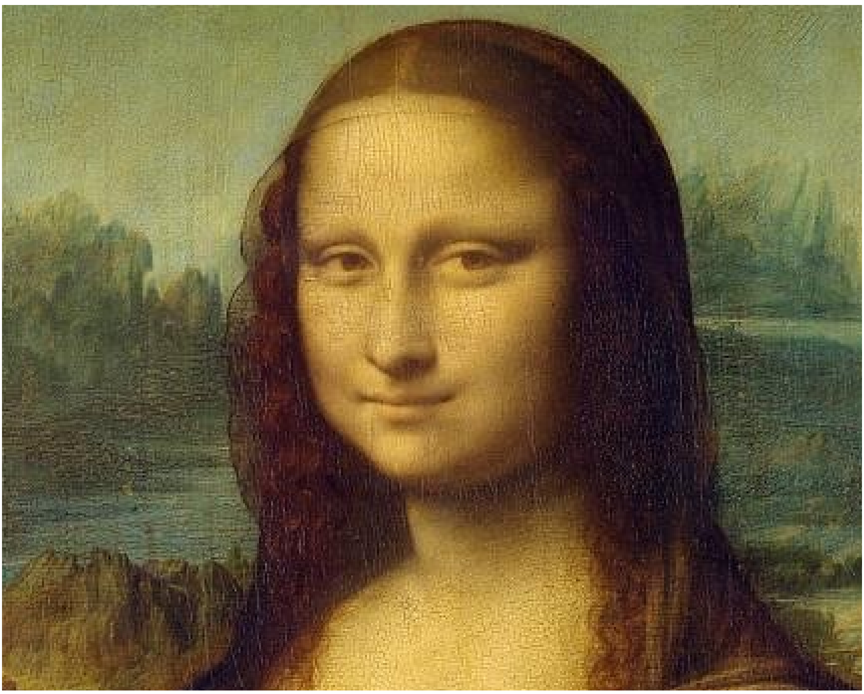

লিওনার্ডো এই চিত্রকর্মটি কখনো লিসা অথবা তার স্বামীকে দেননি, তার মৃত্যু অবধি এটি তিনি তার নিজের কাছে রেখেছিলেন। যদিও এটি বর্তমানে একটি ‘মাস্টারপিস’ হিসাবে স্বীকৃত, কিন্তু লিওনার্ডো সম্ভবত এটিকে অসমাপ্ত বলেই বিবেচনা করতেন। তুলনামূলকভাবে তিনি তার শুরু করা সামান্য কিছু চিত্রকর্ম সম্পূর্ণ করেছিলেন, এবং যারা তাকে আঁকার জন্য কমিশন বা কাজ দিতেন, তিনি তাদের প্রায়শই হতাশ করতেন। নিয়মতিভাবেই তিনি নানা ধরনের রং নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন, অবশ্য সবসময় সেটি সফল হতো না (গ্রেট কাউন্সিল হলে তার যুদ্ধের দৃশ্যটি এমনকি শেষ করার আগেই দেয়াল থেকে খসে পড়তে শুরু করেছিল)। তিনি মূলত প্রকৃতি আর পৃথিবী নিয়ে কৌতূহলী ছিলেন। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন যেন তিনি সেগুলো অধ্যয়ন করতে

পারেন, এবং ভ্রূণ থেকে বার্ধক্য ও বিকলঙ্গতা অবধি প্রতিটি পর্যায়ের নানা রেখাচিত্র তিনি এঁকেছিলেন। পাখিরা কীভাবে ওড়ে সেটি তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং সেই ধারনাটিকে আদি হেলিকপ্টারের পরিকল্পনায় তিনি অনূদিত করেছিলেন। তিনি যুদ্ধের নানা যন্ত্র বা অস্ত্র তৈরি করেছিলেন, পানি বন্টন ও শহর দূর্গকরণ নিয়ে কাজ করেছিলেন। তিনি বাম হাতে লিখতেন, এবং উলটো করেই তিনি তার ডায়েরিতে লিখেছিলেন, ডান থেকে বামে, এটি কারণ হয়তো লেখাগুলো কোথাও তিনি যেন কালি লেপটে না ফেলেন সেই বিষয়ে সতর্ক ছিলেন, অথবা তার কাজ অন্যদের দৃষ্টি থেকে যেন সুরক্ষিত রাখে সেটি নিশ্চিত করেছিলেন (এগুলো পড়তে আপনার একটি আয়না লাগবে)।

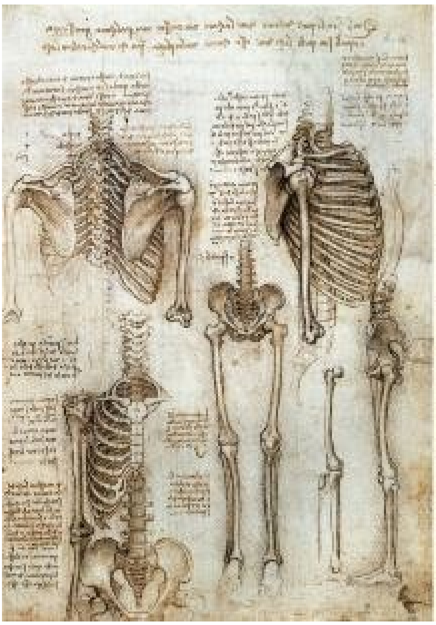

অবশ্য লিওনার্ডো বেশ কিছু নারীর অসাধারণ তৈলচিত্রের কাজ সমাপ্ত করেছিলেন, এবং ক্ষুদ্র তবে ইটালির সমৃদ্ধ শহর-রাষ্ট্র মানতুয়ার শাসক ফ্রানচেস্কো গনজাগার স্ত্রী ইজাবেলা ডে'এস্টের প্রতিকৃতি আঁকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইসাবেলা ও ফ্রানচেস্কো এর প্রায় পনেরো বছর আগে বিয়ে করেছিলেন, এবং সেই মুহূর্ত থেকে তিনি শিল্পকলার অপ্রশম্য একজন সংগ্রাহকে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি একটি 'স্টুডিওলো' সৃষ্টি করেছিলেন, একটি অলংকৃত স্টাডি রুম - যা সেই সময়ের সেরা শিল্পীদের আঁকা চিত্রকর্ম দিয়ে সজ্জিত ছিল, এবং এছাড়াও একটি 'গ্রোটা' অথবা সংগ্রহশালা তৈরি করেছিলেন, যেখানে তিনি প্রাচীন শিল্পকলা, বই এবং মেডেলের প্রদর্শনী করেছিলেন। সেই সময়ের কোনো নারীর জন্য যা অভূতপূর্ব ছিল। তিনি লিওনার্ডোকে তার একটি প্রতিকৃতি এঁকে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, এবং তিনি রাজী হয়েছিলেন কিন্তু সেই উদ্যোগে মাত্র দুটি চক রেখাচিত্র বাস্তবায়িত হয়েছিল। ইসাবেলা শিল্পকলার তথ্য রাখেন এমন ব্যক্তিদের সাথে ইটালিব্যাপী পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখেছিলেন। ফ্লোরেন্সের একজন সন্ন্যাসী-

যাজকের মাধ্যমে লিওনার্দোর কাজ অনুসরণ করেছিলেন, এছাড়া মাইকেলেঞ্জেলোর ভাস্কর্য ক্রয় করতে তিনি রোমে তার প্রতিনিধির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন।

পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের অধীনে, প্রাচীন সেই সময়ের পরে প্রথমবারের মতো রোম শিল্পকলার জন্য ইটালির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি শহরে পরিণত হয়েছিল। ১৫০৩ সালে জুলিয়াস ক্ষমতায় এসেছিলেন, এবং রোমকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শহরের রূপান্তরিত করে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন এটি অর্জন করার মূল মাধ্যম হচ্ছে শিল্পকলা। উচ্চাভিলাষী সব প্রকল্পের জন্য তিনি কমিশন দিয়েছিলেন, এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের তিনি নিয়োগ করেছিলেন, যাদের তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। তার পৃষ্ঠপোষকতা ফ্লোরেন্সে পঞ্চদশ শতাব্দীতে লোরেঞ্জো ডে'মেডিচি যেভাবে বহু শিল্পীদের সহায়তা করেছিলেন, সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়। লোরেঞ্জো ডে' মেডিচি মাইকেলেঞ্জলো এবং লিওনার্দোসহ বহু শিল্পীকে তাদের পেশাগত জীবনে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু ১৪৯২ সালে লোরেঞ্জো মারা গিয়েছিলেন। বড় ছেলে পিয়েরোর বাবার মতো নেতৃত্ব দেবার দক্ষতা ছিল না, মাত্র দুই বছরের মধ্যে মেডিচি পরিবারকে ফ্লোরেন্স থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। লোরেঞ্জো 'দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট'-এর সময় শেষ হয়েছিল। মেডিচিরা যখন নির্বাসনে, রোম তখন রেনেসাঁর নতুন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

মাইকেলেঞ্জেলো, লিওনার্ডো এবং আর প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ শিল্পী রাফায়েল (রাফায়েলো সান্টি ১৪৮৩-১৫২০) সবাই রোমে এসেছিলেন। মাইকেলেঞ্জেলো প্রথমে রোমে এসেছিলেন, যখন পোপ তাকে তার সমাধি স্মারক নির্মাণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, প্রাথমিক পরিকল্পনায় চল্লিশটিরও বেশি ভাস্কর্য দিয়ে তিন তলা উঁচু এই সমাধির সম্মুখভাগ আবৃত করে রাখার কথা ছিল। মাইকেলেঞ্জেলো যখন এই প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত, তখন রোমের একটি আঙ্গুর বাগানের মাটির নীচে প্রাচীন 'লাওকুন' ভাস্কর্যটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, পোপ তাকে সেটি দেখে আসতে প্রেরণ করেছিলেন। যে সময়ে 'লাওকুন' নির্মাণ করা হয়েছিল তখন প্লিনি দ্য এল্ডার বলেছিলেন, লাওকুন হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর্য, কিন্তু ধারণা করা হয়েছিল এটি হারিয়ে গিয়েছে। ক্যাথলিক চার্চের প্রধান কার্যালয় ভ্যাটিকানে তার ভাস্কর্য বাগানের জন্য পোপ দ্রুত সেটি সংগ্রহ করেছিলেন, যেখানে মাইকেলেঞ্জেলো তার অবসরে সেটি অধ্যয়ন করতে পেরেছিলেন।

পোপের সমাধি নিয়ে কাজ করার সময় মাইকেলেঞ্জেলোকে নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। পরিশেষে এটি শেষ করতে তার প্রায় চল্লিশ বছর সময় লেগেছিল, এবং পোপ জুলিয়াসের মৃত্যুর পর অবশ্য এটির কলেবর লক্ষণীয় মাত্রায় সীমিত করা হয়েছিল। এখানে যখন তিনি প্রথম কাজ শুরু করেছিলেন, অনেকেই ঈর্ষাকাতর হয়েছিলেন। তার প্রথম জীবনীকার আসকানিও কনডিভির তথ্য অনুযায়ী স্থপতি ডোনাটো ব্রামান্তে সমাধিসৌধে কাজে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে মাইকেলেঞ্জেলোকে নতুন কাজের দায়িত্ব দেবার জন্য পোপকে রাজী করিয়েছিলেন। ব্রামান্তে আশা করেছিলেন এটি বদমেজাজী মাইকেলেঞ্জেলোকে এতটাই হতাশ করবে যে, তিনি সব কাজ ফেলে চিরকালের মতো রোম ছেড়ে চলে যাবেন। তার নতুন দায়িত্বটি ছিল সিস্টিন চ্যাপেলের

পুরো ছাদটি দেয়ালচিত্র দিয়ে অলংকৃত করা। বতিচেল্লি, ঘিরল্যান্ডিও ও অন্য শিল্পীরা ত্রিশ বছর আগে চ্যাপেলের নীচের দেয়ালগুলোয় ফ্রেস্কো এঁকেছিলেন। এই মহাবিশ্বের প্রতিনিধি হিসেবে পুরো সিস্টিন চ্যাপেলের ছাদটি সেই সময় নীল রঙ এবং এর ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সোনালী রঙের নক্ষত্রে আবৃত ছিল। কিন্তু পোপ পুরো ছাদটিকে বাইবেলে বর্ণিত চরিত্রদের দিয়ে পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন।

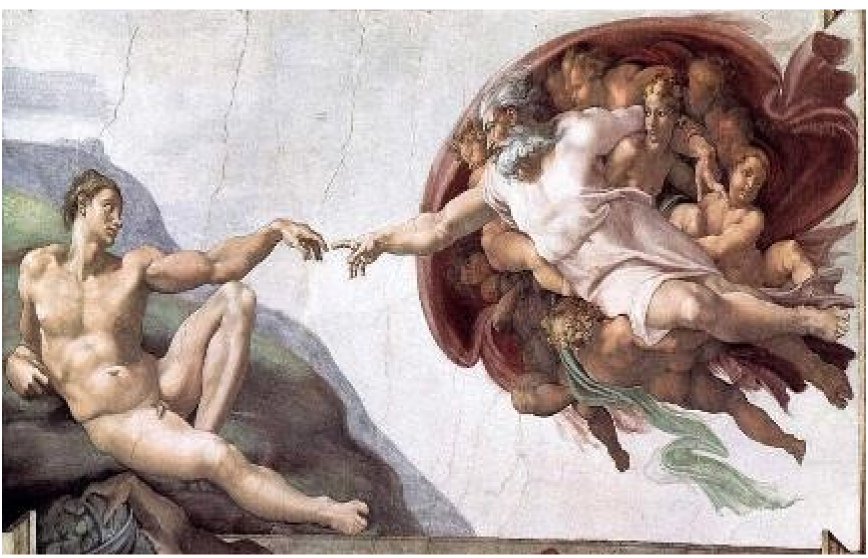

এই সময় নাগাদ যদিও মাইকেলেঞ্জেলো বেশ কিছু চিত্রকর্ম সমাপ্ত করেছিলেন, কিন্তু এই কমিশনে তিনি অবশ্যই খানিকটা দমে গিয়েছিলেন, এছাড়া তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কারণ সমাধির কাজ থামিয়ে এটি তাকে আগে শেষ করতে হবে। বিস্ময়কর নয় তিনি যত দ্রুত সম্ভব তত দ্রুত ছাদের কাজ শেষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মূল সমস্যাটি ছিল, ছাদটি দৈর্ঘ্যে প্রায় চল্লিশ মিটার, এবং ১৩ মিটারের খানিকটা বেশি প্রশস্ত ছিল, এবং এর সর্বোচ্চ বিন্দুটি মাটি থেকে ২০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত ছিল। মাইকেলেঞ্জেলোর প্রথম দায়িত্ব ছিল সমাধান করা কীভাবে তিনি ছাদের কাছাকাছি পৌছাতে পারেন। ফ্রেস্কো কৌশল ব্যবহার করে তিনি সরাসরি নতুন প্লাস্টারের ওপর এঁকেছিলেন, প্রতিদিন সকালে যার প্রলেপ দিতে হতো। তার ফিগারগুলোর মাত্রা এবং প্রতি অংশ যেন পারস্পরিক সংগতিপূর্ণ থাকে, সেই জন্য তিনি পূর্ণ আকারের রেখাচিত্র বা কার্টুন নিয়ে কাজ করেছিলেন। এই বড় কাগজ মূল রেখাচিত্রের বহিঃরেখাটি নিয়মিত বিরতিকে পিন দিয়ে ছিদ্র করা হয়েছিল, এরপর কার্টুনটিকে সেই দিনের ভেজা প্লাস্টারের উপর রাখা হতো এবং চারকোলের মিহি গুড়ো এর উপর ছড়িয়ে দেয়া হতো, যা কাল বিন্দু রেখা দিয়ে দেয়ালের উপর রেখাচিত্রটির একটি বহিঃরেখা সৃষ্টি করতো।

১৫০৮ সালে কাজ শুরু করে সিস্টিন চ্যাপেলের পূরো ছাদের ফ্রেস্কো শেষ করতে মাইকেলেঞ্জেলোর মোট চার বছর সময় লেগেছিল। নয়টি প্যানেলের চিত্রের ভিত্তি ছিল বাইবেলের প্রথম বই, জেনেসিস। যা পুরো ছাদ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। ঈশ্বর পৃথিবীকে আলোকিত করছেন, অ্যাডাম ও ইভকে তার বিস্তৃত করে রাখা হাতের মাধ্যমে জীবন দান করছেন। পরবর্তীতর এই যুগলকে ইডেন বা স্বর্গোদ্যান থেকে বহিস্কৃত করা হচ্ছে এবং মানবতাকে ঈশ্বর শাস্তি দিচ্ছেন বিশ্বব্যাপী একটি মহাপ্লাবন সৃষ্টি করে। মাইকেলেঞ্জেলো ফিগারগুলো এঁকেছিলেন যেন সেগুলো ‘লাওকুনের’ মতো ভাস্কর্যসদৃশ রূপ নেয়, তাদের ওজন আর ঘনত্ব দিয়েছিলেন, খুব সতর্কভাবে ‘ফোরশর্টেনিং’ (বা দর্শনানুপাত ব্যবহার করে ফিগারগুলো এমনভাবে আঁকা, যেন সেগুলো দেখে মনে হয় ক্রমান্বয়ে দূরে অপস্রিয়মান) নিয়ে কাজ করেছিলেন, যখন নীচে দেখা হবে এগুলো দেখলে মনে হবে যেন তারা বাঁকা ছাদে বসে ও শুয়ে আছেন। ছাদ থেকে পাশের দেয়ালে সম্প্রসারিত হয়েছে বিশালাকার সিবিল আর প্রোফেট বা নবীরা।

যারা সবাই চিত্রিত স্থাপত্য কাঠামোর ওপর বসে আছেন, যা চোখকে ধোকা দেয়, মনে হয়ে যেন কার্নিশ, খিলান আর স্তম্ভ দিয়েই ছাদটি নির্মাণ করা হয়েছে। সিবিল নারীরা, যারা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, ভবিষ্যত বলতে পারেন, তারা এমনকি ঈশ্বর, আদম আর হাওয়ার চেয়েও আকারে বিশাল। এই ফিগারগুলো মানব শরীরের মাংসপেশী ও অস্থিকাঠামো সম্বন্ধে অবিশ্বাস্য মাত্রার একটি বোঝাপড়া ইঙ্গিত করে, যদিও কিছু ক্ষেত্রে, যেমন শক্তিশালী হাত আর প্রশস্ত কাধ আর পিঠসহ লিবিয়ান সিবিলকে দেখে পুরুষোচিত মনে হয়। মাইকেলেঞ্জলো নারী নয় বরং নগ্ন পুরুষ মডেল থেকে আঁকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং অবিবাহিত সমকামী পুরুষ হিসাবে নারীদের শরীরের রূপ নিয়ে তার জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। বিশটি সুদর্শন ‘ইগনুডি’ বা নগ্ন পুরুষ, যারা ছাদের কেন্দ্রীয় প্যানেলের ফ্রেম জুড়ে শুয়ে বা বসে আছেন, তাদের স্পষ্টতই নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল।

মাইকেলেঞ্জেলোর একটি উঁচু কাঠামো বা ভারার ওপরে শুয়ে কাজ করেছিলেন, ঘাড় বাঁকিয়ে, মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে তিনি এঁকেছিলেন। ১৫০৯ থেকে ১৫১১ খ্রিস্টাব্দ অবধি রাফায়েল আরো সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গণের অন্য প্রান্তে কাজ করেছিলেন । পঁচিশ বছর বয়সী তরুণ রাফায়েল পোপের ব্যক্তিগত বাসভবনে ফ্রেস্কো আঁকছিলেন। একটি কক্ষ, যা এখন ‘স্টানজা দেলা সেইনাটুরা’ (ট্রাইবুনাল রুম) নামে পরিচিত, সেটিকে পোপের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই ফ্রেস্কোগুলোর পরিকল্পনার মূল ভাবনা মানবতাবাদী জ্ঞানের চারটি শাখার প্রতিনিধিত্ব করেছিল: দর্শন , ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য ও ন্যায়বিচার। দর্শন অথবা ন্যায়বিচারের কোনো রূপক সৃষ্টি (জ্ঞানের এই ক্ষেত্রগুলোর জন্য প্রতীকী ফিগার) করার বদলে রাফায়েল প্রকৃত মানুষদের এঁকেছিলেন, সেই সব বইয়ের লেখকদের জীবন্ত করে তুলেছিলেন, যে বইগুলো ফ্রেস্কোগুলোর নীচের দেয়াল সজ্জিত করে ছিল।

রাফায়েল ঐতিহাসিক আর সমসাময়িক চিন্তাবিদদের মর্যাদাপূর্ণ করে তুলেছিলেন তাদের সেই পটভূমিতে চিত্রায়িত করে যা একই সাথে প্রাচীন গ্রিস আর সাম্প্রতিক রোমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দার্শনিক বিজ্ঞানী আর গণিতজ্ঞদের নিয়ে তার দেয়ালচিত্রটি এখন 'স্কুল অব এথেন্স' নামে পরিচিত। রাফায়েল একটি আর্চ বা খিলান এঁকেছিলেন, যার ভিতর দিয়ে আমরা দেখতে পাই প্রশস্ত একটি অভ্যন্তর, যার চারদিক সজ্জিত করে আছে বহু ভাস্কর্য। সব বয়সের দার্শনিক একত্রিত হয়েছেন কথোপকথনে। প্লেটো তার ছাত্র অ্যারিস্টোটলের সাথে কথা বলছেন কেন্দ্রে। প্লেটোকে দেখতে বাতাসে উড়ন্ত সাদা দাড়ি আর চুলসহ বয়স্ক ব্যক্তির মতো মনে হয়, এটি সম্ভবত লিওনার্ডোর একটি প্রতিকৃতি হতে পারে। যে মেজাজী একাকী ব্যক্তিটি তার কনুইয়ে মাথা ভর করে বসে আছেন পাথরের একটি খণ্ডের ওপর পূরোভূমিতে, সেটি রাফায়েলের সৃষ্টি করা মাইকেলেঞ্জেলোর প্রতিকৃতি (গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের ছদ্মবেশে)। রাফায়েল এমনকি তার নিজের একটি প্রতিকৃতি এখানে যুক্ত করেছিলেন, মাথায় কালো চ্যাপটা টুপি পরা একজন তরুণ , সর্বডানে যাকে টলেমির পেছনে আমরা এক ঝলক দেখতে পাই।

সিস্টিন চ্যাপেল, এবং পোপের কক্ষগুলোয় কাজ শেষ করা হলে মাইকেলেঞ্জেলো ফ্লোরেন্সে ফিরে এসেছিলেন, যখন মেডিচি পরিবার আবার শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহন করেছিল। পোপের সভায় তার পদ নিয়ে খুশি, এবং পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস ও পরবর্তী পোপ দশম লিওর জন্য নতুন কাজের দায়িত্ব পালন করতে রাফায়েলে রোমেই থেকে গিয়েছিলেন। এই নতুন পোপ, পোপ দশম লিও ছিলেন লোরেঞ্জো ডে'মেডিচি'র

ছেলে। তিনিও সিস্টিন চ্যাপেলের ওপর তার নিজস্ব কিছু চিহ্ন রেখে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কীভাবে আপনি মাইকেলেঞ্জেলোর আঁকা ছাদের সাথে প্রতিযোগিতা করবেন? তার সমাধান ছিল রাফায়েলকে এর নীচে এক গুচ্ছ ট্যাপেস্ট্রি (রঙিন সুতা দ্বারা অলংকৃত বস্ত্রখণ্ড) তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া। সেই ট্যাপেস্ট্রিগুলো খ্রিস্টীয় চার্চে দুই প্রতিষ্ঠাতা পিতা - সেইন্ট পিটার আর সেইন্ট পলের জীবন চিত্রিত করবে।

ছাদের জন্য মাইকেলেঞ্জেলোকে যে পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছিল এগুলো তৈরি করতে তার চেয়ে আরো দশগুণ বেশি পরিমান অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল। মূল্য ছাড়াও, এই সব ট্যাপেস্ট্রির একাধিক সেট একই চিত্রিত কার্টুন অনুসরণ করে ব্রাসেলস থেকে বুনন করে নিয়ে আসা হয়েছিল। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী ওয়েস্টমিনিস্টারে তার প্রাসাদের জন্য এক সেট নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি এগুলো সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন পোপের নিয়ন্ত্রণ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে ইংল্যান্ডকে মুক্ত করা ও ইংল্যান্ডের বিকল্প চার্চ প্রতিষ্ঠা করার অল্প কয়েক বছর পরে।

অষ্টম হেনরির রাজসভা ভ্রমণ করতে আমাদের অধ্যায় ১৬ অবধি অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু পরের অধ্যায়ে আমরা দেখবো কীভাবে ধর্মীয় অস্থিরতা ইতোমধ্যেই আল্পসের উত্তরে দানা বাধতে শুরু করেছিল। এটি শিল্পীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, যখন প্রোটেস্টান্টবাদ ক্রমশ এর শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করেছিল, এবং ধর্ম সংস্কারক মার্টিন লুথার বিত্তশালী ক্যাথলিক চার্চকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) David - a masterpiece of Renaissance sculpture, created in marble between 1501 and 1504 by the Italian artist Michelangelo (Detail)
(২) Copy of the Battle of Cascina by Michelangelo's pupil Aristotele da Sangallo
(৩) Peter Paul Rubens's copy of The Battle of Anghiari by Leonardo da Vinci
(৪) Mona Lisa by Leonardo da Vinci (believed to have been painted between 1503 and 1506).
(৫) Anatomical drawings by Leonardo da Vinci
(৬) Isabella d'Este, unfinished portrait by Leonardo da Vinci
(৭) Michelangelo's Moses (Rome)
(৮) Creation of the Sun, Moon, and Plants, by Michelangelo, Sistine Chapel's ceiling, painted c. 1508–1512
(৯) The Creation of Adam by Michelangelo, Sistine Chapel's ceiling, painted c. 1508–1512
(১০) The Fall and Expulsion from Paradise by Michelangelo, Sistine Chapel's ceiling, painted c. 1508–1512
(১১) The Flood by Michelangelo, Sistine Chapel's ceiling, painted c. 1508–1512
(১২) Sistine Chapel's ceiling, by Michelangelo, , painted c. 1508–1512
(১৩) Lybian sibyl, by Michelangelo, Sistine Chapel's ceiling, painted c. 1508–1512
(১৪) The Room of the Segnatura contains Raphael's most famous frescoes.
(১৫)Detail from The School of Athens by Raphael. It was painted between 1509 and 1511
(১৬) Raphael, St Paul Preaching in Athens (1515)

অধ্যায় ১৫ - আগুন আর গন্ধক

১৫১৫ সাল, নেদারল্যান্ডসে সের্টোগেনবশ নামে ছোটো একটি শহরে হিয়েরোনিমাস বশ হাত থেকে তুলি নামিয়ে রেখে, তার সামনে এই মাত্র শেষ করা চিত্রকর্মটি গভীর মনোযোগসহ পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলেন। হয়তো চিত্রকর্মগুলো বলাই উচিত হবে, কারণ তিনটি ওক কাঠের প্যানেল বা পাত একই সাথে যুক্ত করা হবে একটি ফ্রেমে, একটি 'ট্রিপটিক', বাম আর ডান দিকে প্যানেল দুটি কেন্দ্রীয় প্যানেলের ওপর ভাজ হয়ে বন্ধ হবে। এর বাইরের দিকে তিনি দরিদ্র এক ব্যক্তিকে এঁকেছিলেন, তাকে ঘিরে থাকা সব বিপদ আর প্রলোভন সত্ত্বেও যিনি দৃঢ়তার সাথে তার পথ অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছেন। ভিতরে প্যানেলে চিত্রিত চরিত্রগুলো এতটা প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়নি। লোভীর মতো একটি খড় পূর্ণ ঠেলাগাড়ি থেকে তারা মুঠোভর্তি করে খড় আঁকড়ে ধরছে, তারা খ্রিস্ট সম্বন্ধে অজ্ঞ, যিনি তাদের মাথার ওপরেই মেঘের মধ্যে ভাসমান এবং তাদের বিচার করছেন। শয়তান সেই হেওয়াইন বা ঘোড়ায় টানা খড়বাহী গাড়িটি নরকে দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কেউই তা লক্ষ করছে না। এমনকি পোপও নয়, যিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে এটিকে অনুসরণ করছেন, লোভে অন্ধ হয়ে। বাম দিকের প্যানেলে তাদের পাপের সূচনা হয়েছিল, স্বর্গোদ্যানের বাগানে ইভের সেই জ্ঞান বৃক্ষের ফল সংগ্রহ করার দৃশ্য । ডান দিকে নরকের অগ্নিকুণ্ড দেখতে পাই আমরা, ধারালো সুচালো প্রান্তের কাঠের খুঁটিতে এফোড়-ওফোড় ক্ষতবিক্ষত মানুষের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে পেট থেকে, যা কুকুরের খাদ্যে পরিণত হয়েছে।

সাধারণত কবজা দিয়ে যুক্ত এই ধরনের প্যানেলগুলো চার্চের জন্য আঁকা হতো , যেখানে খ্রিস্টের জীবন থেকে নেয়া নানা কাহিনী চিত্রিত হতো। যদিও ''দ্য হেওয়াইন ট্রিপটিক' ধর্মীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য তৈরি করা হয়নি, কারণ কোনো চার্চ এমন কোনো কিছু তাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন করার অনুমতি দিতে পারে কিনা সেই বিষয়ে শিল্পী বশ নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। এটি মূলত মানুষের লালসাপূর্ণ নির্বুদ্ধিতা নিয়ে একটি প্রহসন। তার দৃষ্টিতে স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতা হচ্ছে নরক অভিমূখে একমুখী যাত্রার একটি নিশ্চিত টিকিট। বশ ইতোপূর্বে তার করা অন্য একটি ট্রিপটিকের কথা স্মরণ করেছিলেন, যেখানে পাপের ধারণাটিকে তার মূল ভাবনা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। '

দ্য গার্ডেন অব আর্থলি ডিলাইটস’ নামক তার সেই চিত্রকর্মেও আদম ও হাওয়াকে আমরা বাম প্যানেলের মূল বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখি। ইডেনে উর্বর ভূমি বিস্তৃত হয়েছে কেন্দ্রীয় প্যানেলে, এবং এই মিথ্যা স্বর্গে নারী ও পুরুষ সূর্যালোকে ফুর্তি করছে, ইচ্ছামত জুটি বাধছে আর পাকা স্ট্রবেরি খেতে মগ্ন হয়ে আছে।

তিনি এটিকে একটি স্বপ্নদৃশ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন, তাদের সাদা কালো নগ্ন শরীর, বিশালাকার পাখী আর বিবর্ধিত স্ট্রবেরির কারণে অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি একটি রূপে আবির্ভূত হয়েছে। পুরো চিত্রকর্মটি অতিরিক্ত পাকা একটি ফলের মতো, সুমিষ্ট কিন্তু সেটি ঝাঁঝরা করে রেখেছে পচন আর ক্ষয়। ডান দিকের প্যানেলে এসে স্বপ্নটি দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। হার্প আর ল্যুট বাদ্যযন্ত্রগুলো এখানে ক্রুশে পরিণত হয়েছে, একটি পাখি মানব সেই শরীরগুলোকে আস্ত গিলে খাচ্ছে। বশ পাখি ও প্রাণীদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, এছাড়াও ‘ইলুমিনেটেড’ পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য শিল্পীদের ছাপচিত্রে চিত্রিত কিম্ভুতকিমাকার পশুদেরও অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি মনে করেন, তার আঁকা সবচেয়ে সেরা প্রাণীগুলো তার নিজের কল্পনা থেকেই এসেছে, এবং মানবতার কত ভয়ানক পতন হতে পারে সেটি প্রদর্শন করতে তিনি সেগুলো তার কাজে স্থাপন করেছিলেন।

*

নেদারল্যান্ডসে জার্মান অভিবাসী পিতামাতার পুত্র বশ হিয়েরোনিমাস ভান আকেন (আনু . ১৪৫০-১৫১৬) নামে জন্মগ্রহন করেছিলেন। তার জন্মশহর সের্টোগেনবশের কারণেই তিনি ‘বশ’ নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন (এভাবে বহু শিল্পীই তাদের জন্ম নাম হারিয়েছিলেন)। বশের বংশঐতিহ্য হয়তো তাকে মার্টিন শোনগাউয়েরের (সক্রিয় কাল ১৪৭১-১৪৯১) মতো প্রতিষ্ঠিত জার্মান শিল্পীদের ছাপচিত্র অধ্যয়ন করতে অনুপ্রাণিত

করেছিল। ‘গার্ডেন অব আর্থলি ডিলাইটস’ চিত্রকর্মটির পুরোভূমিতে যে অতিঅলংকৃত বৃক্ষটি দেখা যায়, এর তাল গাছের মতো পাতাগুলো আকাশের দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে, সেটি শোনগাউয়েরের একটি এনগ্রেভিং প্রিন্টের সাথে সাদৃশ্য বহন করছে। এছাড়াও তিনি হয়তো গিলোম ডে লোরির জনপ্রিয় কবিতা ‘রোমাঁ দ্য লা রোজ’ কবিতাটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কবিতাটির পটভূমি ছিল গানের পাখি আর প্রবাহমান ঝর্ণা পূর্ণ বাগানের মধ্যে একটি স্বপ্ন । তবে বশ এই স্বপ্নের সাথে তার নরকের অনন্ত শাস্তির ধারণাটি যুক্ত করেছেন, যার ওপর ভিত্তি করে তিনি সৃষ্টি করেছেন বাইবেলে বর্ণিত শেষ বিচার বিষয়ক কঠোর সংস্করণটি।

যখন ১৫১৬ সালে বশ মারা গিয়েছিলেন, তখন রাফায়েল পোপ দশম লিওর জন্য ব্যয়বহুল ট্যাপেস্ট্রির উপর বিস্তারিত কার্টুনগুলো শেষ করছিলেন। একই সময়ে মাথিয়াস গোথার্ড, এখন যিনি মাথিয়াস গ্রুনভাল্ড (১৪৭০-১৫২৮) নামে পরিচিত, আলব্রেখট ডুরারের সাথে জার্মানীর প্রথম সারির শিল্পীদের একজন ছিলেন (ডুরারের আমাদের পরিচয় হয়েছিল যখন ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি ভেনিসে গিয়েছিলেন)। গ্রুনভাল্ড ক্রুশবিদ্ধ হবার দৃশ্য আঁকতে বিশেষায়িত ছিলেন, এবং সেগুলো নিশ্চয়ই চমকে দেবার মতো ছিল, যেভাবে বশ আত্মাদূষণের ভয়ঙ্কর চিত্রগুলো এঁকেছিলেন, যখন সেগুলো প্রথম চার্চ এবং সন্ন্যাশ্রমগুলোয় স্থাপন করা হয়েছিল। গ্রুনভাল্ড তার সবচেয়ে পরিচিত যে ক্রুশ বিদ্ধ হবার দৃশ্যটি (১৫১২ থেকে ১৫১৬) সৃষ্টি করেছিলেন, সেটি ‘ইসেনহাইম’ অল্টারপিসের বন্ধ করার দুটি প্যানেল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। একটি সুবিশাল বহু প্যানেল বিশিষ্ট কাজ যা আলসাসে সেইন্ট অ্যান্থনি অব ইসেনহাইম সন্ন্যাশ্রমের হাসপাতাল চ্যাপেলের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এখানে তিনি পশ্চিমা শিল্পকলায় প্রদর্শিত হয়েছে এমন সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত খ্রিস্টের চিত্র এঁকেছিলেন। প্রমাণ আকারের চেয়েও বড় এই ফিগারটি বিষণ্ন অন্ধকার একটি ভূদৃশ্যের উপর অস্থায়ীভাবে নির্মিত একটি ক্রুশেরর উপর পেরেক বিদ্ধ অবস্থায় আঁকা হয়েছিল। তার আঙ্গুলগুলো যন্ত্রণায় বেঁকে আছে ঈশ্বরের দিকে। তার রুগ্ন শরীর, কোমরে একটি ছিন্ন কাপড় ছাড়া নগ্ন, যা শরীর আবৃত করে আছে ক্ষতে, গেথে আছে কাটা, তার চামড়া পুঁজযুক্ত ধুসর সবুজ হয়ে আছে যেন গ্রাংগ্রিন বা পচন ধরেছে। তার চোখ বন্ধ কিন্তু যন্ত্রণায় তার মুখ উন্মুক্ত হয়ে আছে, এবং তার মাথায় পরানো কাটার মুকুটের ক্ষতগুলো থেকে রক্তে ধারা তার গাল বেয়ে নীচে নামছে, এবং তার দাড়িতে জটের সৃষ্টি করেছে।

ক্রুশের নীচে তার মা মেরি জ্ঞান হারিয়েছেন, তার হাত প্রার্থনায় মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে আছে। সেইন্ট অ্যান্থনি ও সেইন্ট সেবাস্টিয়ান দুই পাশ থেকে তাকিয়ে আছে অসহায় সাক্ষী হিসেবে। ইসেনহাইমের এই হাসপাতালে সেই সব রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হতো যারা সেইন্ট অ্যান্থনীর ফায়ার দ্বারা আক্রান্ত হতেন। এটি ষোড়শ শতকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত একটি অসুখ ছিল। আক্রান্ত ব্যক্তি উন্মত্ত হয়ে উঠতো যখন গ্যাংগ্রিন তাদের হাত ও

পায়ে আক্রমণ করতো। গ্রুনভাল্ডের খ্রিস্ট যেন তার পঁচতে থাকা মাংস ও সব যন্ত্রণাসহ এই রোগীদের যন্ত্রণার প্রতিনিধিত্ব করছেন।

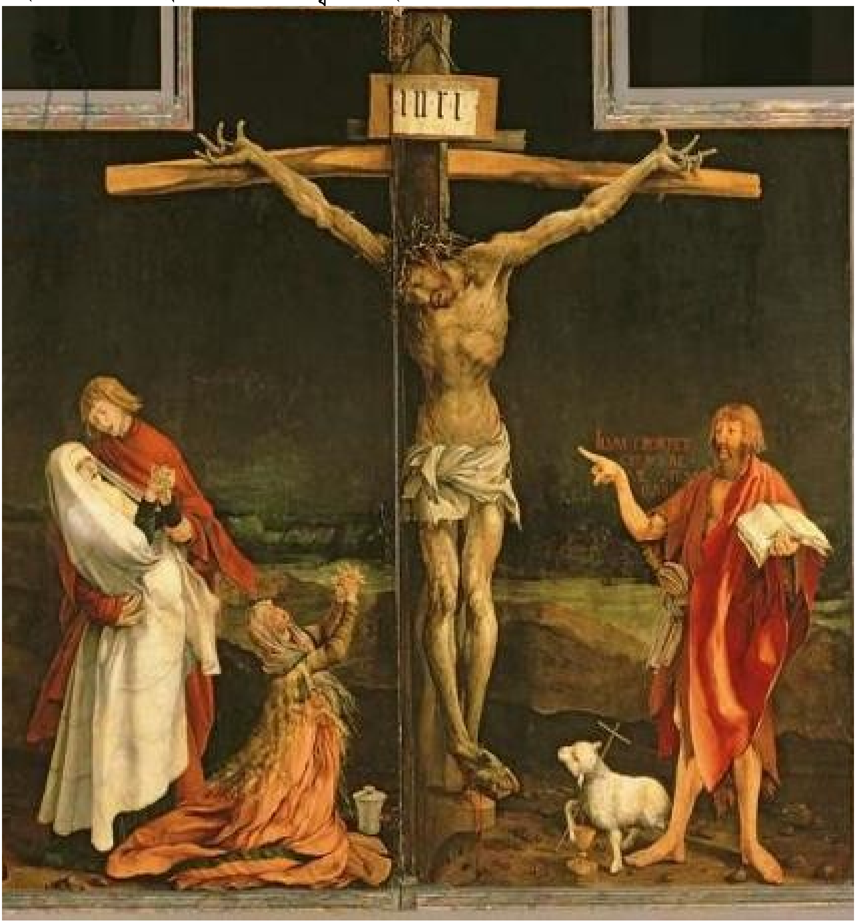

যখন ইসেনহাইম অল্টারপিসের সব প্যানেলগুলো উন্মুক্ত করা হতো, পুরো অল্টারপিসের মেজাজটা খানিকটা আনন্দময় হয়ে উঠতো। 'অ্যানানসিয়েশন' আর বামে 'নেটিভিটির' দৃশ্যকে ভারসাম্য ডান দিকের খ্রিস্টের পুনরুত্থানের দৃশ্যটির সাথে ভারসাম্য সৃষ্টি করেছিল। পনুরজ্জীবিত যিশুর পুনরায় সংশোধিত শরীর এখানে আবৃত করে আছে সোনালী আলোয়। ভিতরের দৃশ্যগুলো প্রদর্শন করা হতো বছরের বিশেষ দিনগুলোয়, এবং সেইন্ট অ্যান্থনির ফিস্ট দিবসে ভিতরের প্যানেলগুলো পেছন দিকে ভাজ করে আরো দুটি গ্রুনভাল্ডের চিত্রকর্ম উন্মোচন করা হতো, যা পালক আর শিংযুক্ত দৈত্যের হাতে সেইন্টের নির্যাতনের দৃশ্য প্রদর্শন করতো। এই ভিতরের দুটি চিত্রকর্ম দুই পাশে ঘিরে রেখেছিল একটি সোনালী আবরণে আবৃত সেইন্টের একটি ভাস্কর্য, যা সৃষ্টি করেছিলেন নিকলাউস অব হেগনাউ (আনু. ১৪৪৫/৬০-১৫৩৮)।

এই অল্টারপিসের কেন্দ্রে স্থাপিত নিকলাস অব হেগেনাউ-এর ভাস্কর্যে গ্রুনভাল্ডের চিত্রকর্মের সেই আবেগময় অভিব্যক্তি অনুপস্থিত। ভাস্করদের মাঝে মাঝে অল্টারপিসের অভ্যন্তরে লুকানো ফিগারিন বা ক্ষুদ্র ভাস্কর্য সৃষ্টি করার দায়িত্ব দেয়া হতো। সেই পর্বের সেরা জার্মান ভাস্কর ছিলেন ভেইট স্টস (১৪৪৭-১৫৩৩), যিনি কাঠকে জীবন্ত করেছিলেন সেই দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহারে, যা আমার একাদশ অধ্যায়ে ক্লাউস স্লুটারকে পাথরের ওপর প্রয়োগ করতে দেখেছিলাম। স্টস অল্টারপিসের অভ্যন্তরীণ ফিগারিন খোদাই করা ছাড়াও চার্চে প্রদর্শনের জন্য ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন। তিনি বিশালাকার লাইমউড গাছের কাঠ ব্যবহার করেছিলেন তার উচ্চাভিলাষী ভাস্কর্যগুলো নির্মাণ করতে, যেমন 'অ্যানানসিয়েশন অব দ্য রোজারি' (১৫১৭-১৫১৮), যা জার্মানীর নুরেমবার্গে সেইন্ট লরেঞ্জ চার্চে কোয়াইয়ারের (গির্জার ধর্মসংগীত গায়কদের জন্য নির্ধারিত এলাকা) ওপর ঝোলানো আছে। মাইকেলেঞ্জেলোর ডেভিডের চেয়েও উচ্চতর একটি উপবৃত্তাকার রোজারি বা গোলাপের মালা, দুটি বিশাল ফিগারকে পরিবেষ্টিত করে আছে - দেবদূত গ্যাব্রিয়েল ও কুমারি মেরি। স্টস তার ভাস্কর্যের ভিতর থেকে কাঠ সরিয়ে ফাঁপা করেছিলেন, যেন সেগুলোর ওজন (এবং ফেটে যাবার সম্ভাবনা) কমানো যায়। তিনি

কাঠের গভীরে খোদাই করে চুলের কুঞ্চন, কাপড়ের ভাজ সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তার ভাস্কর্যকে রক্ত মাংসের জীবন্ত রূপ দেবার প্রচেষ্টায় মুল্যবান রং ব্যবহার করেছিলেন ।

এই প্রজন্মের বহু উত্তর ইউরোপীয় শিল্পী সমকালীন রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তারা মার্টিন লুথারের একনিষ্ঠ অনুসারীতে পরিণত হয়েছিলেন - সেই ধর্মসংস্কারক সন্ন্যাসী, যিনি জার্মানির ভিটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন, এবং সাহসের সাথে লোভ আর দুর্নীতির জন্য ক্যাথলিক চার্চকে অভিযুক্ত করেছিলেন। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে লুথার তার অভিযোগ প্রকাশ করেছিলেন ভিটেনবার্গের একটি চার্চের দরজায় পেরেক দিয়ে সেই অভিযোগপত্রটি সেঁটে দিয়ে, আর এভাবেই প্রোটেস্টান্ট 'রিফরমেশন' শুরু হয়েছিল। গ্রুনভাল্ড, ডুরার এবং লুকাস ক্রানাচের (১৪৭২-১৫৫৩) মতো শিল্পীরা খুব দ্রুত তার এই আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ডুরার এবং ক্রানাচ দুজনেই লুথারের প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। ক্রানাচ লুথারের প্ররোচনাদায়ক পুস্তিকাগুলো সব অলংকৃত করেছিলেন। বশ এই কাজগুলো নিশ্চয়ই সমর্থন করতেন - কারণ লুথার বিশ্বাস করতেন, মানুষের পাপ করার একটি সহজাত প্রবণতা আছে, আর সেই প্রবণতা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে - ঈশ্বর এবং নিজেদের মধ্যে থাকা নৈতিক কম্পাসের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। পোপের নিকট থেকে অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে 'ক্ষমা' ক্রয় করতে পারা তারা উচিত নয়, কারণ পোপ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে এইসব 'ইনডালজেন্স' বিক্রয় করার পদ্ধতি প্রচলন করেছিলেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে পোপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, অর্থের বিনিময়ে আপনি আপনার (এবং চাইলে আপনার আত্মীয়রাও) পাপের ক্ষমা নিশ্চিত করতে পারবেন।

সেই সময়ে ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে ব্যবহৃত হতে থাকা নতুন প্রযুক্তি - প্রিন্টিং প্রেস বা মুদ্রণযন্ত্র লুথারের আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সহায়কে পরিণত হয়েছিল, কারণ এটি তার পুস্তিকাগুলোর দ্রুত প্রকাশনা ও প্রচারণার সুযোগ করে দিয়েছিল। তার ধারণাগুলো সমমনা ব্যক্তিদের ক্রমশ বাড়তে থাকা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে দ্রুত সম্প্রচারিত হয়েছিল। জার্মানীতে ১৪৫০ সালে ইয়োহানেস গুটেনবার্গ ‘মুভেবল’ বা পরিবর্তন করা যায় এমন টাইপ বা মুদ্রাক্ষরসহ মুদ্রণযন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, এবং এই প্রযুক্তিটি খুব দ্রুত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল (এই সময়ে আগে সব বই হাতে লিখে অনুলেখকরা অনুলিপি করতেন)। কাঠের ব্লক বা টুকরোর উপর রেখাচিত্র এঁকে এবং সেটি কেটে অক্ষরবিন্যাসক যন্ত্র ব্যবহার করে মুদ্রিত লেখার পাশে এটিকে চিত্র হিসেবে ছাপানো যেত, এবং ব্যয়সাশ্রয়ী উপায়ে ও দ্রুততার সাথে যে-কোনো বইয়ের বহু অনুলিপি মুদ্রণ করা সম্ভব হয়েছিল। ১৫২১ সালে লুথার ফিলিপ মেলাঙ্খথন এবং ক্রানাচের চিত্রের উডকাট বা কাঠ -খোদাই একত্রিত করেছিলেন তার ‘প্যাশনাল ক্রিস্টি উন্ড অ্যান্টিক্রিস্টি’ নামে একটি সংক্ষিপ্ত তুলনা ও পার্থক্য করার ধারাবাহিক তের জোড়া চিত্র ও পাঠ্যাংশে। যেখানে তুলনা করার জন্য ক্যাথলিক চার্চের সম্পত্তি আর বিলাসী আড়ম্বরতা, খ্রিস্টের সরল পূন্য জীবনের চিত্র পাশাপাশি রাখা হয়েছিল। রিফরমেশন ক্রমশ আরো গতিশীল হয়ে উঠলে ‘প্রোটেস্টান্ট’ মতাবলম্বীরা তাদের উপাসনার সাথে ছবির ব্যবহার করার আচারটিকে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করেছিলেন, সপ্তম অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখেছিলাম, এই কাজটি একটি সময় পূর্বের ‘অর্থোডক্স’ আইকোনোক্লাস্টরাও (ধর্মীয় আইকন বা চিত্র-বিরোধী) করেছিল, কিন্তু প্রারম্ভিকভাবে লুথার তার হাতে থাকা সেরা শিল্পীদের ব্যবহার করেছিলেন তার ধর্মীয় ভাবনাগুলোকে আরো দৃঢ়তর এবং সম্প্রচার করতে। ক্রানাচের প্রিন্টগুলো হচ্ছে উদাহরণ, কীভাবে এই নতুন ধর্মের উদ্দেশ্য পূরণে চিত্রকল্প ব্যবহার করা যেতে পারে, যেন সেটি শক্তিশালী একটি প্রচারণায় পরিণত হতে পারে।

ক্রানাচ খালি পায়ে যিশু খ্রিস্টকে এঁকেছিলেন, যিনি মুদ্রা-পরিবর্তকদের চাবুক দিয়ে আঘাত করে ঈশ্বরের মন্দির থেকে বের করে দিচ্ছেন, কিন্তু এর বিপরীত চিত্র প্রদর্শন করেছিল, পোপ একটি উঁচু মঞ্চে গদি দিয়ে আবৃত সিংহাসনে আসীন আর তিনি দেখছেন তার তহবিলে নিরন্তর মুদ্রা জমা হচ্ছে যখন তিনি একের পর এক ইনডালজেন্স বা পাপমুক্তির ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করছেন। আরেকটি দৃশ্যে খ্রিস্ট যখন বাইরে ধর্ম প্রচার করছেন, তখন অন্যদিকে পোপ জাঁকালো ভোজ উপভোগ করছেন। ক্রানাচের উডকাটে আমরা প্রায়শই পোপকে খানিকটা উচ্চতায় অবস্থান করতে দেখি, যার চারপাশে তার ফাই ফরমায়েশ খাটা অলংকৃত পোষাক পরিহিত কার্ডিনালরা, যেন তিনি সাধারণ মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অবস্থানে আসীন। পোপকে চিত্রায়িত করা হয়েছে তার কার্যালয়ের সব সুবিধাসহ, নাটকীয় বিবিধ আচার অনুষ্ঠানে যিনি অংশ নিচ্ছেন। এর ব্যতিক্রম যিশু খ্রিস্ট মুক্ত ও স্বাধীনভাবেই তিনি তার অনুসারীদের মধ্যে বিচরণ করছেন, তাদের গল্প বলছেন, অথবা অসুস্থকে নিরাময় করছেন। এই উডকাটগুলো যখন ক্রানাচ তৈরি করছিলেন, তখন পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের সমাধি-সৌধের আকৃতি - যেখানে তখনো মাইকেলেঞ্জেলো কাজ করছিলেন - আপনাকে হয়তো অতিরঞ্জন, বিলাসিতা আর আড়ম্বরের প্রতি ক্যাথলিক চার্চের ভালোবাসা সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা দিতে পারে।

ক্রানাচের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিল্পী ডুরারও উডকাট তৈরি করেছিলেন। তার "অ্যাপোক্যালিপস" ধারাবাহিকটির জন্য তিনি এই কৌশল ব্যবহার করেছিলেন, এবং তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে অভিব্যক্তিপূর্ণ কিছু কাঠ-খোদাই-চিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। পরিশেষে যদিও, মাধ্যম হিসেবে 'উডকাট' সুক্ষ্মতা আর টোনের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা প্রদর্শন

করেছিল, এবং ডুরার ক্রমশ ‘এনগ্রেভিং’ করার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। একটি রেখাচিত্রের বহিঃরেখাগুলো অনুসরণ করে বুরিন নামক একটি যন্ত্র ব্যবহার করে তিনি কোনো চিত্রকে একটি তামার পাতের উপর খোদাই করতেন, যাকে বলা হয় - প্লেট। এরপর এই খোদাইয়ের খাজে ঘষে রং মাখিয়ে দেয়া হতো, এবং খানিকটা সিক্ত একটি কাগজ এর উপরে রাখা হতো। এরপর প্লেট ও কাগজ দুটোই একটি প্রিন্টিং প্রেসের রোলারের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত করা হতো, যা একত্রে দুটোকে সামনের দিকে ঠেলে বের করে দিত, পরিণতিতে খাজের মধ্যে থাকা কালি কাগজে স্থানান্তরিত হতো। যখন প্লেট থেকে কাগজটি সরিয়ে আনা হতো, তামার প্লেটের ওপর খোদাই করা রেখাচিত্রের এ কটি বিপরীত চিত্র কাগজের ওপর রয়ে যেত। এই প্রক্রিয়াটি বহু শতবার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে, যতক্ষণ না প্লেটের উপর দাগগুলো অস্পষ্ট না হয়ে যায়, তখন সেই প্লেটটি ফ েলে দেয়া হতো, অথবা সেই দাগগুলোয় আবার নুতন করে খোদাই করতে হতো।

ডুরার নুরেমবার্গে বাস করতেন, এবং তিনি ষোড়শ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রতিভাবান ছাপচিত্রশিল্পী ছিলেন। যদিও তিনি তার ছাপচিত্রগুলো জনসংযোগের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেননি (লুথার আর ক্রানাচের ব্যতিক্রম) কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন গুণগত মান মূল্যায়ন করতে সক্ষম এমন একটি শিল্পকলার বাজারে তার কাজগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ুক। চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্যের ব্যতিক্রম, যেগুলো সাধারণত কমিশনের ভিত্তিতে তৈরি করা হতো, ছাপচিত্রশিল্পীরা সেই ধরনের ছাপচিত্র সৃষ্টি করতেন, যেগুলো জনপ্রিয় হবে বলে তারা আশা করতেন। তারা দেশের মধ্যে এবং বাইরে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করতেন বিভিন্ন শহরের মেলায় এককভাবে কিংবা ধারাবাহিক হিসেবে ছাপচিত্রগুলো বিক্রি করতেন। প্রকৃতির প্রতি ডুরারের ভালোবাসা তার ছাপচিত্রের কাজগুলোকে তথ্যপুষ্ট করেছিল, প্রায়শই যে কাজগুলোয় আমরা সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রাণী আর পাখিদের উপস্থিতি দেখি। ১৫১৩ সালে একটি বিশাল ছাপচিত্র ‘নাইট, ডেথ অ্যান্ড ডেভিল’ তাকে দারুণ সফলতা দিয়েছিল। ইরাসমাস অব রটারডেমের একটি মানবতাবাদী লেখার উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি করা এই কাজটি অশ্বারোহী একটি খ্রিস্টীয় সৈন্যকে প্রদর্শন করেছিল, তার পথে অব্যাহত থাকতে যিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, এমনকি যখন শয়তান নিজেই তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টায় ব্যর্থ। অবিশ্বাস্য ম াত্রার সূক্ষ্মতা আর বিস্তারিত বিষয়গুলো এই ছাপচিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে - আমরা ঘোড়ার চামড়ায় উজ্জ্বলতা আর নাইটের বর্মে আলোর দ্যুতি লক্ষ করতে পারি। ডুরার তার ছাপচিত্রে একটি চিত্রকর্মের সম্পূর্ণ গঠনবিন্যাস আর সূক্ষ্মতা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন সেখানে এক বিন্দু রং ব্যবহার না করে। ডুরারের স্ত্রী অ্যাগনেস এবং পরিচারিকা সুসানা বহু জার্মান শহরের মেলায় এই ধরনের ছাপচিত্রগুলো বিক্রয় করেছিলেন, এবং যখন তারা ১৫২০-১৫২১ খ্রিস্টাব্দে নেদারল্যান্ডসে ভ্রমণ করেছিলেন, বহু ছাপচিত্রের মধ্যে এটি ছিল একটি, যা তারা তাদের সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। পৃষ্ঠোপষকদের কাছে ডুরার এর বহু অনুলিপি বিক্রয় করেছিলেন, এছাড়া অন্য শিল্পীদের কাজের সাথে বিনিময়, কিংবা মূল্যবান উপাদান, যেমন আলট্রামেরিন রং সংগ্রহ করতে গিয়ে তার ছাপচিত্র লেনদেন করেছিলেন।

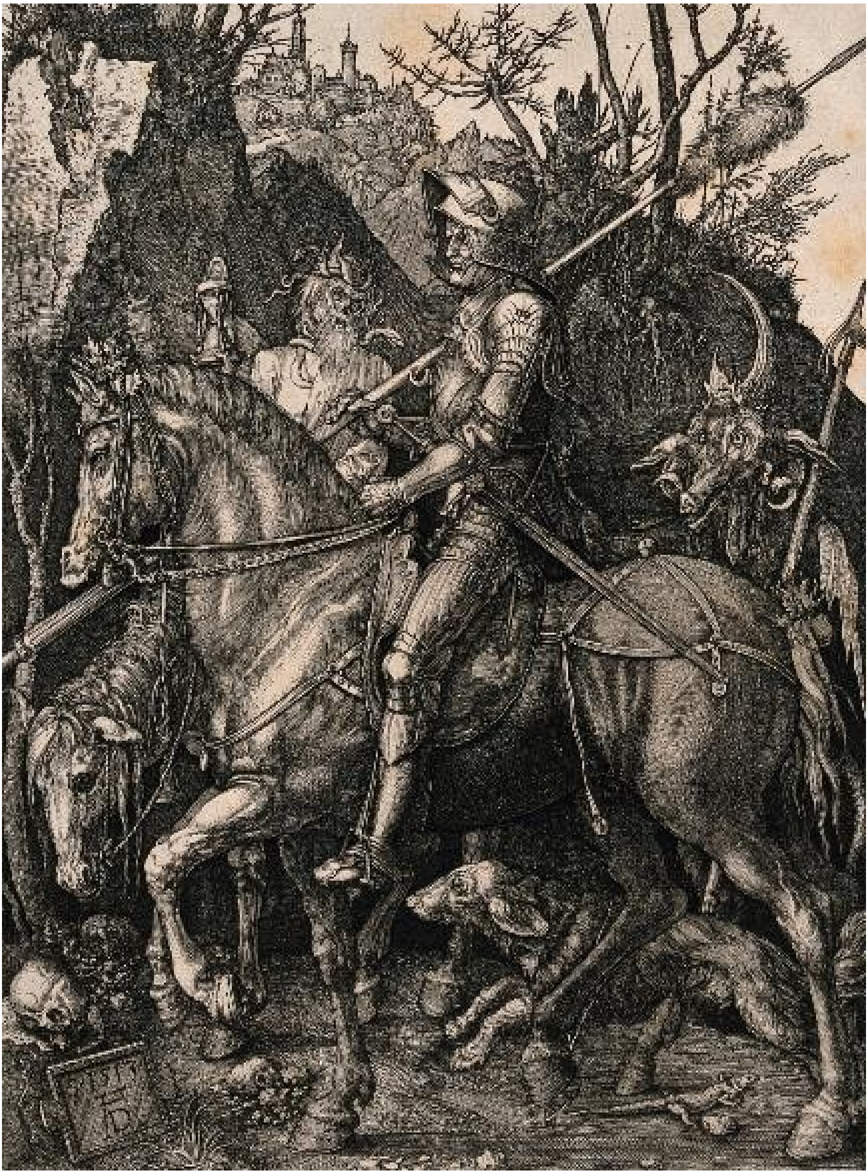

শিল্পকলা এবং ছাপচিত্রের একজন উৎসাহী সংগ্রাহক ডুরার রাফায়েলের সাথে তার রেখাচিত্র বিনিময় করেছিলেন। তিনি ঘেন্টের শিল্পী সুসানা হোরেনবাউটের (আমাদের সাথে শীঘ্রই তার দেখা হবে আবার) কাছ থেকে খ্রিস্টের একটি মিনিয়েচার শিল্পকর্ম সংগ্রহ করেছিলেন। নেদারল্যান্ডস ভ্রমণকালে তিনি অর্থের বিনিময়ে চার্চের কিছু অল্টারপিস উন্মুক্ত করিয়েছিলেন, যেন তিনি সেগুলো অধ্যয়ন করতে পারেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ভ্যান আইকের অসাধারণ সৃষ্টি - 'ঘেন্ট অল্টারপিস', এগারোতম অধ্যায়ে

আমরা যে অল্টারপিসটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। ‘গভীর চিন্তায় পূর্ণ অমূল্য একটি চিত্রকর্ম’ হিসেবে তিনি এটি বর্ণনা করেছিলেন। এছাড়াও ডুরার ছিলেন প্রথম উত্তর ইউরোপীয় শিল্পীদের একজন, যিনি ‘নিউ ওয়ার্ল্ড’ (উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা) থেকে স্প্যানিশ কনকিস্টাডর হেরনান কোরটেস কর্তৃক ইউরোপে প্রেরণ করা ‘সম্পদ’ দেখেছিলেন, ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে যখন ইউরোপব্যাপী এই সম্পদের একটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীতে সেগুলো ব্রাসেলস-এর কুডেনবার্গ প্রাসাদে প্রদর্শিত হয়েছিল।

মেসোআমেরিকা (বর্তমান সেন্ট্রাল আমেরিকা) থেকে আসা ভাস্কর্যগুলো ডুরারকে বিস্ময়ে হতবাক করেছিল, যিনি অ্যাজটেকদের মূল দেশকে ‘স্বর্ণের নতুন দেশ’ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ‘সম্পূর্ণ এই জীবনে, আমি এরকম আর কিছু কখনো দেখিনি, যা কিনা আমার হৃদয়কে এতো আনন্দে পূর্ণ করতে পেরেছে, কারণ সেগুলোর মধ্যে আমি বিস্ময়কর শিল্পকর্ম দেখেছি, এবং সেই ভীনদেশের মানুষগুলোর সূক্ষ্ম প্রকৃতি নিয়ে আমি ভেবেছি’। ষোড়শ শতাব্দীর সূচনায় ইউরোপীয়দের জন্য পৃথিবী খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হতে শুরু করেছিল, এবং যেমন আমরা পরের অধ্যায়ে দেখবো, এবং ডুরার সর্বান্তকরণে সেটি গ্রহন করেছিলেন।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) The closed triptych, The Haywain Triptych by Hieronymus Bosch,
(২) The Haywain Triptych,Hieronymus Bosch
(৩) The Garden of Earthly Delights in the Museo del Prado in Madrid, c. 1495–1505, attributed to Bosch
(৪) Hieronymus Bosch - The Garden of Earthly Delights - Hell (Detail)
(৫) Isenheim alterpiece – central panel, Matthias Grünewald
(৬) Isenheim - sculpted and painted by, respectively, the Germans Nikolaus of Haguenau and Matthias Grünewald in 1512–1516.’
(৭) Interior of the Isenheim Altarpiece (c. 1500), attributed to Nikolaus Hagenauer
(৮) Annunciation by the German artist Veit Stoss in 1518
(৯) portraits of martin-luther and his wife in 1529 by Lucas Cranach the Elder
(১০) Passional Christi und Antichristi - woodcut by Lucas Cranach,
(১১) The Four Horsemen, from The Apocalypse, print, Albrecht Dürer
(১২) Albrecht Dürer, Knight, Death, and the Devil (1513)

অধ্যায় ১৬ - বর্বরদের অনুপ্রবেশ

অ্যাজটেকদের শাসক দ্বিতীয় মকটেজুমা, যা কিছু তিনি কেবলই শুনলেন, সেগুলো নিয়ে ভাবছিলেন। ১৫২০ সাল, হেরনান কোরটেসের নেতৃত্বে একদল স্প্যানিয়ার্ড, মাত্র কয়েক মাস আগে তার রাজ্যের উপকূলে অবতরণ করেছে, এবং তারা বহু স্বর্ণের অ্যাজটেক ভাস্কর্য এবং যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার করেছে, এবং সেগুলোকে গলিয়ে তারা প্রচুর পরিমানে স্বর্ণ সংগ্রহ করছে। কিন্তু কিসের জন্য? যেন সংগৃহীত স্বর্ণ তারা তাদের দরিদ্র স্বদেশে প্রেরণ করতে পারে। এই আগন্তুকরা জানে না কীভাবে শ্রদ্ধা করতে হয়, বুন্য শূকরের মতো লোভী বলে তিনি তাদের গালমন্দ করলেন। তিনি ভাবছিলেন, যখন অ্যাজটেকরা প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো শহর আক্রমণ করে, সেখানে খুঁজে পাওয়া সব শিল্পকর্মই তারা শ্রদ্ধা করে। উজ্জ্বল বহুবর্ণিল টোলটেক ভাস্কর্য 'চাকমুল' (শুয়ে থাকা ফিগার) এখন তার নিজের শহরের মন্দিরে বিসর্জিত হৃৎপিণ্ডগুলো ধারণ করতে ব্যবহৃত হচ্ছে, বিজিত টেহুআকান উপত্যকার সব শিল্পীরা সুবিশাল প্রকল্পগুলোয় তার জন্য কাজ করছেন।

তার শহর টেনোচটিটলানে প্রবেশ করার পর থেকেই স্প্যানিয়ার্ডদের লোভাতুর চোখ মূল্যবান ধাতু ও সামগ্রী খুঁজতে সর্বক্ষণ ব্যস্ত, যেন তারা এতো চমৎকার আর কিছু কখনোই দেখেনি : সংযুক্ত পানিপথের ওপর পানির মধ্য থেকে উত্তোলিত হয়ে থাকা পাথরের উচু ভিত্তির উপর নির্মিত বাড়ি, কাঠ-খোদাই ভাস্কর্যে সজ্জিত অন্দরমহল, পিরামিড মন্দিরের ওপর দেবতার প্রতিনিধিত্ব করা বিশাল পাথরের ভাস্কর্য। 'কোটলিকুয়ে' বিশেষ করে তাদের আতঙ্কিত করেছিল, এবং তিনি বিস্মিত হননি। এটি ছিল শহরের পবিত্র কেন্দ্রে অবস্থিত টেম্পলো মায়োরে সুবিশাল চারটি ভাস্কর্যের একটি। দেবী মস্তকহীন, শিরোচ্ছেদ করা, দুটি প্রবাল শাপ একটি আশযুক্ত মুখোশ তৈরি করেছে, দেবী তাদের চোখ ব্যবহার করে সামনে ও পিছনের দিকে তাকাতে পারে। গলায় মানব হৃৎপিণ্ড আর হাত দিয়ে তৈরি একটি মালা, অতীত বিসর্জন থেকে তৈরি করা তার উপহার । এবং একটি খুলি তার কোমর থেকে ঝুলছে।

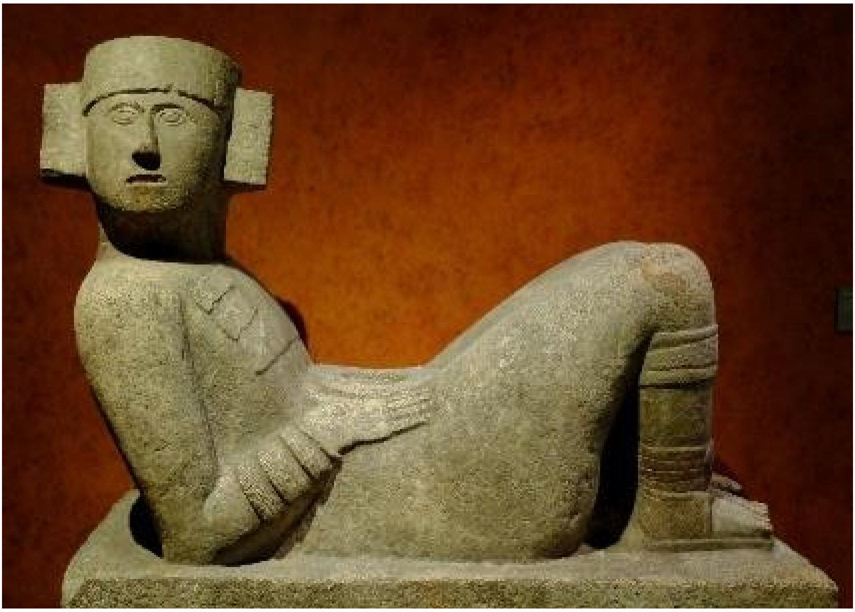

*

কনকিস্টাডোর বা অভিযাত্রী-সৈনিক কোরটেস ও তার বাহিনী অবশেষে দ্বিতীয় মকটেজুমাকে হত্যা করেছিল, এবং টেনোচটিটলান শহরটিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল (এবং এটিকে তারা মেক্সিকো সিটি নামে পরবর্তীতে পুনর্নির্মাণ করেছিল)। স্পেনের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করার লক্ষ্য নিয়ে কোরটেস অ্যাজটেক দেব-দেবীদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলে। স্প্যানিশরা বহু স্বর্ণ আর রৌপ্য নির্মিত দ্রব্য গলিয়ে ফেলেছিল, যেন তারা বুলিয়ন বা পিণ্ড হিসেবে সেগুলো ইউরোপে স্থানান্তর করতে পারে, এবং তারা পাথরের ভাস্কর্যগুলো ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে ‘কোটলিকুয়ে’ টিকে গিয়েছিল, কারণ এটি মাটির নীচে সমাহিত ছিল, যা বেশ কয়েক শতাব্দী পরে আলোর মুখ দেখেছিল, কিন্তু অগণিত ভাস্কর্য চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। কোরটেস অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার জিনিসগুলো ইউরোপে প্রেরণ করেছিলেন, অবসিডিয়ান আর স্বর্ণে আবৃত মাথার খুলি, দ্বিমুখী একটি সরীসৃপ, যা কচ্ছপের খোলসের নীচ থেকে বের হয়ে আছে, মূল্যবান কেটসাল পালক দিয়ে অলংকৃত কাপড়। যখন ডুরার এগুলোকে “বিস্ময়কর আর অপূর্ব শিল্পকর্ম” হিসেবে দেখেছিলেন, সৈনিক কোরটেস এগুলোকে পণ্য বা ‘আজব’ বস্তু হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। শিল্পীরা হয়তো অ্যাজটেক সৃষ্টির রহস্য আর ‘জাদু’ মূল্যায়ন করতে পারবেন, কিন্তু কোরটেসের মত কারো কাছে এগুলো ছিল প্রধানত বিক্রয়যোগ্য অর্থাৎ অর্থ-উপার্জন করার মতো পণ্যবস্তু : প্রদর্শনী করার মতো পণ্য কিংবা মূল্যবান ধাতুর লোভনীয় উৎস।

এর ব্যতিক্রম, অ্যাজটেকরা প্রতিপক্ষের শিল্পকর্ম শ্রদ্ধা করতো, যেভাবে রোমানরা গ্রিক শিল্পকলাকে শ্রদ্ধা করেছিল। অ্যাজটেকরা 'মিক্সটেক' শিল্পীদের নিয়োগ করেছিল, যারা ওয়াহাকার মত বিভিন্ন বিজিত রাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন, এবং তারা অসাধারণ কিছু ধাতুর শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছিলেন। একই সাথে এই শিল্পীরা অন্য সংস্কৃতির শিল্পকলা পুনর্ব্যবহার এবং অধ্যয়ন করেছিলেন, যেমন টোলটেক চাকমুল (চাকমুল এক ধরনের প্রাক-কলম্বীয় মেসোআমেরিকান ভাস্কর্য, যেখানে শায়িত ফিগার প্রদর্শন করা হয়, যার মাথা সামনের দিকে নব্বই ডিগ্রি ঘুরে থাকে, শায়িত শরীরে ভার বহন করে কনুই, এবং এটি এর পেটের ওপর একটি পাত্র বা চাকতী বহন করে। ধারণা করা হয়ে এই ভাস্কর্যগুলো মৃত যোদ্ধাদের প্রতীকীরূপ যারা দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বস্তু বহন

করে, ছবি দ্রষ্টব্য) এবং ওলমেক মাথা (দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এই দানবীয় আকারের ভাস্কর্য দেখেছিলাম)। তারা নিশ্চয়ই এই আগ্রাসী নিষ্ঠুর স্প্যানিশদের অসভ্য আর বর্বর মনে করেছিলেন, যারা অমূল্য শিল্পকর্ম গলিয়ে ধাতু সংগ্রহ , কিংবা সাংস্কৃতিক স্থাপনা আর ভাস্কর্যগুলো ধ্বংস করেছিল।

ভিনদেশী সংস্কৃতির প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর আচরণে ইউরোপীয় সব রাষ্ট্রই এই মাত্রায় বর্বরতা প্রদর্শন করেনি। ষোড়শ শতাব্দীর শুরু থেকেই পর্তুগীজরা বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক অভিযানের সাথে জড়িত ছিল এবং তারাও স্বর্ণের সন্ধান করেছিল। ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তারা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছিল, এবং পরবর্তীতে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতের সাথে বাণিজ্যিক পথ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এছাড়া ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তারা জাপানে পৌঁছেছিল। এই সময়ে নির্মিত শিল্পকর্মগুলো তাদের এই আন্তঃসাংস্কৃতিক সাক্ষাৎগুলোর বিস্তার আর মাত্রা লিপিবদ্ধ করেছে।

১৫২১ খ্রিস্টাব্দে ডুরার রডরিগো ফার্নানডেজ ডা’লমাডার ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন, যিনি অ্যান্টওয়ার্পে পর্তুগালের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সচিব ছিলেন। ডুরার নিজেই আফ্রিকার শিল্পকর্ম ক্রয় করেছিলেন। তিনি তিন ফ্লোরিন খরচ করেছিলেন (বর্তমানে যা ৫০০ ব্রিটিশ পাউন্ডের সমতূল্য) সিয়েরা লিওনে তৈরি দুটি আইভরি ‘সল্টসেলার’ বা লবনদানি কিনতে (বিষয়টির গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি যখন

দেখি সুসানা হোরেনবাউটের মিনিয়েচার ভাস্কর্যটির জন্য তিনি দুই ফ্লোরিন খরচ করেছিলেন, তার নিজের ক্ষুদ্র চিত্রকর্ম একই দামেই বিক্রয় হতো)।

সিয়েরা লিয়নের সাপি ভাস্কররা তাদের নির্মিত এইসব লবনদানী আন্তঃমহাদেশীয় বাণিজ্যের উত্তর-ইউরোপীয় কেন্দ্র অ্যান্টওয়ার্পে আমদানী শুরু হবার বেশ কয়েক দশক আগে থেকেই পর্তুগীজদের কাছে এগুলো বিক্রয় করতে শুরু করেছিলেন। সাপি ভাস্কররা আইভরির গভীরে খোদাই করে একটি গোলাকৃতির কেন্দ্রীয় ধারক বা আধার তৈরি করতেন - লবনদানি বা সল্টসেলার - এবং এটির চারপাশে ঘিরে থাকতো একগুচ্ছ ফিগার , বিস্তারিত খোদাই কাজ দিয়ে আবৃত, এইসব লবনদানিগুলো ব্যবহারের উদ্দেশ্য নির্মিত হয়নি, বরং শিল্পকর্ম হিসেবে দেখা ও উপভোগ করার জন্য নির্মাণ করা হতো।

পর্তুগীজরা যখন পশ্চিম আফ্রিকার সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করতে শুরু করেছিল, স্পষ্টতই কিছু মাত্রায় ধারণাও বিনিময় হয়েছিল, আফ্রো-পর্তুগীজ কিছু আইভরি লবনদানিতে সাংস্কৃতিক এই মিশ্রণটি দেখা যায়। যেখানে আফ্রিকার নারী, পুরুষ আর প্রাণীদের সাথে পর্তুগীজ বনিক, সৈনিক, জাহাজ আর বাইবেলের দৃশ্য খোদাই করা হয়েছিল। এইসব লবনদানী যারা খোদাই করেছিলেন সেই শিল্পীদের নাম আজ

আমাদের জানা নেই, কিন্তু স্পষ্টতই তারা অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, এবং তারা বেশ দ্রুত তাদের নতুন পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। দুই সংস্কৃতির একটি মিশ্রণ সৃষ্টি করতে তারা ইউরোপীয় প্রার্থনার বই কিংবা ভ্রমণ কাহিনি থেকে সংগৃহীত ধারণাগুলো খোদাইকাজে ব্যবহার করেছিলেন।

এছাড়াও স্টেট অব বেনিন এলাকায় (যা বর্তমানে নাইজেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত) এডো এবং ওয়ো শিল্পীরা সমতূল্য লবনদানি তৈরি করেছিলেন। একটি ষোড়শ শতাব্দীর উদাহরণে আড়ম্বরপূর্ণ পোষাকে সজ্জিত চারজন পর্তুগীজ বণিককে লবনদানির চারপাশ ঘিরে খোদাই করা হয়েছিল, এবং এর ওপরে ছিল পাল-দাঁড়সহ সম্পূর্ণ একটি ক্ষুদ্রাকৃতির পর্তুগীজ জাহাজ এবং এছাড়াও এটির ওপরে ছিল পাখির বাসার মতো দূর পর্যবেক্ষণ করার একটি স্থান। বেনিনের লবনদানিগুলো সিয়েরা লিওনের লবনদানির মতো এতো সূক্ষ্ম করে খোদাই করা হয়নি, কিন্তু এই ফিগারগুলো বহু খুঁটিনাটি অনুপুঙ্খে পূর্ণ, পুতির মালায় বাধা ক্রুশ গলায় একজন বণিকের ছড়িয়ে রাখা পায়ে আমরা অলংকৃত বুট জুতো দেখি। এই ফিগারগুলো আরো বেশি সাধারণ ছিল ব্রোঞ্জ আর পিতলের রিলিফ প্যানেলে , যা এই সময়ে বেনিনে নির্মাণ করা হয়েছিল।

পর্তুগীজ বণিকরা আইভরি ক্রয় করেছিলেন পিতল আর তামার মানিলার বিনিময়ে। মানিলা ছিল এক ধরনের মূদ্রা, যা ধাতু নির্মিত মোটা ব্রেসলেট বা চুড়ির মতো দেখতে, এবং সেগুলো গলিয়ে ধাতু সংগ্রহ করে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করা যেত। বেনিন এবং পর্তুগালের মধ্যে একটি বানিজ্যিক সুসম্পর্ক ছিল এবং বেনিনের শিল্পীরা পর্তুগীজদের সাথে ওবা'র (বেনিনের রাজা) ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার বর্গাকার পিতল ও ব্রোঞ্জের পাতের ওপর লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যেগুলো ওবা'র প্রাসাদের স্তম্ভের উপর প্রদর্শিত হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই ব্রোঞ্জ নিয়ে বেনিনের শিল্পীরা কাজ করছিলেন, এই কৌশল তারা শিখেছিলেন ইফের কাছ থেকে, যাদের সাথে আমাদের নবম অধ্যায়ে দেখা হয়েছিল। তারা সুনির্দিষ্ট গিল্ড বা শিল্পী সংঘে সংগঠিত হয়ে কাজ করতেন, যার একটি ছিল ব্রোঞ্জ শিল্পীদের জন্য, আরেকটি ছিল আইভরি শিল্পীদের জন্য এবং তারা ওবা'র প্রাসাদের নিকটেই ইগুন সড়কে বসবাস করতেন।

যে পাতগুলো তারা তৈরি করেছিলেন সেগুলো ওবা'র জীবনের নানা ঘটনার একটি বিবরণ উপস্থাপন করেছিল, যেগুলো মূলত তাকে মহিমান্বিত করেছিল, যেভাবে আসুরবনিপালের রিলিফ ভাস্কর্যগুলো করেছিল, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখেছিলাম। এই রিলিফগুলো গুরুত্বপূর্ণ নানা যুদ্ধের বিবরণ, রাজসভার সদস্য ও পর্তুগীজ বণিকদের সাথে সাক্ষৎকার লিপিবদ্ধ করেছিল। এর অনেকগুলোয় ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি ভারী শিরস্ত্রাণসহ সশস্ত্র ওবাকে আমরা আবির্ভূত হতে দেখি, যার গলায় ও কপালে চিতা বাঘের নখরের মালা। আপাতদৃষ্টিতে তাকে দেখে অস্পৃশ্য আর অজেয় মনে হয়, যার চারপাশে সবসময়ই উপস্থিত প্রহরীদের একটি দল, বর্শা আর ঢাল হাতে যারা প্রস্তুত। পর্তুগীজদের সহজেই শনাক্ত করা যায়, যাদের কারো কারো গোফ ছিল, কিন্তু সবারই দাড়ি ছিল। লম্বা সোজা চুল তাদের সংকীর্ণ মূখের দুই পাশ ঘিরে রেখেছে, গোলাকার টপি তাদের সুচালো নাকের উপর বসানো। তারা অলংকৃত টিউনিকের উপর আঁটসাঁট জ্যাকেট আর পাট করা স্কার্ট পরে আছে।

১৫৪০-এর দশক নাগাদ পর্তুগীজরা পূর্বে জাপান অবধি সমুদ্র যাত্রা বিস্তৃত করেছিল, এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে দেশটি সব বৈদেশিক বাণিজ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করার আগ পর্যন্ত নিয়মিতভাবেই জাপানি পোতাশ্রয়গুলোয় পর্তুগীজ জাহাজ আসা যাওয়া করতো। জাপানি শিল্পীরা পর্তুগীজদের জাপানে আগমন লিপিবদ্ধ করেছিলেন নতুন ধরনের স্ক্রিন বা পর্দা -শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে, যেখানে 'নামবান-জিন' অর্থাৎ দক্ষিণ থেকে আসা বর্বরদের প্রদর্শন করা হয়েছিল। এই পর্দাগুলো দৈর্ঘ্যে চার মিটার অবধি হতে পারতো, এবং প্রায়শই জোড়া হিসাবে তৈরি করা হতো। জাপানি শিল্পকলা-সংগ্রাহকদের কাছে এগুলো অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত একটি দ্রব্যে পরিণত হয়েছিল। সবচেয়ে সেরা স্ক্রিনগুলো এসেছিল কিয়োটোর 'কানো' স্কুল থেকে, জাপানি চিত্রকলার ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত স্কুলগুলোর একটি। পর্তুগীজদের জাপানে আসার আরো একশ বছর আগে কানো মাসানোবু (১৪৩৪-১৫৩০) এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং উনবিংশ শতাব্দী অবধি এটি অব্যাহত ছিল। কানো মাসানোবু চীনা শৈলী (তুলির আঁচড়ে) ব্যবহার করে কাজ করতে শুরু করেছিলে, কিন্তু তার স্কুলটি দ্রুত এর নিজস্ব একটি শৈলী বিকশিত করেছিল, এবং জাপানি 'ইয়ামাটো-ই ' শৈলীতে দৈনন্দিন জীবনের নানা দৃশ্য চিত্রায়িত করতে শুরু হয়েছিল, উজ্জ্বল রং আর স্বর্ণ পাতের উদার ব্যবহার যে শৈলীকে বৈশিষ্ট্যায়িত করেছিল। এই ধরনের স্বর্ণ-পাতের ব্যবহার আকাশ, মেঘ, রাস্তা আর ভূদৃশ্য প্রতিস্থাপিত করার মাধ্যমে চিত্রকর্মের

কম্পোজিশন, অর্থাৎ এর উপাদানগুলোর গঠনবিন্যাসটি (চিত্রকর্ম যেভাবে বিন্যস্ত) সরলীকরণ করেছিল। মূল মনোযোগ দেয়া হয়েছিল যা কিছু এরপর সেখানে বাকি থাকে সেগুলোর ওপর, বিশেষ করে মানব ফিগার। পর্তুগীজ বণিকদের 'বোম্বাচা' পরিহিত ফিগার হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল, সেই বৈশিষ্ট্যসূচক ঢিলাঢালা ট্রাউজার যা মশা তাড়াতে ইউরোপীয়রা পরতেন, এবং পর্তুগীজ বাণিজ্য জাহাজের কর্মীবাহিনির মধ্য ভারতীয়, মালয় এবং আফ্রিকার নাবিকরা দৃশ্যমান।

এই সময়ে ইউরোপে শিল্পীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ধারণা-বিনিময়ে হবার ঘটনাটি ঘটেছিল বিভিন্ন দেশ থেকে যখন শিল্পীরা বিত্তশালী রাজসভাগুলোয় আমন্ত্রিত কিংবা কাজের খোঁজে জড়ো হতে শুরু করেছিলেন। ভাই লুকাসের সাথে (আনু. ১৪৯৫-১৫৪৪) সুসানা হোরেনবাউট (১৫০৩ - আনু. ১৫৫৪) তার কৈশোরে ইংল্যান্ডে এসেছিলেন। ঘেন্টে (বেলজিয়াম) তার বাবা জেরার্ডের কর্মশালায় কাজ করেই তিনি প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন এবং 'মিনিয়েচার' প্রতিকৃতি আঁকার দক্ষতা কারণে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। মিনিয়েচার বা ক্ষুদ্রাকৃতির এই প্রতিকৃতিগুলো ছিল মূলত বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা অভিজাত শ্রেণির সদস্যদের প্রতিকৃতি, প্রায়শই যেগুলো আকারে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার প্রশস্ত হতো। রাজা অষ্টম হেনরি উপদেষ্টা কার্ডিনাল ওলসি হরেনবাউট ও তার ভাইকে ইংল্যান্ডে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, এবং ভাই-বোন দুজনেই রাজার বহু মিনিয়েচার প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। ১৫২৬ সালে, হেনরির রাজসভায় যোগ দেবার চার বছর পরে, হোরেনবাউট প্রতিকৃতিতে উপস্থাপিত রাজার ইমেজ বা চিত্রটিকে আরো ধারালো করে তুলেছিলেন। যখন কিনা তার ভাই ৩৫ বছর বয়সী হেনরিকে খানিকটা স্ফীত, পাণ্ডুর আর উৎকণ্ঠিত চেহারাসহ এঁকেছিলেন, তখন সুসানা তার চোয়ালকে একটি চৌকা রূপ দিয়ে তাকে সতর্ক একটি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তিনি তার প্রশস্ত বুকের ছাতির উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এছাড়া আরো গাম্ভীর্য আনতে দাড়ি যুক্ত করেছিলেন, এবং তার কালো টুপিটাকে খানিকটা আত্মবিশ্বাসী প্রাণবন্ত কোণে তার মাথার উপর বসিয়ে দিয়েছিলেন। আর এটি করার মাধ্যমে তিনি অষ্টম হেনরীকে আরো আত্মবিশ্বাসী আর ক্ষমতাবান একটি চেহারা দিয়েছিলেন এবং এই মিনিয়েচারটি রাজার আনুষ্ঠানিক

‘চেহারার’ নিয়মিত ছাচে পরিণত হয়েছিল। হান্স হলবাইন দ্য ইয়োঙ্গারসহ (১৪৮৭/৮-১৫৪৩) পরবর্তী শিল্পীরা অষ্টম হেনরির প্রতিকৃতি আঁকার সময় তার দেখানো পথ অনুসরণ করেছিলেন, এবং টুডোর (ইংল্যান্ড শাসন করা রাজবংশ, অষ্টম হেনরি ও রানি প্রথম এলিজাবেথ যে বংশের সদস্য ছিলেন) প্রতিকৃতির এটাই ভিত্তিমূলক চিত্রে পরিণত হয়েছিল। অষ্টম হেনরি স্পষ্টতই বেশ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, সেই বছরের শেষে সুসানা যখন জন পার্কারকে বিয়ে করেছিলেন, তার বিয়ের উপহার হিসেবে হেনরি জন পার্কারকে রাজসভার সাধারণ একটি পদ থেকে উন্নীত করে ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদের ‘কিপার’ পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে মিনিয়েচার প্রতিকৃতিগুলো পূর্ণতা অর্জন করেছিল। প্রায়শই ইউরোপীয় রাজ-পরিবার ও অভিজাত শ্রেণিদের সদস্যদের মধ্যে কূটনৈতিক উপহার হিসেবে এই ক্ষুদ্রাকৃতির প্রতিকৃতি বিনিময় হতো। এই কারণে ইংল্যান্ডে দক্ষ ও সেরা ফ্লেমিশ ও নেদারল্যান্ডিশ শিল্পীদের বিশেষ চাহিদা ছিল। উত্তরীয় রেনেসাঁর একটি উত্তরাধিকার - খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি তাদের সতর্ক মনোযোগ ও ক্ষুদ্র মাত্রায় তাদের কাজ করার সহজাত দক্ষতার কারণে এই সব শিল্পীদের বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হতো । হোরেনবাউট এরপর অষ্টম হেনরির ষষ্ঠ স্ত্রী ক্যাথেরিন পারের জন্য আরেকজন ফ্লেমিশ শিল্পী লেভিনা টিরলিঙ্কের (১৫১০-১৫৭৬), সাথে কাজ করেছিলেন। ক্যাথেরিন তার বন্ধু ও মিত্রদের মধ্যে বিতরণ করতে বহু সংখ্যক মিনিয়েচার প্রতিকৃতি আঁকার কমিশন দিয়েছিলেন এবং সেগুলো পরিচ্ছদের অংশ হিসেবে ফ্যাশনদুরস্ত হয়ে উঠেছিল, যা অলঙ্কারের হিসেবেও পরা হতো।

জার্মানীতে জন্ম নেয়া হলবাইন রাজা অষ্টম হেনরির বহু প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন, কিন্তু তার ব্যক্তিগত ফরমায়েসি একটি কাজ, অসাধারণ দ্বৈত প্রতিকৃতি, ‘দ্য অ্যামব্যাসেডরস’ (১৫৩৩) আজও আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে। হলবাইন এটি এঁকেছিলেন সেই বছরে, যখন অষ্টম হেনরি রোম থেকে ইংল্যান্ডকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন, এবং চার্চ অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি আসলে দ্বৈত প্রতিকৃতি, লন্ডনে ফরাসী রাষ্ট্রদূত জ্যঁ দ্য দান্তোভিল এবং তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু লাভাউরের বিশপ জর্জ দ্য সলভে। সুন্দর পোষাক পরিহিত দুই জন ব্যক্তি একটি শেলফের দুই পাশে দাড়িয়ে আছেন, সেই শেলফটি পূর্ণ হয়ে আছে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতবিষয়ক এবং দূর দেশ থেকে সংগৃহীত বিচিত্র কৌতূহলী দ্রব্যে, যেমন, একটি তুর্কী গালিচা, একটি বাদ্যযন্ত্র - ল্যুট, মহাকাশ ও পৃথিবীর ভূগোলক, এবং লুথারীয় স্তবসঙ্গীতের বই। এগুলো এতোই বিস্তারিত এর খুঁটিনাটি বিষয়ে যে আমাদের মনে হতে পারে দান্তোভিলে হয়তো যে-কোনো মুহূর্তে ঐ ভূগোলক দুটি কোনো একটি ধরতে উদ্যত হবেন। পেছনে বিস্তৃত হয়ে থাকা ভারী পর্দাটি এক প্রান্তে সামান্য খানিকটা সরানো আছে, যা ছোট রুপালী একটি ক্রুশ উন্মুক্ত করেছে এবং চিত্রকর্মের পুরোভূমিতে বিভ্রমের খুব সাহসী প্রদর্শনী হিসাবে আমরা একটি বিকৃত খুলি লক্ষ করি, যা স্পষ্ট হয় শুধুমাত্র একটি বিশেষ কোণ থেকে, নীচের ডান দিক থেকে। দান্তোভিল কী এই চিত্রকর্মটি একটি সিড়িঘরের ওপরে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, যেন এই খুলিটি আপনি লক্ষ করতে পারেন যখন সিড়ি দিয়ে উপরে উঠবেন? ‘দ্য অ্যামবাসেডর’ চিত্রকর্মটির মূল বিষয় কী তাহলে মরণশীলতা, যখন কিনা বস্তু কিংবা ফ্যাশনদুরস্ত পোষাক সব কিছুই সাময়িক এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরই চিরন্তন? কেন মার্টিন লুথারের একটি প্রোটেস্টান্ট বই সেখানে রাখা হয়েছে যখন কিনা ছবিতে আমরা একজন ক্যাথলিক বিশপকে দেখছি? এই অমিমাংসিত প্রশ্নগুলো আজো আমাদের মোহাবিষ্ট করে রেখেছে।

হলবাইন মূলত রাজসভার শিল্পী ছিলেন, যিনি হোরেনবাউট এবং টিরলিঙ্কের সাথে কাজ করেছিলেন। বিশ্বজুড়েই রাজারা তাদের রাজ্যকে মহিমান্বিত এবং তাদের রাজত্বকালকে স্মরণীয় করে রাখতে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান শিল্পীদের নিয়োগ করতেন। সুলতান সুলেইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট, যিনি চল্লিশ বছর অটোমান সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন (১৫২০-৬৬), তার রাজসভায় বহু দেশের শিল্পীদের উপস্থিতি ছিল - তুর্কি, ইসলামি, ইউরোপীয় - এবং তার পৃষ্ঠপোষকতায় অটোমান শিল্পকলা একটি স্বর্ণ যুগে প্রবেশ করেছিল। একগুচ্ছ শিল্পী, বর্তমানে যাদের কারো নামই আমরা জানি না, প্রকৃতার্থেই জাঁকজমকপূর্ণ ‘সুলেইমাননামা’ (বুক অব সুলেইমান) বইটি অলংকৃত করতে পরিশ্রম করেছিলেন - সুলতান সুলেইমানের রাজত্বকালের প্রথম পয়ত্রিশ বছরের বিবরণ সম্বলিত অতিঅলংকৃত একটি কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি। বইটি মূলত পারসিক ভাষায় ইতিহাসবিদ, কবি এবং শিল্পী ফেতুল্লা সেলেবি আরিফির (আরিফ সেলিবি বা আরিফ) লেখা একটি মহাকাব্য, যার সাথে যুক্ত হয়েছিল পয়ষট্টিটি পূর্ণ পৃষ্ঠার চিত্রকর্ম, যার

অনেকগুলো বিভিন্ন রক্তাক্ত যুদ্ধে আদর্শায়িত রূপে সুলতান সুলেইমানের অংশগ্রহনের দৃশ্য প্রদর্শন করেছিল। একটি চিত্রে প্রতিপক্ষের এক সৈন্যের মাথা রক্তাক্ত মেঘে বিস্ফোরিত হয়েছে, যখন একজন অটোমান সৈন্য তার ধারালো তলোয়ার দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেছে, আরকজনকে হাতির পায়ের নীচে পিষ্ট হয়ে মরতে দেখি সুলেইমানের সতর্ক দৃষ্টির সন্মুখে। সোনালী পটভূমি আর একমাত্রিক দর্শনানুপাত এই চিত্রকর্মগুলোকে বাইজেন্টাইন মোজাইকের বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে, কিন্তু এর বিস্তারিত নকশার বিন্যাস এসেছে ইসলামি শিল্পকলা থেকে, এবং উজ্জ্বল রং পারসিক মিনিয়েচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শিল্পকলার জন্য শৈলীর এই মিশ্রণ যথোচিত ছিল , যা কিনা এমন একটি সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছিল, যা আলজেরিয়া আর মিসর থেকে সিরিয়া, হাঙ্গেরি এবং কৃষ্ণসাগর অবধি বিস্তৃত ছিল।

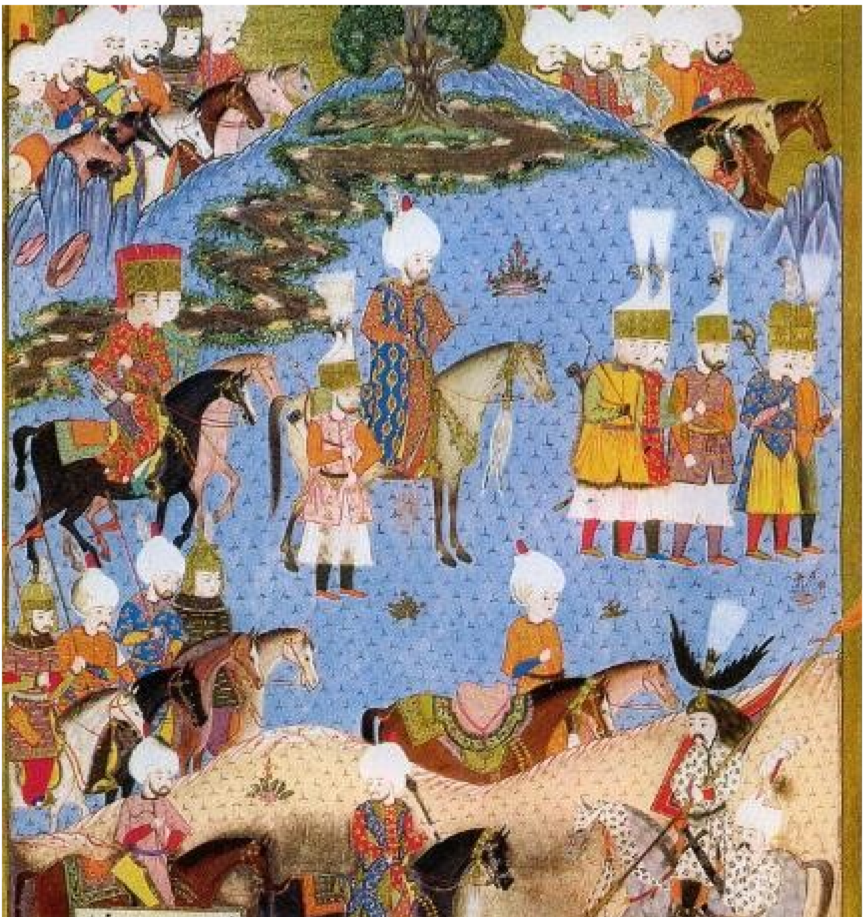

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে, একটি ইউরোপীয় রাজসভা শিল্পকলা ও শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করার ক্ষেত্রে বাকি সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। স্পেনে দ্বিতীয় ফিলিপের

রাজসভা ১৫৫৬ থেকে পরবর্তী চল্লিশ বছর শাসন করেছিল - টিশান এবং আনগুইসোলার মতো শ্রেষ্ঠ কিছু বিদেশী শিল্পীকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল, যাদের সাথে পরের অধ্যায়ে আমাদের দেখা হবে।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Maya chacmool from Chichen Itza.
(২) Statue of Coatlicue
(৩) Gold Warrior Pendant, This intricate warrior figurine recaptures the image of a fierce Mixtec warrior.
(৪) lidded ivory saltcellar was carved by Sapi sculptor
(৫) lidded ivory saltcellar was carved by Sapi sculptor
(৬) This saltcellar created by a Benin ivory carver
(৭) Brass plaques now known as the Benin bronzes, showing Benin's leader, the Oba (left), and a Portuguese man, sixteenth century
(৮) Arrival of the Southern Barbarians (Nanban-jin) Screen "Namban" art ("barbarians from the South"): panels attributed to Kano Naizen,
(৯) Lucas Horenbout/bolte, Henry VIII
(১০) Hans Holbein, the Younger, Portrait of Henry VIII of England
(১০) Levina Teerlinc, Elizabeth I as a Princess c 1550
(১১) Hans Holbein the Younger, The Ambassadors
(১২) Suleiman marching with his army in Nakhichevan, the summer 1554, during the Ottoman-Safavid War of 1532-1555. One of the scenes of the Süleymannâme.

অধ্যায় ১৭ – স্পেনের রাজা

১৫৫৫ সাল, ক্রেমোনা, উত্তর ইটালি, সোফোনিসবা আনগুইসোলা তার দুই বোনকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন, মিনার্ভা আর লুসিয়া, তার পাঁচ বোনের এই দুই জন দাবা খেলছে। সোফোনিসবা ছিলেন বোনদের মধ্যে সবার বড় - তার হাতে চারকোলের লম্বাটে একটি খণ্ড এবং তিনি তাদের রেখাচিত্র আঁকছিলেন, তাদের অভিব্যক্তিগুলো রেখার আঁচড়ে বন্দি করার চেষ্টা করছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি গৃহ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে আঁকা ও চিত্রকর্মে অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন, বর্তমানে তিনি একজন শিল্পী।

.

তিনি আগেও তার বোনদের দাবা খেলার দৃশ্য এঁকেছিলেন। 'চেস গেম' চিত্রকর্মে আমরা মিনার্ভা এবং লুসিয়াকে পরস্পরের মুখোমুখি বসে থাকতে দেখি, তাদের সামনে বিছানো আছে একটি দাবার বোর্ড, সেটি রাখা হয়েছে বেশ সংকীর্ণ একটি টেবিলের উপর, যা আবৃত করে রেখেছে তুর্কি গালিচা। ছোট বোন ইউরোপা তাদের খেলা দেখছে। প্রতিবাদ জানাতে মিনার্ভা তার ডান হাত উঁচু করেছে, এবং দাবার চালটি দেবার আগে লুসিয়া তাকিয়ে আছে নিশ্চিত করতে যেন সবাই দেখে। ইটালিতে কিছুদিন আগেই দাবার নিয়ম হালনাগাদ করা হয়েছিল, (আমরা এখন যেভাবে জানি) রানিকে সবচেয়ে শক্তিশালী একটি গুটিতে পরিণত করা হয়েছিল। হয়তো লুসিয়ার হাত সেই গুটির উপর রাখা, যখন তিনি তার সুবিধার সুযোগ নিয়ে দান দিতে প্রস্তুত। মিনার্ভার অভিযোগ করা দেখে ইউরোপা সশব্দে হেসে উঠেছে।

'চেস গেম' চিত্রকর্মে সোফোনিসবা ইউরোপার অভিব্যক্তির ভিত্তি হিসাবে এর কিছু দিন আগে করা একটি রেখাচিত্র ব্যবহার করেছিলেন, বর্ণমালা শেখার সময় যখন তিনি তার বোনকে হাসতে দেখেছিলেন। তাদের বাবা এমিলকারে তার কিছু রেখাচিত্র বিখ্যাত শিল্পী মাইকেলেঞ্জেলোর কাছে পাঠিয়েছিলেন তার মতামত জানতে। এমিলকারে তার মেয়েদের নিয়ে বেশ উচ্চাভিলাষী ছিলেন এবং সোফোনিসবার শিল্পকলার একজন উৎসাহী সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন। মাইকেলেঞ্জেলো একটি পরীক্ষা প্রস্তাব করে তার উত্তর দিয়েছিলেন - দেখা যাক একজন ক্রন্দনরত বালকের ছবি সে কেমন আঁকতে পারে

, যে বিষয়টি তিনি ভেবেছিলেন ধারণ করা খুব কঠিন হবে। সুতরাং এর উত্তর দিতে সোফোনিসবা তার ছোট ভাই আসড্রুবালের একটি চারকোল রেখাচিত্র এঁকেছিলেন, যার কৌতূহলে কারণে বোনের ঝুড়িতে রাখা ক্রেফিস তার আঙ্গুলে কামড় দিয়েছিল। এই রেখাচিত্রে আমরা দেখি তার হাত পেছন দিকে সরানো, ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যা গুটিয়ে আছে, এবং মুখ কাদার জন্য উন্মুক্ত হয়েছে এবং ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছে ব্যাথায়। বহু অভিব্যক্তিতে পূর্ণ একটি রেখাচিত্র, মাইকেলেঞ্জেলো এতটাই পছন্দ করেছিলেন যে তিনি এটিকে উপহার হিসাবে, তার নিজের একটি রেখাচিত্রসহ প্রথম কসিমো ডে' মেডিচির কাছে প্রেরণ করেছিলেন। 'বয় বিটেন বাই ক্রেফিশ' রেখাচিত্রটি অবশেষে রোমে মানবতাবাদী লাইব্রেরিয়ান ফুলভিও ওরসিনির সংগ্রহে এসেছিল, যেখানে এটি একটি প্রভাবশালী উদাহরণ হিসাবে অন্য শিল্পীদের দেখিয়েছিল কীভাবে একটি একক মুহূর্ত ধারণ করা যেতে পারে এর প্রাণবন্ততা না হারিয়ে।

*

সোফোনিসবা আনগুইসোলা (১৫৩২-১৬২৫) এইসব ক্ষণস্থায়ী আবেগগুলো তার চিত্রকর্মে ধারণ করতে খুবই দক্ষ ছিলেন। তিনি তার নিজের চিত্রকর্ম সৃষ্টি করেছিলেন দৈনন্দিন জীবন নিয়ে, যেগুলোকে বলা হয় 'জনরা' চিত্রকর্ম। তিনি ফ্লেমিশ শিল্পীদের উদাহরণ অনুসরণ করেছিলেন, এবং ইটালিতে একটি নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন। তার চিত্রকর্মে আবেগ আর অভিব্যক্তি বন্দি করার এই মাত্রার দক্ষতা অর্জন করতে নিশ্চয়ই তিনি জীবন থেকে নিয়মিতভাবে রেখাচিত্র এঁকেছিলেন। এবং তার 'চেস গেম' চি ত্রকর্মে 'বয় বিটেন বাই এ ক্রেফিশ' রেখাচিত্রটির মতোই যাপিত একটি মুহূর্তের সতেজতা আর প্রাণবন্ততা ছিল।

আনগুইসোলা উচ্চাভিলাষী ছিলেন, তবে, যেহেতু তিনি অভিজাত শ্রেণির একজন সদস্য ছিলেন, তিনি তার কোনো চিত্রকর্ম বিক্রয় করতে পারেননি। সেই কারণে যখন রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ১৫৫৯ সালে স্পেনে তার রাজসভায় সোফোনিসবার উপস্থিতি কামনা করে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই এটি তার কাছে দারুণ একটি সুযোগ হিসেবে অনুভূত হয়েছিল। ফিলিপের রাজসভা সেই সময়ে ইউরোপে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রাজসভা ছিল। তিনি ফিলিপের তৃতীয় স্ত্রী এলিজাবেথের লেডি-ইন-ওয়েটিং এবং শ্রদ্ধেয় একজন শিল্পী হিসেবে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ফিলিপসহ রাজ-পরিবারের বহু সদস্যদের চিত্রকর্ম এঁকে।

১৫৫৬ থেকে ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি তার দীর্ঘ শাসনামলে রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনের শিল্পকলাকে প্রাদেশিক ও স্থানীয় একটি রূপ থেকে আন্তর্জাতিকভাবে শ্রদ্ধেয় একটি রূপে রূপান্তরিত করেছিলেন । তিনি বহু খ্যাতিমান বিদেশী শিল্পীদের তার রাজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, এবং ইউরোপের সব জায়গা থেকেই তিনি শিল্পকর্ম সংগ্রহ করেছিলেন এবং প্রায় ১৫০০ বিশ্বসেরা চিত্রকর্ম পুঞ্জীভূত করেছিলেন, এবং তার বিভিন্ন প্রাসাদে যে ভাবে তিনি সেগুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন সেটি বর্তমানের আধুনিক শিল্পকলা গ্যালারিগুলোর জন্য একটি মানদণ্ড বেঁধে দিয়েছিল। ফিলিপের সুবিশাল রাজত্ব তখন ইউরোপ, আমেরিকা আর ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জ অবধি বিস্তৃত ছিল, এছাড়াও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল নেদারল্যান্ডস (এখন যা বেলজিয়াম ও হল্যান্ড)। ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে ফেরার আগে ফিলিপ যেখানে প্রায় এক দশক ছিলেন, যে বছর আনগুইসোলাও তার রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। ফিলিপ এরপর আর স্পেনের বাইরে বের হননি। ১৫৬০-এর দশকে স্প্যানিশ শাসনের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডসে গণরোষ ক্রমশ বেড়েছিল, এবং ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দুটি দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় ফিলিপ নেদারল্যান্ডিশ শিল্পকলা অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং এর বিস্তারিত প্রকৃতিবাদের অনুরক্ত ছিলেন। তিনি নেদারল্যান্ডিশ শিল্পকলার বহু উদাহরণ সংগ্রহ করেছিলেন, এবং তার কাছেই ছিল হিয়েরোনাইমাস বশের শিল্পকর্মের সবচেয়ে বড় সংগ্রহ, যেমন, 'গার্ডেন অব আর্থলি ডিলাইট', পঞ্চদশ অধ্যায়ে যে শিল্পকর্মটির সাথে

আমাদের ইতোমধ্যেই পরিচয় হয়েছে। ফিলিপের খালা তাকে রোখিয়ের ভ্যান ডের ভেইডের 'ডিসেন্ট ফ্রম দ্য ক্রশ' উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, এটি দেখে প্রশংসা করার পর (একাদশ অধ্যায়ে আমরাও প্রশংসা করেছি)। এই সব মাস্টারপিসগুলো বর্তমানে স্পেনের মাদ্রিদে প্রাডো জাদুঘরে আছে, কারণ চার শতাব্দী আগে রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ সেগুলো সংগ্রহ করেছিলেন।

যদিও ফিলিপ বহু নেদারল্যান্ডিশ শিল্পীদের শিল্পকর্ম ক্রয় করেছিল, কিন্তু তার নিজের রাজসভায় অধিকাংশ শিল্পী আনগুইসোলার মতোই ইটালি থেকে এসেছিলেন। ইটালিয়ান শিল্পীরা জীবন্ত বাস্তব রূপটি আঁকতে পারতেন, এবং সেটিকে আবেগ দিয়ে পূর্ণ করতে পারতেন। নারী শিল্পীদের জন্য আনগুইসোলা অনুপ্রাণিত করার মতো একটি চরিত্র পরিণত হয়েছিলেন, যারা তার উদাহরণ অনুসরণ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, যেমন লাভিনিয়া ফনটানা, পরের অধ্যায়ে যার সাথে আমাদের দেখা হবে।

যেভাবে আনগুইসোলা দ্বিতীয় ফিলিপের রাজসভায় আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, ইটালির আরেকজন শিল্পী টিশান (টিৎসিয়ানো ভেচেলি, ১৪৯০-১৫৭৬) তখন রাজার জন্য পৌরাণিক কাহিনি ভিত্তিক চিত্রকর্মের একটি বিশাল ধারাবাহিক চক্র শেষ করছিলেন – 'পোয়েজি'। ভেনিসে তরুণ একজন শিল্পী হিসেবে টিশানের সৃষ্টি করা অল্টারপিসটি ছিল ভেনিসে ইতোপূর্ব সৃষ্টি করা হয়েছে এমন সব অল্টারপিসের চেয়েও অনেক বড়। তার ফিগারগুলো ছিল প্রাণশক্তি আর অভিব্যক্তিতে পূর্ণ, তার রং ছিল সাহসী আর সমৃদ্ধ। তিনি বেলিনি ভাইদের সাথে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন, এবং জীবন্ত প্রতিকৃতি জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে, তার শৈলী আরো শিথিল আর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল এবং তিনি তার জীবনের শেষ বছরগুলো দ্বিতীয় ফিলিপের কমিশনগুলো শেষ করে কাটিয়েছিলেন।

টিশানের ‘পোয়েজি’ চক্রের চিত্রকর্মগুলোর ভিত্তি ছিল রোমের কবি ওভিডের ‘মেটামরফোসিস’ কবিতায় বর্ণিত প্রাচীন পুরাণ কাহিনী, এবং এই ধারাবাহিকটি শেষ করতে তিনি এগারো বছর সময় নিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ফিলিপের তীব্র মাত্রায় ধর্মনিষ্ঠ ক্যাথলিক রাজসভা এইসব চিত্রকর্ম নিয়ে কী ভেবেছিল? এগুলো ছিল মূলত চমৎকারভাবে আঁকা ‘নোংরা’ ছবি। মোট ছয়টি ক্যানভাসে প্রায় বিশ জন নারী ছিলেন, ত াদের সবাই ছিলেন নগ্ন অথবা তাদের বক্ষ ও উরু অনাবৃত। পোয়েজির দুটি চিত্রকর্মে ম ূল চরিত্র ছিল দেবরাজ জুপিটার, দ্বিতীয় ফিলিপের প্রতিস্থাপন রূপে। দুটি দৃশ্যেই জুপিটার একজন দেবীকে ধর্ষণ করছেন, একটিতে তিনি স্বর্ণের বৃষ্টির ধারা হয়ে ছদ্মবেশে , যখন তিনি ডানাইকে গর্ভবতী করেছেন, এবং আরেকটি চিত্রকর্ম ষাড় রূপে তিনি ইউরোপাকে অপহরণ করছেন। এই চিত্রকর্ম দুটি ফিলিপের ক্ষমতাসংক্রান্ত সুস্পষ্ট দুটি বার্তা: প্রায় সম্পূর্ণ ইউরোপের ওপর ফিলিপের রাজত্ব এবং নারীদের ওপর পুরুষের অব্যাহত প্রাধান্য।

ষোড়শ শতাব্দীর সেরা শিল্পীদের একজন ছিলেন এল গ্রেকো (দ্য গ্রিক, যার জ ন্ম নাম ছিল ডোমেনিকোস থিওটোকোপুলোস, ১৫৪১-১৬১৪), যিনি রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের উদার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। যদিও রাজার জন্য কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি স্পেনে এসেছিলেন। এল গ্রেকো ক্রিটে জন্মগ্রহন করেছিলেন, এবং তিনি গ্রিক বংশোদ্ভুত ছিলেন। তার বয়স যখন বিশের কোঠায়, অষ্টম অধ্যায়ে আমাদের দেখা ‘ভার্জিন অব ভ্লাদিমির’-এর মতো আইকন চিত্রকর্ম আঁকায় প্রশিক্ষণ ও কাজ করার পর তিনি ভেনিসে এসেছিলেন। ইটালির মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার চিত্রকর্মের আড়ষ্ট শৈলী শিথিল হতে শুরু করেছিল, এবং তিনি টিশানের উজ্জ্বল রং অনুসরণ করতে শুরু করেছিলেন, যার সাথে শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ করেছিলেন।

পরিশেষে এল গ্রেকো ছিলেন এমন একজন শিল্পী যিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি শৈলীর চিত্রকর্ম সৃষ্টির মাঝখানে আটকে গিয়েছিলেন, তার ইটালির কোনো কাজই আমাদের নাড়ির স্পন্দন বাড়িয়ে দেয় না। কিন্তু যখন তিনি স্পেনে এসেছিলেন, যেখানে তার মৃত্যু অবধি জীবনের বাকি চল্লিশ বছর কাটিয়েছিলেন, তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যসূচক শৈলীটি বিকশিত হয়েছিল। তার শৈলীটি ছিল এই সময় অবধি যা কিছু তিনি আত্মীকৃত করেছিলেন, সেগুলোরই খুব অদ্ভুত একটি মিশ্রণ। তার পরবর্তী চিত্রকর্মগুলো উজ্জ্বল রঙে প্রাণবন্ত, দর্শনানুপাতের প্রতি ইচ্ছাপূর্বক উপেক্ষা (আইকন শিল্পী হিসেবে প্রশিক্ষণ থেকে যা জন্ম হয়েছিল), এবং আবেগীয় ও আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতে পূর্ণ, সেই জাতির মতোই, স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের কষাঘাতে যে জাতি ধর্মীয় উন্মত্ততায় তাড়িত হয়েছিল।

১৫৭৯-৮২ সালে এসকোরিয়াল প্রাসাদে রাজার চ্যাপেলের জন্য 'মার্টারডম অব সেইন্ট মরিস অ্যান্ড থেবান লিজিয়ন' চিত্রকর্মটি আঁকার পর এল গ্রেকোকে ফিলিপের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল। এই চিত্রকর্মটিকে এমন একটি স্থানে অনুপযোগী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল, কারণ এটি নগ্ন পুরুষ ও শনাক্তযোগ্য সামরিক নেতাদের প্রদর্শন করেছিল, এবং দ্রুত এটি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। এই বিপত্তি সত্ত্বেও এল গ্রেকোর কল্পনাপ্রসূত ধর্মীয় চিত্রকর্মগুলো খুব দ্রুত তাকে স্পেনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত একজন শিল্পীতে পরিণত করেছিল। স্পেন তখন ক্যাথলিক অতিন্দ্রীয়বাদে আচ্ছন্ন, যখন একনিষ্ঠ ভক্তরা বিশ্বাস করতেন যে সরাসরি তারা ঈশ্বরের সাথে স্বপ্ন বা মনশ্চক্ষে কথা বলতে পারবেন। ১৬০৮-১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আঁকা এল গ্রেকোর 'ভিশন

অব সেইন্ট জন’ চিত্রকর্মে তার ফিগারগুলোর জন্য বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করার কোনো তাড়না তিনি অনুভব করেননি, কারণ এখানে যে সত্যটিকে প্রকাশ করতে হবে সেটি ভৌত নয় বরং আধ্যাত্মিক বার্তা (যেভাবে আইকন চিত্রকর্মে হয়ে থাকে)। টিশানে লাল আর নীলের উত্তরাধিকারের আভাস আমরা দেখি সেইন্ট জনের ভাজ করা ক াপড়ে, যিনি নতজানু, পা ছড়িয়ে, হাত উঁচু করে, চিবুক ওপরের দিকে বাঁকিয়ে, তার মাথায় ঘুর্ণায়মান চোখ ইঙ্গিত করছে যেন তিনি একটি কল্পদৃশ্যের স্বর্গীয় অভিজ্ঞতায় মগ্ন হয়ে আছে। তার শরীরকে সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য পরিবর্তিত করা হয়েছে। সাধুর উরু প্রায় তার সম্পূর্ণ পায়ের দৈর্ঘ্যের সমান, তার ঘাড় অসম্ভাব্য ছোট একটি মাথার বহন করছে, তার পেছনে আকাশ, যেন সেটি জীবন্ত হয়ে নীচে নেমে এসেছে আর ক্যানভাসকে সিক্ত করেছে। তার এই ধরনের পরবর্তী কাজগুলো, এল গ্রেকো শৈলী এত বেশি চূড়ান্ত মাত্রার ছিল যে, বিংশ শতাব্দীরা আগ অবধি কোনো শিল্পীই তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সাহস পাননি।

ইটালিতে শিল্পকলার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে ভেনিস এর অবস্থান ধরে রেখেছিল। টিশান যেহেতু শুধু রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের জন্য কাজ করছিলেন, তরুণ শিল্পীদের শহরের নতুন কমিশনগুলো দেয়া হয়েছিল, যেমন টিনটরেটো (জাকোপো রোবাস্টি, ১৫১৮-১৫৯৪) এবং ভেরোনেসে (পাওলো কালিয়ারি, ১৫২৮-১৫৮৮)। তারা ভেনিসের ‘স্কুয়োলে’ (বিভিন্ন দেশের বণিক ও পেশাজীবীদের সংগঠন), চার্চ আর প্রাসাদগুলো জাঁকালো আর প্রাণবন্ত ক্যানভাস দিয়ে পূর্ণ করেছিলেন, যেমন ভেরেনেসের ‘লাস্ট সাপার

’ (১৫৭৩) (নতুন নাম ‘ফিস্ট ইন দ্য হাউজ অব লেভাই’), ভেনিসের একটি কনভেন্টের জন্য এটি আঁকা হয়েছিল (বাসিলিকা ডি সান্টো জিওভানি ই পাওলো)। টিনটরোটো এবং ভেরোনেসের চিত্রকর্মের আড়ম্বরতা বিপরীতে ভারসাম্য এনেছিলেন অন্য ইটালিয় শিল্পীরা, যারা তাদের পুরো জীবনই সন্ন্যাশ্রম এবং কনভেন্ট কাটিয়েছিলেন।

সিস্টার প্লাউটিলা নেলি (পলিসেনা নেলি, ১৫২৩-১৫৮৮) চৌদ্দ বছর বয়সে ফ্লোরেন্সের সান্টা কাটারিনা ডমিনিকান কনভেন্টে যোগ দিয়েছিলেন। শহরের উন্মুক্তভাবে প্রদর্শিত অন্য শিল্পকর্মগুলো দেখে তিনি নিজেই ছবি আঁকতে শিখেছিলেন। যখন তিনি কনভেন্টের প্রাইওরেস (মঠাধ্যক্ষের পরেই যার অবস্থান) হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তখন তিনি শিল্পীদের একটি কর্মশালা পরিচালনা করতে শুরু করেছিলেন, যারা অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ফ্লোরেন্সের অভিজাত শ্রেণির কাছে চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্য বিক্রয় করতেন । ১৫৬৮ সালে আঁকা নেলির নিজের একটি ‘লাস্ট সাপার’ সংস্করণ আছে, পরিচ্ছন্ন সাদা কাপড়ে আবৃত টেবিল ও সাদামাটা একটি পরিবেশসহ, যার সাথে তার সমসাময়িক ভেরোনিসির সংস্করণটির চেয়ে আমরা লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চির সংস্করণটির অধিকতর মিল পাবো । এটাই সর্বপ্রথম কোনো নারীর আঁকা লাস্ট সাপারের দৃশ্য, এবং এটি কনভেন্টের রিফেকটরি বা ডাইনিং হলে স্থাপন করা হয়েছিল। এটি ছিল বিশাল, এর দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭ মিটার, কিন্তু যেভাবে প্রতিযোগিতামূলক অন্য ভেনেশিয়ান শিল্পীরা করতেন, নেলি সেভাবে সামাজিক কোনো স্বীকৃতি বা খ্যাতির অন্বেষণ করেননি, তার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল যেন তার সহযোগী নানরা চিত্রকর্মের বিষয়বস্তুর সাথে নিজদের সংযোগ করতে পারেন, এবং তাদের ধ্যানে সহায়তা করতে তিনি ঐতিহাসিক উদাহরণ থেকে ধারণা গ্রহন করেছিলেন, সমসাময়িক ধারণা থেকে নয়।

যে সময় নাগাদ নেলি তার ‘লাস্ট সাপার’ শেষ করেছিলেন, রেনেসাঁ পর্ব তখন কার্যত শেষ হয়ে গেছে। শিল্পীদের মধ্যে তখন কথোকথনগুলো মূলত ‘স্টাইল’ অথবা ‘মানিয়েরা’ বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করেছিল। এবং চিত্রকর্মগুলো এর সরল স্বাভাবিকতা ত্যাগ করে আরো বিস্তারিত ও অতিরঞ্জিত হতে শুরু করেছিল। ‘স্টাইল’ অথবা সরাসরি জীবন থেকে আঁকলে যেমন হতো, তার চেয়ে কোনো কিছু কেমন দেখতে হতে পারে সেটি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। হাত-পাগুলো দীর্ঘায়িত হয়েছিল, দেহ ভঙ্গিমাগুলো আরো বেশি জটিলতাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে এই শিল্পীদের, যেমন পারমিজিয়ানিনো (ফ্রানচেস্কো মাৎসোলা, ১৫০৩-১৫৪০), পন্টোরমো (জাকোপো কারুচ্চি ১৪৯৪-১৫৫৭) সমষ্টিগতভাবে ‘ম্যানারিস্ট’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

জিয়ামবোলোনিয়া (জ্যাঁ দ্য বুলোন, ১৫২৯-১৬০৮) নেতৃস্থানীয় ‘ম্যানেরিস্ট’ শিল্পী ছিলেন, ষোড়শ শতাব্দীতে যিনি প্রত্যক্ষভাবে ফ্লোরেন্সকে ইউরোপের ভাস্কর্য কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। আর বিস্ময়করভাবেই তিনি ইটালিয়ান ছিলেন না, তার জন্ম হয়েছিল ফ্লান্ডার্সে (এখন বেলজিয়ামের একটি অংশ)। একুশ বছর বয়সে রোমে ধ্রুপদী ভাস্কর্য শিখতে তিনি ইটালিতে এসেছিলেন। হেলেনিস্টিক (আলেক্সান্ডারে মৃত্যু ও রোমের উত্থানের মধ্যবর্তী পর্ব) ভাস্কর্যগুলো বিশেষভাবে তাকে মোহাবিস্ট করেছিল, যে ভাস্কর্যগুলো বিস্ফোরক বা ভয়ঙ্করভাবে তীব্র কোনো গতিময়তাকে বন্দি করতে পেরেছিল , যেমন ‘লাওকুন’। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার করার পথে মেডিচি পরিবার ফ্লোরেন্সে থাকার জন্য তাকে প্ররোচিত করেছিল, তখনো যারা শহরটির শাসক পরিবার ছিল। এরপর ইটালিতে নুতন পৃষ্ঠপোষকরা তার নামের ইটালিকরণ করছিল – জিয়ামবোলোনইয়া।

জিয়াবোলোনিয়া ইউরোপের সবচেয়ে প্রভাবশালী একজন ভাস্করে পরিণত হয়েছিল, কারিগরী দিক থেকে বিস্ময়কর সব ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন, ক্ল্যাসিকাল ও রেনেসা পর্বের ভাস্কররা যা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন, তিনি সেটি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। যে মাস্টারপিসটি তাকে খ্যাতি দিয়েছিল, সেটি ছিল প্রমাণ আকারের চেয়েও বিশাল ‘স্যামসন স্লেয়িং এ ফিলিস্টিন’ (১৫৬০-২), মূলত ভাস্কর্যটি একটি ঝর্ণার কেন্দ্রীয় কাঠামো হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। পাথরে সচলতা আর গতিময়তা কীভাবে প্রকাশ করতে হয় এটি তার শিক্ষণীয় একটি উদাহরণ।সার্বিক বিন্যাস ও সংগঠনে একটি

নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে দুটো শরীরের দেহভঙ্গিমা বিকৃত এবং নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে । স্যামসন দাড়িয়ে এবং তার ডান হাতে অস্ত্র হিসেবে উদ্যত গাধার চোয়ালের একটি হাড়। তিনি নগ্ন এবং মারণঘাতী আঘাত দেবার প্রত্যাশায় তার মাংসপেশিগুলো টান টান হয়ে আছে। তার শরীর সর্পিলাকার হয়ে আছে সেই প্রচেষ্টায়। মাটিতে পড়ে থকা ফিলিস্টিনের মাথাটি তার বাম হাতে পেছনের দিকে টেনে ধরা, যখন সেই ব্যক্তিটি তার শক্তিশালী মুষ্টি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছে। এই ভাস্কর্যের সব কিছুই গতিময়তা বিষয়, যখন দুটি শরীর পরস্পরকে কুণ্ডলী করে পেচিয়ে আছে। এটি দাবি করছে, চারপাশে ঘুরে, প্রতিটি কোণ থেকে এটিকে দেখুন, সচলতা ও ক্রিয়ার নাটকীয় একটি ঘুর্ণি, ভাস্কর্যবিষয়ক দুঃসাহসিকতা।

রেনেসাঁর শেষ থেকে বারোক পর্ব শুরু হবার মধ্যবর্তী পর্বটিকে স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃতি দিতে ‘ম্যানারিজম’ শব্দটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবিষ্কার করা হয়েছিল, । কিন্তু গতিময় আর নাটকীয় যে ভাস্কর্য জিয়ামবোলোনিয়া সৃষ্টি করেছিলেন, সেগুলোকে অনায়াসে আদি ‘বারোক’ পর্বের অংশ বলা যেতে পারে। তিনি বারোক পর্বে কারাভাজিও এবং বার্নিনির মত প্রতিভাবান ভাস্করদের আগমনের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, যে দুই শিল্পী তাদের নাটকীয় সৃষ্টি দিয়েপরবর্তী অধ্যায়গুলোয় আমাদের বিস্মিত করবে।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে):

(১) Sofonisba Anguissola, Chess Game
(২) Sofonisba Anguissola, Child Bitten by A Lobster
(৩) Sofonisba Anguissola, Self-portrait at the Easel Painting a Devotional Panel
(৪) Rogier van der Weyden, The Descent from the Cross
(৫) Titian, The Venus of Urbino (also known as Reclining Venus)
(৬) Titian, The Rape of Europa র
(৭) El Greco, The Martyrdom of St Maurice
(৮) El Greco, The Vision of Saint John
(৯) Paolo Veronese, The Feast in the House of Levi
(১০) Plautilla Nelli, The Last Supper
(১১) Giambologna, Samson Slaying a Philistine

১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ , রোমে কার্ডিনাল ডেল মন্টের বাড়িতে তার নতুন থাকার জায়গায় স্থানান্তরিত হবেন বলে কারাভাজ্জিও তার জিনিসপত্রগুলো গোছগাছ করছিলেন। আগের বছর কার্ডিনাল তার আঁকা 'জিপসি ফরচুর-টেলার' আর 'কার্ডশার্পস' চিত্রকর্ম দুটি ক্রয় করেছিলেন, এবং এখন কারাভাজ্জিওকে তার জন্য কাজ করতে হবে। কারাভাজ্জিও তার সৌভাগ্য নিয়ে ভাবছিলেন। কাভালিয়ের দা'রপিনোর স্টুডিওতে ফল আর ফুলের ছবি আঁকার কাজ নিয়ে বদমেজাজী ও অস্থির একুশ বছরের তরুণ কারাভাজ্জিও মাত্র তিন বছর আগেই তিনি রোমে এসেছিলেন। এখন তিনি পৃষ্ঠপোষক হিসেবে একজন কার্ডিনালকে পেয়েছেন।

কারাভাজ্জিও সুদর্শন তরুণদের আঁকতে ভালোবাসতেন, যাদের মাংসল ঠোঁট আর আকর্ষণীয় ও প্ররোচনাদায়ী উজ্জ্বল চোখ আছে। কার্ডিনাল ফারনেসের লাইব্রেরিয়ান, ও কার্ডিনালের ডেল মন্টের একজন পরিচিত ফালভিও অরসিনির সংগ্রহে সম্প্রতি তার দেখা

একটি রেখাচিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি একটি নতুন চিত্রকর্ম আঁকার পরিকল্পনা করছিলেন। সেই রেখাচিত্রটি ছিল সোফোনিসবা আনগুইসোলার আঁকা 'বয় বিটেন বাই এ ক্রে ফিশ'। 'বয় বিটেন বাই এ লিজার্ড' চিত্রকর্মে কারাভাজ্জিও শিশু নয় বরং একজন কিশোরকে আঁকবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আকস্মিক হতভম্ভ হওয়ার সেই একই অভিব্যক্তিটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, ডান হাত পেছনে সরিয়ে এনে সেই প্রাণীটিকে ঝাকুনি দিয়ে ফেলে দেবার প্রচেষ্টারত, যেটি তাকে এইমাত্র কামড়ে দিয়েছে, কিশোরের ভ্রূ ব্যাথায় কুঞ্চিত হয়ে আছে, তার মুখ উন্মুক্ত। কারাভাজ্জিও মনশ্চক্ষে সেটি দেখতে পারছিলেন, ছেলেটির সামনে টেবিলে পাকা চেরি ফল এলোমেলো ছড়িয়ে আছে , তার কানের পেছেন গোজা আছে একটি ফুল। তারুণ্যের মাধুর্য্য আর ভালোবাসার ধারালো কামড়।

তিনি এই ধরনের কিশোরদের ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন, কিন্তু তিনি জানতেন তার আরো বড় কাজ লাগবে যদি তিনি কাভালিয়ের দা'রপিনোর স্টুডিওর সাথে মোকাবেলা এবং রোমে চাহিদা আছে এমন কোনো শিল্পী হতে চান। আর এমন কিছু অর্জন করতে হয়তো কার্ডিনাল ডেল মন্টে তাকে সহায়তা করতে পারেন ।

*

মাইকেলেঞ্জেলো মেরিসি ডা কারাভাজ্জিও (১৫৭১-১৬১০) কার্ডিনাল ডেল মন্টের জন্য পাঁচ বছর কাজ করেছিলেন। কিন্তু ততদিনে রোমের সেরা শিল্পী হবার খেতাবটির জন্য

আরেকজন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হয়েছিল - আনিবালে কারাচ্চি (১৫৬০-১৬০৯)। কারাচ্চি, কারাভাজ্জিওর মতোই উত্তর ইটালির অধিবাসী ছিলেন। বোলোনইয়া থেকে তিনি রোমে এসেছিলেন, যেখানে তিনি তার ভাই আগোস্টিনো এবং জ্ঞাতিভাই লুডোভিকোর সাথে একটি সফল স্টুডিও ও আর্ট একাডেমি পরিচালনা করেছিলেন। ম্যানারিস্ট শৈলীর কৃত্রিম অতিরঞ্জনের বিপরীত, সেখানে তিনি প্রকৃত বাস্তবতা বা জীবন থেকে সরাসরি আঁকার ধারণায় প্রত্যাবর্তন করার প্রতি সমর্থন জানিয়ে কাজ করেছিলেন, এবং তিনি টিশান ও ভেরোনেসির কাজ অধ্যয়ন করেছিলেন। ইতোমধ্যেই সফল একজন শিল্পীর পরিচয় নিয়ে তিনি ১৫৯৪ সালে রোমে এসেছিলেন, এবং দ্রুত তাকে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানসূচক কিছু কমিশনও দেয়া হয়েছিল। কারাভাজ্জিও যখন ফারনেসের গ্রন্থাগারিকের রেখাচিত্রের সংগ্রহ অধ্যয়ন করছিলেন, কারাচ্চি কার্ডিনাল ফারনেসের পুরো প্রাসাদের ছাদে ফ্রেস্কোর কাজ করেছিলেন। আদর্শায়িত ভূদৃশ্যপটে উচ্ছ্বসিত দেব-দেবীসহ প্রাচীন পূরাণে বর্ণিত প্রেমকাহিনি দিয়ে ফ্রেস্কোগুলো পূর্ণ ছিল, প্রতিটি দৃশ্যকেই ফ্রেম বন্দি করেছিল 'ভাস্কর্য'- যেগুলো আঁকা হয়েছিল একটি বিভ্রম সৃষ্টি করতে, অত্যন্ত দক্ষ ''ট্রোম্প ল'য়''। ছাদের ফ্রেস্কোগুলো পরিলিপিত হয়েছিল ফারনেসের উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য-সংগ্রহের পরিপূরক হিসেবে, যেগুলোর বেশ কিছু নীচে দেয়াল-কুঠুরীতে প্রদর্শিত হয়েছিল, কিন্তু পুরো সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ছিল প্রমাণ করা, ভাস্কর্য নয় চিত্রকর্ম হচ্ছে শ্রেষ্ঠতর শিল্পকলা, 'পারাগনে'(অর্থাৎ তুলনা) নামক সেই চলমান বিতর্ক, যা সমসাময়িক তাত্ত্বিক বইগুলোয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে রোমে প্রতিভাবান শিল্পীর কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কেন এতো সংখ্যক শিল্পী রোমে স্থানান্তরিত হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? কারণ এটি ছিল বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষক এবং লোভনীয় কমিশনের শহর, যখন ক্যাথলিক চার্চ পুনরায় এর শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করেছিল। এছাড়া ইউরোপের বহু শিল্পীরা ক্ল্যাসিকাল শিল্পকলা ও রেনেসার শ্রেষ্ঠ শিল্পী মাইকেলেঞ্জেলো আর রাফায়েলের প্রতিভা অধ্যয়ন করতেও

রোমে এসেছিলেন। রোমে কাজ পাবার জন্য শিল্পীরা প্রতিদ্বন্দিতা কিংবা একই জায়গার জন্য চিত্রকর্ম সৃষ্টি করে সরাসরি প্রতিযোগিতা করতেন। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে কারাচ্চিকে টাইবেরিয়া চেরাসির সান্টা মারিয়া ডেল পোপোলো চ্যাপেলের ছাদে একটি ফ্রেস্কো আর অল্টারপিস আঁকার কমিশন দেয়া হয়েছিল। এর দুই মাস পরে পোপের কোষাধ্যক্ষ ও বিত্তশালী আইনজীবী চেরাসি কারাভাজ্জিওকে অল্টারপিসের দুই পাশের দেয়ালে দুটি চিত্রকর্ম আঁকার কমিশন দিয়েছিলেন।

কারাচ্চির অল্টারপিস, ‘দ্য আজাম্পশন অব দ্য ভার্জিন’ সংহতিপূর্ণ গতিময় গঠনবিন্যাসের শিক্ষণীয় একটি উদাহরণ। কুমারী মা স্বর্গে আরোহণ করছেন, তার দুই হাত দুই পাশে বিস্তৃত। স্বর্গীয় আলো তাকে স্বর্ণালী জ্যোতিশ্চক্র দিয়েছে, এবং দেবদূতরা তাকে বহন করে ওপর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি যখন এই চ্যাপেলে প্রবেশ করবেন মনে হবে যেন তিনি দুই হাত প্রসারিত করে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। কিন্তু কী বিস্ময়কর পার্থক্য সেই দুটি প্যানেলের সাথে পার্শ্ববর্তী দুটি দেয়ালের ওপর কারাভাজ্জিও যেগুলো এঁকেছিলেন। স্বচ্ছ নীল, লাল আর সোনালী রঙের বদলে কারাভাজ্জিও বাদামি, সাদা আর পোড়া হলুদের প্যালেটের সাথে আমরা মাটিতে ছিটকে পড়ি। কিছু লালের আভাস আছে, চোখে লাগার মতো, প্রতিদ্বন্দ্বী ‘অ্যাজাম্পশন’ থেকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, কিন্তু এর স্বর্গীয় বিষয়বস্তু সত্ত্বেও তার এই দুটি প্যানেলের শিকড় ছিল পৃথিবীতে, বাস্তব পৃথিবীতে ।

ডানদিকে, কারাভাজ্জিওর ‘কনভার্শন অন দ্য ওয়ে টু ডামাস্কাস’ চিত্রকর্মে আমরা সেইন্ট পলকে দেখি একটি একটি স্কিউবাল্ড ঘোড়ার সামনে মাটিতে শুয়ে আছেন, ঘোড়াটি তাকে এড়িয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। সেইন্ট পল আকাশের দিকে দুই হাত উঁচু

করে আছেন, তার শরীর নাটকীয়ভাবে সামনে থেকে সংক্ষিপ্ত বা 'ফোরশর্টেন' করা হয়েছে, তার চোখ স্বর্গীয় আলোর দ্বারা অন্ধ, এবং যেন মনে হয় তিনি আসলেই আমাদের সামনেই এভাবে মাটিতে পড়ে আছেন, কারাভাজ্জিও আলোর নাটকীয় ব্যবহার, আর কালো ছায়া সেইন্ট পলকে ধাক্কা দিয়ে যেন আমাদের পরিসরে নিয়ে এসেছে। তার হাতগুলোকে ভাস্কর্যসূলভ মনে হয়, যেন সেগুলো সত্যিকারের পরিসর দখল করে আছে, কারাচ্চির 'অ্যাজাম্পশনের' কুমারী মায়ের ব্যতিক্রম, যা সেখানে চিত্রিত পৃষ্ঠেরই অংশ হয়ে আছে।

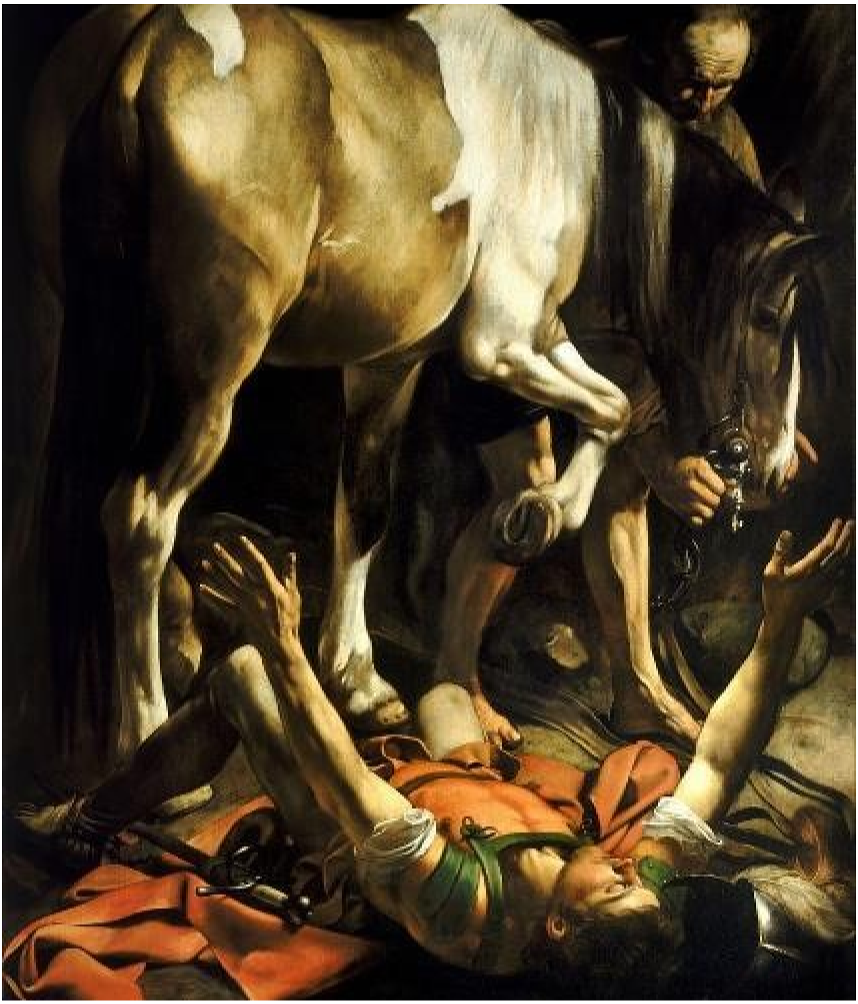

বাম দেয়ালে, 'দ্য ক্রুসিফিক্সন অব সেইন্ট পিটার' চিত্রকর্মে কারাভাজ্জিও এমন কি আরো বহু দূর অগ্রসর হয়েছিলেন, এই আঁকাবাঁকা বিষয়বস্তু বিন্যাসে এতটাই শক্তি ছিল যে মনে হয় যেন এটি জীবন্ত। বর্তমানে আমাদের জন্য, যারা নিয়মিত সিনেমা আর টেলিভিশন

দেখে অভ্যস্ত, কারাভাজ্জিওর নাটকীয় বাস্তবতা আমাদের সাথে এমন একটি উপায়ে সংযোগ করতে পারে, যা কারাচ্চির আদর্শায়িত শৈলী কখনো পারে না। আর এটি হচ্ছে একটি উদাহরণ, যখন আমরা কোনো শিল্পকর্মের দিকে তাকাব, এর মধ্যে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুভব করার সেই বিশেষ উপলব্ধি অর্জন করতে আসলেই ঠিক কী পরিমান মনোযোগ আমাদের সেখানে দিতে হবে। কারাভাজ্জিও আমাদের সাথে সশব্দে এবং স্পষ্টভাবে কথা বলেছিলেন, এবং সমকালীন শিল্পীরা এখনো সেই শক্তিশালী নাটকীয় ক্যানভাসের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন।

কারাভাজ্জিও ও কারাচ্চি দুজনকে আজ 'বারোক' শিল্পী বলা হয়। 'বারোক' হচ্ছে একটি বেশ বিস্তৃত অর্থবাহী একটি শব্দ, যা সপ্তদশ শতকের সব শিল্পকলার ওপর আরোপ করা হয়েছিল। এর কেন্দ্র আছে নাটকীয়তা, গতি, কর্মের একটি বোধ, কারাভাজ্জিওর উত্তেজনাপূর্ণ চিত্রকর্মগুলোয় বৈশিষ্ট্যসূচকভাবেই যা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও সেই সময় গ্রিক-রোমান ক্ল্যাসিকাল পর্বে প্রোথিত শিকড়সহ কারাচ্চির ধ্রুপদী (ক্ল্যাসিকাল) শৈলী

এবং গ্রিক পূরাণ ও রেনেসাঁর ধারণাগুলো নতুন আর্ট অ্যাকাডেমিগুলোর শিক্ষায় প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল। শিল্পকর্ম নিয়ে সেই সময়ের লেখকরা একই ভাবে কারাভাজ্জিওর বিস্ময়কর বাস্তবতাবাদের চেয়ে বরং কারাচ্চির আদর্শায়িত রূপকে শ্রেয়তর বিবেচনা করেছিলেন, আর সেই কারণে কারাচ্চির শৈলী পরবর্তী তিনশত বছর প্রতিটি অ্যাকাডেমি শিক্ষার্থীর আরাধ্য একটি শৈলীতে পরিণত হয়েছিল।

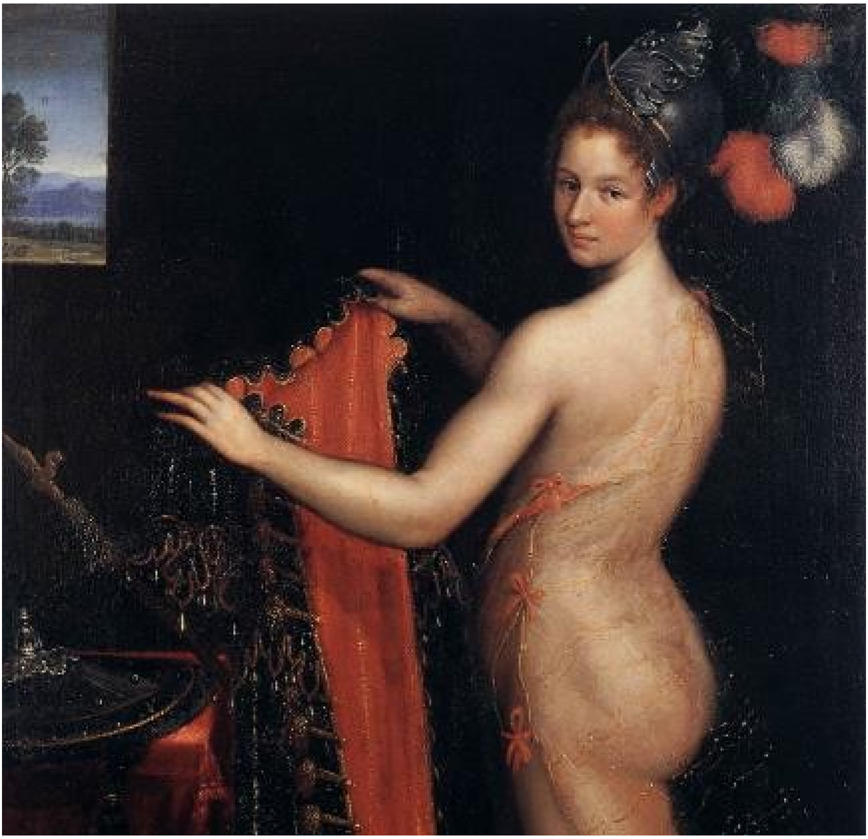

চেরাসি চ্যাপেল কমিশনের সময়, কারাভাজ্জিও এবং কারাচ্চি ছিলেন পরস্পরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু পুরো ইউরোপে কারাভাজ্জিওর নাটকীয়তাপূর্ণ শৈলীর অনুকরণকারীরা প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে আবির্ভূত হয়েছিল, এবং তারা 'কারাভাজ্জিস্টি' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। বোলোনিয়ার কারাচ্চি অ্যাকাডেমি এদের বিরোধিতা করার মতো নিয়মিত ক্ল্যাসিক ঘরানার শিল্পী সরবরাহ অব্যাহত রেখেছিল, যেমন, গুইডো রেনি (১৫৭৫-১৬৪২)। লাভিনিয়া ফনটানাও (১৫৫২-১৬১৪) বোলোনিয়াতে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নারী হবার কারণে কারাচ্চি অ্যাকাডেমিতে ভর্তির জন্য উত্তীর্ণ হতে পারেননি। সৌভাগ্যক্রমে তার বাবা ও বোলোনিয়ার সেই সময়কার নেতৃস্থানীয় ম্যানারিজম ঘরানা শিল্পী প্রসপেরো ফনটানা তাকে ঘরেই প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

বিয়ে এবং এগারো জন সন্তান জন্ম দেয়া সত্ত্বেও লাভিনিয়া ফনটানা ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য ছিলেন। তিনি ধর্মীয় দৃশ্য, অল্টারপিস এবং বোলোনিয়ার অভিজাত শ্রেণির সদস্যদের প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন চিত্রকলার একটি নিজস্ব ওয়ার্কশপ পরিচালনা করে। ১০৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বহুদিন ধরেই নারী শিক্ষার পরিবেশকে বেশ অগ্রসর একটি অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল, এবং পরিণতিতে শহর কর্তৃপক্ষ একটি পর্যায়ে এর নারী শিল্পীদেরও সহায়তা করতে শুরু করেছিল। তিনি নিজেই তার কাজের জন্য দাম নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এমন কিছু যা তার পূর্ববর্তী নারী শিল্পীদের জন্য অসম্ভব ছিল। এবং তিনি মেডিচি এবং স্পেনে দ্বিতীয় ফিলিপের জন্য কমিশনের কাজ করেছেন, সচেতনভাবেই তিনি সোফোনিসবা আনগুইসোলার উত্তরাধিকারের সাথে প্রতিযোগিতা করেছিলেন। আগের জীবনীকাররা বলেছিলেন, তিনি সেই সময়ের নেতৃস্থানীয় পুরুষ শিল্পীদের সমপরিমানে আয় করতেন, এবং চার্চের দলিল ইঙ্গিত দিচ্ছে বোলোনিয়া ক্যাথিড্রালের অল্টারপিস সৃষ্টি করার সময় একই ধরনের কাজের জন্য তাকে কারাচ্চি পরিবারের থেকে বেশি পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছিল।

বোলোনিয়ায় সফল একটি পেশাজীবন শেষ করার পর, ফনটানা ১৬০৪ সালে পোপের জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে তার পুরো পরিবার নিয়ে রোমে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। রোমে থাকাকালীন সময়ে আঁকা তার প্রথম চিত্রকর্মগুলোর একটি ছিল ‘ন্যুড মিনার্ভা’। যুদ্ধের এই রোমান দেবী স্বর্ণের সুতায় বোনা স্বচ্ছ একটি অন্তর্বাস পরে আছেন, যা আলো প্রতিফলিত করছে। তিনি লাল ও সাদা পালকে সজ্জিত একটি শিরস্ত্রাণও পরে আছেন, এবং যুদ্ধের পোষাক পরতে প্রস্তুত হচ্ছেন। অন্তর্বাসের নীচে তার নগ্ন দেহ দৃশ্যমান হলেও তিনি মিনার্ভাকে নিষ্ক্রিয় সৌন্দর্যের কোনো বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করেননি। তাকে আমরা এক পাশ থেকে দেখি, যিনি তার বুকের বর্মের দিকে হেটে যাচ্ছেন, যা তিনি শীঘ্রই পরবেন, তার দৃঢ় উরু, নিতম্ব আর হাতের পেশী তার শারীরিক শক্তির প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই চিত্রকর্মটির প্রশস্তি করেছিল সমসাময়িক একটি কবিতা, যা লিখেছিলেন ওট্টাভিয়ানো রাবাসকো, এবং ফনটানা রোমে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত অ্যাকাডেমি অব সেইন্ট ল্যুক তাকে তাদের একজন হিসেবে গ্রহন করে নিয়েছিল এবং ১৬১৪ সালে তার মৃত্যু অবধি তিনি এই শহরেই ছিলেন।

যে সময় ফন্টানা মারা গিয়েছিলেন, কারাচ্চি আর কারাভাজ্জিওর রোমও হারিয়ে গিয়েছিল। কারাচ্চি উনপঞ্চাশ বছর বয়সে স্নায়ুবৈকল্যের শিকার হয়ে ১৬০৯ সালে মারা গিয়েছিলেন, তাকে প্যানথিওনে রাফায়েলের পাশে সমাহিত করা হয়েছিল। আর কারাভাজ্জিও পালিয়ে গিয়েছিলেন একটি অবৈধ ডুয়েলে রানুচ্চিও টমাসোনিকে হত্যা করার পর, এবং ১৬১০ সালে আটত্রিশ বছর বয়সে তিনি টুসকানিতে মারা যান। কিন্তু কারাভাজ্জিস্টি আর ক্ল্যাসিকাল অ্যাকাডেমি শিল্পীদের মধ্যে এই দুই শিল্পীর শৈলী অব্যাহত ছিল।

শিল্পী ওরাজিও জেন্টিলিস্কি কারাভাজ্জিওর বন্ধু ও একজন কারাভাজ্জিস্টি ছিলেন। ওরাজিওর কন্যা আর্টেমিসিয়া (১৫৯৩-১৬৫৩) শিল্পীদের মধ্যেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন, এবং শৈশব থেকেই তার প্রতিভা লালন করেছিলেন তার পিতা। কৈশোরেই তিনি বিশাল বাইবেলভিত্তিক কাহিনির বিশাল দৃশ্য আঁকতে শুরু করেছিলেন, যেমন, 'সুসানা অ্যান্ড দ্য এলডারস' (১৬১০), যার ভিত্তি ছিল একটি কাহিনি, যেখানে দুই জন ব্যক্তি সুবিধা আদায় করার চেষ্টায় লুকিয়ে স্নানরত তরুণী সুসানাকে দেখেছিল। আর্টেমিসিয়ার জন্য জীবন শিল্পকলাকে অনুকরণ করেছিল, যখন দুই জন ব্যক্তি (তার বাবার সাথ কর্মরত একজন শিল্পীসহ) সতেরো বছর বয়সে তাকে ধর্ষণ করেছিল। আদালতে দীর্ঘ একটা মামলা শেষে অপরাধীদের রোম থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল, কিন্তু তারা কখনোই রোম ত্যাগ করেনি। এর পরিবর্তে আর্টেমেসিয়া ফ্লোরেন্সের একজন শিল্পীকে বিয়ে করে শহর পরিবর্তন করেছিলেন, এবং পুনরায় রোমে ফিরে আসার আগে সেখানে সাত বছর বসবাস করেছিলেন।

ফ্লোরেন্সে থাকাকালীন জেন্টিলিসকি ব্যতিক্রমী একজন শিল্পী হিসেবে তার খ্যাতি সুনিশ্চিত করেছিলেন। কারাভাজ্জিওর চিত্রকর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এমন সব চিত্রকর্ম সৃষ্টি করেছিলেন যেগুলো খুবই বাস্তবিক এবং শারীরিক। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে কারাভাজ্জিওর আঁকা 'বিহেডিং হলোফেরনেস' চিত্রকর্ম থেকে বিষয়বস্তু ঋণ করে তিনি সেটি নিজস্ব

উপায়ে পুনর্বাখ্যা করেছিলেন, ইহুদী বিধবা জুডিথকে তিনি আরো বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছিলেন যখন সে মত্ত আসিরিয় সেনাপতি হলোফেরনেসের শিরচ্ছেদ করতে গলায় ছ ুরি চালিয়েছিল, যে সেনাপতি তার জন্মশহর বেথুলিয়া ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল। জেনটিলিস্কির প্রথম সংস্করণে (১৬১২-১৬১৩) হলোফেরনেস বিছানায় শায়িত, তার মাথা দর্শকের দিকে ফিরে আছে, জুডিথ এবং তার পরিচারিকা আবরা ছাড়া সেই অন্ধকার তাবুতে আর কেউ নেই। যেহেতু তিনি জানতেন জুডিথের মতো কোনো নারীর পক্ষে যোদ্ধা কোনো ব্যক্তির শক্তির তুলনা হতে পারে না, হলোফেরনেসকে শক্ত করে ধরে রাখার জন্য জেনলিস্কি তার পরিচারিকাকে ব্যবহার করেছিলেন, যখন জুডিথ তার গলায় ছুরি চালিয়েছিল। জুডিথ সেনাপতির একগুচ্ছ চুল আকড়ে ধরে আছেন বাম হাতে, এবং ছুরি শক্ত করে টেনে ধরে আছেন, ভারসাম্য রক্ষা করতে বিছানার উপর একটি হাঁটু উঠিয়ে। মৃত্যুরত হলোফেরনেসকে কারাভাজ্জিও যে শক্তিটি দিয়েছিলেন, তার চিত্রকর্মে জেনটিলিস্কি সেটি দুই নারীর মধ্যে স্থানান্তরিত করেছিলেন, যারা তাকে হত্যা করেছিল।

এক বছরের মধ্যেই বিশ বছর বয়সী জেন্টিলিস্কি সেই দৃশ্যটি আবার এঁকেছিলেন, এবার সেটি দ্বিতীয় কসিমো ডে'মেডিচির জন্য। এখানে তিনি জুডিথকে এমনকি আরো শক্তি দি য়েছিলেন, একটি দীর্ঘ তরবারীর পেছনে যিনি শরীর বাঁকিয়ে রেখেছেন। বিছানার চাদরে রক্তের দাগ এবং ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে তার কাধ থেকে, তার হাত, কাপড় আর বুকে ছিটে আসা রক্তের দাগ। একজন সক্রিয় নারীর শরীর কেমন দেখতে হতে পারে

সেটি প্রদর্শন করতে জেন্টিলিস্কি নিজেকে সংযত রাখেননি। জুডিথের ভ্রু কুঞ্চিত, তার চিবুক নীচে দ্বিতীয় একটি ভাজ পড়েছে যখন ছুরি চালাতে তাকে পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আপনি বাধ্য হবেন ভাবতে, দৃশ্যটি যতটা সম্ভব ততটাই বাস্তবতাপূর্ণ করে তুলতে জেন্টিলিস্কি নিশ্চয়ই আয়নার সামনে দাড়িয়ে এই ভঙ্গিমায় নিজের প্রতিবিম্ব অধ্যয়ন করেছিলেন ।

এই চিত্রকর্ম দিয়ে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম 'বারোক' শিল্পীদের একজন হিসেবে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম নারী যাকে ফ্লোরেন্স অ্যাকাডেমি অব আর্টসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, এবং তিনি পারিবারিক বাড়ির বাইরে একটি স্বতন্ত্র স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, তার সময়ে কোনো নারীর জন্য যে কাজটি খুব সহজ ছিল না। ইতিহাসের বিশ্বাসযোগ্য বীরাঙ্গনা হিসেবে নারীদের সক্রিয় ও অংশগ্রহনরত রূপে এই চিত্রায়ন খুব সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন ছিল সেই সময়ে সফল পুরুষ শিল্পীদের সৃষ্ট চিত্রকর্মগুলো থেকে, যাদের নারীদের তখনো কামনার নিষ্ক্রিয় একটি বস্তু হিসেবে আঁকা হতো।

শিল্পী হিসেবে জেন্টিলিস্কি এবং ফন্টানার পেশাগত জীবন নারী শিল্পীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকাল চিহ্নিত করেছিল। তাদের আগে আরো সফল নারী শিল্পীরা এসেছিলেন, যে নারীরা রাজা ও রাণীদের প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন যেমন, সুসানা হোরেনবোল্ট এবং সোফোনিসবা আনগুইসোলা, অথবা একটি সফল কনভেন্ট-ভিত্তিক শিল্পকলা স্কুল পরিচালনা করেছিলেন, যেমন, প্লাউটিলা নেলি। কিন্তু এই পর্যন্ত অধ্যায়গুলোয় আপনারা দেখেছেন, নিয়ম নয় বরং তারা ব্যতিক্রম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। জেন্টিলিস্কি আর ফন্টানার পেশাগত জীবনে একটি পরিবর্তন এসেছিল। তারা এমন বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছিলেন যা সাধারণত পুরুষ শিল্পীদের চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু ছিলেন, বাইবেলের দৃশ্য, নারী নগ্নচিত্র, কিন্তু তারা ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের উপস্থাপন করেছিলেন। তাদের আঁকা নারীদের মধ্যে তারা শক্তি স্থানান্তর করেছিলেন। যারা শক্তিশালী আর আত্মবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। নিজেদের জীবদ্দশায় তারা ব্যতিক্রমী প্রতিভা হিসাবে শনাক্ত হয়েছিলেন ও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, এবং প্রথম নারী শিল্পী হিসেবে তারা পুরুষ-সর্বস্ব শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে নিজ যোগ্যতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন ফ্লোরেন্স এবং রোমে। জেন্টিলিস্কি এবং ফনটানা প্রমাণ করেছিলেন যে, নারী শিল্পীরাও পুরুষদের সমকক্ষ হতে পারেন এবং তাদের পুরুষ সহকর্মীদের দ্বারা গৃহীত হতে পারেন। আপনি তাদের প্রভাবগুলো আরো বেশি দেখতে পাবেন পরবর্তীতে যখন আমরা আরো নারী শিল্পীদের নিয়ে কথা বলবো।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে):

(১) Caravaggio, The Fortune Teller, , second version
(২) Caravaggio, Boy Bitten by a Lizard
(৩) Annibale Carracci, Diana and Endymion
(৪) Tiberio Cerasi's chapel in Santa Maria del Popolo, Rome, with Carracci's The Assumption of the Virgin (centre) and Caravaggio's The Crucifixion of Saint

Peter (left)
(৫) Caravaggio, The Conversion on the Way to Damascus
(৬) Caravaggio, The Crucifixion of Saint Peter
(৭) Lavinia Fontana, Minerva Dressing
(৮) Artemisia Gentileschi, Susanna and the Elders
(৯) Artemisia Gentileschi, Judith Slaying Holofernes

অধ্যায় ১৯ - দেখার নতুন উপায়গুলো

১৬১৪ সাল, অ্যান্টওয়ার্পের আওয়ার লেডি ক্যাথিড্রালের সুউচ্চ ছাদসহ গির্জার মূল অংশে (নেইভ) দাড়িয়ে আছেন শিল্পী পিটার পল রুবেন্স। তিনি দুটি স্তম্ভের মাঝামাঝি একটি অবস্থানে দাড়িয়ে তিনি দূরের উচ্চ বেদির কাছেই একটি চ্যাপেলের (প্রার্থনা করার স্থান) দিকে তাকিয়ে আছেন। চ্যাপেলের অল্টার বা বেদির ওপরেই স্বর্ণের ফ্রেমে বাধাই করা তার 'ডিসেন্ট ফ্রম দ্য ক্রস' চিত্রকর্মটি। চিত্রকর্মটি আকারে বিশাল, উচ্চতায় প্রায় তিন মিটার, এবং এর দুইপাশে দুটি পাল্লা আছে যা কেন্দ্রে খ্রিস্টের ফিগারের উপর বন্ধ ক রা যায়।

রুবেন্স মনোযোগ দিয়ে তার চিত্রকর্মটি দেখছিলেন। খ্রিস্টের তিন ভারবাহীকে তিনি এখানে মূলত প্রদর্শন করেছেন: কুমারী মেরি, সিমিওন এবং সেই ক্রুশটি যার ওপরে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি অল্টারপিসের বাম পাল্লায় মেরির দিকে তাকালেন, কেতাদূরস্ত ফ্লেমিশ কোনো ভদ্রমহিলার মতো কাপড় পরনে, গর্ভধারণ করা

পেটের ওপর রাখা তার হাত, যার ভিতরে এখনো জন্ম নেয়নি খ্রিস্ট নিজেই। ডান পাল্লায় তিনি বয়স্ক সিমিওনের দিকে তাকালেন, যিনি শিশু খ্রিস্টকে ধরে আছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় প্যানেলে ক্রুশের দৃশ্যটি মূলত তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। খ্রিস্টের প্রাণহীন শরীর অপসারণ করা হচ্ছে যখন জেরুসালেমের নিকটে গলগোথায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তার পেছনে বিছানো সাদা কাপড়ের রক্ত বিন্দুর দাগ। চিত্রকর্মটির মাঝখানে আলোকিত একটি অংশ যোগ করতে রুবেন্স এই সাদা কাপড়টি ব্যবহার করেছিলেন, যা উপরের ডান দিক থেকে নীচে বাম দিক অবধি নেমে এসেছে। এটি ধরে আছে বহু হাত – এমনকি উপরের একজন ব্যক্তি এটি জায়গা মতো ধরে রাখতে তার দাঁত ব্যবহার করেছে। নীচ থেকে খ্রিস্টের শরীরের ভার বহন করে আছেন জন দ্য ইভানজেলিস্ট । জন তার উত্তরাধিকার নেবার জন্য প্রস্তুত, তার বিপুলায়তন লাল আলখেল্লা বিসর্জিত খ্রিস্টের রক্তের প্রতীকীরূপ।

*

রুবেন্স (১৫৭৭-১৬৪০) অসাধারণ ব্যতিক্রমধর্মী একজন শিল্পী ছিলেন, যিনি ইটালি থেকে যা কিছু শিখেছিলেন সেটির সাথে তার উত্তর ইউরোপীয় পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদার মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের কূটনীতিবিদ এবং রাজ-চিত্রশিল্পী ও মানবতাবাদী, যিনি তার কাজের নৈতিকতা ও শক্তির জন্য সুপরিচিত ছিলেন । বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্পে বহু সহকারীদের নিয়োগ দিয়ে তিনি দারুণ সফল একটি স ্টুডিও পরিচালনা করেছিলেন, যারা তার তৈলচিত্রের রেখাচিত্র অনুযায়ী কমিশনের চিত্রকর্মগুলোর কাজ সমাপ্ত করতো, এবং অ্যান্থনি ভ্যান ডাইকের মতো প্রতিভাবান শিল্পীদের তিনি তার জন্য কাজ করতে প্ররোচিত করতে পেরেছিলেন, যার সম্বন্ধে আমরা পরের অধ্যায়ে জানবো।

ইটালিতে তরুণ একজন শিল্পী হিসেবে, মানটুয়ার ডিউকের জন্য কাজ করার সময়, রুবেন্স রোমের গ্রিক-রোমান ক্ল্যাসিক পর্বে ভাস্কর্য থেকে নিয়মিত রেখাচিত্র তৈরি করতেন, যাদের মধ্যে একটি ছিল ‘লাওকুন’। ‘ডিসেন্ট ফ্রম দ্য ক্রশের’ শরীরগুলোকে গ ভীরতা ও ঘনত্ব দিতে রূপ, আকৃতি ও আকার সম্বন্ধে তার এই উপলব্ধিগুলো তিনি ব্যবহার করেছিলেন। পরণের লাল আর সোনালী কাপড়ে আঁকতে টিশানের ব্যবহৃত উষ্ণ রং থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন। পাশের পাল্লায় মানব অবয়বগুলো আঁকতে তিনি রাফায়েলের (ভেরোনেসের কৌশলের মাধ্যমে) সুস্পষ্ট রেখা ব্যবহার করেছিলেন, এবং তিনি ক্রসের উপর দাড়ানো ব্যক্তিদের জন্য কারাভাজ্জিওর কাছে থেকে নাটকীয়তা ঋণ করেছিলেন। সেখানে উত্তর ইউরোপীয় একটি বৈপরীত্যও আপাতদৃষ্টিতে রোখিয়ের ভান ডার ভেইডের ‘ডিসেন্ট ফ্রম দ্য ক্রসে’ চিত্রকর্মটির প্রতি স্বীকৃতিরও একটি ইঙ্গিত, খ্রিস্টের হাতের নীচে ও সামনের দিকে ঝুকে থাকা অবস্থান এবং একপাশে হেলে থাকা ক্লান্ত নিস্তেজ মাথায় যা প্রতিফলিত হয়েছে ।

কূটনীতিবিদ হিসাবে, এবং ইউরোপীয় রাজ পরিবারগুলোর সদস্যদের প্রতিকৃতি এঁকে ইউরোপের বিভিন্ন রাজসভাগুলোর মধ্যে যাতায়াত করে রুবেন্স তার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছিলেন। আমরা যেমন দেখেছি, বিত্তশালী ইউরোপীয় রাজসভাগুলো প্রায়শই বিদেশী শিল্পীদের নিয়োগ দিয়েছিল - ইংল্যান্ডে হলবাইন, স্পেনে আনগুইসোলা - এবং একইভাবে ভারতে মুঘল সম্রাটরাও তাদের রাজসভার শিল্পকলার কর্মশালাগুলো সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং ইরান থেকে পারসিক শিল্পীদের আমন্ত্রণ

জানিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এরকমই একজন শিল্পী ছিলেন আকা রিজা (রেজা আব্বাসী , সক্রিয়কাল: ১৫৮০-১৬৩৫), সাফাভিড পারসিক এই শিল্পী চতুর্থ মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্য কাজ করেছিলেন। রিজার মতো শিল্পীরা সরলরৈখিক পৃষ্ঠদেশীয় বিন্যাস ও আনুষ্ঠানিক উপাদানগত সমাবেশ সৃষ্টি করার পারসিক ঐতিহ্য ভারতীয় রাজসভার আনুষ্ঠানিক গঠনবিন্যাসের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহাবাদে (এখন প্রয়াগরাজ, ভারত) জাহাঙ্গীরের রাজকীয় শিল্পকলার কর্মশালাটি রিজা পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু তার পেশাগত জীবনের ভাটা এসেছিল যখন পশ্চিমা শিল্পকলার প্রকৃতিবাদের প্রতি জাহাঙ্গীরের আগ্রহ ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছিল। তবে, রিজার ছেলে আবু'ল হাসান (১৫৮৮- আনু. ১৬৩০), তার প্রজন্মের সবচেয়ে সন্মানিত রাজশিল্পীতে প রিণত হয়েছিলেন।

পারসিক এবং মুঘল রাজসভার শিল্পকলা-কর্মশালাগুলো দীর্ঘ সময়ব্যাপী মূলত সম্মিলিত একটি উদ্যোগ ছিল, যেখানে একাধিক অজ্ঞাতনামা শিল্পীরা একত্রে কাজ করতেন জাঁকালোভাবে অলংকৃত কোনো পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করতে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ এইসব কর্মশালাগুলো ইউরোপের কর্মশালাগুলোর অনুরূপ হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। এগুলো আরো প্রতিযোগিতামূলক আর প্রাধান্যপরম্পরা-নির্ভর হয়ে উঠেছিল, যেখানে মোটামুটিভাবে প্রতি দশজন শিল্পীর জন্য একজন 'মাস্টার' থাকতেন, এবং মুগল শিল্পীরা ক্রমশ স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়িত হতে শুরু করেছিলেন। পশ্চিমা শিল্পীদের মতো তারাও নিজেদের কাজে স্বাক্ষর করতে শুরু করেছিলেন, এছাড়াও দৃশ্যসহ আত্মপ্রতিকৃতি সৃষ্টি, এবং নিজস্ব অনন্য শৈলী বিকাশ করেছিলেন।

ভারতে সেই সময় ক্রমশ লভ্য হতে থাকা পশ্চিমা শিল্পকর্মের কারণে প্রকৃতিবাদের প্রতি জাহাঙ্গীরের কৌতূহলের সূচনা হয়েছিল। তার বাবা আকবর পশ্চিমা শিল্পকর্ম এবং ছাপচিত্রের বেশ বড় একটি সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন, প্রায়শই যেগুলো বাণিজ্যিক সুবিধা পাবার আশায় ইউরোপীয় বণিকদের উপহার ছিল। ইউরোপীয় শিল্পকর্মের প্রকৃতিবাদ ক্রমশ মুঘলদের চিত্রকলায় সঞ্চারিত হতে শুরু করেছিল, ক্রমশ শরীরগুলো ঘনত্ব আর দৃশ্যগুলো গভীরতা পেতে শুরু করেছিল এবং আরো শক্তিশালী আবেগীয় সম্পর্কগুলো প্রকাশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। তেরো বছরের কিশোর হাসান ডুরারের ১৫১১ সালের 'ক্রুসিফিক্সন' ছাপচিত্রের একটি প্রিন্ট থেকে সেইন্ট জনের ফিগারটির একটি প্রতিলিপি সৃষ্টি করেছিলেন, খুব সতর্কভাবে তিনি সেইন্ট জনের প্রার্থনায় বন্দী পরস্পরে যুক্ত আঙ্গুলগুলো আর বিষণ্ন চোখগুলো অনুলিপি করেছিলেন। পরবর্তীতে, হাসানের 'স্কুইরেলস ইন এ প্লেন ট্রি' (১৬০৫-৮) চিত্রকর্মে আপনি দেখতে পারবেন কীভাবে তিনি ইউরোপীয় দর্শনানুপাত এবং জীবন থেকে আঁকার ধারণাটির সাথে সমঝোতা করেছিলেন। তিনি প্রথাগত সোনালী পটভূমি ব্যবহার করেছিলেন এবং অবাস্তব শৈলীতে চিত্রিত গাছটি তার বাবার কিন্তু তিনি ক্রমশ অপসৃয়মান একটি ভূদৃশ্য, এবং সতর্কভাবে পর্ববেক্ষণ করা কিছু প্রাণী যুক্ত করেছিলেন, যেমন গাছের ডালে লাফালাফি করা একগুচ্ছ লাল কাঠবিড়ালী। হাসান পরে জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথার আনুষ্ঠানিক সংস্করণ জাহাঙ্গীরনামায় বেশ কিছু দৃশ্য এঁকেছিলেন (১৬১৫-১৮), যেখানে সম্রাট হাসানকে বর্ণনা

করেছিলেন, 'বর্তমান সময়ে যার কোনো সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী নেই....আসলেই তিনি আমাদের যুগে বিস্ময়ে পরিণত হয়েছেন'।

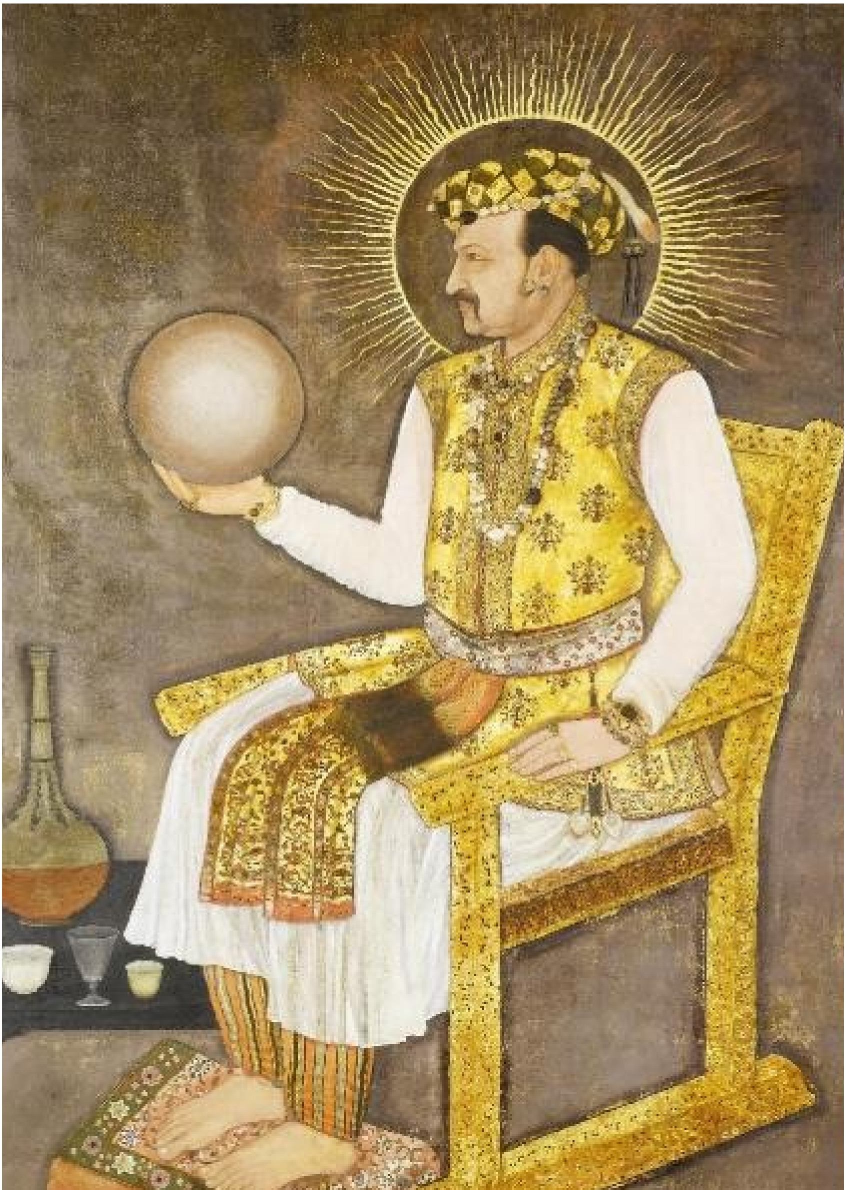

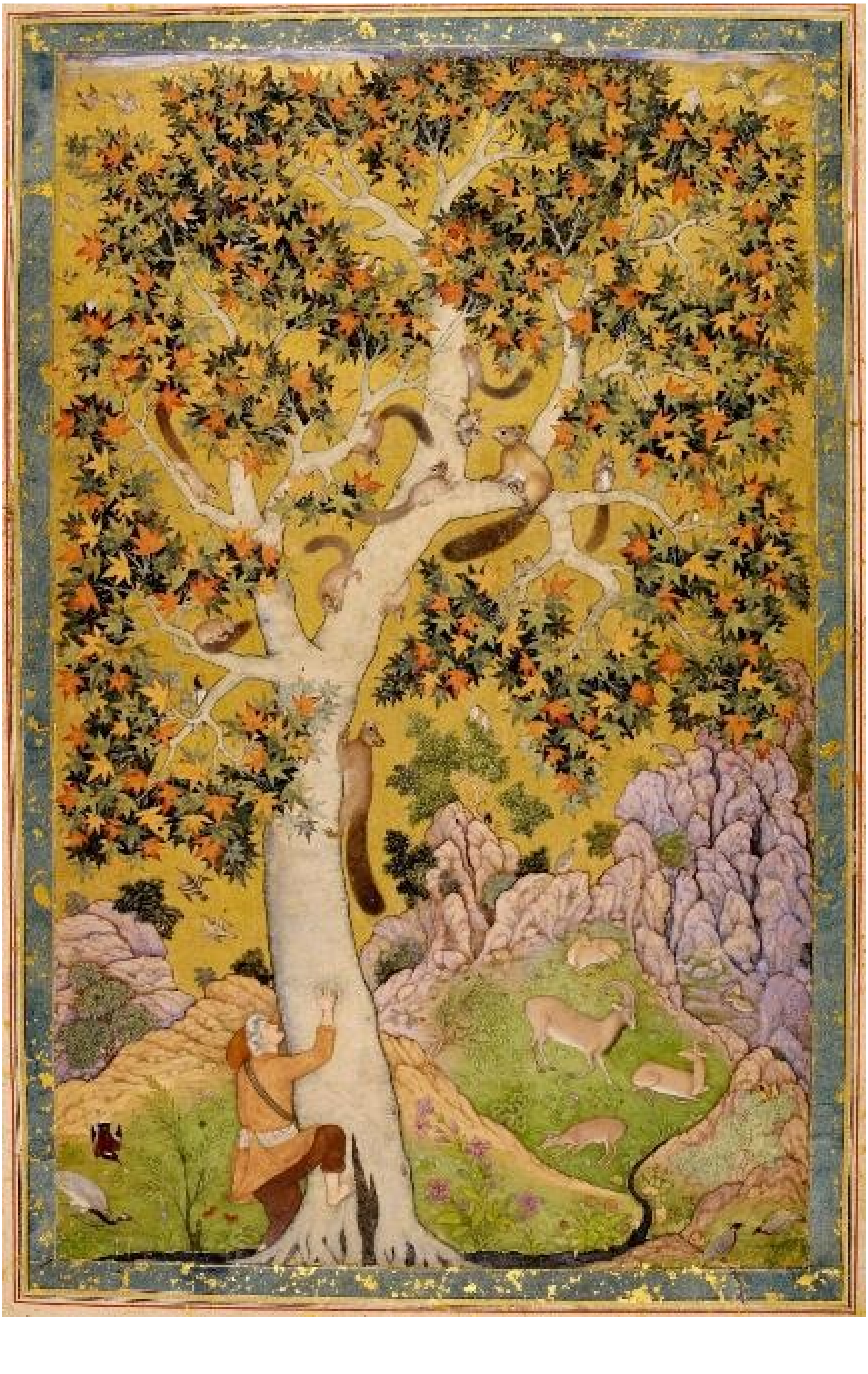

মুঘল সম্রাটরা পশ্চিমা শিল্পকর্ম সংগ্রহ করতে ভালোবাসতেন, এবং ইউরোপীয় মিশনারীরা চীনেও একই ধরনের কৌশল ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন, এবং চীন সম্রাটের রাজসভায় তারা ইউরোপীয় শিল্পকর্ম নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু চীনের লিটেরাটি (বা বুদ্ধিজীবি, রাষ্ট্রীয় আমলা) বা শিক্ষিতসমাজ, সেই সব অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সৌখিন শিল্পীরা, নবম অধ্যায় আমরা যাদের সাথে প্রথম পরিচিত হয়েছিলাম, তারা পৃথিবীকে এভাবে অদ্ভুত নতুন উপায়ে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি খুব সামান্যই মনোযোগ দি য়েছিলেন, এবং পশ্চিমা শিল্পকলা সেখানে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি উনবিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত।

শিল্পী ডং কিচাঙের (১৫৫৫-১৬৩৬) মতে সপ্তদশ শতাব্দীর চীনে শিল্পকলা দুইটি শিবিরে বিভক্ত ছিল। একটি উত্তরীয় স্কুল, যেখানে প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল প্রশিক্ষিত পেশাজীবি শিল্পীরা, যেমন কুই জিঝং (১৫৭৪-১৬৪৪), যারা মূলত ফিগার আঁকতেন, এবং দক্ষিণের স্কুল, যেখানে প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল ডঙের মতো বুদ্ধিজীবীরা, এবং এক রঙা ভূদৃশ্যচিত্রের প্রতি তাদের ভালোবাসা। শিল্পকলা নিয়ে ডঙের লেখাগুলো চীনে বহু শতাব্দীব্যাপী খুবই প্রভাবশালী ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ের আগ অবধি যেগুলো পশ্চিমে প্রায় অজানা ছিল। একক প্রতিভাবান শিল্পী ও ক্ল্যাসিকাল পর্বের রক্ষাণত্মক অনুকৃতির ম ডেলের বিপরীতে তাদের অবস্থান ছিল ভিন্ন। পশ্চিমা চিত্রকর্ম আঁকার শৈলীতে প্রতিযোগিতা করা বড় জোর কয়েক দশক প্রচলিত হলেও, চীনা শিল্পীরা মূলত তাদের ঐ তিহ্য থেকেই অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন, যে ঐতিহ্য বহু সহস্রাব্দ প্রাচীন। ডং বিশ্বাস করতেন, শিল্পীদের অবশ্যই ভ্রমণের মাধ্যমে প্রকৃতিকে আত্মীভূত করতে হবে, অতীতের মহান চীনা শিল্পীদের শৈলীগুলো অনুশীলন করার মাধ্যমে তারপর সেটিকে তারা তাদের চিত্রকর্মে সঞ্চারিত করতে শিখবেন। তাদের নিজস্ব একটি শৈলী তৈরি করে নেয়া উচিত, যা তাদের মৌলিকতা প্রকাশ করবে, কিন্তু তাদের পূর্ববর্তী শিল্পীদের শৈলীর প্রতিও তারা আনুগত্য প্রদর্শন করবেন। পরিণতিতে ডঙের ভূদৃশ্যচিত্রগুলো প্রকৃতি থেকে পর্যবেক্ষণগুলোর হুবহু অনুলিপি করেনি, বরং যে মূলসারটি তিনি সেখানে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সেটি প্রকাশ করেছিল, যেভাবে পূর্ববর্তী শিল্পীরা প্রকাশ করেছিলেন। ১৬২০

সালে তিনি তার বিখ্যাত অ্যালবাম, ‘এইট সিনস ইন অটাম’ এঁকেছিলেন, একগুচ্ছ সংযত নদীরপাড়, গাছ, ঘাস, পাহাড় এবং বরফের চিত্র, যা আগের চিত্রকর্মগুলো থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিল, কিন্তু একই সাথে কালি আর তুলির ব্যবহারে তার দক্ষতা প্রকাশ করেছিল। প্রতিটি দৃশ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল একটি চিন্তাজাগানিয়া কবিতা যা এই ভূদৃশ্যটিকে জীবন্ত করে তুলেছিল, এগুলো লেখা হয়েছিল চিত্রকর্মের এমন একটি এলাকায় যা ইচ্ছা করেই ফাকা রাখা হয়েছিল যেন দর্শকের মন যেন সেখানে ঘুরে বেড়ানোর মতো পরিসর খুঁজে পায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে মূলত পর্তুগীজ ও স্প্যানিশরাই অধিকাংশ ইউরোপীয় সামুদ্রিক অভিযানগুলো পরিচালনা করেছিল। তবে সপ্তদশ শতকে ডাচ বা ওলন্দাজরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করেছিল। স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধ করে স্বতন্ত্র ডাচ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং স্পেনের রাজসভার কর্তৃত্ব থেকে এর ভূখণ্ড জোর করে উদ্ধার করেছিল, যদিও তখনো দক্ষিণ নেদারল্যান্ডসে ফ্ল্যান্ডার্স এলাকাটি স্পেনের দখলে ছিল। যখন চীনা পোরসেলিনের পণ্যগুলো ডাচ প্রজাতন্ত্রে আমদানী হতে শুরু হয়েছিল, তখন এই বাণিজ্যের লভ্যাংশ স্প্যানিশ রাজপরিবারে নয়, বরং ডাচ মধ্যবিত্ত শ্রেণির পকেটে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল, এবং এই বাণিজ্য ঘনবসতিপূর্ণ শহর আর গ্রামগুলোকে বিত্তশালী এলাকায় রূপান্তরিত করতে শুরু করেছিল। এটি প্রাণবন্ত শিল্পকলার একটি বাজারও সৃষ্টি করেছিল, তথাকথিত ‘ডাচ স্বর্ণালী যুগ’, কিন্তু এই শিল্পকর্মগুলো রুবেন্সের ফ্লেমিশ অল্টারপিসের আকারে ছিল না, এর

পরিবর্তে মানুষ মেলা, দোকান এবং শিল্পকলা-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ক্ষুদ্রতর আকারের চিত্রকর্ম কিনেছিলেন, এবং তারা নির্বাচন করেছিলেন সেই চিত্রকর্মগুলো, যেগুলোর বিষয়বস্তু ছিল দৈনন্দিন জীবন, নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্য এবং তাদের পরিবেষ্টিত করে রাখা ভূদৃশ্যচিত্র। শিল্পকলার প্রধান ক্রেতা আর চার্চ কিংবা রাষ্ট্র ছিল না, এবং তাদের নতুন পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদার প্রত্যুত্তর দিতে শিল্পীরা বাধ্য হয়েছিলেন। বর্তমানে টিকে থাকা অধিকাংশ শিল্পকর্ম মূলত ক্ষমতাবান আর বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষকদের জন্য আঁকা হয়েছিল, আর সেই কারণে সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে শিল্পকলার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল সেই বিষয়ক আমাদের উপলব্ধিকে খানিকটা একপেশে করে দিতে পারে। ডাচ স্বর্ণালী যুগের শিল্পকর্ম আমাদের সুযোগ করে দিয়েছিল দেখতে যে, কী ধরনের চিত্রকর্ম বাড়ির দেয়ালে শোভা পেত, যদি আমরা সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাচ প্রজাতন্ত্রে বাস করতাম।

'স্টিল লাইফ' ছিল নতুন ধরনের চিত্রকর্মগুলোর একটি প্রকার, যা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং প্রাতরাশ থেকে বড় ভোজসভা অবধি খাদ্যের নানা উপাদানে ভরা টেবিল এঁকে ক্লারা পিটারস (আনু. ১৫৮৮-১৬৫৭) এই ক্ষেত্রে একজন পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি উত্তরীয় রেনেসাঁর বিস্তৃত প্রকৃতিবাদ থেকে ধারণা সংগ্রহ করেছিলেন এবং প্রতিটি কাজেই একাধিক পার্থক্যসূচক গঠনবিন্যাস তিনি সৃষ্টি করেছিলেন– রুটির শক্ত ত্বক, পালকের মৃদু আভা, পিউটারের (টিন ও অন্য ধাতুর মিশ্রণ) ফ্লাগন বা পাত্রের দ্যুতিময় বক্রতা। তার 'স্টিল লাইফ উইথ এ স্প্যারো হক, ফাউল, পোরসেলিন অ্যান্ড শেলস' (১৬১১) চিত্রকর্মে আমরা জ্বলজ্বলে

সোনালী চোখসহ একটি স্ত্রী স্প্যারো হক পাখিকে দেখি, যে বেতের ঝুড়ির একটি প্রান্ত আঁকড়ে বসে আছে একটি টেবিলের ওপর, বেশ কিছু মৃত পাখিদের শরীর যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, একটি মালার্ড, দুটি পালক ছাড়ানো কবুতর এবং এ কটি বুল ফিন্চ। পাখিগুলো সেই টেবিলের শুয়ে আছে চারটি ঝিনুকের খোলস আর পোর্সেলিনের কিছু পাত্রসহ। এই বিন্যাস ইঙ্গিত করছে এই সব উপাদানগুলোর মালিক বিত্তশালী কেউ, এবং যিনি খুব বৈষয়িক ব্যক্তি, এই ঝিনুকের খোলসগুলো এসেছে ক্যারিবিয়ান ও পশ্চিম আফ্রিকা থেকে, এবং পোর্সেলিন চীন থেকে আমদানী করা হয়েছে। 'স্টিল লাইফ' চিত্রকর্মগুলো সমাপ্ত হবার পরেই সাধারণত বিক্রয় করা হতো, অর্থাৎ এগুলো কারো জন্য বা কমিশনের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হতো না। যে দ্রব্যগুলো এখানে চিত্রিত হয়েছে সেগুলো প্রকৃত মালিকানা চিহ্নিত করার পরিবর্তে এগুলো এদের মালিকদের ধারণকৃত মূল্যবোধ আর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতো।

কেউ কেউ বাড়িতে 'ফিগার' চিত্রকর্ম ঝোলাতে পছন্দ করতেন, এবং প্রাণোচ্ছল ব েপরোয়া শৈলীর ফ্রান্স হলস (১৫৮২/৩-১৬৬৬) ছিলেন খুবই জনপ্রিয় একজন শিল্পী, এবং একই ভাবে জনপ্রিয় ছিল জুডিথ লেইস্টারের (১৬০৯-১৬৬০) চিত্রকর্মগুলো, যিনি সম্ভবত হারলেমে হলসের কর্মশালায় প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। হলস প্রতিকৃতি চিত্রকর্ম সৃষ্টিতে বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন, প্রায়শই তিনি মদ্য পান করার সময় টোস্ট করতে উদ্যত মধ্যবিত্ত কোনো আনন্দিত ব্যক্তির ছবি আঁকতেন, কিংবা বাদ্যযন্ত্রে সুর তুলতে ব্যস্ত কোনো বাদ্যযন্ত্রী। হলস তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন যখন তিনি জীবনের ক্ষণস্থায়ী অভিব্যক্তিগুলোকে তার কাজে বন্দি করেছিলেন - উচ্চস্বরের হাসি, ক্ষণিক পার্শ্বদৃষ্টি, মত্ত স্মিতহাসি।

লেইস্টার জনরা (দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্য) চিত্রকর্মগুলো সৃষ্টি করেছিলেন, যেমন 'দ্য প্রোপোজিশন' (১৬৩১), হলস তার প্রশস্ত প্রাণবন্ত তুলি আঁচড় অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এবং কারাভাজ্জিস্টি – কারাভাজ্জিওর অনুসারীদের কাজ লেইস্টারের কাজে অন্ধকার ছায়াগুলো অনুপ্রাণিত করেছিল, তার চরিত্রগুলোকে আমাদের পৃথিবীর আরো নিকটবর্তী করে তুলতে যা তিনি ব্যবহার করেছিলেন। হ লসের কাজের তুলনায় লেইস্টারের দৃশ্যে অনেক বেশি আবেগীয় গভীরতা ছিল, কারণ তিনি তার প্রতিটি কাজের মধ্যে একটি নৈতিক কাহিনী বপন করে দিতেন।

'দ্য প্রোপোজিশন' চিত্রকর্মটি একটি দ্বৈত প্রতিকৃতি, কিন্তু এটি নারীর দৃঢ়তা এবং পুরুষের কামনার প্রতিহত করার একটি কাহিনী। প্রদীপের আলো প্রতিফলিত করছে এমন শুদ্ধ একটি সাদা শালে আবৃত একজন নারী বসে আছেন, সেই প্রতিফলিত আলো নারীটির মুখটি আলোকিত করেছে। তার মাথা আনত, তার সব মনোযোগ তার সুচীকর্মে, লোমশ পশুচর্মের টুপি পরা এক ব্যক্তির কারণে তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে অস্বীকার করছে, সেই ব্যক্তিটি একটি হাত দিয়ে নারীটি

বাহু আঁকড়ে ধরে আছে। তার ডান হাত নারীটির জন্য মুদ্রায় ভারী - যদি নারীটি তার প্রস্তাবে সাড়া দেয়।

এদিকে স্পেন নিয়ন্ত্রিত ফ্ল্যান্ডার্সে অ্যান্থনি ভ্যান ডাইক (১৫৯৯-১৬৪১) রুবেন্সের শিল্পকলা-কর্মশালা থেকে তার চাকরী ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যতদিন রুবেন্স অ্যান্টওয়ার্পে থাকবেন তিনি কেবল তার ছায়া হয়েই থাকবেন। সুতরাং তিনি ইটালিতে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, প্রথমে জেনোয়া, তারপর রোম ও পরে পালেরমোয়, যেখানে তিনি চিত্রকর্ম নিয়ে আলোচনা করতে করতে বিখ্যাত শিল্পী সোফোনিসবা আনগুইসোলার বার্ধক্যকালীন কয়েকটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। কদাচিৎ তিনি একটি জায়গায় এক বা দুই বছরের বেশি থেকেছিলেন, ভ্যান ডাইক এভাবে বহু এলাকা ভ্রমণ করে, কমিশন যোগাড় করে বিভিন্ন রাজসভার জন্য চিত্রকর্ম এঁকেছিলেন।

তিনি তার বিষয়বস্তু ব্যক্তিদের সম্পদ আর জীবনাচারণ ক্যানভাসে বন্দি করতে পেরেছিলেন, যেমন, রোমে ইংরেজ অভিযাত্রী স্যার রবার্ট শার্লির প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন পারস্য দেশের পরিচ্ছদ পরণে, এবং সাসেক্সে তাদের বাড়িতে তিনি আর্ল অব আরুনডেল এবং তার স্ত্রী আলেথেইয়া ট্যালবটকে এঁকেছিলেন, যখন তি নি মাদাগাস্কারে ব্রিটিশ উপনিবেশ সৃষ্টির পরিকল্পনা করছিলেন, একটি বড় ভূগোলকের ওপর সেই দেশটির প্রতি তার আঙ্গুল নির্দেশিত ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে ভ্যান ডাইক নেতৃস্থানীয় একজন প্রতিকৃতি চিত্রকরে পরিণত হয়েছিলেন। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে রাজা প্রথম চার্লস তাকে নাইটহুডে ভূষিত করেছিলেন এবং পরবর্তী নয় বছর তিনি রাজার প্রধান প্রতিকৃতি চিত্রকর ছিলেন। ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে রাজার প্রতিকৃতি আঁকতে বলা হয়েছিল, যেন সেই সময়ে সেরা ভাস্কর জিয়ান লোরেঞ্জো বার্নিনি তার একটি ভাস্কর্য নির্মাণ করতে পারেন। ভ্যান ডাইক রাজাকে সামনে থেকে, এক পাশ থেকে এবং তিন-চতুর্থাংশ ভঙ্গিমায় এঁকেছিলেন। চার্লসের ফ্যাকাশে সংকীর্ণ আর দাড়িসহ একটি মুখ ছিল, বেশ বড়, খানিকটা আবৃত হয়ে থাকা বড় বাদামী চোখসহ। তার ভরাট ঠোঁট ছিল নরম, কিন্তু কোনো হাসির চিহ্ন ছিল না, এবং তার লম্বা সরু আঙ্গুলগুলো জটিল আর বিস্তারিত লেসের কলারের নীচে সাটিনের রোবটি আঁকড়ে ধরে আছে। প্রথম চার্লসের পরবর্তী নিয়তি এখানে দেখতে আমাদের প্রলুব্ধ করে - অলিভার ক্রমওয়েলের কাছে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধে পরাজিত হবার পরে যার শিরোচ্ছেদ করা হয়েছিল – তার সতর্ক, বিষণ্ন, প্রায় আতঙ্কিত চেহারায়। প্রতিকৃতি শিল্পী হিসেবে ভ্যান ডাইকের অসাধারণত্ব ছিল, মূল চরিত্রের ভেতরের সত্তাটিকে ক্যানভাসে বন্দি করার তার ক্ষমতা। আর এটি করতে শুধু সাদৃশ্য নয়, একটি মানুষের চিত্র নির্মাণ করার সময় তিনি খুবই ক্ষুদ্র অপ্রতিসম অনুপুঙ্খ ব্যবহার করতেন।

সপ্তদশ শতকে শিল্পকলার নতুন বাজার সৃষ্টি হওয়ার সাথে - বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণি - ভিন্ন ধরনের কিছু শিল্পকর্ম আবির্ভূত হতে শুরু হয়েছিল। স্টিল লাইফ ছিল একটি, আরেকটি ছিল ল্যান্ডস্কেপ বা ভূদৃশ্যচিত্র, পরের অধ্যায়ে আমরা সেটি নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Peter Paul Rubens, altarpiece Descent from the Cross
(২) Peter Paul Rubens, The Descent from the Cross
(৩) Reza Abbasi, The Lovers, orTwo Lovers or Courtly Lovers
(৪) Abul al-Hasan, Study of Saint John the Evangelist, After Albrecht Dürer.
(৫) Abu al-Hasan Portrait of Shah Jahangir
(৬) Abu'l Hasan, Squirrels in a Plane Tree
(৭) Dong Qichang, Landscape in the Style of Mi Fu
(৮) Dong Qichang. Eight Scenes in Autumn.2. Album leaf
(৯) Clara Peeters, Still Life with a Sparrow Hawk, Fowl, Porcelain and Shells,
(১০) Frans Hals, The Lute Player
(১১) Judith Leyster, Man Offering Money to a Woman (The Proposition)
(১২) Anthony van Dyck, Portrait of Sofonisba Anguissola
(১৩) Anthony van Dyck, Duke of Arundel and duchess Alathea Talbot
(১৪) Anthony van Dyck, Charles I in three positions

অধ্যায় ২০ - ভূদৃশ্য

১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ, নিকোলাস পুস্যাঁ তার দুটি তৈলচিত্রের সামনে দাড়িয়ে ভাবছিলেন। এই তৈলচিত্রগুলো এথেন্সের সেনাপতি ফোসিওনের মৃত্যু প্রদর্শন করছে, যাকে খ্রিস্টপূর্ব ৩১৮ সালে তার শত্রুরা বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছিল, এবং শহরের দেয়ালের মধ্যে তাকে সমাহিত করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। 'ল্যান্ডস্কেপ উইথ দ্য বডি অব ফোসিওন ক্যারিড আউট অব এথেন্স' চিত্রকর্মে আমরা দেখি সাদা চাদরে আবৃত মৃত সেনাপতিকে সংকীর্ণ একটি খাটে শুইয়ে মাটির একটি রাস্তা দিয়ে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন দুই ব্যক্তি, যাদের মাথা খানিকটা সামনে ঝুকে আছে। তাদের অনুসরিত পথটি গ্রাম্য একটি এলাকার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে অগ্রসর হয়েছে। 'ল্যান্ডস্কেপ উইথ অ্যাশেজ অব ফোসিওন কালেক্টেড বাই হিস উইডো', চিত্রকর্মে একজন নারী ছায়ায় মাটির উপরে ঝুকে বসে আছেন, তার মৃত স্বামীর দেহভস্ম খালি হাত দিয়ে মাটি থেকে তুলছেন, এবং একজন গৃহভৃত্য চারপাশে নজর রাখছেন। চিত্রকর্মের পুরোভূমিতে বহু গাছ ভীড় করে আছে, এবং দূরে একট প্রাচীন ধ্রুপদী মন্দির আরো দূরের কিছু ধ্বংসাবশেষের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্যুসাঁ তার চিত্রকর্ম দুটি পালাক্রমে দেখার সময় আড়চোখে টেবিলের উপর একটি 'ভিউয়িং বক্সের' দিকে তাকাচ্ছিলেন। এটি দেখতে নাটকের ক্ষুদ্রাকৃতির একটি মঞ্চের মতো, যা তার আঁকা প্রতিটি দৃশ্য ধারণ করতো। তিনি বহু দিন ধরে সেই ফিগার আর ভবনগুলো মোম দিয়ে নির্মাণ ও আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে কেবল নির্দিষ্ট একটি কোণ থেকে সেই ক্ষুদ্রাকৃতির মঞ্চের ওপর তিনি আলো প্রক্ষেপ করেছিলেন, এটি যে ছায়া সৃষ্টি করছে সেটি যেন সেটি তিনি অধ্যয়ন করতে পারেন। কোনো কিছুই তিনি ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেননি: তিনি তার আঁকা প্রতিটি দৃশ্যের প্রতিটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতেন, ভারসাম্য আর সার্বিক সংহতি সৃষ্টি করতে।

ফ্রান্সের লিয়নের একজন ব্যবসায়ী, ক্রেসিয়েরের জন্য পুস্যাঁ চিত্রকর্ম দুটি সমাপ্ত করেছিলেন। তার নিজের জন্মভূমি ছিল ফ্রান্স। রোমে চব্বিশ বছর থাকা সত্ত্বেও প্রায়শই তিনি ফরাসী চিত্র সংগ্রাহকদের জন্য এঁকেছিলেন। তার পৃষ্ঠপোষকরা ছিলেন সব মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী, যারা যুক্তিসঙ্গত, পরিমিত চিত্রকর্ম উপভোগ করতেন, যেখানে ক্ল্যাসিকাল পর্বের কোনো ঘটনাকে স্থিররূপ দেয়া হয়েছে এবং জীবন নিয়ে দার্শনিক অনুধ্যানে যা সংক্ষেপিত করা হয়েছে।

*

ত্রিশ বছর বয়সে নিকোলাস প্যুসাঁ (১৫৯৪-১৬৬৫) কেন রোমে এসেছিলেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন? তিনি কারাভাজ্জিওর পথ অনুসরণ করেননি এবং নাটকীয় বা হতবাক করে দেবার মতো কিছু সৃষ্টি করেননি। তিনি কাজ পাবার জন্য পোপের তলহীন অর্থ-ভাণ্ডার থেকে সহায়তা পেতে হাত পাতেননি। আসলে পুস্যাঁর জন্য রোম ছিল ক্ল্যাসিকাল পর্বের সব শিল্পকলার প্রাণকেন্দ্র, কারাচ্চির পরে সপ্তদশ শতাব্দীব্যাপী যা ফরাসি শিল্পী এবং 'অ্যান্টিকোয়ারিয়ানদের' (যারা ক্ল্যাসিকাল শিল্প নিয়ে পড়াশুনা করেন) মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল।

পুস্যাঁর চিত্রকর্মে পূরাণ ও ধর্মীয় দৃশ্যগুলো যে ভূদৃশ্যে স্থাপিত ছিল, ক্রমশ সেই দৃশ্যগুলো ভূদৃশ্যের চেয়ে গুরুত্বহীন হতে শুরু হয়েছিল। কেন? এই পর্যায় অবধি ভূদৃশ্যের চিত্রকর্ম পটভূমি ছাড়া আর বেশি কিছু ছিল না, এমন কিছু যা উত্তরীয় রেনেসাঁর জানালা দিয়ে এক ঝলক দেখা যায়, কিংবা যেমন মোনা লিসার ক্ষেত্রে, বহু দূরে দিগন্তে যা অপসৃয়মান। কিন্তু বেশ দ্রুত ভূদৃশ্য পুরো প্রদর্শনীর কেন্দ্রে অবস্থান নিতে শুরু করেছিল। ভূদৃশ্যচিত্র তাকে তার মানবতাবাদী পৃষ্ঠপোষক এবং সমর্থকদের জন্য রোমের গ্রামাঞ্চলকে আদর্শায়িত একটি রূপে উপস্থাপন করার সুযোগ করে দিয়েছিল। তিনি তার নিজের রেখাচিত্রগুলোই মূলত ব্যবহার করেছিলেন, প্রায়শই আরেকজন ফরাসী শিল্পী ক্লড লোরেইনের (এখন শুধু ক্লড নামেই পরিচিত, ক্লড গেলে, ১৬০৪/৫-১৬৪২) সাথে তিনি রোমের আশে পাশে পাহাড়ী দৃশ্যগুলোর রেখাচিত্র তৈরি করতে বের হতেন। এই দুই ফরাসী শিল্পী নতুন

ধ্রুপদীবাদী ভূদৃশ্যচিত্র আঁকার ঐতিহ্যের মূলভিত্তি ছিলেন, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেগুলো ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

ক্লডের সংগ্রাহকরা পুস্যাঁর সংগ্রাহকদের মতো বুদ্ধিজীবী ছিলেন না, তবে তারা ইউরোপের অভিজাত শ্রেণির সদস্য ছিলেন। ক্লডের চিত্রকর্মে গাছ ভূদৃশ্যকে ফ্রেমবন্দি করে রেখেছিল এবং এই গাছই আমাদের সেই দৃশ্যের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে তার আঁকা 'পাস্টোরাল ল্যান্ডস্কেপ' চিত্রকর্মে নদীর তীরের গাছগুলো দৃশ্যের আরো ভিতরে প্রবেশ করতে আমাদের প্রলুব্ধ করে, দূরে অস্পষ্ট পাহাড়ের দিকে আমরা এর পথ অনুসরণ করি। শুধু মাত্রা বোঝাতে, এবং রঙের ভিত্তি হিসেবে মানুষের অগৌণ উপস্থিতি। তার বহু দৃশ্যেই সূর্য উদিত হচ্ছে, প্রতিটি পাতা, প্রতিটি ঘাসকে যা সোনালী আভায় আলোকিত করে। দিনের সমৃদ্ধ আলো এটি যা কিছু স্পর্শ করেছে তার ওপরে, নীচে ও সামনে ভেসে আছে।

ভূদৃশ্যচিত্র প্রাকৃতিক নয়, এটির আসলেই কোনো অস্তিত্ব নেই। ভূদৃশ্যচিত্র মূলত সেই ভূখণ্ডটি নয়, বরং সতর্কভাবে নির্বাচিত দৃশ্য, পৃথিবীর সাথে মানুষের সম্পর্কের একটি বিশেষ কাহিনি বর্ণনা করতে যা আঁকা হয়েছে। প্যুসাঁ আর ক্লডের জন্য সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কাল্পনিক বহু রোমান মন্দির, এবং যা ধ্রুপদীবাদের উষালগ্নের দিকে ফিরে যেতে আমাদের আহবান করে। এর ব্যতিক্রম, ডাচ শিল্পীদের কাছে ভূদৃশ্যচিত্র সমসাময়িক জীবনেরই কোনো একটি দিককে প্রতিফলিত করেছিল। সমতল ভূমিতে দাড়িয়ে থাকা উইন্ডমিল বা বাতচক্র আর চার্চ, অন্ধকার আকাশের নীচে নৌযাত্রা । মধ্যবিত্ত সংগ্রহকারী ও ক্রেতা আগ্রহই মূলত ডাচদের ভূদৃশ্য চিত্রকর্মের উত্থানের নেপথ্য চালিকা শক্তি ছিল যারা। এই ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত কোনো বিশাল প্রাসাদ কিংবা ক্যাথিড্রাল বা মঠে বাস করতেন না, বরং তারা বাইরে, বাস্তব এই পৃথিবীর বাসিন্দা ছিলেন

, যেখানে তাদের জাহাজগুলো পানির উপর নোঙ্গর করা থাকতো, তাদের বাতাসের কলগুলো শস্যক্ষেতের মধ্যে আবর্তিত হতো। প্রতিদ্বন্দ্বী এক জাতির সাথে তারা তাদের এই ভূখণ্ডের জন্য কঠোর সংগ্রাম এবং যুদ্ধ করেছিলেন, এমনকি সমুদ্রের সাথেও তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। নিম্নাঞ্চলীয় হ্রদগুলো থেকে পানি নিষ্কাষণ করে তারা চাষাবাদের জন্য আরো জমি পুনরুদ্ধার করেছিল।

১৬৪৮ সাল ছিল পুস্যাঁ আর ক্লডের ক্ল্যাসিকাল এইসব ভূদৃশ্যচিত্রের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত, কিন্তু নেদারল্যান্ডসে এই তারিখটি ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের অবসান ইঙ্গিত করে, যা ক্যাথলিক হলি রোমান সাম্রাজ্য আর ডাচ প্রজাতন্ত্রসহ প্রোটেস্টান্ট রাষ্ট্রগুলোকে পারস্পরিক সংঘর্ষে নিমজ্জিত রেখেছিল। ১৬৪৮ সালে স্বাক্ষরিত ওয়েস্টফালিয়া চুক্তি শান্তিপূর্ণ নতুন একটি যুগের সূচনা করেছিল। যুদ্ধের ব্যয় সত্ত্বেও ডাচ স্বর্ণালী যুগ ক্ষীণ হয়ে যাবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করেনি। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক মিশন ও বিভিন্ন এলাকা থেকে অর্থের প্রবাহ অব্যাহত ছিল। আর যে বণিকরা এই ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য থেকে লাভবান হয়েছিলেন, চিত্রকর্ম দিয়ে তাদের বাড়ি অলংকরণ করতে বেশ দ্রুত তারা উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয় করেছিলেন । ১৬৪০ থেকে ১৬৫৯ সালের মধ্যে প্রায় এক মিলিয়ন চিত্রকর্ম নির্মিত হয়েছিল, এবং এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরনের শিল্পকর্ম ছিল ভূদৃশ্যচিত্র।

ডাচ শিল্পী ইয়াকব ফন রয়েজডালের (১৬২৮-১৬৮২) এসেছিলেন হারলেম থেকে এবং ভূদৃশ্যচিত্র নির্মাণে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে দারুণ সফল হয়েছিলেন। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে আঁকা তার ‘ভিউ অব নারডেন উইথ দ্য চার্চ অ্যাট মুইডেরবার্গ’ চিত্রকর্মে বিস্তৃত সমতল ভূমি আকাশকে এই চিত্রকর্মে প্রাধান্য বিস্তার করার সুযোগ করে দিয়েছে। এর বিশালতা মুখের উপর বাতাসের প্রবাহ অনুভব করার সুযোগ করে দেয়, যখন

আকাশে মেঘ দ্রুত উড়ে যায় বৃষ্টি হয়ে ঝরার হুমকিসহ। এই চিত্রকর্মগুলো এর ক্রেতা বণিকদের কাছে সতেজ নিঃশ্বাসের মতো ছিল, ডাচ প্রজাতন্ত্রব্যাপী বহু শহরে যারা সংকীর্ণ আবদ্ধ আর জনাকীর্ণ একটি পরিবেশে বাস করতেন। ভূদৃশ্যচিত্র যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তার কোনো আক্ষরিক সৃষ্টিকর্মের নিশ্চয়তা নয়, বরং আপাতদৃষ্টিতে এটির সম্ভাব্য অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। বালয়াড়িগুলো ধূসর সমুদ্র অভিমূখে অগ্রসরমান, আর গাছের শাখার প্রাণবন্ত আকাশের দিকে এর শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে আছে। নতুন পানি নিষ্কাশন পদ্ধতি, যা সমুদ্র থেকে জমি পুনরুদ্ধার করতে ব্যবহার করা হয়েছিল, কিংবা ক্রমবর্ধমান খালের সংযোগগুলোর খুব সামান্যই চিহ্ন সেখানে উপস্থিত। বণিকরা যে ভূদৃশ্যচিত্রগুলো মিলিয়ন সংখ্যক পরিমানে কিনেছিলেন, সেগুলো হয়তো আজ আমাদের কাছে স্মৃতিবেদনায় কাতর কোনো দৃশ্য মনে হতে পারে, গ্রামীণ জীবনের কোনো আদর্শায়িত দৃশ্য, কিন্তু সেগুলো সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ শহরবাসীদের কাছেও এভাবেই আবির্ভূত হয়েছিল।

এলবার্ট কোইপের (১৬২০-১৬৯১) মতো অন্য ডাচ শিল্পীরা ক্লড লোরেইনের কাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং তারা উপকূলবর্তী শহরগুলোর সোনালী দৃশ্য এঁকেছিলেন। ১৬৫৫ সালে আঁকা তার ‘ভিউ অব ডরড্রেখট’ চিত্রকর্ম আমরা একটি নোঙ্গর করা বিশাল দুই মাস্তুলের জাহাজ দেখি, নদীর তীরে সারি বেঁধে গায়ে গা লেগে নোঙ্গর করে রাখা মাছ ধরার নৌকাগুলোর ক্ষুদ্রতা যা আরো প্রকট করে তুলেছে। ডাচ পতাকাবাহী এই জাহাজটি মহাসাগর পাড়ি দিতে পারে, যা ডাচদের বৈশ্বিক বাণিজ্যিক সংযোগ, ডাচ ওয়েস্ট এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীগুলোর প্রতি তথ্যনির্দেশ করছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন এশিয়ায় সফল বাণিজ্যিক সংযোগগুলো পরিচালনা করছিল, ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন সক্রিয় ছিল ব্রাজিলে, চিনি প্রক্রিয়াজাত করতে যেখানে উপকূলীয় এলাকায় তারা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্রাজিলের এইসব ডাচ উপনিবেশের গভর্নর এই নতুন দেশটির মানচিত্র ও ভূপ্রকৃতি আঁকতে ডাচ শিল্পীদের নিয়োগ দিয়েছিলেন, এবং ১৬৪০-

এর দশকে আলবার্ট একহাউট (১৬১০-১৬৬৬) এবং ফ্রান্স পোস্ট (১৬১২-১৬৮০) দুজনেই সেখানে সময় কাটিয়েছিলেন।

পোস্ট ব্রাজিলে আট-বছর থাকাকালীন নতুন ডাচ উপনিবেশের সম্পদ আর দূর্গগুলোর ছবি এঁকেছিলেন, কিন্তু ১৬৪৪ সালে ডাচ প্রজাতন্ত্রে ফিরে আসার পরেই সমাপ্ত করা তার চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় করে তোলা ব্রাজিলের ভূদৃশ্যচিত্রগুলো তাকে খ্যাতি দিয়েছিল। সুপরিকল্পিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে এমন একটি ভূদৃশ্যে স্থাপিত পরিচ্ছন্ন চিনি কারখানায় তিনি অজ্ঞাতানামা কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের এঁকেছিলেন, যেখানে অতিরিক্ত চমক সৃষ্টি করতে এমনকি পাম ট্রি যোগ করা হয়েছিল। এটি স্পষ্টতই কাল্পনিক একটি বিবরণ , বাস্তবতা ছিল বহু হাজার দাস প্রতি বছর অনিরাপদ এই সব চিনির কলে অমানবিক পরিশ্রমের পরিণতিতে প্রাণ হারিয়েছে। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দ, যে সময় নাগাদ পোস্ট 'সুগার মিল' চিত্রকর্মটি এঁকেছিলেন – প্রায় পঁচিশটি সংস্করণের একটি, যা তিনি শেষ করেছিলেন - ততদিনে ব্রাজিলে ডাচ স্বপ্নেরও ইতি হয়েছিল, এর পাঁচ বছর আগে এই উপনিবেশটি পর্তুগীজরা দখল করে নিয়েছিল।

ইউরোপব্যাপী সপ্তদশ শতাব্দীতে ভূদৃশ্য চিত্রকর্মের উত্থান সত্ত্বেও বহু শিল্পী ফিগার নিয়ে কাজ করা অব্যাহত রেখেছিলেন। আত্মপ্রতিকৃতি একটি শৈল্পিক পরিচয় নির্ধারক ছিল যা দক্ষতার নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করতে প্রায়শই শিল্পীরা ব্যবহার করেছিলেন। ১৬৪০ -এর দশকে সৃষ্ট একটি আত্মপ্রতিকৃতিতে ফ্লেমিশ শিল্পী মাইকেলিনা ভাউটিয়ের (১৬০৪ -১৬৮৯) দর্শকের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন, একটি ইজেলের উপর টান টান একটি ক্যানভাসসহ, তার বাম হাতে একটি প্যালেট, এবং ডান হাতে একটি তুলি। তিনি সেই সময়ে বেশ প্রচলিত লেস-নির্মিত দুই কলারের একটি জামা ও ক্রিম সাটিন স্কার্ট পরে আছে, এছাড়া তার গায়ে বেশ বড় ভেলভেটের একটি চাদর - এমন কোনো পোষাক আঁকার সময় তার পরার কথা নয়। গলায় ও কবজিতে মুক্তোয় আলো দ্যুতি ও পরণের সাটিন কাপড়ে স্নিগ্ধ কোমল আভা, এবং তার গালে লালচে আভা ধরার ক্ষেত্রে তিনি তার দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। ১৬৪০ এবং ১৬৫০-এর দশকে যাদের প্রতিকৃতি তিনি এঁকেছিলেন, তাদের মধ্যেও জীবনের শ্বাস সঞ্চারণে তিনি একই দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। চুলের ঔজ্জ্বল্য, শিশুদের স্ফীত মুখ, বয়সের ভারে বৃদ্ধদের কুঞ্চন ধরতে তিনি দারুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

জিয়ান লরেঞ্জো বার্নিনি (১৫৯৮-১৬৪০) উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন যে, ভাস্কররা ভাউটিয়েরের মতো শিল্পীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না, কারণ শুধু আলো আর ছায়া ছাড়া , তারা শিল্পীদের মতো রং নিয়ে কাজ করতে পারেন না। তার বহু ভাস্কর্যে বারোক বিস্ময়ের অসাধারণ প্রতিভার প্রদর্শনীতে তিনি নিজেকেই ভুল প্রমাণ করেছিলেন, যে

কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে বহু পোপ এবং কার্ডিনাল তাকে করার জন্য কমিশন দিয়েছিলেন।

১৬৫১ সালে রোমে সান্তা মারিয়া ডেলা ভিটোরিয়া চার্চে কার্ডিনাল ফেডেরিকো কোরনারোর চ্যাপেলের জন্য বার্নিনি তার 'দ্য এক্সটাসি অব সেইন্ট টেরেসা' সৃষ্টি করেছিলেন। সেইন্ট টেরেসা অতিন্দ্রীয় একটি কল্পদৃশ্য নিয়ে তার আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, তিনি সুন্দর এক দেবদূতকে প্রজ্বলিত সোনালী একটি বর্শা হাতে আবির্ভূত হতে দেখেছিলেন: 'মনে হয়েছিল সে এটি দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ডে বেশ কয়েকবার আঘাত করেছিল যেন এটি আমার শরীরের মধ্যে অঙ্গটিতে প্রবেশ করতে পারে। যখন সে এটি বের করে এনেছিল, দেবদূত ঈশ্বরের জন্য অসীম ভালোবাসায় আমাকে সম্পূর্ণ প্রজ্জ্বলিত করে গিয়েছিল'। এবার বার্নিনির ভাস্কর্যে তাকে দেখুন: তারা মাথা পেছনে দিকে হেলে আছে, চোখ বন্ধ, দুই হাত সমর্পনের ভঙ্গিতে উন্মুক্ত, পায়ের আঙ্গুল যেন খিচুনীতে শক্ত

হয়ে আছে, যেন কোনো ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রতি তার শরীর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করছে। অজ্ঞাতনামা সমসাময়িক একটি লেখা বলেছিল, বার্নিনি এখানে সেইন্টকে একজন পতিতায় রূপান্তরিত করেছেন, এবং টেরেসা ঈশ্বরের স্পর্শের অভিজ্ঞতা অনুভব করছেন যেন তিনি যৌনসুখের চূড়ান্ত মুহূর্ত উপভোগ করছেন। এর ওপরে চাদোয়ায় লুকানো জানালা দিয়ে আলো প্রক্ষেপ করে, ভাস্কর্যটিকে বিশেষ কোণ থেকে আলোকিত করে তোলার মাধ্যমে বার্নিনি এই অভিজ্ঞতাকে আরো প্রকট করে তুলেছিলেন, যেন টেরেসা আরো দ্যুতিময় হয়ে ওঠেন। তিনি এমনকি তাকে দর্শকও দিয়েছিলেন, তার পৃষ্ঠপোষকদের প্রতিকৃতি খোদাই করে দিয়েছিলেন চ্যাপেলের দেয়ালে, যেন কোনো থিয়েটারের বক্সে বসে থাকা দর্শক, যারা সেখানে বসে মঞ্চে অনুষ্ঠিত অপার্থিব পরমানন্দদায়ক একটি দৃশ্য দেখছেন।

বার্নিনি সহকারীদের একটি বড় দল নিয়ে কাজ করতেন, যারা তার বোজেট্টিকে (কাদার মডেল) প্রয়োজনীয় মাত্রায় বড় করে মার্বেল ভাস্কর্যে পরিণত করতেন, আর এটাই তাকে একই বছরে 'এক্সটাসি অব সেইন্ট টেরেসা' এবং রোমের পিয়াৎসা নাভোনায় 'ফোর রিভার ফাউন্টেনের' মতো বড় মাপের কাজ শেষ করতে সহায়তা করেছিল। 'ফোর রিভার ফাউন্টেন' তৈরি করা হয়েছিল পোপ দশম ইনোসেন্টের জন্য, যার পারিবারিক প্রাসাদটি এই পিয়াৎসার অন্য প্রান্তে অবস্থিত ছিল। এই ঝর্নাটি আসলেই বিশালাকার শরীর, প্রাণী এবং ভূতত্ত্বের শক্তিশালী ও অসাধারণ দক্ষতার একটি অর্জন, যা পূর্ণ করেছিল এর সাথে সংযুক্ত একটি প্রাচীন মিসরীয় ওবেলিস্ক।

যখন বার্নিনি পোপ দশম ইনোসেন্টের জন্য 'ফোর ফাউন্টেনের' কাজটি শেষ করেছিলেন , স্পেনের শিল্পী ডিয়েগো রড্রিগুয়েজ ডে সিলভা ই ভেলাসকেস (১৫৯৯-১৬৬০) তার একটি প্রতিকৃতির কাজ শেষ করছিলেন। ভেলাসকেসের অনুসন্ধানী চোখ এবং তীব্র বাস্তবতা পোপের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়নি, কারণ ভেলাসকেস ইতোমধ্যেই তার প্রশাসনের অন্য কর্মকর্তাদের প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। কিন্তু হয়তো তার মতো পঁচাত্তর বছর বয়সী একজন পোপের রুচির কাছে ভেলাসকেসের কাজ খুব বেশি মাত্রায় বাস্তববাদী অনুভূত হয়েছিল - তার মুখে উদ্বেগপূর্ণ অভিব্যক্তি, একটি ভ্রূকুঞ্চন, এবং বিলাসী জীবনের কারণে তার লালচে ত্বক। তিনি বসে আছেন একটি লাল বিশেষ ক্লোক বা আবরণের নীচে সাদা সাটিনের একটি পোষাকের পরে, তার মাথায় একটি টুপি, এবং তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তিনি হয়তো যে-কোনো মুহূর্তে উঠে দাড়াবেন, কাজে ফিরে যাবার জন্য যিনি অস্থির হয়ে আছেন। সমাপ্ত চিত্রকর্মটি পোপের জীবদ্দশায় কখনোই প্রদর্শন করা হয়নি। এটি জায়গা পেয়েছিল তার পরিবারের ব্যক্তিগত বাসভবনে, কিন্তু অসাধারণ একটি প্রতিকৃতি, ক্ষমতার কলুষিত করার প্রভাব, আর গুরুভার দায়িত্বের প্রতিকৃতি।

ভেলাসকেস ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রিদে ফিরে যাবার আগে এর অনুলিপি তৈরি করে নিয়েছিলেন। এই সময় নাগাদ তিনি স্পেনের রাজা চতুর্থ ফিলিপের জন্য কাজ করেছিলেন (রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের নাতি) প্রায় ত্রিশ বছর, এবং ইটালির শিল্পীদের শিল্পকর্ম অধ্যয়ন করে বহু সময় তিনি কাটিয়েছিলেন, যার মধ্যে ছিল টিশানের রগরগে ‘পোয়েজি’। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে, যে সময় নাগাদ তিনি ফিলিপের কন্যাকে এঁকেছিলেন ‘লাস মেনিনাস’ চিত্রকর্মে, ততদিনে তার একটি নিশ্চিৎ আর আত্মবিশ্বাসী শৈলী বিকশিত হয়েছিল।

‘লাস মেনিনাস’ চিত্রকর্মটি পাঁচ বছরের ইনফান্টা মারগারিটা ও তার পরিচর্যাকারীদের একটি প্রতিকৃতি। কিন্তু এটি একই সাথে কর্মরত শিল্পী ভেলাসকেসেরও নিজেরও একটি প্রতিকৃতি। ইনফান্টার পিতামাতার বিশাল একটি দ্বৈত প্রতিকৃতি আঁকছেন এমন একটি ভঙ্গিমায় এখানে তিনি নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। যাকে পেছনের দেয়ালের আয়নায় অস্পষ্ট একটি প্রতিবিম্ব হিসেবে আমরা দেখতে পাই। ভেলাসকেস তার ছবি আঁকার কাজটি রাজার সংগ্রহের রাখার মতো একটি চিত্রকর্মে উপস্থাপন করেছিলেন। এছাড়া নিজেকে রাজকীয় প্রতিকৃতিতে যুক্ত করে তিনি রাজসভার শিল্পীদের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানটির ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। এইভাবে ‘লাস মেনিনাস’ একই সাথে একটি রাজনৈতিক প্রতিকৃতি। স্পেনে এই সময় হাতের কাজ করে এমন শ্রমিকরা - যে গোষ্ঠীটি প্রথাগতভাবে শিল্পীদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছিল - সমাজে সর্বোচ্চ কোনো সংঘে যুক্ত হতে পারতেন না। শিল্পীরা তাদের কাজকে লিবারেল বা উদারপন্থী শিল্পকলা হিসেবে বিবেচনা করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন, হাতের কাজের চেয়ে বরং কবিতার মতো কিছু। ‘লাস মেনিনাস’ ছিল এই বিতর্কে ভেলাসকেসের অবদান, এবং এটি সম্পূর্ণ হবার দুই বছর পরে, উনষাট বছর বয়সে তাকে রাজ্যের সর্বোচ্চ নাইটহুড খেতাব দেয়া হয়েছিল। এটি ভেলাসকেসের জন্য একটি বিজয় ছিল, এবং একই সাথে স্প্যানিশ সব শিল্পীদের জন্য এটি একটি বিজয় ছিল। দুঃখজনকভাবে আরেকজন মহান শিল্পী, যিনি তার জীবনের একটি পর্যায়ে দারুণ সফলতা অর্জন করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার বয়স যখন ষাটের নিকটে, পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করেছিল: রেমব্রান্ট ভ্যান রাইন।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Nicolas Poussin, Landscape with the Body of Phocion Carried Out of Athens
(২) Nicolas Poussin, Landscape with the Ashes of Phocion
(৩) Nicolas Poussin, The Death of Germanicus
(৪) Claude Lorrain (Claude Gellée), View of La Crescenza
(৫) Claude Lorrain, Pastoral Landscape
(৬) Jacob van Ruisdael, View of Naarden and the Church of Muiderberg
(৭) Aelbert Cuyp, View of Dordrecht
(৮) Frans Post, A Sugar Mill (c. 1660)
(৯) Michaelina WautierSelf-portrait, 1649
(১০) Gian Lorenzo Bernini’s Ecstasy of Saint Teresa
(১১) Bernini’s theatrical installation of the Ecstasy of Saint Teresa in Rome,
(১২) Gian Lorenzo Bernini, Fontana dei Quattro Fiumi
(১৩) Diego Velázquez, Portrait of Pope Innocent X
(১৪) Diego Velázquez, Las Meninas ('The Ladies-in-waiting')

অধ্যায় ২১ - স্টিল লাইফ এবং স্থবির জীবন

১৬৫৮ সাল, রেমব্রান্ট ইজেলের উপর রাখা তার চিত্রকর্মটির দিকে তাকালেন: বেশ বড় তার একটি আসীন আত্মপ্রতিকৃতি। এখানে তিনি কালিসদৃশ অন্ধকার একটি পটভূমি থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন, তার পরণে অতিঅলংকৃত সোনালী একটি টিউনিক , এবং কোনো প্রাচীন রাজার মতো ভারী আলখেল্লা পরণে, তার বাম হাত একটি রুপালী ছড়ি ধরে আছে, যেন সেটি কোনো রাজদণ্ড। তার টুপিটি দীর্ঘ দিনের উদ্বেগে ক্লান্ত বিষণ্ন চোখগুলোয় ছায়ায় আবৃত করে রেখেছে, চিবুকে কিছু খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, কিন্তু তার ডান হাত, যে হাতটি তিনি আঁকতে ব্যবহার করেন, সেটি চেয়ালের হাতল ধরে আছে এবং সম্পূর্ণ আলোকিত, যেন এটাই এই প্রদর্শনীর মূল তারকা। ক্রমশ তিনি তার প্রতিকৃতি আঁকতে তুলির প্রশস্ত আঁচড় ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন, কখনো এমনকি প্যালেট নাইফ ব্যবহার করে চ্যাপটা করে লেপটে দিয়েছেন রং, মোটা রঞ্জকের দানাগুলোকে ঘষে ঘষে ক্যানভাসের উপরে ব্যবহার করেছেন বাড়তি একটি গঠনবিন্যাস যোগ করতে। এই আত্মপ্রতিকৃতিতে তার মুখ আর হাতই শুধু বিস্তারিতভাবে আঁকা হয়েছে যেন এখানে এই দুটি অংশই শুধু গুরুত্বপূর্ণ।

আর যা-ই হোক না কেন, এটি হচ্ছে সেই হাত যা তাকে প্রচুর খ্যাতি এনে দিয়েছিল। যে সব চিত্রকর্ম এটি সৃষ্টি করেছিল, সেগুলো তাকে সুযোগ করেছিলেন সেই সব সম্পত্তি ক্রয় করতে, এখন যেখানে তিনি অবস্থান করছেন, আমস্টারডামের বিত্তশালী এবং আধুনিক একটি এলাকায়। পাঁচ-তলা বিশাল এই টাউনহাউসটি তিনি সাজিয়েছিল টিশান এবং ডুরারের কাজসহ অন্য বহু শিল্পীর আঁকা বহু ধরনের চিত্রকর্ম আর ছাপচিত্র দিয়ে, এবং তার স্টুডিও পূর্ণ ছিল বিচিত্র সাজপোষাক এবং উপাদানে, যেগুলো এসেছিল পৃথিবীর বহু দেশ থেকে - চীনা রেশমী কাপড়, পারসিক পাগড়ি, ডাচ যুদ্ধাস্ত্র। কিন্তু তার এই সব বেহিসেবী খরচ অবশেষে তাকে বিপদে ফেলেছিল। একদা ডাচ প্রজাতন্ত্রের প্রধানতম শিল্পী, এখন প্রায় দেউলিয়া, এই সব কিছুই এখন বিক্রয় করতে তিনি বাধ্য হচ্ছেন।

*

রেমব্রান্ট হারমেন্সজুন ভান রাইন (১৬০৬-১৬৬৯), এখন শুধু রেমব্রান্ট নামেই পরিচিত, আসলেই বর্ণিল এক চরিত্র ছিলেন। কিন্তু কী ধরনের চরিত্র সেটি সেই দিনের উপর নির্ভর করতো। সমস্ত জীবন ধরেই তিনি রেখাচিত্র, ছাপচিত্র এবং চিত্রকর্মে আত্মপ্রতিকৃতি নির্মাণ করেছিলেন, প্রায় আশিটিরও বেশি আত্মপ্রতিকৃতির এখনো অস্তিত্ব আছে। তেইশ বছর বয়সে তার এলোমেলো অপ্রশম্য বাদামী চুল আঁকতে গিয়ে তিনি ভেজা রঙের উপর তুলি ভুল প্রান্ত দিয়ে আঁচড় কেটেছিলেন, যা তার সন্তুষ্টিপূর্ণ সাদৃশ্যটিকে বুনো প্রাণশক্তি দিয়ে ঘিরে ছিল। একটি আত্মপ্রতিকৃতিতে আমরা পঁচিশ বছর বয়সী রেমব্রান্টকে দেখি, যিনি পারসিক পাগড়ি মাথায় দিয়ে বেশ ফোলানো একটি রেশমী আলখাল্লা গায়ে জড়িয়ে দাড়িয়ে আছেন, পায়ের কাছে বসে একটি তার পোষা কুকুরটি - এখানে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন একজন উচ্চাকাঙ্খী শিল্পী হিসাবে, যিনি একজন আন্তর্জাতিক তারকা হিসেবে নিজের চিহ্ন রেখে যেতে আগ্রহী। অন্য আত্মপ্রতিকৃতিতে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন লোমশ পশুচর্মের প্রান্ত দিয়ে সজ্জিত ডাবলেট (গলাবন্ধনীসহ আঁটোসাঁটো একধরনের পোষাক) ও জোড়া লাগানো জ্যাকেটে, কিংবা তার প্রথম স্ত্রী সাসকিয়ার সাথে হাস্যরত ও মদ্য পান করছেন, এবং কখনো নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন বিত্তশালী ব্যবসায়ী রূপে চমৎকার সাদা রাফ (ভাজ করা মসলিন অথবা লিনেনের বড় গোল গলার বন্ধনী বা কলারসহ পোষাক) পরিচ্ছদে। তিনি নিজেকে যে-কোনো চরিত্রেই রূপান্তরিত

করতে পারতেন তার অন্তর্ভেদী সাদৃশ্যকে অক্ষুণ্ন রেখে, আর সেই কারণে আপনার জন্যেও তিনি সেই একই কাজ করতে পারতেন, যদি আপনি তাকে কমিশন দিতেন। খুব শীঘ্রই তিনি বিত্তশালী শহুরে বণিক ও শহরের গিল্ড বা পেশাজীবিদের সমিতিগুলোর প্রধান একজন শিল্পীতে পরিণত হয়েছিলেন। তাকে দিয়ে প্রতিকৃতি আঁকাতে সবাই আগ্রহী ছিলেন।

১৬৪২ সালে হারকেবুজিয়ার বা সশস্ত্র পৌর নিরাপত্তা বাহিনীর একটি ডিভিশন তাদের দলগত প্রতিকৃতি আঁকতে রেমব্রান্টকে কমিশন দিয়েছিল। এখন এটি পরিচিত 'দ্য নাইট ওয়াচ' নামে, এই সুবিশাল চিত্রকর্মটি প্রদর্শন করেছিল কীভাবে তিনি দলগত বা গ্রুপ প্রতিকৃতি আঁকার কৌশলটি পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। এর আগে যা ছিল ভবিষ্যতের জন্য স্থবির কিছু মানুষের সারিবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে থাকার চিত্রকর্ম, সেটি তিনি উৎসবমুখর সক্রিয় নিরাপত্তা প্রহরীদের অসাধারণ একটি চিত্রকর্মে রূপান্তরিত করেছিলেন। ক্যাপটেন কক এবং তার অনুসারী সৈন্যরা বন্দুক, বর্শা আর উড়ন্ত পতাকা নিয়ে খিলান আবৃত একটি পথে ঢোলের শব্দের ছন্দে কুচকাওয়াজ করে অগ্রসর হচ্ছেন, একটি কুকুর চিৎকার করছেন, একটি মেয়ে মাথা ঘুরিয়ে এই কুচকাওয়াজ দেখছে। এটি ছিল রেমব্রান্ট তার শ্রেষ্ঠতম সময়। কিন্তু ১৬৫৮ সাল নাগাদ প্রতিকৃতির কাজ ক্রমশ কমে আসতে শুরু করেছিল, তার শিথিল শৈলী সেই সময়ে বিস্তারিত প্রকৃতিবাদী বাস্তবতা থেকে ভিন্ন ছিল, এবং ছাপচিত্র সৃষ্টি করতে তাকে ক্রমশ আরো বেশি সময় কাটাতে হয়েছিল।

ছাপচিত্র সৃষ্টি করতে রেমব্রান্ট 'এচিং' পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। এচিং এনগ্রেভিং (খোদাই) পক্রিয়ার মতো, কিন্তু পরিশ্রমসাধ্য উপায়ে ধাতুর পাতের উপর আঁচড় কাটার বদলে মোম গলিয়ে আবৃত করা তামার একটি পাতের ওপর সেই মোমের পাতলা স্তরে রেখাচিত্র আঁকতে রেমব্রান্ট 'বিউরিন' (খোদাই করার জন্য ধাতব একটি উপকরণ) ব্যবহার করেছিলেন। যখন রেখাচিত্র আঁকা শেষ হতো, এই প্লেটটিকে অ্যাসিডের একটি দ্রবনের মধ্যে ডোবানো হতো, অ্যাসিড আচড়ের কারণে মোম থেকে উন্মুক্ত ধাতুর উপর দাগ সৃষ্টি করতো, ছাপচিত্রের জন্য কালি ধারণ করতে সক্ষম এমন রেখা সৃষ্টি হতো।

রেমব্রান্ট প্রায়শই তার ছাপচিত্রগুলোর ওপর একাধিকবার কাজ করেছিলেন, কোনো চরিত্রকে মুছে ফেলা, কিংবা কোনো বিশেষ ছায়া সৃষ্টি করে বা কোনো অংশের উপর গুরুত্বারোপ করা। তিনি ভার্নিশ ব্যবহার করে সেই দাগগুলো পূর্ণ করতে দিতেন যা আর তার দরকার ছিল না। জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীতে তার খ্যাতির একটি বড় অংশ মূলত

এসেছে তার সমৃদ্ধ টোন সৃষ্টি করা ধর্মীয় নানা বিষয়ের এচিংগুলো থেকে, যেমন ১৬৫৩ থেকে ১৬৬০ সালের মধ্যে করা 'দ্য থ্রি ক্রসেস'।

দেশে-বিদেশে একাধিক যুদ্ধ পরিচালনার পরিণতিতে সপ্তদশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে আমস্টারডামের সমৃদ্ধি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছিল। চীনের অস্থিতিশীল একটি পর্বে পোরসেলিন রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাবার কারণে ইউরোপ জুড়েই একটি সরবরাহ ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছিল। আর এই পরিস্থিতি ডাচ মৃৎশিল্পীদের জন্য একটি সুখবর ছিল, বিশেষ করে ডেলফটে যারা কর্মরত ছিলেন। স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা নীল সাদা চীনা পোরসেলিনের অনুকরণ সৃষ্টি করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই অনুলিপিগুলো 'ডেলফটওয়্যার' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল, এবং মৃৎশিল্পকে অর্থকরী একটি বাণিজ্যে রূপান্তরিত করেছিল। আর এই বাণিজ্য মাত্র ২০,০০০ বাসিন্দার ছোট এই শহরটিকে শিল্পকলার সমৃদ্ধ একটি কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। ইয়োহানেস ভারমিয়ের (১৬৩২-১৬৭৫) এখানে জন্মগ্রহন করেছিলেন এবং ১৬৫০ সালে পিটার ডে হোখ (১৬২৯-১৬৮৪) রটারডাম থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিলে। ভারমিয়েরকে প্রভাবিত করেছিল গেরার্ড টের বর্খের জনরা চিত্রগুলো, বহু দেশভ্রমণে অভিজ্ঞ এই ডাচ শিল্পী স্বদেশে ফিরে আসার আগে রোম ও স্পেনে চতুর্থ ফিলিপের রাজসভায় সময় কাটিয়েছিলেন। টের বর্খ কাপড় আঁকার ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন এবং তিনি পরিকল্পিতভাবে সজ্জিত বিত্তশালী গৃহস্থালীর অন্তরঙ্গ

দৃশ্য সৃষ্টি করেছিলেন - ল্যুট বাজানো, চিঠি পড়া - সাদা সাটিনের স্কার্টের উপর আলোর সূক্ষ্ম দ্যুতি ধারণ করতে পারার ক্ষমতা প্রদর্শন করার লক্ষ্যে।

ভারমিয়েরও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে কিংবা চিঠি পড়তে ব্যস্ত নারীদের এঁকেছিলেন, কিন্তু তার চিত্রকর্মে সুস্পষ্টভাবেই স্বাতন্ত্র্যসূচক একটি স্থিরতা ছিল। সাটিনের স্কার্টের পরিবর্তে তিনি খুব সতর্কতার সাথে সাধারণ কিছু উপাদানের সূক্ষ্ম অনুপুঙ্খ পুনঃসৃষ্টি করেছিলেন তার 'উওমেন ইন ব্লু রিডিং এ লেটার' চিত্রকর্মে (১৬৬৩-৬৪)- চেয়ারের পেছনে অলংকরণের পেরেকগুলো, সম্প্রতি দেয়ালে লাগানো মানচিত্রের ভাজ, শীতল ধূসর আলো, যা স্থিরভাবে প্রক্ষেপিত হয়েছে তার গর্ভবতী স্ত্রী ক্যাথ্যারিনার ওপর, জানালার দিকে মুখ করে আমরা তাকে একটি চিঠি পড়তে দেখি। গত অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম যে, পুস্যাঁ একটি ভিউয়িং বক্সের মধ্যে মোমের মডেলগুলো সাজিয়ে নিয়ে আলোর উৎস নিয়ন্ত্রণ করতেন যেন তিনি আঁকার আগে কোনো দৃশ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারেন। অনেকেই বিশ্বাস করেন ভারমিয়ের এমনকি আরো অগ্রসর হয়েছিলেন, অপটিক্স বা আলোকবিজ্ঞানের নতুন কিছু আবিষ্কারের কারণে। ক্যামেরা অবস্কুরা জন্য তিনি তার বাসাটিকেই একটি মঞ্চে পরিণত করেছিলেন। আমরা যে ক্যামেরাকে চিনি তার একটি পূর্বসূরি হচ্ছে ক্যামেরা অবস্কুরা। এটি সামনের কোনো দৃশ্যকে লেন্সের মাধ্যমে প্রতিফলিত করে, সেটিকে উলটো করে একটি অন্ধকার কক্ষের পেছনের দেয়ালে প্রক্ষেপ করে। এটি হয়তো ভারমিয়েরকে সুযোগ করে দিয়েছিল চেয়ার, টেবিল, জগ এবং এমনকি মানুষকে নানা ধরনের অবস্থানে সাজিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে, প্রতিটি গঠনবিন্যাসে এভাবেই হয়তো তিনি নানা উপাদানগুলোর মধ্য আকর্ষণীয় একটি ভারসাম্য সৃষ্টি করেছিলেন। যেহেতু তিনি খুবই ধীরগতিতে কাজ করা শিল্পী ছিলেন, তার জন্য এটি সম্ভবত বেশ উপযোগী একটি উপকরণ ছিল। তিনি এমনকি প্রক্ষেপিত দৃশ্যের বহিঃরেখা একে নিতে পারতেন মূল ক্যানভাসে কাজ শুরু করার আগে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ হিসেবে। এভাবে যে বিষয়গুলো তার কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হতো, সেগুলোর ওপর তিনি মনোযোগ দিতে পারতেন: যেভাবে তার সামনে আলো

মানুষ আর বস্তুকে রূপান্তরিত করে সেটি ধারণ করতে এবং সামান্য কিছু রং - বিশেষ করে ডেলফট নীল আর হলদে গিরিমাটি ব্যবহার করে তিনি সংহতিপূর্ণ একটি বিন্যাস তৈরি করতে পারতেন।

পিটার ডে হোখও গৃহস্থালী পরিবেশকে তার শিল্পকলার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছিলেন কিন্তু তিনি তার দৃশ্যগুলো ভারমিয়েরের মতো কোনো একটি ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রাখেননি, তিনি খোলা জানালা, দরজার ওপাশে অন্য জীবনের চিত্র এবং দৃশ্য আঁকতে আনন্দবোধ করতেন। এছাড়া তিনি বাইরে, বাড়ির পেছনের উঠানের প্রবেশ করেছিলেন , পানির পাম্প, ঝাড়ু, চারকোনা পাথরে আবৃত মেঝে, দূরে খোলা দরজা এঁকেছিলেন তার ‘উওমেন অ্যান্ড মেইড ইন এ কোর্টইয়ার্ড’ চিত্রকর্মে (১৬০০-৩)। তার চিত্রগুলো আঁকা হয়েছিল ডেলফট এবং অ্যামস্টারডামে, যেখানে ১৬৬০ সালে তিনি স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, এবং মূলত নারীদের তিনি এঁকেছিলেন, পরিচারিকা থেকে গৃহকর্ত্রী সবাইকে , যারা দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত, দোলনা দুলানো থেকে শুরু করে পয়সা গোনা, শিশুদের নির্দেশনা কিংবা রান্না করতে।

ভারমিয়ের, ডে হোখ এবং টের বর্খের মতো সপ্তদশ শতাব্দীর শিল্পীদের চিত্রকর্মগুলো আমাদের জন্য ঐতিহাসিক সাহিত্য কিংবা বাইবেল থেকে কোনো কাহিনি উপস্থাপন করেনি, যেভাবে ইটালিতে তাদের সমসাময়িকরা করেছিলেন। টেবিলের উপর স্থাপিত বস্তুগুলো নির্বাচন, কিংবা ফিগারগুলোর সজ্জা থেকে নৈতিক একটি বার্তা প্রায়শই আবিষ্কার করা সম্ভব, কিন্তু সপ্তদশ শতকের ডাচ শিল্পীরা চিত্রকর্ম আঁকার আলো, রূপ ও বিন্যাসসংক্রান্ত শিল্পটিকে উপস্থাপনের সময় সেখানে কোনো গল্পের অনুপস্থিতি বরং আপাতদৃষ্টিতে উপভোগ করতেন। কাহিনীর অনুপস্থিতিতেই তারা এই বিষয়গুলোকেই মূলত গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করতে পারতেন। তারা তাকানো এবং আলোকবিজ্ঞানের দক্ষতার ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, সেই সময়ে যা আলোচিত একটি বৈজ্ঞানিক বিষয় ছিল। যেভাবে কাহিনীগুলো এটি কেমন হতে পারে সেটি 'কল্পনা' করে, সেটি নয়, বরং কীভাবে এই পৃথিবীকে 'দেখা' হয়ে থাকে সেটাই তারা তাদের কাজে অনুসন্ধান করেছিলেন।

এর ব্যতিক্রম, ইটালির শিল্পী এলিজাবেট্টা সিরানি (১৬৩৮-১৬৬৫) তার চিত্রকর্মে এই ধরনের কাহিনী চিত্রায়িত করেছিলেন। বোলোনিয়ায় তারা বাবার কর্মশালায় প্রশিক্ষিত হবার পরে , এই কর্মশালা ও এখানে কর্মরত সব পুরুষ সহকারীদের পরিচালনা করার সার্বিক দায়িত্ব নিয়েছিলেন মাত্র ষোল বছর বয়সে, যখন তার বাবা গেঁটেবাতের কারণে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। পরের দশ বছর তিনি তার পিতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন - যিনি ছিল গুইডো রেনির সবচেয়ে সেরা শিক্ষার্থী – এবং পরে বোলোনিয়ার প্রথম সারির শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আর্টেমিসিয়া জেনটিলেস্কির মতো, তার বিশেষত্ব ছিল বাইবেল কিংবা ধ্রুপদী পর্বে শক্তিশালী নারী চরিত্রদের আঁকা। তবে, জেন্টিলিস্কির ব্যতিক্রম তিনি সেগুলো নাটকীয়তাপূর্ণ পরিস্থিতি কিংবা নাটোকোচিত রূপে আলো ব্যবহার করে আঁকেননি, বরং আদর্শবাদের ধ্রুপদী পথ অনুসরণ করেছিলেন, অ্যানিবাল কারাচ্চির কাজে যা আমরা প্রথম দেখেছি, এবং যা হস্তান্তরিত হয়েছিল কারাচ্চি অ্যাকাডেমিতে পড়া সব শিল্পীদের মধ্যে, যেমন রেনি।

১৬৬৪ সালে তার 'পোর্শিয়া ওয়াউন্ডিং হার থাই' চিত্রকর্মে সিরানির একটি নাটকীয় মুহূর্ত নির্বাচন করা সত্ত্বেও সেখানে তীব্র আবেগের খুব সামান্যই উপস্থিতি ছিল যা জেন্টিলিস্কি তার আঁকা নারীদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। রোমান সিনেটর ব্রুটাসের স্ত্রী পোর্শিয়াকে আমরা প্রায় নিষ্ক্রিয়ভাবে হাতে একটি ছোট ছুরি ধরে থাকতে দেখি, যা ব্যবহার করে তিনি নিজের শরীরে একটি ক্ষত সৃষ্টি করেছেন। তার শরীর মসৃণ, শৈলীবদ্ধ ও আদর্শায়িত। পোর্শিয়া নিজেকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিলেন দেখাতে যে, নারীরাও পুরুষদের মতো সাহসী হতে পারে এবং সেই কারণে পুরুষালী গোপন তথ্য সুরক্ষিত রাখতে তাদের ওপর ভরসা করা উচিত - এই ক্ষেত্রে তথ্যটি ছিল জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করার প্রস্তাবনাটি। সিরানি এখানে পোর্শিয়াকে অন্য কোনো নারীদের সাথে আলাপচারিতায় উপস্থাপন করেননি, যারা দূরের একটি কক্ষে বসে আছেন অথবা ব্রুটাসকে কিছু জানাতেও তিনি অনুরোধ করছেন না। এর পরিবর্তে সিরানি তার একক সাহসিকতার উপর মনোযোগ দিয়েছিলেন, কীভাবে পোর্শিয়া তার নিজের নিয়তির পরিচালক। হয়তো সিরানী তার সাথে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন, একজন নারী যিনি কিনা পুরুষদের পৃথিবীতে নিজের অবস্থান সৃষ্টি করার প্রচেষ্টায় সংগ্রাম করছেন।

তার এই চিত্রকর্ম আঁকার চার বছর আগে তিনি নারীদের জন্য একটি শিল্পকলা অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইউরোপ যা ছিল প্রথম এই ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান। বোলোনিয়া সবসময়ই নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল, যদিও ইউরোপের অন্যত্র নারী শিল্পীরা ক্রমশ তাদের পেশাগত ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তারপরও শিল্পী পিতামাতা ছাড়া কোনো নারীদের শিল্পী হবার বিষয়টি বেশ দুর্লভ ঘটনা ছিল। সিরানির একাডেমিটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ এটি শিল্পী নয় এমন পরিবারের নারীদের শিল্পী হিসেবে প্রশিক্ষণ নেবার সুয

োগ করে দিয়েছিল। তিনি তার ছোট বোনদের, এবং চোদ্দ জন অন্য নারীদের পেশাজীবী শিল্পী হবার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, এবং নিজের প্রায় দুই শত চিত্রকর্ম রেখে গিয়েছিলেন যখন মাত্র সাতাশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। পরবর্তীতে শিল্পকলার ইতিহাসে যদিও উপেক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার মৃত্যুর সময় তাকে রেনির একজন সমকক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল , শহর থেকে তাকে আনুষ্ঠানিক আন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে বিদায় জানানো হয়েছিল এবং রেনির নিজের কবরে তাকে সমাহিত করা হয়েছিল।

ডাচ প্রজাতন্ত্র এবং ফ্ল্যান্ডার্সে যদিও সিরানির প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমির মতো কোনো প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান ছিল না, কিন্তু পুরুষ শিল্পীরা নারী শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতেন। অ্যান্টওয়ার্পে এরকমই একজন শিল্পী ছিলেন ইয়ান ডাভিডস ডে হিম (১৬০৬-১৬৮৪), একজন প্রতিষ্ঠিত মূলত ফুলের ‘স্টিল লাইফ’ শিল্পী, যার কর্মশালায় ষোল বছর বয়সে মারিয়া ভান উস্টারভিক (১৬৩০-১৬৯৩) শিক্ষানবীশ শিল্পী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তার আঁকা ‘ভ্যানিটাস’ (১৬৬৮) স্টিল লাইফ চিত্রকর্মটি ফুল প্রদর্শনের সেই সব বিষয়গুলো আত্মভূত করেছিল যেভাবে তার শিক্ষক ডে হিম আঁকতেন, কিন্তু এর সাথে তিনি মরনশীলতার প্রতীক হিসেবে একটি মানব খুলি, ভুট্টা খাওয়া একটি ইদুর এবং একটি রেড অ্যাডমিরাল প্রজাপতি যুক্ত করেছিলেন।

১৬৩০-এর দশকে ডাচ প্রজাতন্ত্রকে আচ্ছন্ন করে রাখা ‘টিউলিপোম্যানিয়া’ পর্বের পরে ফুলের চিত্রকর্মগুলো ‘স্টিল লাইফ’ চিত্রকর্মের বাজারের জনপ্রিয় একটি সংযোজনে পরিণত হয়েছিল।

টিউলিপের জন্য এই উন্মত্ততায় এমনকি টিউলিপের একটি বাল্ব বা কন্দও একটি বাড়ির দামে বিক্রয় হয়েছিল অস্বাভাবিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের পরিণতিতে, এবং বাজারের অস্বাভাবিকতা অবশেষে শেষ হয়েছিল ভয়ঙ্কর একটি দর পতনের মধ্য দিয়ে, বাজার অর্থনীতির সাথে যুক্ত কোনো অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের এটাই ছিল প্রথম উদাহরণ। এইসব ফুল ও অন্যান্য ফুলের ছবি ক্রমশ সবচেয়ে মূল্যবান চিত্রকর্মে পরিণত হয়েছিল। সবচেয়ে আরাধ্য লম্বা দাগাঙ্কিত টিউলিপ, এখন লিলি আর গোলাপের পাশে চিত্রকর্মে আবির্ভূত হতে শুরু করেছিল, যদিও সেগুলো একই সময়ের ফোটার মতো ফুল ছিল না। শিল্পীরা ফুলের চিত্রসহ ক্যাটালগ থেকে তাদের তথ্য সংগ্রহ করতেন, যেখানে বিভিন্ন ঋতুতে ফোটা ফুলের তালিকা থাকতো।

র‍্যাচেল রুইশ (১৬৬৪-১৭৫০) তার প্রজন্মের অন্যতম সেরা ফুলের শিল্পীতে পরিণত হয়েছিল, য িনি তার জীবনের আশির দশক অবধি ছবি এঁকেছিলেন। যদিও বহু ডাচ শিল্পী বই থেকে বিভিন্ন ধরনের একক ফুলের বিন্যাস-সমাবেশ করে ফুলের সজ্জা সৃষ্টি করতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, কিন্তু রুইশ তার চিত্রকর্মগুলো জীবন্ত করে তুলতে পারতেন। তারা বাবা ছিলেন একজন শারীরস্থানবিদ ও উদ্ভিদবিদ, সুতরাং তার কাছে হাতে রং করা এনগ্রেভিং করা বই হয়তো লভ্য ছিল, যেমন, মারিয়া সিবাইলা মেরিয়ানের ‘‘নিউ ফ্লাওয়ার বুক’’ (১৬৮০)। তিনি আলো আর ছায়া ব্যবহার করে তার চিত্রকর্মে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন প্রতিটি ফুলকে গভীরতা দিতে, যা তিনি গতিময় প্রদর্শনী হিসেবে সতর্কভাবে সাজিয়েছিলেন।

রুইশের 'ভাস উইথ ফ্লাওয়ার্স' (১৭০০) চিত্রকর্মে গাঢ় নীল ফ্ল্যাগ আইরিসের বিপরীতে ভারসাম্য রক্ষা করছে লাল-সাদা দাগকাটা টিউলিপ, এর পাপড়িগুলো উন্মুক্ত, নীচে গোলাপী পিয়োনি, বুনো সাদা গোলাপ আর নীল ব্লু-টিপড কনভলভ্যুলাসের গুচ্ছে একটি ভাঙ্গা বা কাটা বোঁটার নীচে জড়ো হয়ে আছে, যেন একটি মৃত ফুলকে ইতোমধ্যেই এই ফুলের সজ্জা থেকে অপসারিত করা হয়েছে। আর এটাই প্রতিটি ফুলের সজ্জার অন্তর্নিহিত বার্তাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, জীবনের সৌন্দর্য আর সংক্ষিপ্ততা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় ফ্রান্সে এই সক অনুভূতি আর আবেগ, এবং এই শিল্পকর্মগুলো ক্রমশ তাদের আবেদন হারাতে শুরু করেছিল। ফরাসী অভিজাত শ্রেণির মধ্যে ক্রমশ শোভাবৃদ্ধির অলঙ্কারিষ্ণু শূন্যগর্ভ চিত্রকর্মগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছিল, যেখানে মৃত্যুকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, এবং অসীম কোনো কল্পনা রূপে জীবনকে প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু বিলাসী পলায়নী প্রবৃত্তি অবশেষে অনেক মূল্যবান প্রমাণিত হয়েছিল।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Rembrandt van Rijn, Self-Portrait
(২) A collage of Self-Portraits by Rembrandt
(৩) Rembrandt, The Night Watch (Dutch: De Nachtwacht)
(৪) Rembrandt, Sleeping Puppy,
(৫) Rembrandt, Christ Crucified between the Two Thieves: The Three Crosses (৬
) Gerard ter Borch, Woman writing a letter
(৭) Johannes Vermeer, Woman Reading a Letter
(৮) Pieter de Hooch, A Woman and a Maid in a Courtyard
(৯) Guido Reni St Matthew and the Angel
(১০) Elisabetta Sirani, Portia Wounding her Thigh
(১১) Maria van Oosterwijck, Vanitas-Still Life
(১২) Maria Sibylla Merian, Pineapple with cockroaches
(১৩) Rachel Ruysch,Vase with Flowers

অধ্যায় ২২ - রোকোকো পলায়নী প্রবৃত্তি এবং লন্ডনের জীবন

১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ, জ্যাঁ-আন্তোয়ান ভাতো প্যারিসে ফরাসী অ্যাকাডেমির সম্মেলন কক্ষে একটি জানালার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাড়িয়ে আছেন। সামনেই দাড়িয়ে আছে তার প্রজন্মের শীর্ষস্থানীয় শিল্পীরা, এবং সবাই তার সাম্প্রতিক চিত্রকর্মটির দিকে তাকিয়ে আছেন, 'পিলগ্রিমেজ টু দ্য আইলে অব কাইথেরা'। পাঁচ বছর আগে ভাতোকে তার একটি চিত্রকর্ম উপস্থাপন করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তার ব্যক্তিগত নানা কমিশনের কাজগুলো সম্পন্ন করতে তিনি ব্যস্ত ছিলেন, এবং সময় পেরিয়ে গিয়েছিল। এছাড়া, তিনি চেয়েছিলেন যেন তার সবচেয়ে সেরা কাজটি এখানে প্রদর্শনীর জন্য উপস্থাপন করতে পারেন, কারণ এটি অ্যাকাডেমির সংগ্রহশালায় যুক্ত হবে - এই সমিতির সদস্য হবার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্য - এবং এটি প্রদর্শিত হবে অ্যাকাডেমির কোনো একটি প্রদর্শনী কক্ষে যা বিস্তৃত হয়ে আছে ল্যুভের (প্রাক্তন একটি রাজপ্রাসাদ) দ্বিতীয় তলাব্যাপী। এবং এটি দেখবেন সরাসরি জীবন থেকে রেখাচিত্র আঁকার প্রশিক্ষণ নেয়া শিল্পী, শ্রদ্ধেয় অতিথি এবং তার সব শিল্পী সহকর্মী আর প্রতিদ্বন্দ্বীরা।

অ্যাকাডেমির পরিচালক এবার ভাতোকে উদ্দেশ্য করেই একটি সমস্যা ব্যাখ্যা করলেন। প্রতিটি শিল্পী যারা অ্যাকাডেমির সদস্য হন, তাদেরকে কোনো না কোনো একটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়: ঐতিহাসিক চিত্রকর্ম, প্রতিকৃতি, জনরা দৃশ্য, ভূদৃশ্যচিত্র অথবা স্টিল লাইফ। এখানে একটি প্রাধান্যপরম্পরাও আছে, ইতিহাসের বিষয় নিয়ে আকা চিত্রকর্ম সবার উপরে - বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়বস্তু আর শিল্পীর মুন্সিয়ানার একটি সমন্বয়ের কারণে যার বিশেষ মূল্য দেয়া হয়ে থাকে - এবং সবচেয়ে নীচে হচ্ছে স্টিল লাইফ। অ্যাকাডেমির সমস্যা হচ্ছে তারা ভাতোকে কোন শ্রেণিতে স্থাপন করবেন। তার এই চিত্রকর্মে ভালোবাসার সেই প্রাচীন গ্রিক দ্বীপ কাইথেরায় অভিজাত শ্রেণির বেশ কিছু যুগলকে আমরা দেখি। এটি আংশিক পুরাণভিত্তিক ভূদৃশ্যচিত্র এবং আংশিক রাজসভার প্রতিকৃতি চিত্রকর্ম। বাতাস যেন উজ্জ্বল কুয়াশার রূপ নিয়েছে আফ্রোদিতির জাদুর মন্ত্রে, সেই বাতাসে স্রোতে আনন্দর চেরাবরা ভাসমান। কিন্তু এটিকে কোন শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে? ভাতোকেই বা কোন শ্রেণিতে জায়গা দেয়া যেতে পারে? অ্যাকাডেমির সদস্যরা দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। অ্যাকাডেমির বয়স তখন প্রায় সত্তর বছর, কিন্তু এর আগে এ ধরনের সমস্যার কথা কেউ মনে করতে পারছিলেন না।

অবশেষে, নতুন একটি শ্রেণি সৃষ্টি করার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছিল, এবং সেভাবেই তার কাজটিকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। তারা এই শ্রেণির নাম দিয়েছিলেন 'ফেট গালান্টেস' যার অর্থ হচ্ছে কেতাদুরস্ত মার্জিত বহিঃদৃশ্য। আর এভাবেই ভাতো অবশেষে অ্যাকাডেমির সদস্য হয়েছিলেন 'ফেট গ্যালান্টেসের' একজন শিল্পী হিসেবে।

*

জ্যাঁ-আন্তোয়ান ভাতো (১৬৮৪-১৭২১) টিশান আর রুবেন্সের কাজ থেকে তার 'ফেট গ্যালান্টেস' ঘরানার চিত্রকর্মগুলো সৃষ্টির অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন। কোমল স্বপ্নাবিষ্ট আকাশের নীচে ধ্রুপদী ভূদৃশ্যচিত্রের ওপর তিনি প্রেমকাহিনিগুলো মঞ্চস্থ করেছিলেন, তার রংগুলোকে আরো মধুর আর মসৃণ করে তুলতেন প্যাস্টেলের আঁচড় আর রঙের মাত্রা ব্যবহার করে, যেগুলো তার পৃষ্ঠপোষকদের সোনালী রঙে আবৃত রোকোকো অন্দরমহলগুলোর পরিপূরক হয়ে উঠতো। তার প্রায় উন্মত্ত মাত্রায় কেতদুরস্ত চিত্রকর্মগুলো খুব দ্রুত পোর্সেলিন-পাত্র, নস্যি-বাক্স এবং পর্দায় প্রতিলিপি করা হয়েছিল, বহু হাজারে যা বিক্রি করা হয়েছিল ইউরোপীয় অভিজাত শ্রেণিদের কাছে। এছাড়াও ছাপচিত্রেও এগুলোর অনূদিত হয়েছে, ইউরোপ জুড়েই সেগুলো সঞ্চারিত হয়েছিল, টমাস গেইন্সবরো আর ফ্রাঁসোয়া বুশেরের মতো বিচিত্র ধরনের শিল্পীদের যা প্রভাবিত করেছিল।

ভাতোর মতোই বুশের (১৭০৩-১৭৭০) দরিদ্র একটি পরিবার থেকে এসেছিলেন, এবং কোনো অ্যাকাডেমিতে তিনি প্রশিক্ষণ পাননি । সেই সময় নেতৃস্থানীয় শিল্পীরা প্রায়শই ধ্রুপদী ঘরানায় প্রশিক্ষিত ছিলেন। জীবন্ত মডেল নিয়ে কাজ শুরু করার আগে শরীর সম্বন্ধে সার্বিক একটি বোঝাপড়া অর্জন করতে গ্রিক আর রোমান ভাস্কর্যের রেখাচিত্র এঁকেই তারা ফর্ম অধ্যয়ন করতে শুরু করতেন। এরপর প্রত্যাশা করা হতো যে, তারা বিদ্যায়তনিক ঘরানার শিল্পকলার প্রাধান্যপরম্পরায় সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হবার জন্য পরিশ্রম ও প্রাচীন ইতিহাস ও পৌরাণিক দৃশ্য আঁকার প্রচেষ্টা করবেন। তবে বুশের তারা বাবার কাছেই প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন, এবং ভাতোর চিত্রকর্মের কিছু এচিং সম্পন্ন করে তিনি প্রথমে ছাপচিত্রকর হিসাবে তার পেশাগত জীবন শুরু করেছিলেন। ল্যুভে মার্বেল শরীর স্কেচ করে সময় কাটানো চেয়ে তিনি বরং অনেক বেশি পরিমানে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। তবে একটি পর্যায়ে ভাতোর মতোই তিনিও অ্যাকাডেমির সদস্য হয়েছিলেন। অ্যাকাডেমিতে যোগ দেবার সময় যে শিল্পকর্মটি তিনি উপস্থাপন করেছিলেন সেটি ছিল ১৭৩৪ সালে তার আঁকা ‘রিনালডো অ্যান্ড আরমিডা’ - ষোড়শ শতাব্দীর একটি কবিতার সম্মোহনী পুনর্কথন, যেখানে সারাসেন জাদুকরী মোহিনী নারী আরমিডা রিনালডোকে কৌশলে তার প্রণয়ে আবদ্ধ করেছিলেন।

অ্যাকাডেমিতে ‘রিনালডো অ্যান্ড আরমিডা’ গৃহীত হবার পরে এটিকে অ্যাকাডেমি অ্যাকাডেমির কেন্দ্র - প্রধান প্রদর্শনী কক্ষে রাখা হয়েছিল, যেখানে অ্যাকাডেমির বিবেচনায় সবচেয়ে সেরা চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্যগুলো প্রদর্শন করা হতো। এছাড়া ল্যুভের

উত্তর উইঙে বুশেরকে একটি স্টুডিও দেয়া হয়েছিল, বহু অ্যাকাডেমিক শিল্পীকে যেমন দেয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি গৃহস্থালী বহু দৃশ্য এঁকেছিলেন, যেগুলোর পটভূমি ছিল কেতাদুরস্ত অন্দরমহল, এবং সেগুলো মূলত পরিকল্পিত হয়েছিল অভিজাত শ্রেণিকে আকৃষ্ট করতে, যারা তাদের সম্পদ আর পরিশীলিত রুচির প্রদর্শন করতে ক্রমশ আরো বেশি মাত্রায় বিলাসী দ্রব্য কামনা করতে শুরু করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মার্জিত দৃষ্টিকোণ থেকে, ভাতো ও বুশেরের শিল্পকলাকে একটি অবজ্ঞাসূচক শিরোনামের অধীনে একত্রে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছিল - ‘রোকোকো’। পলায়ন-প্রবৃত্তিপ্রবণ সেই সমাজের জন্য এটি ছিল শূন্যগর্ভ, অগভীর মেজাজের, যৌন-উত্তেজক, নির্বোধ কৌতুকপূর্ণ শিল্পকলা, গিলোটিনের ধারালো ব্লেডের নীচে যে সমাজটি একদিন এর সমাপ্তি দেখেছিল। রোকোকো ক্ল্যাসিসিজম বা ধ্রুপদীবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। রুবেন্সকে প্রশংসা করে এবং রেখার চেয়ে রঙের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে রোকোকো শিল্পীরা ধ্রুপদী ঘরানায় প্রশিক্ষিত অ্যাকাডেমিক বা বিদ্যায়তনিক শিল্পীদের জন্য শিল্পকলার একটি বিকল্প রূপ উপস্থাপন করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরো সময়ব্যাপী, ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রের শিল্পকলা বিষয়ক নিবন্ধগুলো রেখা রঙের বিরুদ্ধে এবং বুদ্ধিমত্তার প্রকৃতির সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। লেখক ডানি ডিডেরো বেশ স্পষ্ট করেই বলেছিলেন কোন পক্ষ তিনি সমর্থন করেন। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই স্যালোন কারেতে অ্যাকাডেমি এর নিয়মিত মুক্ত

প্রদর্শনীর আয়োজন করত। এটি ছিল ল্যুভের বিশাল একটি কক্ষ, অ্যাকাডেমির অফিসগুলোর দূরবর্তী প্রান্তে - যেখানে মানুষ সরাসরি রাস্তা থেকে ভিতরে প্রবেশ করতে পারতো। ডিডরো বছরে দুইবার অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীগুলো পর্যালোচনা করেছিলেন, যেগুলো 'সালোনস' নামেই পরিচিত ছিল, এবং তিনি বুশেরের চিত্রকর্মগুলোকে সময় আর প্রতিভার অপচয় হিসেবে চিহ্নিত করে, তার 'গোলাপী আর টোল পড়া নিতম্বগুলো' সমালোচনা করেছিলেন। ডিডরো স্পষ্টত সেই সব শিল্পীদের পছন্দ করতেন যারা মার্জিত, চিন্তাশীল বিষয়বস্তুর বিন্যাস প্রদর্শন করেছিলেন, যেমন জ্যঁ-সিমেওন শার্ডা (১৬৯৯-১৭৭৯), 'বেশ ইনি হচ্ছেন প্রকৃত চিত্রশিল্পী', তিনি উচ্ছসিত হয়ে বলেছিলেন, ' এই জাদু অবোধ্য'।

যদি বুশেরের চিত্রকর্ম কৃত্রিমতার অতিরঞ্জিত রুপ এবং যৌন-তাড়নার ইঙ্গিতগুলো অভিজাতদের শয়নকক্ষের প্রতি নিয়তিনির্দিষ্ট হয়ে থাকে, শার্দা দৈনন্দিন জীবনের মার্জিত সুস্থির মুহূর্ত উপস্থাপন করেছিলেন। ১৭৩৭ সালের সালোনে তিনি দুটি জনরা দৃশ্য উপস্থাপন করেছিলেন, 'গার্ল উইথ এ শাটলকক' এবং 'দ্য হাউজ অব কার্ডস', দুটোই শিশুদের প্রদর্শন করেছিল যারা খেলছে, যখন কিনা তাদের হয়তো অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকা উচিত ছিল, মেয়েটির সেলাইয়ের কাচিটি সুস্পষ্টভাবে একটি মোটা নীল ফিতায় তার পাশে ঝুলছে, এবং অপর ছবিটিতে একটি গৃহপরিচারক বালকটি পরিচ্ছন্ন করা কাজ থেকে বিরতি নিয়ে তাসের একটি ঘর নির্মাণ করছে। চপলতা আর কৌতুক ক্ষণিকের জন্য, এই চিত্রকর্মগুলো প্রস্তাব করেছিল, এবং এটি করা হয়েছিল আরো প্রয়োজনীয় কাজ অবহেলা করে। 'গার্ল উইথ এ শাটলকক' এবং 'দ্য হাউজ অব কার্ডস'

ক্রয় করেছিলেন স্যাক্সোনির (বর্তমানে জার্মানী) প্রধানমন্ত্রী। এই সালোনগুলো খুব দ্রুত প্যারিসের বর্ষপঞ্জিকায় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল, এবং আন্তর্জাতিক সংগ্রাহকদের যা আকর্ষণ করেছিল, ইউরোপে সমকালীন চিত্রকলা প্রদর্শনীর এটাই ছিল উৎপত্তি।

পরের বছরগুলোয় শার্দা প্যাস্টেল ব্যবহার করে ধারাবাহিক কিছু আত্মপ্রতিকৃতি একেছিলেন - প্যাস্টেল ছিল বিশেষভাবে উৎপাদিত রঙীন চকের খণ্ড যা প্রতিকৃতি আঁকার মাধ্যম হিসাবে যা জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন ইটালির শিল্পী রোসালবা কারিয়েরা (১৬৭৫-১৭৫৭)। ১৭২০ থেকে ১৭২১ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ এক বছর কারিয়েরা প্যারিসে কাটিয়েছিলেন, যেখানে তিনি ভাতোর সাথে তার কাজ বিনিময় করেছিলেন, প্যাস্টেল ব্যবহার করে রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। মাধ্যম হিসেবে প্যাস্টেল খুব ক্ষমাশীল নয়, সহজেই লেপটে যেতে পারে, ভঙ্গুর, যা ব্যবহার করা কঠিন। কারিয়েরার আগে এটি শুধুমাত্র স্কেচের জন্য ব্যবহৃত হতো। তবে ক্যারিয়েরা, এটি ব্যবহার করেছিলেন ত্বকের রঙ মিশ্রণ করতে যেন প্রতিকৃতির গালগুলো এদের প্রাকৃতিক দ্যুতি ধারণ করতে পারে এবং পরিচ্ছদের কাপড়গুলো বাড়তি উজ্জ্বলতা পায়। যদিও মাত্র একটি বছর তিনি ফ্রান্সে ছিলেন, কিন্তু তার প্রতিকৃতিগুলো ‘রোকোকো’ শিল্পকলার বিকাশ প্রক্রিয়াটিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাকে ফরাসী একাডেমির সদস্য করে নেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি ভেনিসে ফিরে গিয়েছিলেন, এবং তার স্টুডিও চুম্বকের মতই ইউরোপীয় অভিজাত শ্রেণিকে আকর্ষণ করেছিল, যারা গ্রান্ড টুরের একটি অংশ হিসেবে তার স্টুডিও ভ্রমণ করতে আসতেন। ক্ল্যাসিকাল শিক্ষা সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে তরুণ, বিশেষত ইউরোপীয় অভিজাত শ্রেণির পুরুষ সদস্যদের মহাদেশীয় এই ভ্রমণের নাম দেয়া হয়েছিল ‘গ্রান্ড ট্যুর’। ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় শিক্ষিত এই তরুণদের ক্ল্যাসিকাল পুরাণ ও দর্শন বিষয়ক গভীর উপলব্ধি ছিল এবং তারা ইটালি ভ্রমণ করতে আসতেন সরাসরি রোমান শিল্পকলা আর স্থাপত্য অধ্যয়ন করতে। যদিও রোম তাদের

চূড়ান্ত গন্তব্য ছিল, কিন্তু পথিমধ্যে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিরতি স্থান ছিল, যেমন প্যারিস, ফ্লোরেন্স ও ভেনিস।

গ্রান্ড ট্যুরের অংশ হিসাবে যারা ভেনিস ভ্রমণ করতে আসতেন, তাদের অনেকেই এই শহরটির সম্মোহনী জাদুতে মোহাবিস্ট হয়ে পড়তেন, যে শহরটি একটি মরিচীকার মতো লেগুন (উপহ্রদ) থেকে উঠে এসেছে। যদি আপনি ডোজে'র (নির্বাচিত শহর-প্রধান) প্রাসাদ বা গ্রান্ড ক্যানালের কোনো দৃশ্য চান, যা কিনা ইংল্যান্ডে আপনার অভিজাত বাড়ির দেয়ালে ঝোলাতে পারবেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই একটি স্টুডিওতে আসতে হবে: কানালেট্টোর স্টুডিও (জিওভান্নি অ্যান্টোনিও কানাল, ১৬৯৭-১৭৬৮)। কানালেট্টো নাটোকোচিত পটভূমি দৃশ্যের শিল্পী হিসেবে তার বাবা কাছে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু খুব দ্রুত তিনি জমকালো দৃশ্যচিত্র বা 'ভেডুটে' সৃষ্টি করতে (একবচনে ভেডুটা, যার অর্থ দৃশ্য, বিস্তারিত বৃহৎ মাত্রার চিত্রকর্ম, সাধারণ শহরের বা অন্য কোনো দৃশ্য) তার দিক পরিবর্তন করেছিলেন। তার বিষয়বস্তু ছিল তার জন্মশহর, আর ক্রেতারা ছিলেন মূলত ইংল্যান্ড থেকে আসা অভিজাত শ্রেণির সদস্যরা। ব্রিটিশ কুটনৈতিক উপদেষ্টা জোসেফ স্মিথ তার এজেন্ট হিসাবে কাজ করতেন, এবং তারা দুজনে এই গ্রান্ড ট্যুরের অভিজ্ঞতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে একটি কানালেট্টো ক্রয় করার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, এমনকি যদিও আপাতদৃষ্টিতে সরবরাহের চেয়ে চাহিদা ছিল বেশি, মাঝে মাঝে উৎকোচের প্রয়োজন হতো যেন আপনার চিত্রকর্মটি সময়মতো সম্পন্ন হয়।

অভিজাত শ্রেণির সদস্যরা দীর্ঘদিনব্যাপী তাদের চেহারার নিকটবর্তী একটি সাদৃশ্য ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত করতে প্রতিকৃতি চিত্রকর্মের ওপরেই মূলত আস্থাশীল ছিলেন। ভেডুটেসহ ভূদৃশ্যচিত্রের উত্থানে এই দুটি ঘরানার শিল্পকলা একত্রিত হয়েছিল শিল্পী টমাস গেইন্সবরোর (১৭২৭-১৭৮৮) কাজে । তার 'মি. অ্যান্ড মিসেস অ্যান্ড্রিউজ ' (১৭৫০) চিত্রকর্মটির পটভূমি ছিল ইংল্যান্ড স্টাওয়ার উপত্যকা। ফসল কেটে একত্রিত করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে কোনো শ্রমিকের উপস্থিতি নেই। শস্যক্ষেত্রের সাথে একই সীমানা ভাগাভাগি করে নিয়েছে পার্শ্ববর্তী বিশেষভাবে পরিচর্যা করা উন্মুক্ত একটি ভূমি। এর একটি প্রান্তে বসে আছেন মিসেস ফ্রান্সিস অ্যান্ড্রিউজ, ঋজু পিঠের একজন তরুণী, খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে, তার পায়ে বাড়িতে পরার চটি জুতা, পরণে কাদার চিহ্নহীন নীল একটি স্কার্ট। তার বয়স আঠারো, সম্প্রতি তার বিয়ে হয়েছে। তার স্বামী মি. রবার্ট অ্যান্ড্রিউজ, বয়সে তার থেকে সাত বছরের বড়। তিনি বেঞ্চের একপাশে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে আছেন, একটি পা আরেকটি পায়ের ওপর খানিকটা আড়াআড়িভাবে রেখে, তার একটি হাত পকেটের মধ্যে ঢোকানো, তার দীর্ঘ নলের শটগান বন্দুকটিও এখানে যুক্ত করা হয়েছে, যেন তিনি শিকার করতে বের হয়েছেন। মিসেস অ্যান্ড্রিউজের কোলের মাঝখানে কোনো রঙ করা হয়নি। এই জায়গাটি কী খালি রাখা হয়েছিল যেন তার শিকারকে সেখানে রাখা যায়, অথবা একটি শিশু, ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী, যাকে পরে কখনো সেখানে যুক্ত করা হবে? এই চিত্রকর্মটি প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে একটি বিয়ের প্রতিকৃতি হিসেবে পরিকল্পিত মনে হতে পারে, কিন্তু এটি কৃত্রিম। ফ্রান্সিস ওই জুতা পরে এমন কোনো বেঞ্চ অবধি হেঁটে আসতে পারার কোনো সম্ভাবনা নেই। অবশেষে এই চিত্রকর্মটি মূলত মালিকানার একটি বিবৃতি। এই যুগলের মিলনে উল্লেখযোগ্য আকারের জমি একত্রিত হয়েছে, প্রায় ৩০০০ একরের কাছাকাছি, যা তাদের পেছনে বিস্তৃত হয়ে আছে।

গেইন্সবরো যখন এটি এঁকেছিলেন, তিনি তখন কেবল তার পেশাগত জীবন শুরু করেছেন। রবার্ট অ্যান্ড্রুজ আর তিনি ছিলেন সমবয়সী, এবং তারা একই স্কুলেও তারা সহপাঠী ছিলেন। তার প্রজন্মের অন্যতম সেরা শিল্পী হিসাবে গেইন্সবরো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রতিকৃতি আর ভূদৃশ্যচিত্রগুলোর জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ গেইন্সবরো লন্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন। কিন্তু ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডন নয় বরং এসেক্সের গ্রামাঞ্চলে ছবি আঁকতে পেরেই খুশী ছিলেন, কারণ লন্ডন শহরটি সেই সময় বেশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। ঘোড় সওয়ার ডাকাতরা (হাইওয়েম্যান) দিনে দুপুরে পিকাডিলিতে ডাকাতি করতে শুরু করেছিল, এবং ভেঙ্গে দেওয়া সেনাবাহিনির বেকার সৈন্য আর নাবিকরা বেঁচে থাকার জন্য অপরাধের পথ বেছে নিয়েছিল। আর যারা শহরের বস্তিতে আটকে পড়েছিল তারা আরো বেশি পরিমানে জিন অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়েছিল। লন্ডন জীবনের কর্কশ দিকগুলোর প্রতি তার অবিশ্রান্ত মনোযোগসহ উইলিয়াম হোগার্থ (১৬৯৭-১৭৬৪) গেইন্সবরো ও তার অভিজাত পলায়ন প্রবৃত্তির সাথে সুস্পষ্ট একটি পার্থক্য উপস্থাপন করেছিলেন।

হোগার্থ ছিলেন দরিদ্র পরিবারের সন্তান, এবং একজন এনগ্রেভারের কাছে শিক্ষানবীশ হিসেবে তার পেশাজীবন শুরু করেছিলেন। তিনি নিজেই আঁকতে শিখেছিলেন, এবং বহু একক প্রতিকৃতি এবং গৃহস্থালী পরিবেশে দলবদ্ধ প্রতিকৃতি (যেগুলোকে ‘কনভারসেশন পিসেস’ বলা হয়) এঁকেছিলেন কিন্তু তার প্রিন্ট বা ছাপচিত্র তাকে খ্যাতি দিয়েছিল, তবে তৎকালীন সরকারকে বিব্রত করেছিল। ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ হোগার্থ তার বিখ্যাত ‘বিয়ার

স্ট্রিট আর জিন লেন' ছাপচিত্রটি প্রকাশ করেছিলেন। ছবি প্রতি এক শিলিং করে এগুলোর দাম রেখেছিলেন, আর দামটি তিনি ইচ্ছা করেই কম রেখেছিলেন। ইউরোপের মেলাগুলোয় বহু শতাব্দী ধরেই ছাপচিত্রের বেচাকেনার প্রচলন ও সঞ্চালন ছিল, পনেরোতম অধ্যায় আমরা দেখেছিলাম, ডুরার তার নিজের ছাপচিত্রগুলো এইসব মেলায় বিক্রি করেছিলেন - কিন্তু সেগুলো শিল্পকর্ম হিসেবে বিক্রি হতো। হোগার্থের ছাপচিত্রগুলো, যা আজ আমরা শিল্পকর্ম হিসেবে এখন মূল্যায়ন করি, সেগুলো ভয়ানক সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে বিবরণ আর তীব্র সমালোচনামূলক ভাষ্য ছিল। সর্বোচ্চ সংখ্যক দর্শকের হাতে যেন এটি পৌঁছাতে পারে সেভাবেই পরিকল্পিত হয়েছিল।

হোগার্থের এই ছাপচিত্রটি প্রকাশের প্রায় ষাট বছর আগে ডাচ প্রজাতন্ত্র থেকে ইংল্যান্ডে জিন (এক ধরনের অ্যালকোহল) আমদানী করা শুরু হয়েছিল, এবং মধ্যবর্তী সময়ে শ্রমিক শ্রেণির বহু সদস্য এর আসক্তি সৃষ্টি করার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। হোগার্থের বন্ধু ঔপন্যাসিক হেনরি ফিল্ডিং ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ইংল্যান্ডে এই জিন মহামারির ভয়ঙ্কর পরিণতিগুলো নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করছিলেন, এবং হোগার্থ তার দুটি ছাপচিত্র এর এক মাসের মধ্যেই সৃষ্টি করেছিলেন (অবশেষে ফিল্ডিং এবং হোগার্থের প্রচারণা ও আন্দোলনের পরিণতিতে জিন সংক্রান্ত আইনটি পুনরায় পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হয়েছিল। উপরে প্রথম ছবি জিন লেনে আমরা দেখি একজন নারী অসাড়, সংজ্ঞাহীন হয়ে বসে আছেন, তার সন্তান তার কোল থেকে নীচে

পড়ে যাচ্ছে তার মৃত্যুর মুখে। কঙ্কালসার একজন সঙ্গীতশিল্পী তখনো তার জিন পান করার গ্লাস হাতে ধরে আছে, দেখে মনে হচ্ছে ইতোমধ্যেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। তার ঝুড়িতে একটি গানের স্বরলিপি, সেখানে লেখা 'দ্য ডাউনফল অব মাদাম জিন'। হোগার্থের আঁকা ধারালো এই শহর দৃশ্যে আমরা মাদাম জিনকে দেখতে পাই, যে আরো ক্ষতি করা অব্যাহত রেখেছে। একটি ভাঙ্গা বাড়ির কড়িকাঠ থেকে একজন ব্যক্তি ঝুলে আছে, এবং একজন নারীকে একটি কফিনে ঢোকানো হচ্ছে। শুধুমাত্র বন্ধক ব্যবসায়ী বেশ লাভজনক বাণিজ্য করছেন। এর ব্যতিক্রম 'বিয়ার স্ট্রিট' জিন পানের কারণে সৃষ্ট মৃত্যু আর ধ্বংস থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে আনন্দময়, প্রগলভ, স্বদেশপ্রেমী একটি বিকল্প উপস্থাপন করেছে বিয়ার হয়তো আপনার কোমরের পরিধি বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু হোগার্থ এটিকে সৎ আর পরিশ্রমী মানুষের পানীয় হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। এই বিকল্প বাস্তবতায় বন্ধক ব্যাবসায়ীর ব্যবসা খারাপ হচ্ছে কিন্তু বাকি শহর সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

মানব প্রকৃতির প্রায় অবিশ্বাস্য একজন পর্যবেক্ষক ছিলেন হোগার্থ এবং সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষদের অভ্যাস আর আচরণ লক্ষ করার মতো চোখ ছিল তার। তার 'ম্যারেজ আ লা মোড' (১৭৪৩-৪৫) চিত্রকর্মগুলোয় তিনি শহরের বিত্তশালী একজন অল্ডারম্যানের (কাউন্সিলর) মেয়ে এবং বর্তমানে অর্থকষ্ঠে ভুগতে থাকা একজন অভিজাত শ্রেণির আর্লের সিফিলিসে আক্রান্ত ছেলের ভালোবাসাহীন একটি বিয়ের কিছু দৃশ্য এঁকেছিলেন। এই ধারাবাহিকটিতে মোট ছয়টি চিত্রকর্ম আছে, 'লা টোয়ালেট'- ধারাবাহিকটির চতুর্থ এই চিত্রকর্মে আমরা একজন কৃষ্ণাঙ্গ গৃহভৃত্যকে অতিথিদের গরম চকলেট পরিবেশন করতে দেখি, যখন স্ত্রী তার প্রেমিককে তার শয়নকক্ষে আপ্যায়ন করছেন। পালকযুক্ত পাগড়ি মাথায় একটি কৃষ্ণাঙ্গ বালক একটি ক্ষুদ্র মূর্তি দিয়ে খেলছে,

যা প্রয়াত আর্লের সংগ্রহ থেকে এসেছে, যেগুলো শীঘ্রই নিলামে ওঠানো হবে কিছু বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করতে। সবকিছুই প্রদর্শনীর জন্য, 'চমকপ্রদ' কৃষ্ণাঙ্গ গৃহভৃত্য থেকে অপেরা গায়ক (কাস্ট্রাটো) এবং বাঁশিবাদক অবধি, যারা তার বেশভূষাপ্রিয় অতিথিদের মনোরঞ্জন করছেন।

পরিশেষে, হোগার্থ চেয়েছিলেন, তার সৃষ্ট সমসাময়িক ইংল্যান্ডের দৃশ্যগুলোকে সর্বকালের সেরা ঐতিহাসিক চিত্রকর্মগুলোর সাথে বিচার করা হোক। কিন্তু ক্রমশ তিনি রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন যখন এমন কিছুই ঘটেনি। লন্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব আর্টস প্রতিষ্ঠা হবার চার বছর আগে তিনি মারা গিয়েছিলেন। তত্ত্ব আর অ্যাকাডেমিগুলোর প্রতি তার বিতৃষ্ণা যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে অনুমান করাই যেতে পারে যে, সেখানে যোগ দেবার তার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তিনি খুব বেশি মাত্রায় বাস্তববাদী ছিলেন, ইংলিশ চ্যানেলের দুই পাশে তথাকথিত বিদ্যায়তনিক শিল্পীদের তুলনায় তিনি মূলত রাস্তার একজন মানুষ ছিলেন।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Jean-Antoine Watteau, Pilgrimage to Cythera
(২) François Boucher, Rinaldo and Armida
(৩) Jean Siméon Chardin, Girl Playing with a Racquet and shuttlecock
(৪)Jean Siméon Chardin, The House of Cards
(৫) Rosalba Carriera, Portrait of Antoine Watteau
(৬) Giovanni A. Canal, The Entrance to the Grand Canal, Venice
(৭) Thomas Gainsborough, Mr. and Mrs. Andrews'
(৮) William Hogarth, Gin Lane
(৯) William Hogarth, Beer street,

(٥٠) William Hogarth, Self-portrait of with Pug
(٥١) William Hogarth, The Toilette, called The countess's morning levee on the framelis, the fourth canvas in the series of six satirical paintings known as Marriage A-la-Mode

অধ্যায় ২৩ - রয়্যাল অ্যাকাডেমি: দেশে এবং বিদেশে

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ, লন্ডনের নতুন রয়্যাল অ্যাকাডেমি আর্টসের লাইফ-ড্রয়িং কক্ষে অ্যাকাডেমির অধিকাংশ সদস্য একত্রিত হয়েছেন। তখন রাত, ছাদ থেকে ঝোলানো একটি বড় তেলের প্রদীপই সেখানে একমাত্র আলোর উৎস। এর নীচে, একটি অনুচ্চ মঞ্চের উপর দুইজন জীবন্ত পুরুষ মডেল বসে আছেন। তাদের একজন ইতোমধ্যেই নগ্ন , এবং অ্যাকাডেমির স্কুলগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত শিল্পী জর্জ মোসেরের জন্য মডেল হিসেবে তিনি বসেছেন। মোসের তার মডেলের ডান হাতটি দেয়াল থেকে ঝুলন্ত একটি দড়ির ফাঁসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন, যেন মডেলটি হাতটি উঁচু করে অদ্ভুত এই ভঙ্গিমাটি ধরে রাখতে পারেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অ্যাকাডেমিক প্রশিক্ষণের কেন্দ্রে ছিল এভাবে জীবন্ত মডেল দেখে রেখাচিত্র অঙ্কন - ‘লাইফ ড্রইং’, এবং এটি ছাড়া কোনো শিল্পীই সফল শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখতে পারতেন না।

রয়্যাল অ্যাকডেমির প্রথম পরিচালক, সাদা সাটিনের প্রান্তসহ কালো জ্যাকেট পরা অভিজাত চেহারার জোশুয়া রেনোল্ডসকে আমরা দেখি, তার শোনার জন্য ব্যবহৃত রুপালী 'ইয়ার' ট্রাম্পেটটি আলোয় উজ্জ্বল। তিনি মডেলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন না, তবে অ্যাকাডেমির সচিবের কথা শুনছিলেন। পরচুলা আর মোজায় বাকি সদস্যরা তখন অর্ধবৃত্তাকার ড্রইং বেঞ্চের আসনগুলো পূর্ণ করে বসে ছিলেন। ভূদৃশ্যচিত্র শিল্পী রিচার্ড উইলসন এক কোণে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে আছেন, এবং আমন্ত্রিত চীনা শিল্পী টান-চে-কোয়া আমেরিকার ইতিহাস-বিষয়ক চিত্রকর্মের শিল্পী বেঞ্জামিন ওয়েস্টের সুবিশাল শরীরের পেছনে দাড়িয়ে আছেন। টান-চে-কোয়া ওয়েস্টের সাথে কথা বলছেন না, বরং দূরের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন, নারী শিল্পীদের দুটি প্রতিকৃতির দিকে, এই কক্ষে তারাই ছিলেন শুধুমাত্র নারী, কারণ এই জীবন্ত মডেল থেকে আঁকার এই কক্ষে নারীদের প্রবেশাধিকার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

*

শিল্পীদের এই সমাবেশটি আসলে ঘটেনি, অথবা অন্ততপক্ষে এভাবে ঘটেনি। কারণ দৃশ্যটি আঁকা হয়েছিল।- 'দ্য অ্যাকাডেমিসিয়ানস অব দ্য রয়্যাল অ্যাকাডেমি' (১৭৭১-২) - এই দলবদ্ধ প্রতিকৃতিটি জার্মানীতে জন্ম নেয়া অ্যাকাডেমির প্রথম সদস্যদের মধ্যে একজন ইয়োহান জোফানি (১৭৩৩-১৮১০) এঁকেছিলেন, যিনি রঙের প্যালেট হাতে নিজেকে চিত্রকর্মের নীচে বাম কোণে স্থাপন করেছিলেন। এই চিত্রকর্মে যা সঠিক ছিল সেটি হচ্ছে চিত্রিত প্রতিকৃতির দুই নারী - মেরি মোসের (১৭৪৪-১৮১৯) এবং অ্যাঞ্জেলিকা কাউফম্যান (১৭৪১-১৮০৭) - অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়া সত্ত্বেও রয়্যাল অ্যাকাডেমির 'লাইফ ড্রইং' কক্ষের ভিতরে তারা কখনোই প্রবেশ করেননি। (কিছু পুরুষ সদস্য, উল্লেখযোগ্যভাবে গেইন্সবরো, রেনোল্ডস-এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চূড়ান্ত চিত্রকর্মে স্থান পাননি)।

'দ্য অ্যাকাডেমিশিয়ানস অব দ্য রয়্যাল অ্যাকাডেমি' রাফায়েলের 'স্কুল অব এথেন্স' চিত্রকর্মটির আধুনিক একটি ব্যাখ্যা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল, চৌদ্দতম অধ্যায়ে যে কাজটি আমরা দেখেছিলাম। চিত্রকর্মটি অ্যাকাডেমির কিছু সদস্যদের শৈল্পিক বিন্যাসে সজ্জিত একটি রূপে প্রদর্শন করেছিল, যা 'কনভারসেশন পিস' নামে পরিচিত। জোফানি এই ধরনের কাজে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই চিত্রকর্মটি শেষ করার প্রায় সাথে সাথেই রানি শার্লোটের কাছ থেকে তিনি প্রায় একই ধরনের আরো একটি নতুন কাজের কমিশন পেয়েছিলেন। এর বিষয়বস্তু ছিল ফ্লোরেন্সে সদ্য-উদ্বোধিত উফিৎসি গ্যালারির ট্রিবিউনা (মাস্টারপিস রাখার কক্ষ), ব্রিটিশ পর্যটকদের দ্বারা যে কক্ষটি পূর্ণ হয়ে আছে, যারা গ্রান্ড ট্যুরের অংশ হিসেবে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। 'দ্য ট্রিবিউনা অব দ্য উফিৎসি' (১৭৭২-৭) চিত্রকর্মে আমরা অষ্টভূজ একটি কক্ষের মেঝে থেকে ছাদ অবধি দেয়ালে সজ্জিত চিত্রকর্মগুলো দেখি। উফিৎসি মেডিচি সংগ্রহে পূর্ণ ছিল এবং জোফানি আরো নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য তার চিত্রকর্মে গুরুত্বপূর্ণ কিছু

সংগ্রহগুলোকে আলাদা করেছিলেন।

‘দ্য অ্যাকাডেমিসিয়ানস অব দ্য রয়্যাল অ্যাকাডেমি’ এবং ‘ট্রিবিউনা অব দ্য উফিৎসি’ চিত্রকর্ম দুটির মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। দুটো চিত্রই অভিজাত এবং শিল্পরসিক পুরুষদের প্রদর্শন করেছিল, আর নারীদের শুধু দর্শনীয় চিত্র হিসেবে এই চিত্রে যুক্ত করা হয়েছিল। ‘ট্রিবিউনা’ চিত্রকর্মে মাথায় পরচুলা পরা পুরুষরা হেলেনিক ‘মেডিচি ভিনাসের’ একটি নগ্ন নারীমূর্তি ও টিশানের ‘ভেনাস অব উরবিনো’ চিত্রকর্মটি ঘিরে দাড়িয়ে আছেন। আর ‘অ্যাকাডেমিসিয়ানস’ চিত্রকর্মে নারী দুই সদস্যকে সক্রিয় সদস্য হিসেবে দেখানো হয়নি - ‘লাইফ ড্রইং’ রুমে মডেল থেকে আঁকতে কিংবা রেনোল্ডস-এর সাথে শিল্পকলা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে। এর পরিবর্তে আবক্ষ প্রতিকৃতি রূপে তারা দেয়ালে ঝুলছেন - এমন কোনো বস্তু যাদের দিকে তাকিয়ে দেখা হয়। (অ্যাকাডেমির পরবর্তী সদস্য হয়েছিলেন যে নারী শিল্পী, তিনি ছিলেন ল্যরা নাইট, আর সেটি ঘটেছিল ১৯৩৬ সালে, প্রায় দুইশ বছর পরে। খুব সম্প্রতি অবধি এটি শুধু পুরুষদের জগত ছিল)।

অ্যাকাডেমির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য জর্জ মোসেরের কন্যা মেরি মোসের ফুলের শিল্পী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন, এবং অ্যাঞ্জেলিকা কাউফম্যান দক্ষ একজন প্রতিকৃতি-শিল্পী ছিলেন, যিনি অ্যাকাডেমির প্রাধান্যকাঠামোর শীর্ষে ওঠার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন - আর সেটি হচ্ছে ইতিহাস-বিষয়ক চিত্রকর্ম সৃষ্টি। সুইজারল্যান্ডে জন্ম নেয়া কাউফম্যান তার বাবার সাথে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, যিনি একজন ‘জার্নিম্যান-পেইন্টার’ (অন্য শিল্পীদের জন্য কাজ করা শিল্পী) ছিলেন। কাউফম্যান প্রতিভাবান একজন সঙ্গীত শিল্পীও ছিলেন, কিন্তু তিনি চিত্রকর্মকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, তার প্রথম আত্মপ্রতিকৃতি শেষ করেছিলেন মাত্র বারো বছর বয়সে। তার বয়সের বিশের দশকে

তিনি ইটালিতে বসবাস করেছিলেন - ফ্লোরেন্স, বোলোনিয়া এবং রোম - অবশেষে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, যেখানে মোট পনেরো বছর অবস্থান করেছিলেন। এই চারটি শহরের অ্যাকাডেমি তাকে সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল, এবং তিনি বেশ কিছু অনুগত অনুসারী এবং প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষক অর্জন করতে পেরেছিলেন, যার মধ্যে একজন ছিলেন রানি শার্লোট। নগ্ন মডেলের দেখে অনুশীলন করার অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও – ইতিহাস বিষয়ক চিত্রকর্ম সৃষ্টিতে যা একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করা হতো - তিনি সফল পুরাণ ও ইতিহাস বিষয়ক চিত্রকর্ম সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন - যেমন 'জিউক্সিস চুজিং মডেলস ফর হিস পেইন্টিংস অব হেলেন অব ট্রয়' (১৭৭৫-৮০), এবং 'সরো অব টেলিম্যাকাস'(১৭৮৩)। তিনি দারুণ সফলতা অর্জন করেছিলেন এবং তার প্রভাবশালী এনগ্রেভিং বা খোদাইচিত্রগুলো ইউরোপব্যাপী সঞ্চালিত হয়েছিল, আর সেটি দেখে ১৭৮১ সালে লন্ডনে ডেনিশ রাষ্ট্রদূত স্মরণ করেছিলেন, কীভাবে পুরো পৃথিবী 'অ্যাঞ্জেলিকাম্যাড' অর্থাৎ অ্যাঞ্জেলিকা উন্মত্ততায় আক্রান্ত হয়েছিল।

জশুয়া রেনোল্ডস (১৭২৩-১৭৯২) একজন প্রতিকৃতি শিল্পী ছিলেন, যিনি তার প্রতিকৃতির চরিত্রদের দেবী এবং বীরের স্তরে উন্নীত করেছিলেন এবং তার কাজগুলো অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীতে কাউফম্যানের পৌরাণিক ও ইতিহাস বিষয়ক চিত্রকর্মগুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করেছিল। কিন্তু যখন তার সহকর্মী ও অ্যাকাডেমি সদস্য বেনজামিন ওয়েস্ট তার' দ্য ডেথ অব জেনারেল ওলফ' (১৭৭০) চিত্রকর্মের জন্য কুইবেকের যুদ্ধের একটি সাম্প্রতিক দৃশ্যকে বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন, রেনোল্ডস উদ্বেগ অনুভব করেছিলেন। সেই সময় অবধি ঐতিহাসিক বিষয়গুলো ছিল ক্ল্যাসিকাল পর্বের (গ্রিক-রোমান) এবং শিক্ষামূলক, সাম্প্রতিক এবং বাস্তবতা নির্ভর নয়। ওয়েস্ট সৈন্যদের

সমসাময়িক সামরিক উর্দি অপরিবর্তিত রেখেছিলেন, এবং একজন আসীন মোহাক যোদ্ধাকেও যুক্ত করেছিলেন, যার বিস্তারিত উলকি এবং পুতির অনুসঙ্গগুলো ইঙ্গিত করে, ওয়েস্ট আগেই এই ধরনের কোনো ব্যক্তির বিস্তারিত অধ্যয়ন সম্পন্ন করেছিলেন। রেনোল্ডস-এর উদ্বেগ সত্ত্বেও ওয়েস্ট সমসাময়িক এই দৃশ্যকে একটি ক্ল্যাসিকাল ঐতিহাসিক চিত্রকর্মের গাম্ভীর্য আর গভীরতা প্রদান করেছিলেন। তার মৃত্যুপথযাত্রী জেনারেল রুবেন্সের খ্রিস্টের মতো মাটিয়ে শুয়ে আছেন, উনিশতম অধ্যায়ে যেভাবে আমরা রুবেন্সের ‘ডিসেন্ট ফ্রম দ্য ক্রস’ চিত্রকর্মে দেখেছি। এটি আদর্শায়িত মৃত্যু, বাস্তব মৃত্যু নয়। ‘দ্য ডেথ অব জেনারেল উলফ’ দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং এর বহু প্রিন্টও বিক্রি হয়েছিল, এবং ওয়েস্ট অ্যাকাডেমির দায়িত্ব নিয়েছিলেন যখন রেনোল্ডস তার পদ থেকে সরে দাড়িয়েছিলেন।

অ্যাকাডেমির সদস্যদের নতুন কাজগুলো একটি বার্ষিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা হতো, ফ রাসী সালোনের একটি ইংলিশ সমতূল্য। যে-কারো জন্যই প্রদর্শনীটি উন্মুক্ত ছিল, যারা কিনা এক শিলিং (বর্তমান ৫ পাউন্ড) খরচ করতে পারতেন, এবং অ্যাকাডেমি খুব শীঘ্রই লন্ডনের শিল্পকলা জগতের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, যখন এটি প্যারিসের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সব অ্যাকাডেমিক সদস্যরা একমত ছিলেন না , অনেকেই তাদের এই প্রদর্শনী স্যালোনের সমতূল্য হতে পারে বলে মনে করেননি, এবং তারা নিজেরাই বিষয়টি পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জন সিঙ্গলটন কোপলে (১ ৭৩৮-১৮১৫) ছিলেন ওয়েস্টের একজন আমেরিকান অনুসারী, এবং ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি অ্যাকাডেমির সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। তার সমসাময়িক ইতিহাসভিত্তিক চিত্রকর্মগুলো ভাড়া করা পৃথক কক্ষে প্রদর্শন করার মাধ্যমে তিনি পৌনঃপুনিকভাবে

রেনোল্ডস ও অ্যাকাডেমির অন্য সদস্যদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রদর্শনী যেন তার নিজের কাজের উপর ঘনীভূত হতে পারে। কোপলির আঁকা ‘ডেথ অব মেজর পেইরসন’ (১৭৮৪) চিত্রকর্মটি দেখতে এক শিলিং খরচ করতে হতো, যে চিত্রকর্মটির কমিশন দিয়েছিলেন জন বয়ডেল, এবং প্রিন্ট হিসেবে যা বহু বিক্রিত একটি চিত্র হবার জন্য নিয়তিনির্দিষ্ট ছিল। বয়ডেল ওয়েস্টের ‘দ্য ডেথ অব জেনারেল উলফের’ প্রিন্টের মতো একই সাফল্য পুনরাবৃত্তি করতে চেয়েছিলেন, যা প্রায় ১৫,০০০ পাউন্ড আয় করেছিল (বর্তমান সময়ে যার পরিমাণ তিন মিলিয়ন পাউন্ড)।

তার মৃত্যুর আগে মেজর পেইরসন তেমন সুপরিচিত কোনো চরিত্র ছিলেন না, কিন্তু কোপলির চিত্রকর্মটি আর যা-ই হোক না কেন দেশপ্রেমের শক্তি আর আনুগত্যে পরিপৃক্ত ছিল। পেইরসন জার্জিতে (ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিম উপকূলবর্তী একটি দ্বীপ) একটি যুদ্ধের সময় ফরাসী সেনাবাহিনির আক্রমণে নিহত হয়েছিলেন। ঘটনাটি নিয়ে কোপলির ব্যাখ্যায়, সেখানে আমরা দেখি শ্বেতাঙ্গ মেজর যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন মৃত্যুতে, তার কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্য অস্ত্র হাতে নিয়ে তার খুনির দিকে তাক করে গুলি নিক্ষেপ করছেন। আর পরনের কোট বাতাসে উড়ছে, তার টানটান প্রস্তুত শরীর ক্রমশ এগিয়ে আসা সৈন্য, আর পালাতে থাকা নারী শিশুদের কৌণিক রেখাগুলোরই প্রতিধ্বনি করছে, গতিময়তার একটি বোধ যা প্রতিধ্বনিত্ব হচ্ছে প্রমাণ আকারের চেয়ে বড় বাতাসে আন্দোলিত ইউনিয়ন জ্যাকের পতাকায়। এই সব কৌণিক বিন্যাসগুলো যুদ্ধকে আরো দ্রুততর করে তোলে, আপনাকে সরাসরি ঘটনার কেন্দ্রে নিয়ে যায়।

অ্যাকাডেমির সব সদস্যরা ইংল্যান্ডেই শুধু অবস্থান করেননি। তরুণ উইলিয়াম হজেস (১৭৪৪-১৭৯৭) ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজ 'রেজুল্যুশনে' তিন বছর কাটিয়েছিলেন। ১৭৭২ থেকে ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ অবধি। তিনি কুকের দ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী সমুদ্রযাত্রায় সঙ্গী হয়েছিলেন এবং উদ্ভিদ আর প্রাণী আর মানুষের ছবি এঁকেছিলেন, যা কিছু তিনি দেখেছিলেন তাহিতি, নিউ জিল্যান্ড এবং রাপা নুই দ্বীপে (ইস্টার আইল্যান্ড)। সময়টি ছিল এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকায়ন পর্বের শীর্ষ সময়, যখন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্রুত সম্প্রাসারিত হতে শুরু করেছিল এবং ইউরোপীয়রা পুরো পৃথিবীকে দেখতে বুঝতে ও শ্রেণিবিন্যস্ত করতে চেয়েছিল (একই সাথে তারা আগ্রাসী সাম্রাজ্য-নির্মাণের মানসকিতা নিয়ে সেই পৃথিবীকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার উদ্যোগ নিয়েছিল)। উদ্ভিদবিদ জোসেফ ব্যাঙ্কস, প্রথম সমুদ্রযাত্রায় যিনি কুকের সঙ্গী হয়েছিলেন, তার আবারো কুকের সঙ্গী হবার কথা ছিল, এবং ব্যাঙ্কস শিল্পী হিসেবে জোফানিকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন, ক িন্তু কুক ব্যাঙ্কের বড় দলের সবাইকে জায়গা দিতে অস্বীকার করেছিলেন, এবং পরিণতিতে উদ্ভিদবিদ এই যাত্রা থেকে নিজেকে ও জোফানিকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। রানি শার্লোটের জন্য কাজ করতে জোফানি ফ্লোরেন্সে গিয়েছিলেন, এবং কুকের দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রায় প্রধান শিল্পী হিসেবে তাকে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন হজেস।

ওশিয়ানিয়া সংক্রান্ত চিত্রকর্মগুলোর কাজ ইংল্যান্ডে ফেরার পর হজেস সমাপ্ত করেছিলেন । এবং সেগুলো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ভূদৃশ্যের নিখুঁত প্রতিনিধিত্ব করছে না, যা তিনি নিজে দেখেছিলেন, এর পরিবর্তে এটি আবৃত হয়ে আছে ক্লড লোরেইনের সোনালী আবহাওয়ায় , এবং আকর্ষণীয় ও সুন্দর একটি রূপে যা রূপান্তরিত হয়েছিল, যেন ইউরোপীয়রা সেগুলো বুঝতে পারেন। তার চিত্রকর্মগুলো সমকালীন ইউরোপীয় রুচির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, ইংল্যান্ডে যা দৃষ্টান্তমূলক ছিল, ভূদৃশ্যচিত্রকর রিচার্ড উইলসনের (১৭১৪-১৭৮২)

কাজের মতো, যার সাথে হজেস প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। যদিও হজেসের চিত্রকর্মগুলো কোনো দ্বীপে উদ্ভিদজগতের বিন্যাসসংক্রান্ত বিস্তারিত পর্যবেক্ষণগুলো প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু প্রায়শই যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল দ্বীপবাসীদের নির্মিত স্থাপনা ও নৌকা, কিন্তু হজেস মূলত তার ইউরোপীয় ভাবনা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। 'এ ভিউ অব মাটাভাই বে ইন দি আইল্যান্ড অব ওতাইহেতি' (১৭৭৬) চিত্রকর্মে তাহিতিবাসীরা যারা নৌকায় বসে আছেন, তাদের গাঢ় বর্ণের ত্বক এবং দ্বীপের সীমানা সুরক্ষা করতে তারা উপকূল অনুসরণ করে তাদের যুদ্ধ ক্যানুগুলো পরিচালনা করছেন। এর ব্যতিক্রম হজেসের 'এ ভিউ টেকেন ফ্রম দ্য বে অব ওতাইহেতি পেহা' চিত্রকর্মে নারীদের তিনি এঁকেছেন বেশ হালকা রঙের ত্বকসহ। একটি ছোট খাড়িতে যারা নগ্ন হয়ে স্নান করছে, শুধু তাদের নিতম্বে বিস্তৃত হয়ে থাকা উলকির চিহ্ন তাদের ইউরোপীয় রমনীদের থেকে ভিন্ন হিসেবে চিহ্নিত করে।

চমকপ্রদ উপাদান হিসেবে দীর্ঘ পাম ট্রি এবং একটি তাহিতির "টাই'ই" খোদাই কাজ এখানে যুক্ত করা হয়েছিল, অন্যথায় যে দৃশ্যটি গাছ আর দূরবর্তী পাহাড়ের ফ্রেমে বন্দি আঁকাবাঁকা পানির স্রোতের পরিচিত কোনো ভূদৃশ্যচিত্রের মতোই। ফরাসী সমুদ্র অভিযাত্রী লুইস-আন্তোয়ান বুগেইনভিলের তাহিতি সংক্রান্ত জনপ্রিয় বিবরণটি ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি তাহিতিকে নতুন 'কাইথেরা' হিসেবে হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। 'কাইথেরা' - ভালোবাসা সংক্রান্ত যে গ্রিক দ্বীপটির কথা আমরা জেনেছিলাম গত অধ্যায়ের ভাতোর আঁকা সুপরিচিত একটি চিত্রকর্ম থেকে। হজেস এই ধারণাটি অব্যাহত রেখেছিলেন, এবং ইংল্যান্ডের দর্শকরা সেখানকার নারী ও ভূদৃশ্য দেখতে পেরেছিলেন, উভয়ের ওপর ঐক্ষিক মালিকানা উপভোগ করে।

হজেসের দুটি চিত্রকর্মই ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে রেনোল্ডসের ‘প্রোট্রেট অব ওমাই’ চিত্রকর্মটির সাথে প্রদর্শিত হয়েছিল। ‘ওমাই’ রা’ইটিয়া দ্বীপের মাই (লন্ডনে যিনি ওমাই নামে পরিচিত) নামক একজন ব্যক্তির প্রতিকৃতি, যিনি কুকের দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রার সময় পলিনেশিয়া থেকে ইংল্যান্ডে এসেছিলেন, এবং লন্ডনে আসার পরে তিনি ইংরেজ সমাজের অংশে পরিণত হয়েছিলেন। এটি কোনো কমিশনে করা প্রতিকৃতি ছিল না, রেনোল্ডস ধারণা করেছিলেন বার্ষিক প্রদর্শনীতে দর্শকরা একজন চমকপ্রদ ‘ভিন্ন ’ দ্বীপবাসীকে দেখতে আগ্রহী হতে পারেন। রেনোল্ডসের আঁকা এই প্রতিকৃতিতে মাইয়ের বিকৃতি স্পষ্টতই আজ অরুচিকর, এমনকি বর্ণবাদী মনে হতে পারে। তিনি খালি পায়ের তরুণ মাইকে বেশ বিশাল একটি সাদা রোব আর মাথায় পাগড়ি দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন , তার উলকিগুলো কেবল দৃশ্যমান ছিল দুই হাতে। হজেসের নিজের করা মাইয়ের প্রতিকৃতি থেকেও এই প্রতিকৃতিতে তার ত্বক উল্লেখযোগ্যমাত্রায় হালকা ছিল, রেনোল্ডসের প্রতিকৃতিতে পশ্চিমা বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যতিক্রম হজেস তাকে আরো প্রশস্ত নাক ও মুখ দিয়েছিলেন। এবং এখানে রেনোল্ডেসের নাটকীয় মহিমান্বিত করার প্রবণতাটি তার দৃশ্যগত পর্যবেক্ষণ-বোধটিকে আত্মীকৃত করেছিল।

‘টাই’ই’ খোদাই কাজগুলো, যা হজেসের ‘এ ভিউ টেকেন ফ্রম দ্য বে অব ওতাহেইতি পেহা’ চিত্রকর্মে প্রদর্শিত হয়েছিল, ইংল্যান্ডে নিয়ে আসা হয়েছিল কুকের সমুদ্র অভিযানের সময়। এখন আমরা এই সব ক্ষুদ্র খোদাই করা মূর্তিগুলোকে ভাস্কর্য হিসেবে বিবেচনা করি, কিন্তু অষ্টাদশ শতকে এগুলোকে এভাবে দেখা হতো না। এগুলোকে মূলত নৃতাত্ত্বিক কৌতূহলী দ্রব্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো, পশ্চিমা চোখে মাইয়ের মতো যেগুলো ছিল ভিন্ন ও বিচিত্র। ইউরোপে এগুলো শিল্পকলা হিসেবে

বিবেচিত হয়নি, কারণ অজ্ঞাতনামা শিল্পীরা যারা এগুলো তৈরি করেছিলেন তারা হুবহু কারো সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে সেগুলো তৈরি করেননি। আদর্শায়িত কিংবা প্রাকৃতিক এবং খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াই কোনো কিছুর প্রতি দৃশ্যগত ইঙ্গিত সৃষ্টি করা কাজ, কিংবা বিভ্রম সৃষ্টি করা ট্রোম্প লো'য় - যা-ই হোক না কেন, অষ্টাদশ শতকে সব শিল্পকলা এর 'মাইমেসিস' (বাস্তবতা অনুলিপি অথবা পুনঃসৃষ্টি করার প্রচেষ্টা) দক্ষতার পরিমাপ দ্বারা বিচার করা হতো, অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিশ্বকে অনুকরণ অথবা অনুলিপি করার ক্ষমতা) যার (আমরা যেমন দেখেছি) উৎস ছিল মূলত ক্ল্যাসিকাল গ্রিস ও রোমের শিল্পকলায়।

দুটি টি'আই মূর্তি, একজন পুরুষ এবং একজন নারী, এখন অক্সফোর্ডের পিট রিভার্স মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। যদিও এই ক্ষুদ্র মূর্তিগুলোর আবশ্যিক সব মানব বৈশিষ্ট্যই আছে, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। মাথার আকৃতি তুলনামূলকভাবে বড়, খর্বাকার পা ধনুকের মতো বাঁকা, চোখ আর আঙ্গুলগুলো নির্দেশ করতে গভীরভাবে দাগ কাটা হয়েছে। যখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বিশ্বমেলায় গল গগ্যাঁর মতো আধুনিক শিল্পীরা এই ধরনের কাজ প্রথম দেখেছিলেন, এবং এগুলোকে অনুপ্রেরণার সমৃদ্ধ উৎসে রূপান্তরিত করেছিলেন, কেবল তখনই ক্রমান্বয়ে পাশ্চাত্যে এই কাজগুলোর নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য অনুধাবন করা শুরু হয়েছিল (আমরা গগ্যাঁকে তাহিতি অবধি অনুসরণ করব উনত্রিশতম অধ্যায়ে)। এমনকি তারপরও এই কাজগুলো সৃষ্টি করার মূল প্রাসঙ্গিকতা কখনো স্বীকৃতি পায়নি। আমাদের জানা নেই এইসব ক্ষুদ্র মানবসদৃশ মূর্তিগুলো পলিনেশিয়ান কোনো দেব-দেবী বা কোনো ধরনের বিশ্বাসের কাঠামোর সাথে সংযুক্ত কিনা, কিংবা প্রাথমিকভাবে এই সৃষ্টির শৈল্পিক কোনো লক্ষ্য ছিল কিনা।

সাধারণত মনে করা হয় ক্যাপ্টেন কুকের অভিযানের সময় দ্বীপবাসীরা পশ্চিমা পদ্ধতির শিল্পকলার সংস্পর্শে আসেনি। এর পরিণতিতে, ব্রিটিশ নৌবাহিনি কর্মকর্তা আর পলিনেশিয়ার স্থানীয়দের প্রাথমিক সাক্ষাৎসংক্রান্ত বাস্তব-প্রতিনিধিমূলক জলরংগুলো ব্রিটিশ কোনো নাবিকের আঁকা বলে ধারণা করা হতো।

১৯৯৭ সালে কুকের সাথে তার প্রথম সমুদ্র যাত্রার সময় লেখা ব্যাঙ্কসের একটি চিঠি প্রথম বারের মতো উন্মোচন করেছিল যে, রা'ইয়াটিয়ান উচ্চ যাজক টুপাইয়া পশ্চিমা শৈলীকে আঁকতে শিখেছিলেন। টুপাইয়ার পরবর্তী একটি জলরঙে আমরা ব্রিচ আর বাকলসহ জুতা পরিহিত ব্যাঙ্কসকে দেখতে পাই, যিনি উলকি আঁকা একজন মাওরির নিকট থেকে 'ফ্ল্যাক্স' চাদরের বিনিময়ে একটি লবস্টার সংগ্রহ করছেন। টুপাইয়া এছাড়াও একজন প্রধান

শোকপ্রকাশকারীর আনুষ্ঠানিক পোষাক এঁকেছিলেন, এবং আবশ্যিক রূপগুলো এর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি এর বিমূর্তন করেছিলেন, আর এর কাছাকাছি এমন কিছু করতে পশ্চিমা শিল্পীদের আরো ১৫০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কারণ আমরা দেখেছি ইউরোপীয় অ্যাকাডেমিগুলো ক্ল্যাসিকাল ঐতিহ্যে আর শিক্ষার প্রতি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়ে ছিল। ফ্রান্সের নতুন নব্য-ধ্রুপদী তারকা ডাভিডের চিত্রকর্মে এই অনুসরিত পদ্ধতির উদাহরণ আমরা দেখতে পাই।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে) :

(১) Johan Zoffany, The Portraits of the Academicians of the Royal Academy
(২) Johan Zoffany, The Tribuna of the Uffizi
(৩) Angelica Kauffman, Zeuxis Selecting Models for His Painting of Helen of Troy
(৪) Benjamin West, *The Death of General Wolfe*
(৫) John Singleton Copley, The Death of Major Peirson
(৬) William Hodges, A View of Matavai Bay in the Island of Otaheite
(৭) William Hodges, A view taken in the Bay of Otaheite Peha
(৮) Joshua Reynolds, Portrait of Omai
(৯) Wooden ti'i figures from Tahiti
(১০) Tupaia, Māori trading a crayfish for cloth with Joseph Banks
(১১) Tupaia, a woman dancing and the Chief Mourner

অধ্যায় ২৪ - স্বাধীনতা, সাম্যতা, ভ্রাতৃত্ব?

১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ, জাক-লুই ডাভিড অবশেষে ‘দ্য ওথ অব দ্য হোরেশিয়াই’ সমাপ্ত করেছেন। এটি প্রায় চার মিটার প্রশস্ত, এবং আসন্ন যুদ্ধের জন্য হোরাশিয়াই পরিবারের প্রস্তুতির কাহিনি ছিল এর মূল বিষয়বস্তু। প্রমাণ আকারের চারজন পুরুষ - তিন ভাই দাড়িয়ে তাদের তরবারীর অভিমূখে হাত প্রসারিত করে ভ্রাতৃত্বে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার ভঙ্গিমায় দাড়িয়ে আছেন, আর সেই তরবারীগুলো উঁচু করে ধরে রেখেছেন তাদের পিতা হোরেশিয়াস। তিন ভাই রোম সুরক্ষা করতে প্রতিজ্ঞা করছেন, তাদের পিতা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন, এই আনুগত্যকে আশীর্বাদ করতে তিনি যেন দেবতাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন।

ডাভিড তার এই চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু হিসেবে একটি প্রাচীন কাহিনী নির্বাচন করেছিলেন, যেখানে দুটি পরিবারের ভাইরা রোম আর নিকটবর্তী শহর আলবার মধ্যকার একটি দ্বন্দ্ব

নিরসনে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি হোরেশিয়াই পরিবারকে আড়ম্বরহীন একটি ‘ক্ল্যাসিকাল’ অন্দরমহলে স্থাপন করেছিলেন, যেখানে তিনটি খিলান পরিবারটির সদস্যদের তিনি ভাগে ফ্রেমবন্দী করেছে। বাম দিকে দাড়িহীন তরুণ তিন ভাই, যুদ্ধের শিরস্ত্রাণ আর বুকের বর্ম পরিহিত, পিতা দাড়িয়ে আছেন কেন্দ্রীয় খিলানের সামনে, দাড়িসহ এবং শক্তিশালী, তৃতীয় খিলানের সামনে পরিবারের নারী সদস্য ও তাদের সন্তানরা, পুরুষদের ইস্পাতশীতল দৃঢ়তার আবেগীয় বিপরীত-ভারসাম্য হিসাবে।

এখন অবশ্য ডাভিডকে সমাধান করতে হবে, চিত্রকর্মটিকে সালোনে প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করতে কীভাবে তিনি এটিকে পারিসের অ্যাকাডেমিতে নিয়ে যাবেন। কাজটা অবশ্যই সহজ হবে না। যদিও ডাভিড ফরাসী রাজা ষোড়শ লুইয়ের জন্য এই কাজটি শুরু করেছিলেন, কিন্তু তিনি এটি এঁকেছেন রোমে, ধ্রুপদীবাদী ভাস্কর্যের মূল ঠিকানা এবং নিওক্ল্যাসিসিজম বা নব্যধ্রুপদীবাদের জন্মস্থান।

*

ফ্রান্সে ‘দ্য ওথ অব হোরেশিয়াই’ নতুন করে ক্ল্যাসিসিজম বা ধ্রুপদীবাদের পুনসূচনা করেছিল। শতাব্দীর শুরুর দিকেই আগ্নেয়গিরির লাভা ও ছাইয়ে সমাহিত প্রাচীন রোমান দুই নগরী, পম্পেই এবং হারকিউলেনিয়াম আবিষ্কৃত হয়েছিল, এবং ধ্রুপদীবাদী শিল্পকলা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছিল। এই পুনর্জাগরণ এখন নিউক্ল্যাসিসিজম (নব্যধ্রুপদীবাদ) নামে পরিচিত, যেখানে ‘নিও’ মানে হচ্ছে শুধু নতুন। জাক-লুই ডাভিডের (১৭৪৮-১৮২৫) নব্যধ্রুপদী চিত্রকর্মগুলোর ভিত্তি ছিল প্রাচীন

কাহিনী, এবং ইতিহাস বিষয়ক চিত্রকর্ম হিসেবে এগুলো ফরাসী অ্যাকাডেমির কঠোর প্রাধান্যপরম্পরার সবচেয়ে উপরের স্তরে শ্রেণিভুক্ত হয়েছিল।

অ্যাকাডেমির বেশ কঠোর কিছু নিয়ম ছিল। কোনো একটি সময়ে সদস্য হিসেবে শুধু চারজন নারীকে এটি মনোনীত করেছিল এবং লন্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমির মতোই 'জীবন্ত' মডেল দেখে রেখাচিত্র আঁকার কক্ষে কোনো নারীর প্রবেশাধিকার ছিল না। শিল্পী আডেলাইড লাবিল-গিয়ার্ড (১৭৪৯-১৮০৩) এবং এলিজাবেথ ভিগে লোব্রুন (১৭৫৫-১৮৪২), দুজনেই ফরাসী একাডেমির সদস্য ছিলেন। যে সালোনে ডাভিডের 'দ্ য ওথ অব দ্য হোরেশিয়াই' প্রদর্শিত হয়েছিল, লাবিল-গিয়ার্ড তার বিশাল ক্যানভাস 'সেল্ফ প্রোর্ট্রেইট উইথ টু পিউপিলস' প্রদর্শন করেছিলেন, নারী শিল্পীদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে সুস্পষ্ট একটি ঘোষণা। এর পরের বছর তিনি ফরাসী রাজার ফুফু এবং তার গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়মিত একজন পৃষ্ঠপোষক মাদাম অ্যাডেলাইডের প্রতিকৃতি 'প্রোর্ট্রেইট অব মাডাম আডেলাইড' প্রদর্শন করেছিলেন।

সালোন এমনিতেই বেশ বিশৃঙ্খল একটি আয়োজন ছিল। যেখানে মেঝে থেকে ছাদ অবধি চিত্রকর্মগুলো ঝোলানো হতো, এবং তারপর চিত্রকর্মগুলো দেখার সেরা জায়গার জন্য দর্শকরা ধাক্কাধাক্কি করতেন। শিল্পীকেই সম্ভাব্য যে-কোনো উপায়ে অমনোযোগী দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে হতো - কখনো আকৃতি, কিংবা উজ্জ্বল রং ব্যবহার করে, আর কখনো নিজের সুনাম এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে যেয়ে যে তার কাজের

জন্য দেয়ালের শ্রেষ্ঠ জায়গাটি নির্বাচন করা হতো - ইংলিশ চ্যানেলের দুই পাশের অ্যাকাডেমির সদস্য যাকে বলতেন ‘অন দ্য লাইন’ (মাথার উপর থেকে এক মিটার পর্যন্ত একটি এলাকা)। আর এখানেই ডেভিডের চিত্রকর্মগুলো ঝোলানো হয়েছিল। লাবিল-গিয়ার্ড এবং ভিগে লোব্রুনের সুখ্যাতি কেমন ছিল সেই সম্বন্ধে একটি ঘটনা আমাদের কিছু ধারণা দিতে পারে - ১৭৮৭ সালে সালোনে ডাভিডের ‘ডেথ অব সক্রেটিস’ চিত্রকর্মটির দুই পাশে তাদের প্রতিকৃতিগুলো ঝোলানো হয়েছিল, অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত শিল্পিদের কাজের সাথে ‘আকাশে’ নয়, যাদের কাজ প্রায় ছাদের কাছাকাছি অবস্থান করতো।

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে সালোনে অংশ নেয়া ভিগে লোব্রুনের চিত্রকর্মটি ছিল ‘মারি আন্তোয়ানেট অ্যান্ড হার চিল্ডরেন’, রানির একটি প্রশস্তিমূলক প্রতিকৃতি। রানি মেরি আন্তোয়ানেটের সুনাম ও ইমেজ রক্ষা করার সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে এটি আঁকার জন্য রাজপরিবার থেকে তাকে কমিশন দেয়া হয়েছিল, যাকে অস্থিরচিত্তের ছেলেমানুষিপূর্ণ একটি চরিত্র হিসেবে দেখা হতো, যিনি তার প্রজাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। ভিগে লোব্রুনকে এর জন্য যে পরিমান পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছিল সেটি বিবেচনা করে রাজপরিবারের কাছে আমরা এই চিত্রকর্মের গুরুত্ব বিচার করতে পারি, সেই সময়ে সবচেয়ে বড় কোনো ইতিহাসভিত্তিক চিত্রকর্মের চেয়েও যার পরিমান অনেক বেশি। তবে সেই সময় নাগাদ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতই ভঙ্গুর ছিল যে, জনগণের বিক্ষোভ সীমিত করার প্রচেষ্টায় লোব্রুনের এই চিত্রকর্মটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্যালোন উদ্বোধন হয়ে যাবার পরেই কেবল প্রদর্শন করা হয়েছিল। মারি আন্তোয়ানেটের প্রিয় শিল্পী হবার সুবাদে লোব্রুনকে মূল্য দিতে হয়েছিল, দুই বছর পরে যখন ফরাসী বিপ্লব শুরু হয়েছিল। গিলোটিন থেকে বাঁচতে তিনি নির্বাসনে

গিয়েছিলেন।

ফ্রান্সে অভিজাত শ্রেণির সদস্যদের প্রতিকৃতি খুব দ্রুত অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল যখন ক্ষুব্ধ ফরাসীরা তাদের রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে জোটবদ্ধ হতে শুরু করেছিল। ডাভিড এবং অন্যান্য শিল্পীদের নৈতিকতার বার্তাবাহী মার্জিত নব্যধ্রুপদী দৃশ্যগুলো এই প্রতিকৃতিগুলোকে প্রতিস্থাপিত করেছিল। যেভাবে আমরা দেখেছিলাম, ডাভিডের নব্যধ্রুপদীবাদের উৎস ছিল রোম, যেখানে ভেনিসে জন্ম নেয়া শিল্পী আন্তোনিও কানোভারও (১৭৫৭-১৮২২) নিজস্ব একটি স্টুডিও ছিল। হোয়াকিম ভিঙ্কেলমানের প্রভাবশালী লেখা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এইসব শিল্পীরা ধ্রুপদীবাদে পুনঃপ্রত্যাবর্তন সমর্থন করেছিলেন।

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ‘হিস্টরি অব দ্য আর্ট অব অ্যান্টিকুইটির’ মতো বইগুলোয় ভিঙ্কেলমান ধ্রুপদী ভাস্কর্যগুলো নিয়ে অনুপ্রাণিত করার মতো উদ্দীপনাসহ লিখেছিলেন, ভাস্কর্যগুলো তিনি জীবন্ত করে তুলেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে তিনি সর্বজনীন একটি সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছিলেন, আর কানোভার মত সমসাময়িক শিল্পীদের প্রাচীন গ্রিকদের অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। শিল্পকলার সৌন্দর্য বিষয়ে

ভিঙ্কেলমানের একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি ছিলেন শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় পুরুষ এমন একটি সময়ে, যখন এই ধরনের মানুষগুলো আলোকায়নের নামে তাদের চারপাশের পৃথিবীর সব কিছুই বিন্যস্ত ও নামকরণ, এবং এভাবে তারা সব কিছু ক্রমবিন্যাস আর নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিলেন। ভিঙ্কেলমানের সমকামিতা পুরুষ ধ্রুপদী নগ্নশিল্পগুলো সম্বন্ধে তার বিবরণগুলোকে প্রভাবিত করেছিল, যেগুলো প্রায়শই উত্তেজনাপূর্ণ। তিনি দাবি করেছিলেন সব সুন্দর গ্রিক নগ্নশিল্পগুলো ছিল পুরুষ, তিনি ‘অ ্যাপোলো বেলভেডেয়ারের’ প্রশংসা করেছিলেন ‘শিল্পকলার সর্বোচ্চ আদর্শ’ হিসেবে চিহ্নিত করে। তার দৃষ্টিভঙ্গি সেই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল, যার ওপর পশ্চিমা শিল্পকলার ইতিহাসের আধুনিক শাখাটি নির্মিত হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন পরবর্তীতে সব শিল্পকলার ‘মহান সরলতা আর প্রশান্তিময় মহিমার’ সেই গ্রিক আদর্শ অর্জন করার প্রচেষ্টা করা উচিত হবে।

ব্রিটিশরা তাদের গ্র্যান্ড ট্যুরে বারোক ভাস্কর্যগুলোকে অনেক বেশি নাটকীয় মনে করেছিলেন, এবং তাদের নব্যধ্রুপদী বাড়িগুলো সাজাতে তারা মার্জিত, চিরন্তন শিল্পকলা চেয়েছিলেন আর ফরাসী সংগ্রাহকরা সেই শিল্পকলা চেয়েছিলেন, যা ‘রোকোকো’ অবক্ষয়ের বিপরীত। ধ্রুপদী মূল্যবোধে পুনঃপ্রত্যাবর্তন এই সব কিছুই সরবরাহ করতে পারে, ভিঙ্কেলমান যুক্তি দিয়েছিলেন, যখন সাদা মার্বেল থেকেই আদর্শ ায়িত রূপ তৈরি করা যেতে পারে। ভিঙ্কেলমান যখন এইসব পুরুষদের নিখুত শারীরিক সৌন্দর্য, স্থির হয়ে থাকা কর্ম, উন্মুক্ত মাংসের ভাস্কর্যগুলো দেখেছিলেন, তখন য ৌনতার নান্দনিকতার শিহরণও কখনো খুব দূরে অবস্থান করছিল না।

ভিঙ্কেলমানের ধারণাগুলো দ্বারা কানোভা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্য খোদাই করার আদি বারোক দক্ষতাকে তিনি ফেলে দিতে পারেননি (সতেরোতম অধ্যায়ে জিয়ামবোলোনিয়ার কাজে আমরা যেমন দেখেছি),

অথবা ভালোবাসা নিয়ে রোকোকো মোহাবিষ্টতা পরিত্যাগ করতে পারেননি। এইসব কিছুই তার সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছিল, যেমন 'সাইকি রিভাইভড বাই কিউপিডস কিসেস' । মরণশীল সাইকিকে আলিঙ্গন করে আছে তার ডানাসহ প্রেমিক কিউপিড, তার প্রায় নগ্ন শরীর উপরের দিকে সম্প্রসারিত হয়ে আছে তাকে ধরার জন্য যখন তার প্রেমিক তাকে ভালোবাসায় স্পর্শ করেছে। কিউপিড হচ্ছে সেই আদর্শায়িত সুন্দর গ্রিক তরুণের হালনাগাদ সংস্করণ, যার বর্ণনায় ভিঙ্কেলমান প্রচুর পরিমানে কালি খরচ করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ বীরদের প্রতি নিবেদিত স্মৃতিসৌধের কোনো অভাব ছিল না, এটিয়েন মরিস ফ্যালকোনেটের (১৭১৬-১৭৯১) সেইন্ট পিটার্সবার্গে রুশ জার প্রথম পিটারের ব্রোঞ্জের ঘোড়সওয়ার থেকে শুরু করে আমেরিকার রিচমন্ডে জ্যাঁ-আন্তোয়ান উদোর (১৭৪১-১৮২৮) জর্জ ওয়াশিংটনের পূর্ণাঙ্গ আকারের ভাস্কর্য। কিন্তু এই পর্বে কৃষ্ণাঙ্গ মডেলদের নিয়ে আমরা ভাস্করদের কাজ করতে দেখেছি। অজ্ঞাতনামা একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির - সম্ভবত কোনো ক্রীড়াববিদ - ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন ব্রিটিশ গ্র্যান্ড ট্যুরের একজন ভাস্কর ফ্রান্সিস হারউড (১৭২৭-১৭৮৩), এখানে ভাস্কর মার্বেলের পরিবর্তে কালো পাথর ব্যবহার করেছিলেন তার মডেলের সাদৃশ্য রূপটি প্রকাশ করতে। উডো নিজেও কৃষ্ণাঙ্গ একজন নারীর ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন শার্ত্রের ডিউকের জন্য তার পরিকল্পিত একটি ঝর্নায়, সেখানে সেই নারী সাদা মার্বেলে নির্মিত একজন স্নানরতা নারীর পরিচারিকা রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আজ এই ভাস্কর্যটির শুধু রং করা একটি প্লাস্টার অনুশীলন টিকে আছে, কারণ সেই ঝর্নার স্থাপনাটি অবহেলার শিকার হয়েছিল যখন ফরাসী বিপ্লব শুরু হয়েছিল এবং ১৭৯৩ সালে ডিউক গিলোটিনে তার মাথা

হারিয়েছিলেন।

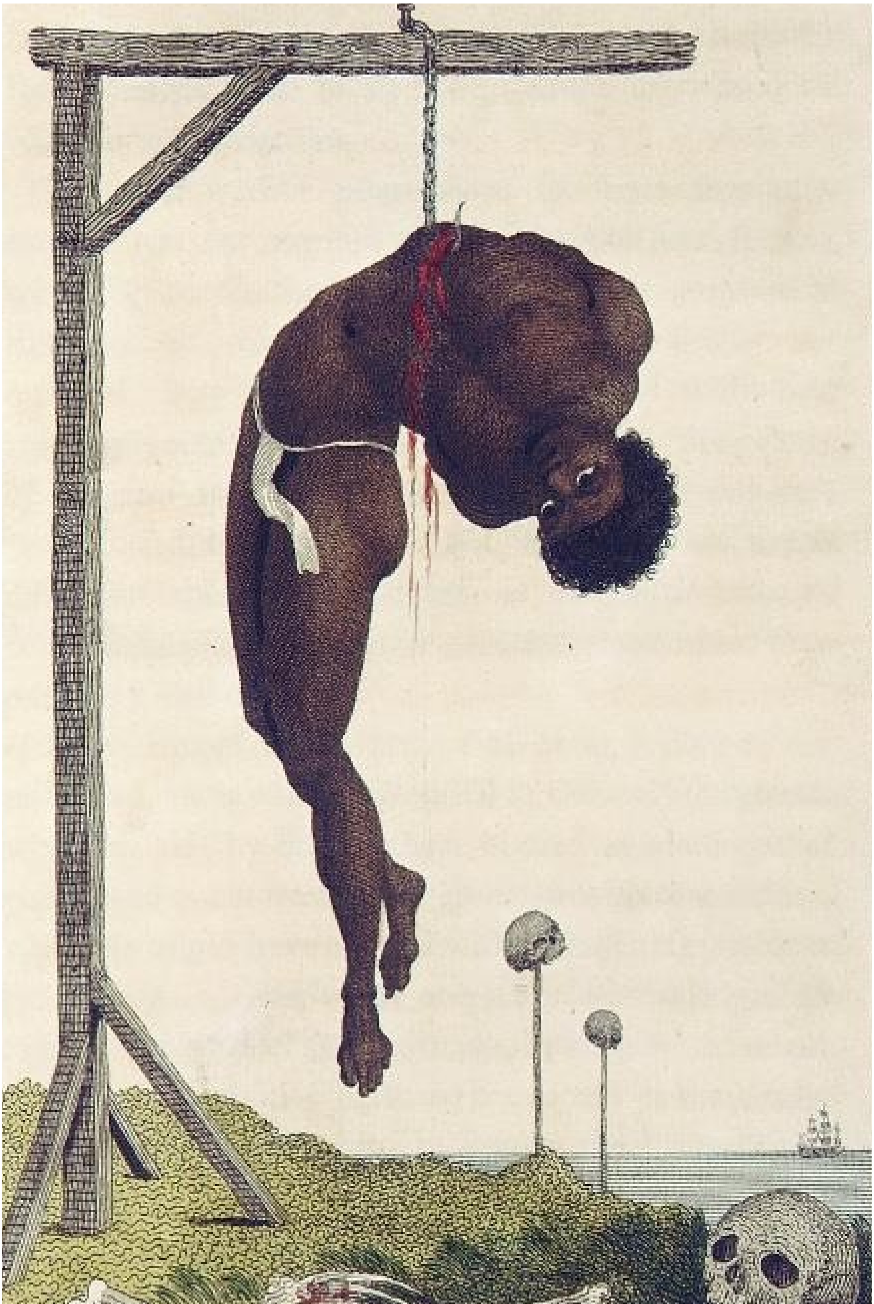

ইংল্যান্ডে, স্বপ্নদ্রষ্টা শিল্পী ও কবি উইলিয়াম ব্লেক (১৭৫৭-১৮২৭) বাড়তি উপার্জন করতে প্রকাশকদের জন্য বইয়ের প্লেট এনগ্রেভিং করতেন। ১৭৯৬ সালে তিনি জন স্টেডম্যানের "ন্যারেটিভ অব এ ফাইভ ইয়ার্স এক্সপেডিশন এগেইনস্ট রিভোল্টেড নিগ্রোস অব সুরিনাম" বইটির অলংকরণ করেছিলেন। যে বইটি দক্ষিণ আমেরিকার ডাচ উপনিবেশ সুরিনামে আখ বাগানে দাসদের ওপর নৃশংস অত্যাচার এবং সব হত্যাকাণ্ড বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিল। ব্লেক একটি রঙ্গীন খোদাইচিত্রে বিশেষভাবে বর্বর এক শাস্তির চিত্র এঁকেছিলেন, হাত-পা বাঁধা একজন ক্রীতদাসকে লোহার একটি আকশী থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আকশীটিকে তার পাজরের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে । আমরা এই বীভৎস নিষ্ঠুরতার পটভূমিতে মাথার খুলিসহ সারিবদ্ধ খুঁটি এবং উপসাগর ছেড়ে যাওয়া একটি ডাচ বাণিজ্য জাহাজ দেখতে পাই, যে জাহাজগুলো এই দাসদের উৎপাদিত চিনি দিয়ে বোঝাই করা হয়েছে, যে চিনির গন্তব্য ছিল লোভী ইউরোপীয়দের খাবারের টেবিল। স্টেডম্যানের এই বইটি দাসত্ব-বিরোধী ব্রিটিশ আন্দোলনকর্মীরা দাসত্ব প্রথা বিলোপ করার লক্ষ্য পূরণে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন, এবং এই খোদাইচিত্রটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপকভাবে অনুলিপিকৃত ও প্রচারিত দাসত্ব-বিরোধী শিল্পকর্মের একটি নমুনায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

ইতোপূর্বে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের চিত্রকর্মে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল শুধু দুটি ভূমিকার কোনো একটি পূরণ করতে: কোনো 'কনভারসেশন পিসে' সেই সময়ের রীতি অনুযায়ী বিচিত্র ভিনদেশী গৃহভৃত্য হিসেবে, যেমন হোগার্থের আঁকা সেই চিত্রকর্মটি, যা আমরা বাইশতম অধ্যায়ে দেখেছিলাম, অথবা আফ্রিকার রাজা বালথাসার হিসাবে, সেই তিন রাজার একজন, যিনি বেথলেহেমের তারকা অনুসরণ করেছিলেন এবং খ্রিস্টের জন্য উপহার নিয়ে এসেছিলেন, যেভাবে আমরা দেখেছি ডুরার, বশ এবং রুবেন্সের 'অ্যাডোরেশন অব ম্যাগাই' চিত্রকর্মে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ, বিপ্লবের পরে যখন ফ্রান্স (সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য) গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল, শিল্পীরা কৃষ্ণাঙ্গ মডেলদের একক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আকঁতে শুরু করেছিলেন। এইসব প্রতিকৃতির সেরা উদাহরণগুলোর একটি হচ্ছে 'পোর্ট্রেইট অব ডেপুটি বেলেই', যা এঁকেছিলেন অ্যান-লুইস জিরোডে (১৭৬৭-১৮২৪), এবং ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের সালোনে যা প্রদর্শন করা হয়েছিল। ব েলেই একজন শিশু দাস হিসেবে সেনেগাল থেকে ফ্রান্সে এসেছিলেন, এবং বহু বছরের শ্রমের বিনিময়ে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ফরাসী বিপ্লবী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং ক্যাপ্টেন পদ অবধি পদোন্নতি পেয়েছিলেন, এরপর ন্যাশনাল কনভেনশনের (অন্তর্বর্তীকালীন ফরাসী সংসদ) একজন ডেপুটি হয়েছিলেন, যিনি ক্যারিবিয়ান দ্বীপ হিসাপানিওয়ালায় (বর্তমান হাইতি) ফরাসী উপনিবেশ সেইন্ট ডমিঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে বেলেই তার অবস্থানকে ব্যবহার করেছিলেন, এবং ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী কনভেনশন যখন সব উপনিবেশে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করেছিল, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যখন এই প্রতিকৃতি

প্রদর্শিত হয়েছিল, বেলেই কেবল তার দায়িত্ব থেকে সরে দাড়িয়েছেন, এবং দেশে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন – চিত্রকর্মটির পটভূমিতে সেইন্ট-ডোমিঙ্গে দৃশ্যমান।

বেলেই-এর প্রতিকৃতিটি সালোনে সাদরে গৃহীত হয়েছিল ও ইতিবাচক প্রতিক্রয়া সৃষ্টি করেছিল এবং তাকে ফরাসী বিপ্লবের লক্ষ্যের একটি প্রতীক হিসেবে হিসেবে দেখা হয়েছিল - স্বাধীনতা ও সাম্যতা। বেলেই, সেই মার্বেলের আবক্ষ মূর্তিটির মতো সুস্পষ্টভাবে শনাক্তযোগ্য, যার গায়ে হেলান দিয়ে তিনি দাড়িয়ে আছেন - অ্যাবে রেনালের একটি ভাস্কর্য প্রতিকৃতি, দাসত্ব প্রথা বিলুপ্তি আন্দোলনে সক্রিয় একজন আদি শ্বেতাঙ্গ চরিত্র, যিনি এর আগের বছর মারা গিয়েছিলেন। বেলেই তার প্রাক্তন প্রতিষ্ঠানের সামরিক উর্দি পরে আছেন, তার ধূসর হতে থাকা চুল পেছনে দিকে টেনে আচড়ানো। জিরোডে তারপরও তাকে পুরোপুরিভাবে ফরাসী সমাজের সাথে অঙ্গীভূত হবার অনুমতি দেননি - তার কানের দুল এখানে সুস্পষ্ট - কিন্তু সামগ্রিকভাবে এটি সহানুভূতিশীল একটি প্রতিকৃতি। জিরোডে এই প্রতিকৃতি সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছিলেন কারণ তিনি বেলেই ও তার বিশ্বাস ও মতাদর্শ সমর্থন করতেন। আর যেহেতু এই ধরনের প্রতিকৃতিগুলো রোমান্টিকতাবাদের ক্রান্তিলগ্নে অবস্থান করছে - একটি নতুন হৃদয়স্পর্শী এবং নাটকীয় শৈল্পিক আন্দোলন - আমরা পরের অধ্যায়ে সেটি পরীক্ষা করে দেখবো।

জিরোডে ডাভিডের একজন সহকারী ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি নিজেকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী

হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছিলেন। মারি গিলমিন বেনোয়া (১৭৬৮-১৮২৬) জিরোডে'র সমবয়সী ছিলেন এবং তিনিও ডেভিডের স্টুডিওতে সময় কাটিয়েছিলেন, এছাড়াও তিনি ভিগে লোব্রুনের ছাত্রী ছিলেন। তার 'পোট্রেইট অব মাডেলাইন' তাকে সুখ্যাতি দিয়েছিল, যখন এটি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের সালোনে প্রদর্শিত হয়েছিল। মাডেলেইন একজন কৃষ্ণাঙ্গ তরুণী, যিনি বসে আছেন এবং সরাসরি তার দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছেন, তার স্থির দৃষ্টি আমাদের দৃষ্টির মুখোমুখি। তিনি কমলা বন্ধনীর সাদা রঙের একটি শিথিল কাপড়ে আচ্ছাদিত, নীল রঙের একটি শাল পেছনের চেয়ারের উপর রাখা। কোনো কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে চিত্রকর্মে এভাবে উপস্থাপন অভূতপূর্ব একটি ঘটনা ছিল। কোনো ভূমিকা (দাস কিংবা রাজা) পালন করতে নয়, বরং এখানে এই নারী নিজ অধিকারে প্রতিকৃতির বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছেন। তিনি কী মাদার ফ্রান্সের প্রতীকীরূপ - রাজতন্ত্র থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত, সাম্যতার ধারণায় পরিপৃক্ত নতুন একটি রাষ্ট্রের পুনর্জন্ম - একটি রাষ্ট্র যা দাসত্ব প্রথা বিলোপ করেছিল? তিনি কি কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী এবং নারী মুক্তি প্রতীক? যদি তিনি এই সব কিছুর প্রতীকী রূপ হয়ে থাকেন, সেই স্বপ্ন ছিল ক্ষণকালীন। সালোনে মেডাল জয় লাভ করার পরও বেনোয়া বাধ্য হয়েছিলেন ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে, যখন তার স্বামীর পদন্নোতি হয়েছিল। আর দাসত্ব প্রথা বিলোপের সেই সম্ভাবনাটি অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছিল যখন ১৮০২ সালে নেপোলিয়ন এটি পুনর্বহাল করেছিলেন।

ফরাসী বিপ্লব একজন রাজাকে হত্যা করেছিল, এবং একজন সম্রাটকে সৃষ্টি করেছিল, যিনি বাকি ইউরোপ (এবং এর সীমানা বাইরেও) জয় করতে ও প্রতিটি রাষ্ট্রের মূল্যবান ঐহিত্য আর সম্পদ লুন্ঠন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে যখন নেপোলিয়ন স্পেন আক্রমণ করেছিলেন, ততদিনে তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে চুরি করে আনা প্রচুর

মাস্টারপিস দিয়ে ল্যুভের প্রতিটি কক্ষ পূর্ণ করেছিলেন। তিনি ইটালি থেকে 'মেডিচি ভিনাস', 'অ্যাপোলো ভেলভেডেয়ার' এবং 'লাওকুন' সংগ্রহ করেছিলেন। তার প্রতিনিধিরা অ্যান্টওয়ার্প থেকে রুবেন্সের 'ডিসেন্ট ফ্রম দ্য ক্রস' লুট করে এনেছিল, এবং তিনি এমনকি ভ্যাটিকান থেকে রাফায়েলের 'দ্য স্কুল অব এথেন্স' ফ্রেস্কোটি দেয়াল থেকে খুলে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। ভেনিসের একটি ডমিনিকান মোনাস্টেরি থেকে ভেরোনেসের বিশাল দশ মিটার প্রশস্ত 'দ্য ওয়েডিং ফিস্ট অব কানা' চিত্রকর্মটিকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল, যখন এটি আল্পস অতিক্রম করেছিল, এবং খুব তাড়াহুড়ো করে সেটি যুক্ত করা হয়েছিল।

নেপোলিয়নকে অবশেষে থামানো গিয়েছিল, এবং বহু শিল্পকর্ম সেগুলোর মূল জায়গায় প্রত্যাবর্তন করেছিল, কিন্তু সেটি স্পেনে তার ছয় বছরের আগ্রাসনের আগে ঘটেনি। এই যুদ্ধটি 'পেনিনসুলার' বা স্প্যানিশ স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে পরিচিত ছিল। একজন শিল্পীর দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসকো হোসে ডে গয়া ই লুসিয়েন্টেস (১৭৪৬-১৮২৮) এই যুদ্ধের ভয়াবহতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় তিনি 'দ্য ডিজাস্টার অব ওয়ার' (১৮১০-১৫) শিরোনামে ছাপচিত্রের একটি সিরিজ সৃষ্টি করেছিলেন। যুদ্ধের আমনাবিকতা ও নিষ্ঠুরতা নিয়ে এযাবৎ সৃষ্টি করা হয়েছে এমন শিল্পকর্মের মধ্য এটি সবচেয়ে হৃদয়বিদারক। এগুলো সৃষ্টির সময় গয়া ছিলেন বৃদ্ধ এবং বধির, তিনি বিরাশিটি ছাপচিত্র সৃষ্টি করেছিলেন 'এচিং' এবং সেই সাথে নতুন পদ্ধতি 'অ্যাকোয়াটিন্ট' ব্যবহার করে, যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করে ছাপচিত্র প্রয়োজন অনুযায়ী 'টোন' (রেখার বদলে ধুসর রং) যুক্ত করা যেত । এই ছাপচিত্রের ধারাবাহিকে আমরা দুর্ভিক্ষ, অকল্পনীয় সহিংসতা আর অমানবিক উন্মত্ততার দৃশ্য দেখি। এই ধারাবাহিকের উনচল্লিশ নং প্লেটে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও জননাঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা তিনটি শবদেহকে গাছ থেকে ঝুলতে দেখি। পাঁচ নং প্লেটে আমরা দেখি নারীরা তাদের পেছনে শিশুদের বেঁধে ফরাসী সৈন্যদের মোকাবেলা করছে শুধুমাত্র পাথর

আর লাঠি ব্যবহার করে। ‘দ্য ডিজাস্টার অব ওয়ার’ এতো বেশি অস্বস্তিকর ছিল যে, গয়া তার জীবদ্দশায় এগুলো প্রকাশ করতে সাহস পাননি। তার মৃত্যুর পয়ত্রিশ বছর পরে, ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে এগুলো প্রকাশ করা হয়েছিল।

এই অধ্যায় ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে):

(১) Jacques-Louis David, Oath of the Horatii
(২) Adélaïde Labille-Guiard, Self-Portrait with Two Pupils
(৩) Adélaïde Labille-Guiard, Portrait of Madame Adelaide
(৪) Jacques-Louis David, The Death of Socrates, (1787)
(৫) Élisabeth Vigée Le Brun, Marie Antoinette and Her Children
(৬) Antonio Canova, Psyche Revived by Cupid's Kiss
(৭) Francis Harwood, Bust of a Man
(৮) Anne-Louis Girodet, Portrait of Citizen Belley
(৯) Marie-Guillemine Benoist, Portrait of Madeleine
(১০) Goya (Francisco de Goya y Lucientes), Plate 5 from 'The Disasters of War
(১১) Goya (Francisco de Goya y Lucientes), Plate 39 from 'The Disasters of War

অধ্যায় ২৫ - রোমান্টিসিজম থেকে ওরিয়েন্টালিজম

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ, জুলাই মাস, থিওডোর জেরিকো তার হাত থেকে তুলি নামিয়ে রাখলেন। তার কাজ শেষ হয়েছে। ছবি আঁকার প্রবল উন্মত্ততা নিয়ে গত নয় মাস তিনি স্টুডিওতে কাটিয়েছেন, এবং জাহাজডুবির পরে বেঁচে থাকা কিছু মানুষের তীব্র আবেগপূর্ণ একটি চিত্রকর্ম দিয়ে সাত মিটার প্রশস্ত আর পাঁচ মিটার উঁচু একটি ক্যানভাস আবৃত করেছেন। সেখানে আফ্রিকার সৈন্য, ভূমধ্যসাগরীয় নাবিক, প্রাণহীন ফ্যাকাসে ফরাসী মৃতদেহ গভীর সমুদ্রে একটি ক্ষুদ্র ভেলায় ভাসমান। বেশ দূরে একটি জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রচেষ্টায় জোড়াতালি দিয়ে বানানো একটি পতাকা বাতাসে দোলাতে খালি গায়ের কৃষ্ণাঙ্গ একজন ব্যক্তিকে উঁচু করে তুলে ধরা হয়েছে । কিন্তু ক্ষুদ্র পালে বাতাসের প্রবাহ তাদের ভিন্ন একটি দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিশাল ঢেউ গ্রাস করে নেবার হুমকি নিয়ে এগিয়ে আসছে, মৃত্যু ইতোমধ্যেই পাঁচ জনকে স্পর্শ করেছে।

জেরিকো তার স্টুডিওর চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, তার বন্ধুরা সেখানে আসা বন্ধ করে দিয়ে বহু দিন আগে, গন্ধের তীব্রতা তারা সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি তার স্টুডিওতে অর্থের বিনিময়ে মৃতদেহ পৌছে দেয়ার জন্য বন্দোবস্ত করেছিলেন যেন তিনি সময়ের সাথে তাদের হাত-পা, চামড়ার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, এবং বেশ কিছু দিন সেগুলো সেখানে ছিল। চারিদিকে

অসংখ্য রেখাচিত্র আর খসড়া চিত্রকর্ম, সবই মূল ‘দ্য র‍্যাফট অব মেডুসা’ চিত্রকর্মটি সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটি সর্বক্ষণের জন্য তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যখন বেঁচে যাওয়া নাবিকদের তিনি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, এবং সমুদ্রে পরিত্যক্ত এই ব্যক্তিদের সত্যিকারের দুর্দশাটিকে জীবন্ত করে তুলতে তিনি বেশ কিছু ভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক বিন্যাস নিয়েও কাজ করেছিলেন।

এই চিত্রকর্মটির ভিত্তি ছিল ১৮১৬ সালের একটি নৌবিপর্যয়, যখন ফরাসী ফ্রিগেট ‘মেডুসা’ সেনেগালের উপকূলে নিকটে একটি চড়ায় আটকে গিয়েছিল, এবং একটি জোড়াতালি দিয়ে বানানো ভেলার ওপর ১৫০ নাবিক ও যাত্রীকে পরিত্যক্ত করা হয়েছিল, তারা প্রায় তেরো দিন সমুদ্রে ভেসেছেন, অবশেষে সেদিক দিয়ে অতিক্রম করা একটি জাহাজ তাদের উদ্ধার করেছিল, ম াত্র পনেরো জন জীবিত ফিরে এসেছিল, এবং নরমাংস খেয়ে বেঁচে থাকার কাহিনী জীবিতদের সাথেই তীরে ফিরে এসেছিল। জেরিকো এঁকেছেন, ভেলার অনেকেই দূরে একটি জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে, যে জাহাজটি দিগন্তে ক্ষুদ্র, ত্রিভূজাকৃতির একটি পাল ছাড়া আর কিছুই নয় । জেরিকো তাদের চিৎকার আর বিলাপ শুনতে পেয়েছিলেন, সমুদ্র লবনাক্ত পানির গন্ধ পেয়েছিলেন, তাদের ভয়ের স্বাদ অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাদের যুদ্ধটি ছিল জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে যুদ্ধ এবং তিনি চিত্রকর্মে এই বিষয়টির সুবিচার করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

*

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের সালোনে ‘দ্য র‍্যাফট অব দ্য মেডুসা’ স্বর্ণপদক জয় করেছিল, কিন্তু সাথে সাথেই এটি রাষ্ট্র ক্রয় করেনি, হয়তো এই চিত্রে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অবস্থান দেবার জন্য, বিশেষ করে এমন একটি সময়ে, যখন ফ্রান্স পুনরায় দাস বাণিজ্যে অংশ নিতে শুরু করেছিল । সমালোচকদের প্রতিক্রিয়া বিভাজিত হয়েছিল দুটি গোষ্ঠীতে, একদল থিওডোর জেরিকোর (১৭৯১-১৮২৪) বাস্তবতাবাদের প্রশংসা করেছিলেন, এবং অন্যরা সমকালীন জীবনের একটি বীভৎস পর্বকে ক্ল্যাসিকাল ইতিহাসের মাত্রায় আঁকা বাড়াবাড়ি মনে করেছিলেন। আর জেরিকোর কাছে ‘দ্য র‍্যাফট অব দ্য মেডুসা’ ছিল তার সেই বিশ্বাসের প্রতিনিধি - শিল্পীদের অ্যাকাডেমি বিধি -নিষেধের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা উচিত নয়, বরং যে-বিষয় তাকে আন্দোলিত করে, তার সেগুলো আঁকার স্বাধীনতা থাকা উচিত।

এর মাত্র পাঁচ বছর পরেই জেরিকো মারা যান, কিন্তু তার এই চিত্রকর্মটিকে সব শিল্পীদের প্রতি উদাত্ত একটি আহবান হিসেবে দেখা হয়েছিল, যারা নিজেদের প্রকাশ করতে, এবং কাজের প্রকৃতি আর রূপ নির্ধারণে তাদের আবেগকে অনুমতি দিতে চান। এইসব ‘রোমান্টিক’ - যারা পরে এই

নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন - শিল্পীরা নব্যধ্রুপদীবাদ প্রত্যাখান করেছিলেন, এবং পরিবর্তে ত াদের নিজেদের ব্যক্তিত্ব আর অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারা রং, আবেগ, অনুভূতি, ইন্দ্রিয়বোধকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, কারণ ধ্রুপদী প্রশিক্ষণ থেকে তারা নিজেদের দ ূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। 'রোমান্টিসিজম' ছিল প্রভাবশালী ইউরোপীয় শিল্পকলা অ্যাকাডেমিগুলোর দুর্ভেদ্য বর্মে প্রথম ফাটল, যে প্রতিষ্ঠানগুলো সেই সময় অবধি নিয়ন্ত্রণ করছিল , কীভাবে শিল্পকলা শেখাতে হবে, কোনো শৈলীকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে হবে।

পুরো অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী ক্লড লরেইনের কাজ ইউরোপীয় ভূদৃশ্যের চিত্রকর্মগুলোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু এখন রোমান্টিক শিল্পীরা আরো গভীর ও আরো আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান করতে শুরু করেছিলেন, যেখানে প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গুলোকে সম্পূর্ণভাবে অভিভূত করতে সক্ষম। সুউচ্চ পর্বত আর অসীম সমুদ্র আঁকার মাধ্যমে তারা মানসিক ও আবেগীয় অবস্থাগুলো প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন, তাদের ভূদৃশ্যচিত্রগুলো আপনাকে ধাক্কা দিয়ে জীবনে ফিরিয়ে আনবে, প্রকৃতির ক্ষমতা নিয়ে অপরিসীম সম্ভ্রম আর একটি সন্ত্রস্ত বিস্ময়বোধে আপনার অ নুভূতিকে আপ্লুত করবে। এটাই হচ্ছে 'সাবলাইম' - বিস্ময় আর সম্ভ্রম উদ্রেককর..ভীষণসুন্দর আর মহীয়ান। ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীরা, যেমন এডমন্ড বুর্ক এই ভীষণসুন্দর 'সাবলাইম' ধারণাটি নিয়ে অষ্টাদশ শতকে লিখেছিলেন, কিন্তু অর্ধশতাব্দী পরে ক্যাসপার ডেভিড ফ্রিয়েডরিখের শিল্পকর্মে (১৭৭৪-১৮৪০) এটি সবচেয়ে সফলভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ফ্রিয়েডরিখের কাজে জার্মান ভূদৃশ্য ও ভূপ্রকৃতি তার ব্যক্তিগত ধ্যান আর আধ্যাত্মিক সংযোগের একটি স্থানে পরিণত হয়েছিল। কঠোর প্রোটেস্টান্ট পরিবারে জন্ম নেয়া ফ্রিয়েডরিখ তার বহু ভূদৃশ্যচিত্রে ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করেছিলেন, পর্বত চূড়ায় ক্রুশ, নিষ্প্রাণ শীতকালীন বনে একটি মঠ বা ধর্মাশ্রম, বালিয়াড়ির উপর দাড়িয়ে থাকা সাগরের বিশালতা নিয়ে ধ্যানমগ্ন একজন সন্ন্যাসী।

ফ্রিয়েডরিখ প্রাকৃতিক আর ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিবর্ধিত করেছিলেন ভীষণসুন্দর আর মহীয়ানের প্রতি সম্ভ্রমউদ্রেককারী বোধটিকে আরো বৃদ্ধি করতে। তার 'দ্য ওয়ান্ডারার অ্যাবাভ এ সি অব ফগ' (১৮১৮) চিত্রকর্মে আমরা দেখি একজন ব্যক্তি পৃষ্ঠ থেকে খানিকটা উঁচু হয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা পাথর খণ্ডের উপরে দাড়িয়ে আছেন, বেশ নীচে নেমে আসা মেঘে ঢাকা একটি উপত্যকার দিকে নীচে তাকিয়ে আছেন। বাতাসে তার চুল এলোমেলো উড়ছে এবং তাকে প্রান্ত থেকে সরে আসতে বলার তাড়না আমরা অনুভব করি। যে ভুদৃশ্য নিবিষ্টভাবে তিনি অবলোকন

আর ধ্যান করছেন সেটি সুবিশাল। ফ্রিয়েডরিখ প্রায়শই প্রকৃতির এই ভীষণসুন্দর দিকটি তার সৃষ্টিতে আবাহিত করেছিলেন, যা আমাদের দারুণ বিস্ময়ের ধাক্কায় বর্তমান মুহূর্তে নিয়ে আসে, প্র াকৃতিক বিশ্বের স্বর্গীয় সৌন্দর্য আর মহিমার অনুভূতি আমাদের ব্যস্ত মনে পৌঁছে দিতে।

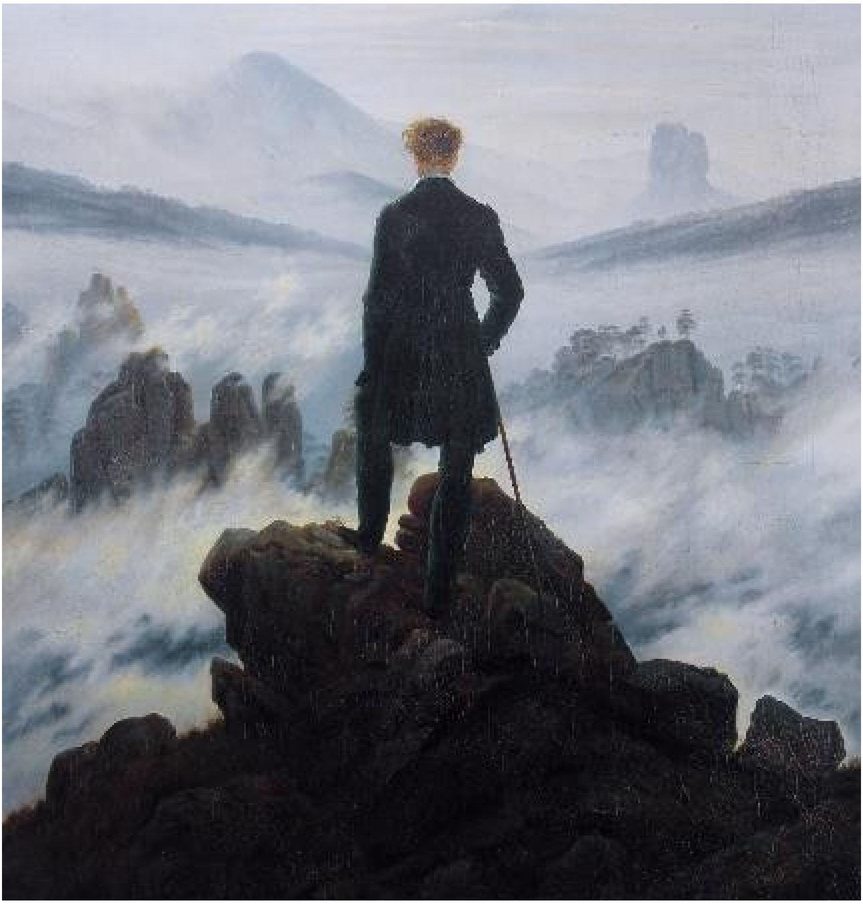

ইংল্যান্ডে জন কনস্টেবল (১৭৭৬-১৮৩৭) তার শৈশবের সাফোক এলাকার সমতল ভূপ্রকৃতির প্রতি তার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। যখন ফ্রিয়েরিখ সেই 'সাবলাইমের' অভিজ্ঞতা তার সৃষ্টিতে ধারণ করতে চেয়েছিলেন, কনস্টেবল প্রকৃতির প্রাত্যহিক গৃহস্থালী মেজাজগুলো পুনঃসৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন। বার্লির ভারে নত শস্যক্ষেতের উপর দিয়ে ছুটে চলা মেঘসহ তিনি ইংলিশ গ্রীষ্মের দিনগুলোর প্রাণবন্ত পরিবর্তনশীলতাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

কনস্টেবল তার ভূদৃশ্যচিত্র নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, এবং তিনি চেয়েছিলেন রয়্যাল অ্যাকাডেমির প্রতিযোগিতায় সেগুলো যেন ইতিহাস ভিত্তিক চিত্রকর্মগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে। আর এই কারণে তিনি কিছু 'সিক্স-ফুটার' সৃষ্টি করেছিলেন - দুই মিটার প্রশস্ত ক্যানভাস, যেমন, ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের 'দ্য হে ওয়েইন'। একটি পরিবর্তনশীল আকাশের নীচে ঘোড়ায় টানা একটি গাড়ি (ওয়েইন) কনস্টেবলের বাবার ফ্ল্যাটফোর্ড মিলের কাছে অগভীর স্টাওয়ার নদীর উপর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সূর্যালোকে প্রতিটি পাতা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং নদীর ওপারে আলোছায়ার ছোপযুক্ত মাঠ আকাশের মেঘের বিন্যাসকে প্রতিফলিত করছে। যদিও কনস্টেবলের কাজ প্রায়শই ইংল্যান্ডে খানিকটা আগ্রহহীনতার সাথে গৃহীত হয়েছিল, তবে 'দ্য হে ওয়াইন' ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে যখন প্যারিসের স্যালোনে প্রদর্শিত হয়েছিল এটি স্বর্ণপদক জয় করেছিল। ফ্রান্সে কনস্টেবল একজন রোমান্টিক শিল্পী হিসেবে প্রশংসিত হয়েছিলেন, এবং সেখানে অন্য বহু রোমান্টিক শিল্পীদের তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যেমন ইউজেন ডেলাক্রোয়া।

একই সময়ে ব্রিটিশ বংশোদ্ভুত শিল্পী টমাস কোল (১৮০১-১৮৪৮) নিজেকে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছিলেন। শিল্পী হিসেবে কোলের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছিল না, এবং একজন এনগ্রেভার বা খোদাইশিল্পী হিসাবে তিনি কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু তিনি আমেরিকার পূর্ব উপকূলে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকা পর্যটক এলাকাগুলোর প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন - হাডসন নদী, ক্যাটস্কিল পর্বতমালা, এবং তিনি ভূদৃশ্যচিত্র আঁকতে শুরু করেছিলেন। কোল ছিলেন প্রথম শিল্পী যিনি আমেরিকায় এভাবে আঁকতে শুরু করেছিলেন। উপনিবেশবাদী ইউরোপীয়দের জন্য আমেরিকার ভূখণ্ড ছিল এমন কিছু যা অধিগ্রহন করতে হবে, সম্পদ হিসাবে দখল করতে হবে। শুধু দৃশ্য হিসেবে দেখার বিষয়টি বাস্তব হয়নি যতক্ষণ না প্রথম ট্যুরিস্ট হোটেলগুলো প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছিল, এবং জলপ্রপাতের বিস্ময়কর সৌন্দর্যপূর্ণ পতন অথবা পর্বতচূড়ার সূউচ্চে ভেসে থাকা দৃশ্যগুলো উপভোগ করা সম্ভব হয়েছিল দেখার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত মঞ্চগুলো থেকে।

কোলের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বড় সমস্যা ছিল। তিনি ক্লড লোরেইনের মত তার ভূদৃশ্যে কোনো প্রাচীন স্থাপনা যুক্ত করতে পারছিলেন না, কারণ আমেরিকায় এমন কিছুর কখনো অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তিনি দেশটির নিজস্ব ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন, এবং এর পরিবর্তে আদিবাসী আমেরিকানদের কাজে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে বন্ধু জেমস ফেনিমোর কুপার একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন, ‘দ্য লাস্ট অব দ্য মোহিকানস’, বেশ আগের একটি ফরাসী-ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের যুদ্ধ ছিল এর পটভূমি, এবং কোল এই উপন্যাসটি ব্যবহার করে ভূদৃশ্যচিত্র নিয়ে নতুন ধরনের কিছু কম্পোজিশন বা বিন্যাস সৃষ্টি করার সুযোগ নিয়েছিলেন। তার এই ‘ল্যান্ডস্কেপ কম্পোজিশনগুলো’ ছিল মূলত কাল্পনিক কিছু উপাদানসহ ভূদৃশ্যচিত্র যা আরো গভীরতর কোনো অর্থ প্রকাশ করে। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তার আঁকা ‘কোরা নিলিং অ্যাট দ্য ফিট অব টামেউন্ড’ চিত্রকর্মে আমরা পার্বত্য একটি পটভূমিতে পাথরের একটি খোলা জায়গা আদিবাসী আমেরিকানরা বৃত্তাকারভাবে দাড়িয়ে থাকতে দেখি, তাদের সামনে দাড়িয়ে আছেন কুপারের উপন্যাসের নায়িকা কোরা, তার বোন এবং সঙ্গীদের মুক্তি দেবার জন্য তিনি তাদের কাছে নতজানু হয়ে মিনতি করছেন। কোলের কাজে এই আদিবাসী সভার অন্তর্ভুক্তি, যেখানে

আদবাসীরা একত্রিত হয়ে তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তর্কবিতর্কের মাধ্যমে নিরসন করে, কোলকে তাদের দীর্ঘ ইতিহাসের ঐতিহ্যে থেকে রসদ সংগ্রহ করার অনুমতি দিয়েছিল । কারণ কোলের কাছে এগুলো ছিল ফোরামে একত্রিত হওয়া রোমানদের মতো একটি বিষয়। এখানে ইউরোপ থেকে ভিন্ন একটি কাহিনি আমরা দেখি কিন্তু এটি সমপরিমানে বৈধ।

উনবিংশ শতাব্দীতে জাপানে কাটসুশিকা হকুসাই (১৭৬০-১৮৪৯) এবং উটাগাওয়া হিরোশিগে (আন্ডো হিরোশিগে, ১৭৯৭-১৮৫৮), দুজনেই তাদের ভূদৃশ্যচিত্র আঁকতে আরো অনেক বেশি সরল এবং বাহুল্যবর্জিত পথ অনুসরণ করেছিলেন। তবে এর পরিণতিতে তাদের সৃষ্ট কাঠের ব্লকের (উড ব্লক) ছাপচিত্রগুলো সমপরিমানেই নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৫০-এর দশক নাগাদ জাপান বিদেশীর জন্য নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ডাচ বণিকরা তাদের বাণিজ্য জাহাজগুলো প্রেরণ করার অনুমতি পেয়েছিলেন, এবং এই জাহাজগুলো পশ্চিমা ভূদৃশ্যচিত্র সম্বলিত বই এবং ছাপচিত্র বহন করে এনেছিল, যার মধ্যে ছিল ইটালিয় 'ভেডুটে' (দৃশ্য, খুবই বিস্তারিত সাধারণ বড় মাত্রার চিত্রকর্ম বা ছাপচিত্র, যার বিষয়বস্তু সাধারণ শহুরে দৃশ্য, কিংবা অন্য কোনো কিছু।) এই দৃশ্যগুলো গাণিতিক দর্শনানুপাতের জন্য জাপানি দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। এগুলোকে বলা হতো 'উকি-এ' অথবা 'ভাসমান চিত্র', কারণ জাপানি দর্শকরা অনুভব করতেন, তারা এই চিত্রকর্মের মধ্যে উপর থেকে নীচের দিক বরাবর পড়ে যাচ্ছেন। এবং এগুলো জাপানে ভূদৃশ্য ছাপচিত্রের একটি ঘরানার সূচনা করেছিল, এবং দারুণ কার্যকরীভাবে সেগুলো অনুশীলন করেছিলেন হকুসাই আর হিরোশিগে, এবং এগুলো পরিচিত ছিল 'উকিইয়ো-এ ' অথবা 'ভাসমান পৃথিবীর চিত্র' নামে। আর এই ছাপচিত্রগুলো দুই বাটি নুডলস কিনতে যা খরচ হতো, তা দিয়ে কেনা যেত, এবং একেবারে দরিদ্র পরিবার ছাড়া বাকী সবাই এই ধরনের ছাপচিত্র সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছিল।

হকুসাই এডো (পরবর্তীতে টোকিও) শহরে বাস করতেন এবং তার দীর্ঘ জীবনব্যাপী তিনি ছাপচিত্র সৃষ্টি করেছিলেন, জীবনের শেষাংশে তাকে কাজ করতে সহায়তা করেছিলেন তার মেয়ে কাটসুশিকা ওই (আনু. ১৮০০-১৮৬৬)। আগ্নেয়গিরি ফুজি পর্বতকে নিয়ে তার পরবর্তী ভূদৃশ্যচিত্রগুলোর জন্য হকুসাই পশ্চিমে মূলত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতটি ছিল ১৮২৯-৩৩ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্টি করা 'গ্রেট ওয়েভ', যা তার 'থার্টি সিক্স ভিউজ অব মাউন্ট ফুজি' ধারাবাহিকের একটি চিত্র। এই রঙ্গীন ছাপচিত্রে নখরের মতো ফেনাসহ শৈলীভূত রূপে উপস্থাপিত একটি ঢেউ তিনটি নৌকাকে গ্রাস করার হুমকি নিয়ে স্থির হয়ে আছে, নৌকাগুলো বিশালাকার এই ঢেউয়ের পাশে কোনোমতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। দূরে তুষারাবৃত মাউন্ট ফুজি এই ছাপচিত্রটির কেন্দ্র নির্দিষ্ট করেছে, তুষারঝড় সদৃশ সমুদ্রের ফেনা পর্বতকে পরিবেষ্টিত করে

রেখেছে। এই সমাবেশ, দূর ও কাছের উপাদানের এই বিন্যাস, ‘উকিইয়ো-এ’ ছাপচিত্রগুলোর ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যসূচক, যেখানে সার্বিক ছাপচিত্রে একটি সঙ্গতি নিয়ে আসতে বিন্যাসের প্রতিটি অংশ একত্রে কাজ করে।

যখন জাপান আবার বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য নিজেকে উন্মুক্ত করেছিল, ১৮৫০ এবং ১৮৬০-এর দশকে ছাপচিত্রগুলো ইউরোপে আবির্ভূত হতে শুরু করেছিল। এগুলো প্যারিসে কর্মরত তরুণ শিল্পীদের অত্যন্ত আরাধ্য একটি বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। জাপানি ছাপচিত্রের প্রভাব আমরা বহু শিল্পীদের মধ্যে দেখতে পাই, যেমন ভিনসেন্ট ভ্যান গো, যার সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে জানবো। তবে ‘উকিইয়ো-এ’ ফ্রান্সে আবির্ভূত হবার আগে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আর কৌশল

সম্বন্ধে জানতে শিল্পীদের ইউরোপের সীমানার বাইরে ভ্রমণ করতে হতো। রোমান্টিক শিল্পী ইউজেন ডেলাক্রোয়া (১৭৯৮-১৮৬৩), যিনি তার আদর্শ শিল্পী জেরিকোর 'দ্য র‍্যাফট অব দ্য মেডুসা'র জন্য মডেল হিসেবে বসেছিলেন, তার তীব্র আবেগময় এবং রাজনৈতিক সৃষ্টি, 'লিবার্টি লিডিং দ্য পিপল' চিত্রকর্মটি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের সালোনে প্রদর্শন করেছিলেন। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ উত্তর আফ্রিকার দেশ মরোক্কোর উদ্দেশ্যে তিনি ফ্রান্স ত্যাগ করেছিলেন।

মরোক্কো যাত্রায় ডেলাক্রোয়া কুটনীতিবিদদের একটি দলের সঙ্গী হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেখানে গিয়েছিলেন 'ওরিয়েন্ট' বা প্রাচ্যের ছবি আঁকতে। 'ওরিয়েন্ট' শব্দটি পশ্চিমা শব্দ, ইউরোপের বাইরে ভূমধ্যসাগরীয় আফ্রিকার উপকূলবর্তী ও মধ্যপ্রাচ্য অবধি বিস্তৃত দেশগুলোকে চিহ্নিত করতে শব্দটি বোঝানো হতো। শতাব্দীর শুরুর দিকে নেপোলিয়নের মিসর দখল ও ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের আলজেরিয়ায় আগ্রাসনের পরে এই এলাকাগুলোর প্রতি আগ্রহ পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। স্বশরীরের মাঘরেব (উত্তর আফ্রিকা) ভ্রমণ ডেলাক্রোয়ার জন্য অভিভূত করার মতোই একটি অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি লিখেছিলেন: 'আমি স্বপ্নে জাগ্রত কোনো ব্যক্তির মতো, যে সেই সব কিছু দেখছিল, কিন্তু একই সাথে সে আতঙ্কিত, কারণ খুব শীঘ্রই এগুলো তার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে'। তিনি ছয় মাস মরোক্কোয় কাটিয়েছিলেন, এবং আলজেরিয়া হয়ে ফ্রান্সে ফিরে এসেছিলেন, এবং আফ্রিকা ত্যাগ করার সময় তিনি লিখেছিলেন, 'রোমকে আর রোমে খুঁজে পাওয়া যাবে না'। অ্যাকাডেমিক প্রথার প্রশিক্ষণের বর্মে আরেকটি ফাটল সৃষ্টি করেছিল এই 'ওরিয়েন্ট', যা তখনো সুস্পষ্টভাবে রোমের ধ্রুপদী শিল্পকলা প্রতি সংকল্পবদ্ধ ছিল।

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ফরাসী শিল্পী জ্যাঁ-অগুস্ত-ডমিনিক আঙ্গ্রে (১৭৮০-১৮৬৭) 'ওরিয়েন্ট' বা তথাকথিত এই প্রাচ্যের কল্পদৃশ্যগুলোর চিত্ররূপ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেটি করেছিলেন রোমে নিজের স্টুডিওর স্বস্তিকর পরিবেশে। আঙ্গ্রে ডাভিডের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন, এবং নব্যধ্রুপদীবাদের আরেকজন তারকা শিল্পী ছিলেন। আঙ্গ্রের সতর্ক রেখা আর মসৃণ

পৃষ্ঠদেশ ডেলাক্রোয়ার অস্থির, আবেগময়, শক্তিশালী রোমান্টিক তুলির আঁচড়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, এবং দুই শিল্পীকে প্রায়শই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ব্যঙ্গ করা হতো সংবাদ মাধ্যমে - তুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত পেন্সিল।

১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে আঙ্গ্রে তার প্রথম ‘ওডালিস্ক’ বা নারী দাসের চিত্রকর্ম সৃষ্টি করেছিলেন। ‘লা গ্রান্ডে ওডালিস্ক’ ছিল পুরুষের কল্পনা - কোনো কল্পিত প্রাচ্যে একজন নগ্ন নারী তার বিছানায় শুয়ে আছেন এবং আপনার সঙ্গের জন্য অপেক্ষমান। বিস্ময়করভাবে আঙ্গ্রেকে তার স্বামীর জন্য একটি উপহার হিসেবে এই কাজটি করার কমিশন দিয়েছিলেন একজন নারী, নেপলসের রানি ক্যারোলাইন। বিষয়টি খুবই ব্যতিক্রমী একটি ঘটনা ছিল, একজন নারী যে-কিনা নারী নগ্নচিত্রের জন্য কমিশন দিচ্ছেন - যে কাজগুলোকে পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যারা এগুলো দেখতে এবং এই ধরনের চিত্রকর্মগুলোর ‘মালিক’ হতে কামনা করতেন।

ক্যারোলাইনের স্বামী ইতোমধ্যে আঙ্গ্রের ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে আঁকা ‘স্লিপার অব নেপলস’ কিনেছিলেন, বর্তমানে হারিয়ে যাওয়া এই চিত্রকর্মটি একটি বিছানার উপর শায়িত একজন নারীর সামনে থেকে আঁকা একটি নগ্নচিত্র। রানি ক্যারোলাইনের ফরমায়েসে সৃষ্ট নগ্নচিত্রটি অবশ্য একটি ভিন্ন দৃশ্য উপস্থাপন করেছিল। প্রথমত, ‘লা গ্রান্ডে ওডালিস্ক’ তার দর্শকের দিকে পেছন ফিরে শুয়ে আছেন, পেছনের অংশটি প্রায় অসম্ভাব্য মাত্রায় দীর্ঘ, কিন্তু এটি তার আবেদনময়তা ও ইন্দ্রিয়সম্পৃক্ততায় বাড়তি কিছু যোগ করেছিল। অনেকটা পাগড়ির মতো করে তিনি তার মাথার উপর একটি চাদর পেচিয়ে রেখেছেন, এবং ময়ুর-পালকের একটি হাত-পাখা ধরে আছেন। আপনি হয়তো তার শরীরের মসৃণ বাঁকের দিকে তাকাবেন, কিন্তু আপনাকে তার দৃষ্টির সাথে দৃষ্টি মেলাতে হবে, যেভাবে তিনি তার অলঙ্কারের সজ্জিত মাথাটি ফিরিয়ে আপনার সাথে তার নিজের চোখ মেলাচ্ছেন। আসলেই চিন্তাটি প্রলুব্ধকর, এই বিন্যাস আর সজ্জায় ক্যারোলাইনের কী কোনো অংশগ্রহন ছিল? ওডালিস্ক সাদামাটা কোনো বস্তু নয় যার দিকে বিনামূল্যে তাকানো যেতে পারে, তার চোখ আপনাকে যাচাই করে, যখন আপনি তার দিকে তাকাচ্ছেন।

ডেলাক্রোয়া ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে তার ‘উওমেন অব আলজিয়ার্স ইন দেয়ার অ্যাপার্টমেন্ট’ চিত্রকর্মটি আঁকতে আফ্রিকা থাকাকালীন সময়ে তৈরি করা রেখাচিত্র আর খসড়া ব্যবহার করছিলেন। এটি ছিল সালোনে প্রদর্শিত তার প্রথম চিত্রকর্ম যা তার উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণের উপর

ভিত্তি করা আঁকা হয়েছিল। ডেলাক্রোয়া, আঙ্গ্রে, জ্যাঁ-লিওন জেরোম (১৮২৪-১৯০৪) এবং ডেভিড রবার্টসের (১৭৯৬-১৮৬৪) মতো শিল্পীদর চিত্রকর্ম ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যখন 'ও রিয়েন্টালিজম' ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছিল। পশ্চিমা দর্শকদের জন্য আরব সংস্কৃতির বিকৃত উপস্থাপন ছিল 'ওরিয়েন্টালিজম', তামাক সেবন করা পুরুষ আর যৌনদাসীদের অতিঅলংকৃত জগত যেখানে চিত্রিত হয়েছিল। শিল্পী আর সংগ্রাহকরা ওরিয়েন্টালিজমের ধারণায় আকর্ষিত হয়েছিলেন সেই অসাম্যের জন্য, যা এটি অব্যাহত রেখেছিল বলে ধারণা দিয়েছিল, বিশেষ করে সেই ধারণাটি, নারীরা সেখানে পৃথকীকৃত, এবং এখনো যৌন দাসী হিসেবে বিক্রিত হয়, এমন একটি সময়ে, যখন কিনা ইউরোপীয় নারীরা ক্রমবর্ধমান হারে তাদের সম-অধিকারের দাবিতে উচ্চকণ্ঠ।

আফ্রিকা নিয়ে ডেলাক্রোয়ার প্রতিক্রিয়া বেশ দীর্ঘমেয়াদী ছিল, যা তার কাজের বিষয়বস্তু, তার রঙের প্যালেটকে প্রভাবিত করেছিল। অন্য দিকে, জোসেফ ম্যালর্ড উইলিয়াম টার্নার, আধুনিক আফ্রিকা নিয়ে একবারই চিত্রকর্ম সৃষ্টি করেছিলেন, তার জীবনের শেষের দিকে সৃষ্ট একটি চিত্রকর্ম , যার ভিত্তি ছিল এটি আঁকার ষাট বছর আগের একটি ঘটনা, যে চিত্রকর্মটি এখনোও আমাদের বিচলিত করার ক্ষমতা রাখে, যেমন ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে করেছিল, যখন এটি রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে)

(১) Théodore Géricault, The Raft of the Medusa
(২) Théodore Géricault, Portrait of *Laure Bro*

(৩) Caspar Dav Friedrich, View of the Small Sturmhaube from Warmbrunn
(৪) Caspar David Friedrich, Wanderer above the Sea of Fog
(৫) The Hay Wain, John Constable
(৬) The Hay Wain, John Constable, detail,
(৭) Thomas Cole, Cora Kneeling at the Feet of Tamenund
(৮) Katsushika Hokusai, The Great Wave off Kanagawaoki
(৯) Katsushika Hokusai, The Falling Mist Waterfall at Mount Kurokami
(১০) Hiroshige, Plum Park in Kameido
(১১) Eugène Delacroix, Liberty Leading the People
(১২) Jean-Auguste-Dominique Ingres, La Grande Odalisque
(১৩) Eugène Delacroix, Women of Algiers in their Apartment

অধ্যায় ২৬ - বাস্তবতার দংশন

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ, জুন মাসের উষ্ণ একটি দিন। তরুণ শিক্ষার্থী জন রাস্কিন তার ক্রাভাট (গলাবন্ধনী), কোট আর লম্বা টুপি পরে রয়্যাল অ্যাকাডেমির গ্রীষ্মকালীন প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত টার্নারের 'স্লেভ শিপ' চিত্রকর্মটির সামনে দাড়িয়ে আছেন। রাস্কিন এই চিত্রকর্মটির মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলেন, উত্তাল সাগরে অভিভূত, প্রবল ঢেউয়ে দোদুল্যমান জাহাজ, সূর্যাস্তে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠা আকাশ। তার চোখ আটকে থাকে চিত্রকর্মটির পুরোভূমির অস্থির, পরিবর্তনশীল ঢেউয়ের অংশে, যেখানে ঢেউয়ের ওপরে একটি মানব পা আমরা ভাসতে দেখি, যার গোড়ালীতে সুস্পষ্টভাবে বাধা দাসের শিকল। যখন আরো ভালোভাবে লক্ষ করেছিলেন, তিনি দেখেছিলেন, বাঁচার আকুতি নিয়ে ফেনিল সমুদ্রের ঢেউয়ের নীচ থেকে হাত বেরিয়ে আছে, যার চারপাশে ঘুরছে মাছ আর গাংচিল, খাদ্যের জন্য অধীর আগ্রহে যারা অপেক্ষা করছে। তার নিজের ক্ষুধা ছিল অগ্নিময় সূর্যাস্তের জন্য, যখন সূর্যটি ডুবছে রক্ত-লাল সাগরে ঝড়ে দুলতে থাকা জাহাজটির ছায়াচিত্রের পেছনে।

একুশ বছরের রাস্কিন মানসিক স্বাস্থ্যজনিত কারণে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন, এবং ইটালিতে বছর-ব্যাপী ভ্রমণে যাবার জন্য কেবল প্রস্তুত হয়েছেন। তার তেরোতম জন্মদিনে বাবা-মায়ের কাছ থেকে তিনি ইটালির নানা দৃশ্য দিয়ে ইটালি বিষয়ক একটি গাইড বই উপহার পেয়েছিলেন, তখন থেকেই তিনি টার্নারের শিল্পকলার ভক্ত। তার কাছে এমনকি টার্নারের একটি জলরঙের কাজও ছিল, আরেকটি জন্মদিনের উপহার। এবং এই মহান শিল্পীর সাথে শীঘ্রই তার দেখা হবে বলে তিনি আশাবাদী ছিলেন। ইতোমধ্যে তাদের পত্রযোগাযোগ হয়েছে এবং তিনি তাকে রসিক আর উদার একজন মানুষ হিসেবে আবিষ্কার করেছিলেন। যদিও রাস্কিন জানতে অধিকাংশ মানুষই তাকে স্থুল, বুদ্ধিমত্তাহীন, অগভীর মনে করেন।

রাস্কিন হতাশা নিয়ে এই বছরের গ্রীষ্মকালীন প্রদর্শনীর পর্যালোচনাগুলো পড়েছিলেন। যদিও তিনি মনে করেন বর্তমানে জীবিত শিল্পীদের মধ্যে টার্নারই হচ্ছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সমালোচকরা তার সাম্প্রতিক কাজ নিয়ে উপহাস করেছিলেন, বলেছিলেন 'রং-বাতিকগ্রস্ত' খেয়ালিপনার কারণে এবার তিনি নিজেকে 'আউটটার্নার'

করেছেন। তবে রাস্কিন বুঝতে পারছিলেন না, তিনি যে কত অসাধারণ একজন শিল্পী সেটি কেন তারা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

*

জন রাস্কিন উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেইনে সবচেয়ে প্রভাবশালী শিল্পকলা সমালোচকে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি তার শ্রেষ্ঠ কাজ, 'মডার্ন পেইন্টার্স' বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেছিলেন টার্নারের 'স্লেভ শিপ' (স্লেভার্স থ্রোয়িং ওভারবোর্ড ডেড অ্যান্ড ডাইয়িং-টাইফুন কামিং অন) চিত্রকর্মটি দেখার তিন বছর পরেই, যে চিত্রকর্মটি পরবর্তীতে তিনি নিজের সংগ্রহে যুক্ত করেছিলেন। 'মডার্ন পেইন্টার্স' বইয়ে তিনি লিখেছিলেন. 'স্লেভ শিপ ' চিত্রকর্মটির প্রকৃত বিষয়বস্তু হচ্ছে, ''উন্মুক্ত, গভীর, অসীম সাগরের ক্ষমতা, মহিমা, এবং এর প্রাণঘাতী রূপ', কিন্তু যে-বিষয়টি তিনি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেটি ছিল সমসমায়িক সেই বিষয়টি, যার ওপর ভিত্তি করে টার্নার তার এই ভীষণসুন্দর সম্ভ্রম জাগানো, জীবন্ত অথচ মৃত্যুকে অনুভব করার মতো চিত্রকর্মটি সৃষ্টি করেছিলেন: দাসত্ব।

জোসেফ ম্যালোর্ড উইলিয়াম টার্নার (১৭৭৫-১৮৫১) দাসপ্রথা-বিলোপ করার আন্দোলনের একজন সমর্থক ছিলেন, যে আন্দোলনটি অবশেষে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে দাসপ্রথায় ব্রিটেইনের সংশ্লিষ্টতার পরিসমাপ্তি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। আর এটি অর্জন করতে তাদের পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ব্যাপী আন্দোলন করতে হয়েছিল। 'স্লেভ শিপ' চিত্রকর্মটির ভিত্তি ছিল 'জং' নামক দাসবাহী একটি জাহাজের অধিনায়কের অমানবিক আচরণের ঐতিহাসিক বিবরণ। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার ঘানা থেকে জ্যামাইকা যাবার পথে জাহাজে পানির সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, জাহাজের খোলে অমানবিক পরিস্থিতিতে বন্দি দাসদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, এবং সেই কারণে যখন একটি ঝড় এগিয়ে আসছিল, জাহাজের কর্মীদের ১৩০ জনের বেশি দাসকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে নির্দেশ

দেয়া হয়েছিল, যারা তখনও শৃঙ্খলিত ও জীবন্ত ছিল, যেন এর মালিকরা বীমা কোম্পানীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা দাবি করতে পারেন, তাদের বীমা সমুদ্রে মৃত বা জাহাজ ডুবিতে হারিয়ে যাওয়া দাসদের জন্য ক্ষতিপূরণ দিত, কিন্তু যদি জাহাজে কোনো অসুখের কারণে তারা মারা যেত, তার জন্য মালিকরা কোনো ক্ষতিপূরণ পেতেন না।

সমালোচকরা টার্নারের এই চিত্রকর্মের বিষয়বস্তুর প্রতি বৈরি ছিলেন না - এই একই প্রদর্শনীতে ফ্রাসোয়া অগুস্ট বিয়ার্ডের (১৭৯৯-১৮৮২) 'দ্য স্লেভ ট্রেড' চিত্রকর্মটি এর বুদ্ধিমত্তা আর নির্ভুলতার জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। তৎকালীন সমালোচকরা যা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, বাস্তবিকভাবে শুধুমাত্র তারা যে বিষয়টি নিয়েই কথা বলেছিলেন, সেটি ছিল মূলত টার্নার যেভাবে 'স্লেভ শিপ' এঁকেছিলেন। ঔপন্যাসিক উইলিয়াম থ্যাকারে এটিকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, ''সবুজ আর বেগুনীর জঘন্য সমুদ্র''। এবং অন্য একজন সমালোচক এর 'গাঁদাফুলের মতো রঙে রঙ্গীন আকাশের আবেগময় অতিরঞ্জনের' সমালোচনা করেছিলেন। এর ব্যতিক্রম টার্নারের শেষের দিকের 'স্লেভ শিপের' মতো চিত্রকর্মগুলোই আজ আমাদের মনে সরাসরি আবেদন রাখে.. আমাদের আন্দোলিত করে। যখন আমরা 'জং' জাহাজে অধিনায়ক ও কর্মচারীদের অমানবিক ঘৃণ্য কর্মের মুখোমুখি হই, তখন অস্তগামী সূর্য একই সাথে দাসপ্রথা বাণিজ্যের পরিসমাপ্তি, আফ্রিকা থেকে অপহরণ করে আনা দাস হিসেবে বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়া এইসব অসহায় ব্যক্তিদের করুণ পরিণতি, অর্থের জন্য জাহাজ-অধিনায়কের অমানবিকতার গভীরতা, এবং সমুদ্র-শক্তির মুখোমুখি ভয়ঙ্করভাবে অসহায় মানবজাতিকে ইঙ্গিত করে।

টার্নারের শিল্পী জীবনের শেষের দিকে সৃষ্টি করা ক্যানভাসগুলো আবেগের তীব্রতায় পূর্ণ ছিল, এবং প্রায়শই যা সমালোচকরা ভুল বুঝেছিলেন, যারা আরো মসৃণ বিদ্যায়তনিক শৈলীর শিল্পকর্ম দেখে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু রোমান্টিকরা, টার্নার নিজেও যে গোষ্ঠীর

অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, প্রদর্শন করেছিলেন, শিল্পকলার আদৌ সেই রকম হবার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, এবং ফ্রান্সে তরুণ শিল্পীরা এর থেকে আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এবং আরো একবার তারা শিল্পকলায় প্রভাবশালী বিদ্যায়তনিক রুচিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

গুস্তাভ কুরবে (১৮১৯-১৮৭৭) ইতিহাস বিষয়ক চিত্রকর্মের মাত্রা আর মহিমাকে ধরে রেখেছিলেন, কিন্তু তার ক্যানভাসে বিষয়বস্তু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল দরিদ্র সমাজের সেই মানুষগুলো, ইতিহাসের ওপর যারা কোনো চিহ্ন কখনো রেখে যেতে পারে না – ভ্রাম্যমান বাদ্যযন্ত্রী-সঙ্গীতশিল্পী, পাথর ভাঙ্গার শ্রমিক, ক্ষেতমজুর আর কৃষক। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তার 'এ বারিয়াল অ্যাট ওরনানস' চিত্রকর্মে পূর্ব ফ্রান্সে কুরবের জন্মস্থান ওরনানস শহরে আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন ব্যক্তিকে একটি অন্ত্যেস্টিক্রিয়ায় অংশ নিতে দেখি । প্রতিটি ফিগার প্রমাণ আকারের, এবং একত্রে তারা প্রায় ছয় মিটার প্রশস্ত সুবিশাল একটি ক্যানভাসে বিস্তৃত হয়ে আছেন। এখানে বিশেষভাবে নজর দেয়া যেতে পারে এমন কোনো বীর নেই, কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই। কুরবে তার নিজের শহরের বাসিন্দাদের মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, এবং এমন একটি কাজ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যা অবিচলিতভাবে বাস্তববাদী, ডাভিডের নব্যধ্রুপদী দৃশ্যগুলো থেকে যা খুবই ভিন্ন। ১৮৫১ সালে কুরবে লিখেছিলেন, ''আমি .... সর্বাগ্রে একজন বাস্তববাদী...কারণ 'বাস্তববাদী' মানে প্রকৃত সত্যের একজন আন্তরিক প্রেমিক'। শ্রমজীবী শ্রেণিকে সহায়তা করার লক্ষ্য নিয়ে তিনি তার শিল্পকলাকে অস্ত্রে পরিণত করেছিলেন, কিন্তু তার চিত্রকর্মগুলো বহু সমালোচকদের সহ্য হয়নি, এবং তারা তার বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিলেন, তার কাজগুলোকে কদর্য, অমার্জিত এবং বেশি বড় এবং বেশি সমাজতান্ত্রিক হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

শিল্প সমালোচকদের কাছে রোজা বনঅরের (১৮২২-১৮৯৯) চিত্রকর্মগুলোই অপেক্ষাকৃত শ্রেয়তর ছিল। তার কর্মরত ঘোড়া আর গবাদীপশুর ক্যানভাসগুলো দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, এবং উনবিংশ শতাব্দীতে তিনি ফ্রান্সের সবচেয়ে সফল নারী শিল্পীতে পরিণত হয়েছিলেন। ১৮৫৩ সালে আঁকা 'দ্য হর্স ফেয়ার' চিত্রকর্মে আমরা তেজস্বী পারচরন জাতের ড্রাফট বা নানাবিধ কাজের জন্য ব্যবহৃত ঘোড়াদের একটি ঘূর্ণি দেখি - যাদের কেবলই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে আশাবাদী বণিকরা। প্রায় ৫ মিটার প্রশস্ত এই বিশাল ক্যানভাসটি যখন সালোনে প্রদর্শিত হয়েছিল, এটি ছিল সবচেয়ে বৃহত্তম প্রাণী প্রতিকৃতি যা কখনো সালোনে প্রদর্শিত হয়েছে। যদিও একজন নারী হিসেবে অ্যাকাডেমির জীবন্ত মডেল অনুসরণ করে আঁকার কক্ষে তিনি তখনো প্রবেশাধিকার পাননি, কিন্তু এই ধরনের কোনো আইন কসাইখানা কিংবা ঘোড়ার বেচাকেনা করার মেলায় ছিল না।। তবে প্যান্ট বা ট্রাউজার পরার জন্য তাকে বিশেষ অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়েছিল, সুতরাং শান্তিতে আঁকতে তিনি পুরুষের ছদ্মবেশ নিতে পেরেছিলেন। এবং তার রেখাচিত্র - যা তিনি জীবন থেকে এঁকেছিলেন, সেগুলোই তাকে তার ক্যানভাসের সেই ঘোড়া আর অন্য প্রাণীদের আঁকতে সক্ষম করে তুলেছিল, যেগুলো তার ক্যানভাসে নাসিকধ্বনি আর হ্রেষাধ্বণিসহ জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

ইংল্যান্ডে ভিন্ন একটি বিপ্লব চলমান ছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান শিল্পীদের একটি গোষ্ঠী, যারা নিজেদের সংগঠিত করে 'প্রি-রাফায়েলাইট ব্রাদারহুড' অথবা 'পিআরবি' গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। এটি ছিল শিল্পকলা অ্যাকাডেমির প্রথাগত শিক্ষার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া। তারা অনুভব করেছিলেন, রয়্যাল অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীগুলো আড়ম্বরে স্ফীত চিত্রকর্মে পরিপূর্ণ, যে চিত্রকর্মগুলো নির্মাণে শিল্পীরা অতিরঞ্জিত আনুষ্ঠানিক ও আচরণিক শৈলী স্বাতন্ত্রহীনভাবে অনুসরণ করেছিলেন। তারা সাম্প্রতিক ইতিহাসকে সরিয়ে জটো এবং ভ্যান আইকের কাজের দিকে তাকাতে চেয়েছিলেন, সেই নির্দোষ সময়ে, শিল্পকলা যখনো পাণ্ডিত্যপূর্ণ সবজান্তা রূপ গ্রহন করেনি। জন এভেরেট মিলে (১৮২৯-১৮৯৬) ১৮৪০ সালে রয়্যাল অ্যাকাডেমির স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, এগারো বছর বয়সে তিনি স্কুলে সবচেয়ে অল্পবয়সী ছাত্র ছিলেন। এখানে তার সাথে পরিচয় হয়েছিল ডান্টে গাবলিয়েল রোজেটি (১৮২৮-১৮৮২) এবং উইলিয়াম হোলমান হান্টের (১৮২৭-১৯১০) সাথে, এবং ১৮৪৮ সালে তারা একটি গোপন সংগঠন তৈরি করেছিলেন - 'পিআরবি'। ১৮৫০ সালে অ্যাকাডেমির বার্ষিক প্রদর্শনীতে মিলে 'ক্রাইস্ট ইন দ্য হাউজ অব হিস প্যারেন্টস' চিত্রকর্মটি প্রদর্শন করেছিলেন। অল্পবয়সী খ্রিস্ট দাড়িয়ে আছে কাঠমিস্ত্রী জোসেফের দোকানে, প্রতিটি কাঠের টুকরো, কাঠের গুড়া সতর্কভাবে আঁকা হয়েছিল, ঝাঁড়ু দেয়া হয়নি এমন একটি মেঝের উপর। খ্রিস্টকে আপাতদৃষ্টিতে ম্লান এবং আহত মনে হচ্ছে , জোসেফ যে দরজা নিয়ে কাজ করছিলেন তারই একটি পেরেকে তিনি হাত কেটে ফেলেছিলেন, পরবর্তীতে তার ক্রুশবিদ্ধ হবার পূর্বাভাস। এই চিত্রকর্মটি সমালোচকদের দারুণ উত্তেজিত করে তুলেছিল, পবিত্র পরিবারকে দেখতে আদৌ স্বর্গীয় মনে হয় না, তারা দেখতে খুবই

সাধারণ। লেখক চার্লস ডিকেন্স ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন মনে হচ্ছে যেন খ্রিস্ট কেবলই কোনো নর্দমা থেকে উঠে এসেছেন, 'একটি কুৎসিৎ, বাকানো অনমনীয় ঘাড়সহ ক্রন্দনরত লাল-চুলো বালক, যে রাতের শোবার কাপড় পরে আছে'। কিন্তু জন রাস্কিন 'পি আরবি' শিল্পীগোষ্ঠীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন, আর দাবি করেছিলেন তাদের কাজ 'অনাকর্ষণীয় এবং অসহনীয়' নয় (ডিকেন্সের ব্যবহৃত শব্দ), বরং তাদের অনুপুঙ্খ বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ, এবং প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে প্রি-র‍্যাফায়েলাইট শিল্পীরা আরো গভীরতর সত্য অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় আছেন।

যে সময় নাগাদ 'পিআরবি' সংগঠিত করেছিল, ততদিনে আলোকচিত্রের বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হবার প্রায় এক দশক অতিক্রান্ত হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে এটি চূড়ান্ত মাত্রায় 'মাইমেসিস' বা অনুলিপি সৃষ্টি করার একটি উপায় উপস্থাপন করেছিল, ইতিহাসে প্রথমবারের মত শিল্পীরাই শুধু একমাত্র গোষ্ঠী ছিলেন না, যারা কিনা পৃথিবী দৃশ্যচিত্র পুনঃসৃষ্টি করার ক্ষমতা ধারণ করতেন। যদিও বহু শতাব্দী ধরে ক্যামেরা অবসক্যুরা পরিচিত ছিল, কিন্তু ১৮২০-এর দশকে কেবল আবিষ্কারকরা সমাধান করেছিলেন কীভাবে এর সৃষ্টি করা চিত্র স্থায়ীভাবে ধারণ করা যায়। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের লুই-জাক -মান্ডে ডাগের (১৭৮৭-১৮৫১) রুপার প্রলেপ দেয়া তামার পাতে তার চিত্রগুলোকে ধারণ করতে পেরেছিলেন আলোক সংবেদী লবন ব্যবহার করে, এবং তিনি ক্যামেরার বিষয়বস্তুর 'পজিটিভ' চিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। তার ডাগেরেওটাইপ আবির্ভূত হতে বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগতো, এবং শুরুর দিকে তার প্রতিকৃতির জন্য মডেলদের গলায় বিশেষ বন্ধনী দিয়ে বাধা হতো, তারা যেন নড়তে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে।

একই বছর আলোকচিত্রের ব্রিটিশ পথিকৃৎ উইলিয়াম হেনরি ফক্স ট্যালবট (১৮০০-১৮৭৭) তার চিত্রগুলোকে ধারণ করেছিলেন কাগজের 'নেগেটিভ'-এর উপর, যা 'কালোটাইপ' নামে পরিচিত ছিল। যদিও প্রথম চিত্রগুলো ডাগেরেওটাইপের মতো এতো স্পষ্ট নয়, কিন্তু চিত্রটি পুনরুৎপাদন করতে নেগেটিভকে বহু বার ব্যবহার করা যেত, ছাপচিত্র বা প্রিন্টের মতো। অবশেষে দুটি স্বতন্ত্র 'আলো দিয়ে আঁকার প্রক্রিয়া' একত্রিত হয়েছিল 'কোলোডিওন' পদ্ধতিতে, যা ১৮৫০-এর দশকের শুরুর দিকে উদ্ভাবিত হয়েছিল, নেগেটিভ হিসেবে এটি কাচের পাতের ওপর দৃশ্যটি ধারণ করে, যেখান থেকে ছবিটি সুস্পষ্টভাবেই বহুবার পুনরুৎপাদিত করা যায়।

১৮৫০-এর দশকে আলোকচিত্র প্রতিকৃতি সৃষ্টি করার একটি সস্তা উপায় হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে বলা যেত, 'আমি সেখানে ছিলাম'।

বিশ্বজুড়েই বহু আলোকচিত্রের স্টুডিও প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছিল, এবং ক্যামেরা মেরু অভিযান থেকে শুরু করে ক্রাইমিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছেছিল। ১৮৫০-এর দশক নাগাদ আলোকচিত্র ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়েছিল নাসির আল-দ্বীন শাহের ইরানী রাজসভায় , যিনি নিজেও একজন উৎসাহী সখের আলোকচিত্রী ছিলেন।

যদিও এই সময়ে আলোকচিত্রকে শিল্পকলা হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি, কিন্তু আধুনিক সময়ের স্কেচবুক এবং পেন্সিলের মতো শিল্পীদের জন্য এটি উপযোগী উপকরণ ছিল এবং তাৎক্ষণিকভাবে এটি শিল্পকলার ক্ষেত্রটিকে প্রভাবিত করেছিল। ১৮৫৬-৭ খ্রিস্টাব্দে সানি' আল-মুলকের (আবু'ল হাসান গাফফারি, ১৮১৪-১৮৬৬) আঁকা 'পোর্ট্রেট অব প্রিন্স আলি কুলি মির্জা' শিরোনামের পারসিক মিনিয়েচারটি দেখতে ঠিক কেতাদূরস্ত কোনো স্টুডিওতে তোলা আলোকচিত্রের প্রতিকৃতি মনে হতে পারে, এর অতি অলংকৃত পটভূমি এবং সতর্কভাবে সজ্জিত আসবাবসহ। একই ভাবে চীনে, গুরুত্বপূর্ণ সাংহাই স্কুলের শিল্পী রেন শং (১৮২-১৮৫৭) একটি চমকে দেবার মতো আত্মপ্রতিকৃতি এঁকেছিলেন তার স্বাভাবিক চুল কামানো মাথা এবং উন্মুক্ত বুকসহ, যে প্রতিকৃতিতে আলোকচিত্রের মতো স্পষ্টতা আছে, কিন্তু এটি বেরিয়ে এসেছিল খুবই আনুষ্ঠানিক অতিরঞ্জিত প্রথাগত চীনা জ্যাকেট আর ট্রাইজারের মধ্য থেকে।

শুরুর দিকে কিছু আলোকচিত্রশিল্পী এই নতুন প্রযুক্তির শৈল্পিক সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে শুরু করেছিলেন। ফ্রান্সে গুস্তাভ লো গ্রে'র (১৮২০-১৮৮৪) মতো শিল্পীরা ক্যামেরা ব্যবহার করেছিলেন ভূদৃশ্যের আলোকচিত্র সৃষ্টি করতে, যেমন ১৮৫৭ সালে তার 'দ্য গ্রেট ওয়েভ, সেট'। ইংল্যান্ডে জুলিয়া মার্গারেট ক্যামেরন (১৮১৫-১৮৭৯) প্রতিকৃতি সৃষ্টিতে ক্যামেরার সৃজনশীল সম্ভাবনাগুলো অনুসন্ধান করতে তিনি রেনেসাঁ পর্বের শিল্পকলা থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন। আলোকচিত্রে তিনি মৃদু ফোকাসের বিন্যাস ব্যবহার করেছিলেন যা শিশুদের দেবদূত আর স্বপ্নদর্শী, এবং তরুণীদের গ্রিক জাদুকরী সার্সি এবং কুমারী মেরিতে রূপান্তরিত করেছিল।

ভাস্কর্যকে এর নিজস্ব বিপ্লবের জন্য আরো খানিকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং

আটলান্টিকের উভয় পার্শ্বে উনবিংশ শতাব্দীর পুরো সময়ব্যাপী ভাস্কর্যে নব্যধ্রুপদী শৈলী এর জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছিল। তবে, আমেরিকার নারী শিল্পীদের একটি সাহসী গোষ্ঠীর মাধ্যমে ভাস্কর্যের নতুন বিষয় হিসেবে এটি ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল, যারা ১৮৫০ আর ১৮৬০-এর দশকে রোমে বসবাস করতেন। ঔপন্যাসিক হেনরি জেমস যাদের 'স্ট্রেঞ্জ সিস্টারহুড' নামে চিহ্নিত করেছিলেন। এই নারীরা রোমে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন সেরা মার্বেল নিয়ে কাজ করতে এবং ধ্রুপদী ভাস্কর্য দেখতে, এছাড়া এখানে দক্ষ সহকারীর কোনো অভাবও ছিল না। এমন কোনো একটি দেশের লোভনীয় হাতছানি , যেখানে তারা উনবিংশ শতকে নারীদের উপর আরোপিত সামাজিক বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে প্রতিবন্ধকতাহীন কাজ করতে পারবেন, নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করেছিল। হ্যারিয়েট হসমার (১৮৩০-১৯০৮) ছিলেন প্রথম রোমে স্থানান্তরিত হওয়া এইসব শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৮৫২ সালে রোমে এসেছিলেন। তিনি পরে লিখেছিলেন, 'এখানে (রোমে) প্রতিটি নারীর একটি সুযোগ আছে যদি তিনি সেই সুযোগটি নেবার জন্য যথেষ্ট সাহসী হতে পারেন'।

বোস্টনে ব্যক্তিগত উদ্যোগে হসমার অনানুষ্ঠানিকভাবে শারীরস্থান (অ্যানাটমি) সম্বন্ধে পড়েছিলেন, এবং মানব শরীরের গঠন সম্বন্ধে তার গভীর উপলব্ধিবোধ ছিল। রোমে বসবাস করার ব্যয় বহন করতে করতে যদিও তিনি খুবই সহজে বিক্রয়যোগ্য দেবদূতদের ভাস্কর্য তৈরি করতেন, কিন্তু এছাড়াও তিনি শক্তিশালী নারীদের বিষয়বস্তু করে ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছিলেন, যেমন 'জেনোবিয়া ইন চেইনস' (১৮৫৯)। জেনোবিয়া তৃতীয় শতাব্দীতে পালমিরার (আধুনিক সিরিয়ায়) একজন রানি ছিলেন। তাকে শৃঙ্খলিত করেছিল তার আটককারীরা, যদিও তার মাথা খানিকটা ঝুঁকে আছে কিন্তু তারপরও তিনি

আত্মমর্যাদাসহ দাড়িয়ে আছেন, সাহসের সাথে তার বন্দিত্বকে মেনে নিয়েছেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে যখন এই ভাস্কর্যটি ইংল্যান্ডে প্রদর্শিত হয়েছিল, সমালোচকরা দাবি করেছিলেন এমন কাজ কোনো নারীর পক্ষে করা সম্ভব নয়। তারা বলেছিলেন এটি নিশ্চয়ই খোদাই করেছে তার প্রাক্তন শিক্ষক অথবা রোমান সহকারীরা। হসমার দ্রুত দুটি পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন, যারা এই অভিযোগ করেছিল, এবং প্রবন্ধ আকারে একটি দীর্ঘ যুক্তি খণ্ডনও প্রেরণ করেছিলেন, যা ব্যাখ্যা করেছিল, সহকারীদের সাথে কাজ করার বিষয়টি নারী ও পুরুষ ভাস্করদের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য।

হসমারের শিল্পী চক্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মেরি এডমোনিয়া লিউইস (১৮৪৪-১৯০৭)। আমেরিকা থেকে ১৮৬৫ সালে লিউইস রোমে এসেছিলেন। যে-সময়ে আমেরিকা অবশেষে কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের স্বাধীনতা দিতে শুরু করেছিল, তখন গৃহযুদ্ধের বীরদের আবক্ষ মূর্তি, দাসপ্রথা বিলোপবাদীদের মেডাল বিক্রয় করে তিনি রোম অবধি তার যাত্রার তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন। আফ্রিকান-আমেরিকান পিতা এবং আমেরিকার আদিবাদী মায়ের কন্যা, মিশ্রবর্ণের একজন নারী হিসেবে লিউইস আমেরিকায় বহু ধরনের সীমাবদ্ধতা আর বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন, এবং অধিকাংশ সময় তিনি রোমে কাটানোরই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, শুধুমাত্র দেশে ফিরেছিলেন তার কিছু উন্মুক্ত ভাস্কর্যের উদ্বোধনের সময়। প্রথাগত বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার পরিবর্তে তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের মুক্তি নিয়ে ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন, যেমন ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে তার নির্মিত 'ফরএভার ফ্রি'। ভাস্কর্যটি নির্মাণের দুই বছর পরে এটি বোস্টনে ট্রেমন্ট টেম্পলে স্থাপন করা হয়েছিল। একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি দাড়িয়ে আছেন, তার হাত ওপরে ওঠানো, যিনি সব দাসদের স্বাধীনতা দান করা লিঙ্কনের ঘোষণাটি উদযাপন করছেন, তার পাশেই একজন নারী নতজানু হয়ে আছে, তার হাত ওঠানো প্রার্থনা আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে।

রোম হয়তো ১৮৬০-এর দশকে আমেরিকার নারী শিল্পীদের জন্য প্রগতিশীল একটি জায়গা ছিল, কিন্তু ফ্রান্স তখনো হতাশাজনকভাবেই আনুষ্ঠানিকতার সংরক্ষক অ্যাকাডেমি আর স্যালোনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। তবে, ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাতিষ্ঠানিকতার ঠিক কেন্দ্রে একটি বিস্ফোরক প্রদর্শনী চিরকালের জন্য সবকিছু বদলে দিয়েছিল।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে)

(১) J. M. W. Turner, The Slave Ship
(২) Auguste Francois Biard, The Slave Trade
(৩) Gustave Courbet, The Stone Breakers,
(৪) Gustave Courbet, A Burial at Ornans
(৫) Rosa Bonheur, The Horse Fair
(৬) John Everett Millais, Christ in the House of His Parents
(৭) Louis Daguerre, Still life with plaster casts
(৮) William Henry Fox Talbot, An oak tree in winter, Lacock
(৯) Mirza Abolhassan Khan Ghaffari, Portrait of Prince Ali Quli Mirza
(১০) Ren Xiong, Self-Portrait
(১১) Julia Margaret Cameron, I Wait
(১২) Harriet Goodhue Hosmer, Zenobia in Chains
(১৩) Mary Edmonia Lewis, The Death of Cleopatra
(১৪) Mary Edmonia Lewis Forever Free

অধ্যায় ২৭ - ইম্প্রেশনিস্ট

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ, এডুয়ার্ড মানে'র উচ্চাভিলাষী চিত্রকর্ম ''ডেজোনে সুর লা' আর্ব'' (ঘাসের ওপর মধ্যাহ্নভোজন) প্যারিসের একটি প্রদর্শনীতে চোখে পড়ার মতো একটি অবস্থানে প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রদর্শনীটি প্রতিদিন প্রায় ১০০০ দর্শককে আকর্ষণ করছিল। তিনি বিখ্যাত একটি সালোনে জায়গা করে নিয়েছিলেন, কিন্তু একটি সমস্যা ছিল, এটি ছিল ভুল স্যালোন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে, প্রথমবারের মতো ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ শিল্পীদের দাবি মেনে নিয়েছিলেন, এবং ঘোষণা করেছিলেন, শিল্পীদের যে কাজগুলো আনুষ্ঠানিক সালোন বা প্রদর্শনী থেকে বাতিল করা হয়েছে - প্রায় ৩০০০ শিল্পকর্ম - সেগুলো পৃথক একটি প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে, যে প্রদর্শনীর শিরোনাম ছিল 'সালোন দে রোফ্যুজে' (অর্থাৎ বাতিলকৃত শিল্পকর্মের প্রদর্শনী)। জনগণকেই দেখার সুযোগ দেয়া হোক, কেন রাষ্ট্রীয় জুরিরা সালোন থেকে সেগুলো বাতিল করেছেন। সুতরাং মানে'র এই চিত্রকর্মটি অন্য বহু চিত্রকর্মের সাথে প্রদর্শিত হয়েছিল, যেগুলো এখনো অসমাপ্ত অথবা খুব বেশি দুঃসাহসী বলে রক্ষণশীল সালোন জুরিরা বিবেচনা করেছিলেন।

চিত্রকর্মগুলো সজ্জিত ছিল 'জিগশ' ধাঁধার টুকরোগুলোর মতো, মেঝে থেকে ছাদ অবধি বিস্তৃত। স্ফীত হয়ে থাকা পরিচ্ছদে নারী এবং টুপি পরা পুরষরা তাদের ঘাড় বাকিয়ে চিত্রকর্মগুলো ভালো করে দেখার চেষ্টা করছিলেন। 'ডেজোনে সুর লা'আর্ব' একটি দেয়ালের ঠিক মাঝখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানে ঝোলানো ছিল। এখানে প্রদর্শিত সব কাজের মধ্যে এটাকেই সবচেয়ে দুঃসাহসী কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল, যেখানে আমরা একজন নগ্ন নারীকে পূর্ণ পোষাক পরিহিত পুরুষদের সাথে পিকনিক করতে দেখি। বহু শতাব্দী ধরে পুরুষ শিল্পীরা আবরণহীন নারীদের আঁকছেন, কখনো নিম্ফ বা দেবীর ছদ্মবেশে, যা বোঝাতে চেষ্টা করতো, এই নগ্ন নারীরা বাস্তব চরিত্র নন, কল্পিত। কিন্তু মানে'র এই নারী নগ্নচিত্রের বিষয়বস্তু ছিল না, কারণ তার উপস্থিতি ও চিত্রায়ন খুব বেশি বাস্তবধর্মী, যা ঐ সংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব হয়নি। তিনি বসে ছিলেন হালফ্যাশনের পোষাক পরা দুইজন পুরুষের পাশে, তার নিজের সব কাপড় চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রদর্শনীতে দর্শকর ওই পুরুষদের সাথে এই নারীর কী সম্পর্ক সেটি বুঝতে পারছিলেন না, এবং তার এই নগ্নতা তাদের অস্বস্তিকর একটি

অনুভূতিতে আপ্লুত করেছিল। কিন্তু আসলেই যা অদ্ভুত বিষয় ছিল সেটি হচ্ছে, যেভাবে তিনি শীতলভাবে প্যারিসের দর্শকদের দিকে স্থির অবিচলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, বেশ? আপনারা কী দেখছেন?

*

মানে শিল্পী হিসেবে তার পেশাগত জীবনব্যাপী মূলত আধুনিক জীবন থেকে নানা দৃশ্য এঁকেছিলেন, কিন্তু আসলেই তিনি চেয়েছিলেন সালোন যেন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাকে গ্রহন করে নেয়, এবং তার ভেলাসকেস আর হলসের মতো তার প্রিয় পূর্ববর্তীদের শিল্পীদের কাজের সাথে যেন তার কাজগুলো বিচার করা হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ, ফ্রান্সে সালোন ছিল শিল্পকর্ম প্রদর্শন করার একমাত্র উন্মুক্ত স্থান। যে শিল্পীরা এটি পরিচালনা করতেন, তারা তখনো অষ্টাদশ শতাব্দী রুচিবোধ আর প্রাধান্যপরম্পরা আঁকড়ে ধরে ছিলেন, যেখানে ইতিহাস বিষয়ক চিত্রকর্মের অবস্থান ছিল সবার ওপরে এবং স্টিল লাইফের অবস্থান ছিল সর্বনিম্নে, এবং কোনো শিল্পকর্মকে প্রধানত বিচার করা হতো এটির 'মাইমেসিস' বা সাদৃশ্য অনুকরণ করার মাত্রার ওপর ভিত্তি করে। মানের চিত্রকর্মগুলো ছিল সজীব, উত্তেজনাপূর্ণ, সাহসী, অসমৃণ, ছায়াগুলো ছিল প্রকট, কখনো কর্কশ, বিষয়বস্তু ছিল অপ্রত্যাশিত। তিনি সেই শিল্পীর প্রতিমূর্তি ছিলেন, লেখক শার্ল বদলেয়ার যাকে বর্ণনা করেছিলেন তার 'দ্য পেইন্টার অব মডার্ন লাইফ' শীর্ষক একটি প্রভাবশালী প্রবন্ধে, যা একই বছর প্রকাশিত হয়েছিল। এই শিল্পী, 'তার দায়িত্ব হিসাবে

গ্রহন করেছেন - কীভাবে প্রচলিত ফ্যাশন থেকে সেই সারবস্তুকে উদ্ধার করতে হয়, যেন সেটি ইতিহাসের মধ্যে কবিতাকে ধারণ করে, ক্ষণকালীনতার মধ্যে অসীমকে পাতিত করতে পারে'। শিল্পী হিসেবে মানে সেই আবশ্যিক সত্যকে অনুসন্ধান করেছিলেন প্রাত্যহিক নানা উপাদানে। কিন্তু সালোনের জুরি আর জনগণের জন্য মানের বিষয়বস্তু ছিল অনেক বেশি মাত্রায় বাস্তব, অনেক আধুনিক, অনেক প্ররোচনাদায়ী।

যদিও আনুষ্ঠানিক সালোনে তার কাজ প্রদর্শন করা প্রচেষ্টা তিনি কখনোই ত্যাগ করেননি , এবং সেখানে তিনি সফলতা পেয়েছিলেন তার জীবনের শেষাংশে, কিন্তু এটি ছিল সেই 'সালোন দে রোফ্যুজে' যা তার প্রজন্মের শিল্পীদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করেছিল। প্রথমবারের মতো এটি ছিল এমন একটি প্রদর্শনী যেখানে সাধারণ দর্শকরা নিজেরাই শিল্পকলাকে বিচার করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সময় অবধি উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিল্পীরা অ্যাকাডেমিতে পড়াশুনা করতেন, এবং কর্তব্যপরায়নতার সাথে বিধি মেনে নানা স্তর বেয়ে উপরে উঠতেন, তাদের কাজ আনুষ্ঠানিক সালোনে প্রদর্শন করতেন, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাহকরা সেটি দেখার সুযোগ পেত। অ্যাকাডেমি তখনো সেই শিল্পীদের প্রশিক্ষণ আর সহায়তা করা অব্যাহত রেখেছিল, যারা পৌরাণিক দেবী আর 'জনরা' দৃশ্য আকতেন যেমন, উইলিয়াম-আলোডফ বুজেরো (১৮২৫-১৯০৫)। ১৮৭৯ সালে আঁকা তার 'বার্থ অব ভিনাস' চিত্রকর্মে নগ্ন দেবীকে আমরা ঝিনুকের খোলসে সমুদ্রের ওপর ভাসমান দেখি, যাকে ঘিরে রেখেছিল সেন্টর, নিম্ফ এবং চেরাবরা। সমুদ্রের রং সবুজ, আকাশ নীল এবং সবাই আনন্দিত। বুজেরো ফিগারগুলো ধ্রুপদী ভাস্কর্যগুলোর মতো নিখুঁত, তার আকার কৌশল পরিশীলিত ও মসৃণ। তার চিত্রকর্ম নিয়ে আজ কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু দেখে মনে হতে পারে প্রাণহীন, বরং সেকেল কোনো কাজ। যে সময়ে এই চিত্রকর্মগুলো তৈরি করা হয়েছিল সেই সময়ের সাথে এগুলোর কোনো সংযোগ ছিল না,

যে পৃথিবী তখন সর্বোচ্চ গতিতে আধুনিক যুগের দিকে ছুটে যাচ্ছিল।

১৮৬০-এর দশকে শিল্পীরা ক্রমশ অনুভব করতে শুরু করেছিলেন, অ্যাকাডেমি এর বিধিনিষেধ নিয়ে খুব বেশি মাত্রায় কঠোর আর স্থবির, সেকেলে। শিল্পীরা অনুধাবন করেছিলেন, যদি তারা একত্রিত হতে পারেন, তাহলে প্রদর্শনী করার জন্য সালোনই একমাত্র উন্মুক্ত উপায় হিসেবে আর থাকবে না। ১৮৬০-এর দশক এবং ১৮৭০-এর দশকের শুরুতে ক্লড মনে (১৮৪০-১৯২৬), বের্থে মরিসোট (১৮৪১-১৮৯৬), পিয়ের-অগুস্ত রেনোয়া (১৮৪১-১৯১৯) এবং কামিল পিজারো (১৮৩০-১৯০৩) ও অন্যান্য শিল্পীরা সালোনে তাদের কাজ প্রদর্শনে নানা মাত্রায় সফলতা অর্জন করেছিলেন, যেখানে বুজেরোর মতো শিল্পীরা রাজত্ব করছিলেন। এমনকি যখন তারা তাদের কাজ গ্রহন করতেন, সেগুলো দূরবর্তী কোনো স্থানে ঝোলানো হতো, কারণ এগুলো প্রদর্শনী কক্ষের দেয়ালে প্রাধান্য বিস্তার করা বিশাল মাত্রার ইতিহাস আর পৌরাণিক চিত্রকর্মগুলোর চেয়ে আকারে বেশ ছোট ছিল (বুজেরোর ভিনাস উচ্চতায় ছিল তিন মিটার)।

এইসব শিল্পীরা ক্রমশ পরস্পরের পাশাপাশি কাজ করতে শুরু করেছিলেন, এবং ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'কোম্পানি অব আর্টিস্ট, পেইন্টার্স, স্কাল্পটর অ্যান্ড এনগ্রেভার' শিরোনামে তারা একটি স্বাধীন প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। এই প্রদর্শনীর স্থান হিসেবে তারা প্যারিসের বুলোভার্ড দে কাপুসিনে আলোকচিত্রী নাদারের স্টুডিওটি ভাড়া করেছিলেন। এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ১৬৫টি শিল্পকর্মের মধ্যে একটি ছিল ক্লড মনে'র 'ইম্প্রেশন:সানরাইজ' (১৮৭২) চিত্রকর্মটি, একটি অস্পষ্ট রেখাচিত্র সদৃশ অসমাপ্ত দৃশ্য, যা প্রদর্শন করেছিল নৌকা, জাহাজের পাল মাস্তুল আর কারখানার ধূসর ছায়াচিত্রের পেছনে উদিত হচ্ছে একটি লাল সূর্য, আর নীচে পানিতে সেই আলো বিস্তৃত হয়ে আছে এবং উপরে আকাশে হলদে-কমলা রঙের আভা। সমালোচক লুইস লেরয়, মনে'র এই শিরোনামটি নির্বাচন করেছিলেন, এবং এই গোষ্ঠীকে 'ইমপ্রেশনিস্ট' নামে চিহ্নিত

করেছিলেন, আর এটি কোনো প্রশংসাসূচক নাম ছিল না। তিনি বোঝাতে চেয়েছিল শুধুমাত্র একটি ইম্প্রেশন বা ছাপ চিত্রিত করা হয়েছে, কোনো কিছুর এক ঝলক দৃশ্য, অসমাপ্ত রেখাচিত্র। সুপরিকল্পিত কোনো বিন্যাসসহ এটি পূর্ণাঙ্গ সমাপ্ত কোনো চিত্রকর্ম নয়। জুল কাস্টানারির মতো অন্য সমালোচকরা অবশ্য আরো ক্ষমাশীল ছিলেন, 'তারা ইম্প্রেশনিস্ট সেই অর্থে যে, তারা কোনো ভূদৃশ্যচিত্র আঁকেননি, বরং একটি ভূদৃশ্যের সৃষ্টি করা ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলো এঁকেছিলেন'। তবে এই 'ইমপ্রেশনিস্ট' নামটি টিকে গিয়েছিল, এবং যখন ১৮৭৭ সালে শিল্পীদের এই গোষ্ঠীটি যখন তাদের তৃতীয় প্রদর্শনী করেছিলেন , তারাও এটি আত্মীকৃত করে নিয়েছিলেন।

ইমেপ্রশনিস্ট শিল্পীরা পরিমিত মাত্রায় কাজ করেছিলেন কারণ প্রায়শই তাদের স্টুডিওর বাইরে কাজ করতে হতো, যা তারা আঁকতে চাইছেন সরাসরি তার সামনে দাড়িয়ে। আর সেই অবস্থানে প্রতিদিনই তাদের ক্যানভাস বহন করে নিয়ে যেতে হতো। তারা সময়ের প্রবাহমান ধারায় কোনো একটি মুহূর্তকে ধরার প্রচেষ্টা করেছিলেন - দেখাতে চেয়েছিলেন কীভাবে আলো পানির উপর খেলা করে অথবা ছায়া দিনব্যাপী এর রূপ পরিবর্তন করে। নিরন্তর পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিগুলো ধারণ করার প্রচেষ্টায় তারা দ্রুত তুলির আঁচড় ব্যবহার করতেন। এই ঘরানার শিল্পীরা পেইন্ট বা রঙের টিউব (যে রং অনেক বেশি বহনযোগ্য, স্টুডিওতে হাতে রং মিশ্রিত করার চেয়ে) এবং সেরুলিয়ান নীল আর ভিরিডিয়ান সুবজের মতো উজ্জ্বল রং আবিষ্কারের সুফল ভোগ করেছিলেন। এছাড়া

তাদের উজ্জ্বল রঙের প্যালেট মিশেল শেভরুলের তত্ত্বগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যিনি একটি রঙের চাকা বা কালার হুইল উদ্ভাবন করেছিলেন প্রদর্শন করতে যে, কীভাবে পরস্পর পরিপূরক রং যেমন, লাল এবং সবুজ পরস্পরকে আরো ঝলমলে এবং উজ্জ্বল করে তোলে।

এইসব শিল্পীরা আধুনিক প্যারিসীয় জীবনের সব দিকগুলোই অনুসন্ধান করেছিলেন, সম্প্রতি ব্যারন হাউসম্যানের নির্মিত বুলেভার্ড নামে পরিচিত নতুন ধরনের প্রশস্ত সড়ক থেকে কনসার্ট হল, ক্যাফে, পার্ক এবং ট্রেইন স্টেশন, বৈঠকখানা এবং বাগান। কিন্তু তাদের অনেকে একই সাথে প্রতিটি দৃশ্য সংশ্লিষ্ট পরিবেশকে ধারণ করারও চেষ্টা করেছিলেন – মনে'র আঁকা 'গেয়ার সেন্ট-লাজারে' (১৮৭৭) চিত্রকর্মে সেইন্ট-লাজারে ট্রেন স্টেশনের বাষ্পীয় ধোয়ার মেঘ থেকে পিজারোর আঁকা 'হোয়াইট ফ্রস্ট' (১৮৭৩) চিত্রকর্মে শস্যক্ষেতে তুষারকণায় আবৃত লাঙ্গলের ফলার দাগে সূর্যের আলোর স্পর্শ। ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের জন্য এটি ছিল নতুন এক ধরনের বাস্তবতা, যেখানে নিরন্তর পরিবর্তন ও প্রবাহ, সালোনের দ্বারা সমর্থিত প্রথাগত উপায়ে বিশ্বকে অপরিবর্তনীয় রূপে প্রতিনিধিত্ব করার প্রচলনটিকে প্রতিস্থাপিত করেছিল।

ফিগারগুলো কখনো কখনো রঙের ছোপে পরিণত হয়, যেমন আমরা দেখি মনে'র আঁকা 'লা গ্রেনুইয়ের' (১৮৬৯) চিত্রকর্মে, তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল সাইন নদীর ওপর এই জনপ্রিয় স্নান করার এলাকায় সতত সঞ্চারণশীল পানির ওপর গাছগুলো যেভাবে প্রতিফলিত হয়। যেন এখানে আমরা একটি জীবনের খণ্ডাংশ দেখছি - একটি মুহূর্তের চিত্র অথবা ক্ষণকালীন কোনো মুহূর্ত - পুরো দৃশ্যটি নয়। আর এটি আসলেই আমরা যেভাবে পৃথিবীকে অনুভব করি তার নিকটবর্তী - ক্ষণকালীন দৃশ্যের একটি ধারাবাহিক, যা আমাদের স্মৃতি একত্রে যুক্ত করে বোধগম্য একটি দৃশ্য সৃষ্টি করে।

এই ধরনের চিত্রকর্মে সৃষ্টির সাথে যুক্ত বহু শিল্পী অপেক্ষাকৃত নতুন মাধ্যম, আলোকচিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যা সমসাময়িক জীবনের দৃশ্য উপস্থাপন করার সুযোগ করে দিয়েছিল, এবং সালোনে প্রদর্শিত চিত্রকর্মগুলো থেকে যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ভিন্ন ছিল। এডগার ডেগা (১৮৩৪-১৯১৭) ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর, কিন্তু তিনি নিজেই আলোকচিত্র সৃষ্টি করতেন। আলোকচিত্র নিয়ে তার নিজস্ব পরীক্ষা ও আগ্রহের সাথে

সংগৃহীত জাপানি ছাপচিত্রগুলো তার নিজের চিত্রকর্মগুলোয় দৃশ্যমান অপ্রচলিত দৃষ্টিকোণগুলোকে প্রভাবিত করেছিল। তার চিত্রকর্মগুলোর প্রান্ত ফিগারগুলোর হাত কিংবা পায়ের খানিকটা অংশ কেটে ফেলতো, যেমন তার "টু ড্যান্সারস অন এ স্টেজ", য েন মনে হয় ব্যালের নৃত্যশিল্পীরা ইতোমধ্যেই দূরে সরে গেছেন। শিল্পী বের্ট মরিজো যেভাবে দৃশ্যগুলো ফ্রেম বন্দি করেছিলেন সেগুলো এর চেয়ে ভিন্ন ছিল না।

মরিজো ও তার বোন এডমা শিল্পী হিসাবে প্রারম্ভিক কিছু সফলতা উপভোগ করেছিলেন , ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ অবধি প্রতি বছর তারা সালোনে প্রদর্শনী করেছিলেন। এর পরের বছর মানের সাথে বের্ট মরিজোর দেখা হয়েছিল, এবং পরবর্তীতে তিনি মানের ভাই ইউজেনকে বিয়ে করেছিলেন। অন্যদিকে এডমা একজন নৌবাহিনির কর্মকর্তাকে বিয়ে করেছিলেন, এবং তাকে ছবি আঁকা বাদ দিতে হয়েছিল, যে বিষয়ে চিঠিতে তিনি তার বোনকে নিয়মিত অভিযোগ করতেন। আটটি ইমপ্রেশনিস্ট প্রদর্শনীর সাতটির সাথে মরিজো যুক্ত ছিলেন, একটিতে তিনি যুক্ত হতে পারেননি তার মেয়ে জুলিকে জন্ম দেয়ার সময়। দিনব্যাপী কাজের শেষে সমাজ তাকে একা একা ক্যাফেতে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছিল, যা তার পুরুষ শিল্পীরা নিয়মিতভাবে করতেন, তবে তিনি এডুয়ার্ড মানে'র সাপ্তাহিক মদ্যপানের পার্টিতে যোগ দিতে পারতেন। তার কাজও বেশ বিক্রি হয়েছিল, এবং ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে একজন সমালোচক, 'লো টম্প' পত্রিকায় তাকে এই গ্রুপের সত্যিকারের একজন 'ইমপ্রেশনিস্ট' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বাড়িতে তার মা ও বোনকে, এবং নারীরা পড়ছেন এমন চিত্র এঁকেছিলেন, কিন্তু তিনি বাইরেও কাজ করেছিলেন, পার্ক, নৌকাভ্রমণ এবং পারিবারিক ভ্রমণের দৃশ্য।

আমেরিকান শিল্পী মেরি কাসাটও (১৮৪৪-১৯২৬) সালোনে প্রারম্ভিক কিছু সফলতা পেয়েছিলেন। সেখানে ডেগা তার চিত্রকর্ম দেখেছিলেন, এবং তিনি কাসাটকে ইমপ্রেশনিস্টদের সাথে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, এবং ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেটি করেছিলেন। 'অবশেষে', তিনি লিখেছিলেন, 'আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছি, কোনো বিচারকের মতামত নিয়ে আদৌ চিন্তা না করে'। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে আঁকা তার 'উওম্যান ইন ব্ল্যাক অ্যাট দ্য অপেরা' চিত্রকর্মটি ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় একটি বিষয় নিয়ে কাজ করার প্রচেষ্টা ছিল - থিয়েটার বা অপেরায় দর্শকে বক্সে একজন নারী।

রেনোয়ার 'লা লোগে' (দ্য বক্স, ১৮৭৪) চিত্রকর্মে যেমন, কেতাদুরস্ত সাদা-কালো দাগাঙ্কিত গাউন পরিহিত নারী বাইরে দর্শকের দিকে তাকিয়ে আছেন, তার গলা ঘিরে আছে মুক্তার মালা, এবং দস্তানায় আবৃত হাতে একটি স্বর্ণের অপেরা গ্লাস। তার পেছনের পুরুষটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো তার নিজস্ব অপেরা গ্লাসটি ব্যবহার করছেন দর্শকের

সারিতে বসে থাকা মানুষগুলোকে ভালো করে দেখতে। আমরা তাকে দেখি করি যেভাবে কোনো পুরষ অন্য নারীদের দেখে, যেন প্রদর্শিত কোনো বস্তু। ক্যাসাটের দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুসরিত পদ্ধতির সাথে এটির তুলনা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। কাসাটের নারী একাকী বসে আছেন। তিনি কালো কাপড় পরে আছেন, যা আমাদের ইঙ্গিত দেয় যে তিনি বিধবা। একজন বিধবাকে কারো তত্ত্বাবধানে থিয়েটারে আসার প্রয়োজন পড়ে না, তার প্রেক্ষাপট ও সামাজিক শ্রেণির অন্য নারীদের তুলনায় তিনি অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করেন। কাসাটের নারী আমাদের সামনে সুন্দর পরিচ্ছদ আর অলঙ্কার নিয়ে উপস্থিত হননি, অর্থাৎ কোনো পণ্য রূপে নয়, বরং তিনি সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণের কর্মে ব্যস্ত, রেনোয়ার চিত্রকর্মের সেই পুরুষের মতো। তিনি মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন, তার বন্ধ হাতপাখাটি বাম হাতে শক্ত করে ধরা, আর তার দস্তানামুক্ত ডান হাতটি অপেরা গ্লাসটিকে সঠিক অবস্থানে ধরে রাখতে পরিশ্রম করছে। তার অজান্তেই আমরা দেখতে পাই একজন পুরুষ তার দিকে তাকিয়ে আছেন, সেই সার্কেলের আরো পেছনে একটি বক্স থেকে বেশ খানিকটা ঝুকে। তার কনুইগুলো বক্সের প্রান্তে তার কনুইগুলোকে অনুকরণ করছে। তবে, তিনি এই পুরুষটির দৃষ্টির স্বীকৃতি দেননি, আমাদের দৃষ্টিতে তিনি অস্পষ্ট এবং দূরবর্তী। এভাবেই কাসাট নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন কীভাবে আমরা নারীকে দেখবো এবং কীভাবে আমরা চিত্রকর্ম দেখবো। পুরুষ আর থিয়েটারটিকে অস্পষ্ট করে আঁকার কারণে আমরা বিধবা নারীর প্রতি মনোযোগ দেই, যিনি স্পষ্টতই তার নিজের দৃষ্টির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছেন।

ইভা গনজালেসও (১৮৪৯-১৮৮৩) তার চিত্রকর্মে নারী ও পুরুষকে অপেরায় প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু তিনি ইমপ্রেশনিস্টদের সাথে প্রদর্শনী করেননি। মানে'র মতো তিনি আনুষ্ঠানিক সালোনে ছবি প্রদর্শন করার লক্ষ্যে মূলত স্থির ছিলেন, কারণ তার কাছে সেটাই ছিল সাফল্যের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। তিনি মানে'র সাথে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, এবং তার কাজে স্পষ্টতই আমরা মানের প্রভাব দেখতে পাই, বিশেষ করে শুরুর দিকে কাজগুলোয় যেমন, ঘন কালো পটভূমি আর কর্কশ আলোকসজ্জাসহ 'এ বক্স অ্যাট দ্য

ইটালিয়ান থিয়েটার' (১৮৭৪)। গনসালেজের নারীর হাতেও অপেরা গ্লাস, আত্মবিশ্বাসের সাথে তিনি দর্শকের দিকে তাকিয়ে আছেন, মূল্যায়ন করতে সঙ্গী পুরুষটির কেবল একটি পাশ আমরা দেখতে দেখতে পাই, একই বছর রেনোয়ার আঁকা 'লা লোগে' চিত্রকর্মটির বিবেচনায় এখানে সুস্পষ্ট একটি লৈঙ্গিক স্থানবদল উপস্থিত।

গনজালেজ এবং মোরিজো দুজনেই মানে'র সহায়তা পেয়েছিলেন, কিন্তু সব নারী শিল্পীরা সেই সময় এতটা সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। মারি ব্রাকেমন্ড (১৮৪০-১৯১৬) ছিলেন একজন প্রতিভাবান শিল্পী, যিনি ইমপ্রেশনিস্টদের সাথে প্রদর্শনী করেছিলেন কিন্তু তার স্বামী, ছাপচিত্রকর ফেলিক্স ব্রাকেমন্ড তার পেশাগত জীবনে যতটা না সয়াহতা করেছিলেন তার চেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন, তার ঈর্ষা প্রায়শই তাকে প্রভাবিত করেছিল। এর আগে কী আপনি কখনো মারি ব্রাকেমন্ডের নাম শুনেছেন ? শোনেননি, তাই না? এটাই সম্ভবত এর কারণ।

১৮৭৮ থেকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি মোট আটটি 'ইমপ্রেশনিস্ট' প্রদর্শনী হয়েছিল। সম্মিলিতভাবে যে পঞ্চান্ন জন শিল্পী সেখানে তাদের চিত্রকর্ম প্রদর্শন করেছিলেন, তারা শিল্পকলার ওপর অপরিমেয় মাত্রার একটি প্রভাব ফেলেছিলেন। শিল্পকলাকে তারা একটি নতুন পথে স্থাপন করেছিলেন, যে পথটি আমাদের একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে এসেছিল। তারা আলোকচিত্রের আবিষ্কারকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন দর্শনানুপাতের রেনেসীয় বিধি আর ধ্রুপদী রক্ষণশীল অনুকরণ নিজেকে মুক্ত করতে। দেখা বলতে আসলেই কী বোঝায় - কীভাবে সূর্য জনপ্রিয় অবসর কাটানোর কোনো এলাকার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে কিংবা রেলওয়ে স্টেশনগুলো যখন ধোয়ায় পূর্ণ হতে থাকে - সেটি ধারণ করতে তারা সংগ্রাম করেছিলেন । কিন্তু যখন ইমপ্রেশনিজম ফ্রান্সে বিকশিত হচ্ছিল , সম্ভাবনাগুলোর সব দিকই অনুসন্ধান করে দেখতে অন্য শিল্পীরাও শিল্পকলার সীমানাকে আরো সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করেছিলেন। মাঝে মাঝে তাদের এই সংগ্রাম সমস্যাও সৃষ্টি করেছিল। বেশ বড় সমস্যা।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে):

(১) Claude Monet, Impression, Sunrise
(২) Claude Monet The Gare Saint-Lazare
(৩) Camille Pissarro, White Frost
(৪) Claude Monet Bain à la Grenouillère
(৫) Edgar Degas - Two Dancers on a Stage
(৬) Berthe Morisot, Young Woman Watering a Shrub
(৭) Mary Cassatt, In The Loge
(৮) Pierre-Auguste Renoir, La Loge
(৯) Eva Gonzalès A Loge at the Théâtre des Italiens
(১০) Marie Bracquemond - Perspectives No. 258

অধ্যায় ২৮ - শিল্পীদের প্রতিরোধ

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ, ২৬ নভেম্বর। লন্ডনের একটি আদালত কক্ষে ছড়ি দোলাতে দোলাতে হেঁটে প্রবেশ করলেন বেশ বর্ণাঢ্য চরিত্রের আমেরিকান শিল্পী জেমস অ্যাবোট ম্যাকনেইল উইসলার। চুয়াল্লিশ বছর বয়সী, কোঁকড়া কালো চুল, একচোখো চশমা, বেশ আঁটসাঁট কোট আর চামড়ার জুতায় তিনি দেখতে দারুণ আকর্ষণীয় ছিলেন। দিনটি ছিল উইসলার বনাম রাস্কিন মামলার দ্বিতীয় দিন। তিনি শিল্প-সমালোচক জন রাস্কিনের লেখা একটি বাজে সমালোচনার জন্য মানহানির মামলা করেছিলেন, এবং তার সুনাম উদ্ধারে যুদ্ধ করতে এই আদালতে তিনি হাজির হয়ছিলেন (এছাড়াও তিনি ১,০০০ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দেবার দাবি করেছিলেন, তার ক্রমশ বাড়তে থাকা ঋণের বোঝা লাঘব করতে যা প্রয়োজনীয় ছিল)।

সেই সময়ে ব্রিটেইনের সবচেয়ে প্রভাবশালী শিল্প সমালোচক রাস্কিন উইসলারের সাম্প্রতিক প্রদর্শনী নিয়ে তীব্র সমালোচনামূলক একটি পর্যালোচনা লিখেছিলেন। প্রকৃতির সতর্ক অধ্যয়নের দীর্ঘদিনের সমর্থক রাস্কিন তার তীব্র ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন উইসলারের 'নকটার্ন ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড গোল্ড: দ্য ফলিং রকেট' চিত্রকর্মটি নিয়ে, যা টেমস নদীর উপর আতশবাজি পোড়ানোর ক্ষণকালীন মুহূর্তটি ধারণ করেছিল।

তিনি উইসলারকে একজন দেমাকী ফূলবাবু ('কক্সকম্ব') বলে চিহ্নিত করেছিলেন, এবং মন্তব্য করেছিলেন, উইসলার শুধু 'মানুষের মুখের ওপর এক পাত্র রং ছুড়ে দেবার জন্য ২০০ গিনি (বর্তমান সময়ে ১৫,০০০ পাউন্ড)' দাবি করার সাহস প্রদর্শন করেছেন। উইসলার তার 'নকটার্ন ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড গোল্ড' চিত্রকর্মে বাস্তববাদ উপস্থাপন করার কোনো চেষ্টা করেননি। তিনি রাতের আকাশের পটভূমিতে সৃষ্টি হওয়া স্ফূলিঙ্গগুলোর বিন্যাস এবং সেই সন্ধ্যার মেজাজ ধারণ করতে চেয়েছিলেন। শুধুমাত্র রাস্কিন সেখানে সেগুলো কিছুই দেখতে পাননি।

আদালত কক্ষ পূর্ণ ছিল যখন উইসলার বক্তব্য উপস্থাপন করতে উঠে দাড়িয়েছিলেন। রাস্কিন তার পক্ষে লড়তে অ্যাটর্নি জেনারেল, স্যার জন হলকারকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। হলকার উইসলারের চিত্রকর্মটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন , এবং সেটি বুঝতে তাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল। ''নকটার্ন ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড গোল্ড

আঁকতে কী আপনি বেশি সময় নিয়েছিলেন’? তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘কত দ্রুত আপনি কাজটি নামিয়ে ফেলেছিলেন’? জুরিরা হেসে উঠেছিলেন। উইসলারও এই খেলা অংশ নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, ‘সম্ভবত দুই একদিনের মধ্যেই আমি এটি শেষ করেছিলাম’। হলকার ভেবেছিলেন এবার হয়তো তিনি তাকে কোণঠাসা করে ফেলেছেন । ‘এবং এই পরিমান শ্রমের জন্য আপনি ২০০ গিনি দাবি করেছেন’? উইসলার বলেছিলেন, না, যে টাকা তিনি দাবি করেছিলেন সেটি তিনি একটি জীবন ধরে সঞ্চিত জ্ঞানের জন্য দাবি করেছিলেন’। উপস্থিতদের মধ্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে হর্ষধ্বণি উঠেছিল, আর উইসলার মামলায় জিতবেন, এমন আশাবাদ অনুভব করেছিলেন।

*

উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে সেরা মানহানির মামলায় উইসলার (১৮৩৪-১৯০৩) জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু ১,০০০ পাউন্ড ক্ষতিপূরণের বদলে তাকে মাত্র একটি ফার্দিং বা এক পেনির সিকিভাগ ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এবং তাকে তার মামলা চালানোর পুরো ব্যয় বহন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এটি ছিল এমন একটি বিজয় যার

জন্য তাকে অনেক খেসারত দিতে হয়েছিল। একটি বিজয়, যা বাস্তবিক অর্থে পরাজয় ছিল। স্পষ্টতই তার সামনে দাড়ানো সফল আর সুখ্যাত দুই ব্যক্তির কাণ্ডকারখানায় বিচারক কোনো ধৈর্য প্রদর্শন করেননি, যারা শুধু কিছু শব্দের জন্য কলহ করছিলেন। উভয় ব্যক্তি এই মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু উইসলারকে হারাতে হয়েছিল সবকিছু। তার নতুন জাপানি শৈলীতে নির্মিত বাড়ি, তার আসবার,তার ছাপচিত্রের সংগ্রহ, চিনামাটির পাত্র, এবং তার বিশেষভাবে নির্মিত স্টুডিওতে থাকা চিত্রকর্মগুলো। তিনি দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলেন।

আমেরিকায় জন্মগ্রহন করা উইসলার রাশিয়ায় তার শৈশব কাটিয়েছিলেন, যেখানে তার বাবা দেশটির নতুন রেলওয়ে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করার প্রকল্পে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছিলেন। এরপর তিনি আমেরিকা ও ফ্রান্সে শিল্পকলায় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, উভয় দেশ থেকেই ভিন্ন ধরনের শৈল্পিক ধারণাগুলোকে তিনি আত্মীকৃত করেছিলেন। ‘প্রি-র‍্যাফায়েলাইট’ শিল্পীদের মিত্র উইসলার অবশেষে ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এবং ব্রিটেনের নন্দনতাত্ত্বিক ‘অ্যাসথেটিক’ আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছিলেন। শিল্পী এবং ডিজাইনাররা যারা এই আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন, তারা বিশ্বাস করতেন, ভিত্তিমূলক কোনো ফিগারেটিভ বা প্রতিনিধিত্বমূলক বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই রং, আকার এবং রেখা সুন্দর আর সুসম সঙ্গতিপূর্ণ কাজ সৃষ্টি করতে পারে। তাদের মূলনীতি ছিল ‘শিল্পকলার খাতিরে শিল্পকলা’।

উইসলার তার ধারণা ও কাজে সেই সমন্বয়পূর্ণতার প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেছিলেন যা তিনি জাপানি শিল্পকলায় খুঁজে পেয়েছিলেন, এবং সেটিকে তিনি

পাশ্চাত্যের তৈলচিত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। তার সৃষ্ট প্রতিকৃতিগুলো সাদা কিংবা ধূসর রঙের অধ্যয়ন, তার নদী দৃশ্যগুলো ধূসর, নীল আর কালোর বাহুল্যবর্জিত পরিবেশ। তার শিল্পকলা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি বাস্তব পৃথিবীর চিত্রায়ন থেকে চিত্রকর্মকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছিল, এবং চিত্রকর্মের নিজস্ব একটি ভাষা আর ব্যকরণ অনুসন্ধান করেছিল। তিনি ছিলেন অনেকটাই ধ্রুপদী কোনো সঙ্গীতজ্ঞের মতো, যিনি স্বরলিপি আর শব্দের ব্যবহারে মেজাজ আর পরিবেশ সৃষ্টি করেন (জনপ্রিয় সূর কিংবা গান পরিবেশন করা কোনো গায়ক মতো নয়)। পরবর্তীতে তার একটি ভাষণে যেভাবে তিনি বলেছিলেন, 'প্রকৃতি রং এবং রূপে সব চিত্রের উপাদানগুলো ধারণ করে, ঠিক যেভাবে পিয়ানোর চাবি পৃথিবীর সব সঙ্গীতের স্বরলিপিগুলো ধারণ করে। কিন্তু শিল্পীর জন্ম হয়েছে সেখান থেকে যাচাই-বাছাই করার জন্য ... যতক্ষণ না তিনি সেই বিশৃঙ্খলা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন মহিমান্বিত ঐক্যতান সৃষ্টি করে'। তার কাজগুলো বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিল্পীদের এমনকি আরো বহু দূর অগ্রসর হতে, এবং চিত্রকর্ম থেকে বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করে পশ্চিমা শিল্পকলার প্রথম বিমূর্ত চিত্রকর্ম সৃষ্টি করার সাহস যুগিয়েছিল ।

আমেরিকার পূর্ব উপকূলীয় এলাকায় বসবাস ও কর্মরত উইসলারের সমসমায়িক শিল্পীদের শিল্পকলা আসলেই খুব ভিন্ন ছিল। উইনস্লো হোমার (১৮৩৬-১৯১০) আমেরিকার নতুন সেই সংস্করণের চিত্র এঁকেছিলেন, গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার পরে মানুষ যে দেশটি কামনা করেছিল। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দব্যাপী যে গৃহযুদ্ধে ৬০০ ,০০০ এরও অধিক সৈন্যের মৃত্যু দেখছিল আমেরিকা। বোস্টনের জন্ম নেয়া হোমার ছাপচিত্রে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন, এবং জনপ্রিয় ম্যাগাজিন 'হারপারস উইকলির' জন্য তিনি যুদ্ধকালীন সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছিলেন। গ্রামীন জীবনের স্মৃতিজাগানিয়া অতীতবিধুর দৃশ্যাবলি আঁকতে গিয়ে খুব দ্রুত তিনি সহিংসতার সব অভিজ্ঞতা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। ১৮৭০-এর দশকে দীর্ঘ অর্থনৈতিক মন্দায় তার সৃষ্ট চরিত্রগুলো ঘোড়ায় চড়েছিল, সাতার কেটেছিল এবং নৌযাত্রা করতে শিখেছিল, যেমন, তার ১৮৭৩-৬ খ্রিস্টাব্দে তার সৃষ্ট ব্রিজিং আপ (এ ফেয়ার উইন্ড) চিত্রকর্ম।

১৮৭৬ সালে আঁকা তার 'ওয়াটারমেলন বয়েজ' চিত্রকর্মে আমরা তিনজন বালককে চুরি

করে আনা একটি তরমুজ উপভোগ করতে দেখি। তরমুজের প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া লম্বা এক ফালি একজনের হাতে, তার পাশেই উদ্বিগ্নভাবে তার বাম দিকে তাকিয়ে আছে আরেকজন, তাদের এই অভিযানটিকে গোপনীয় রাখতে যে সতর্ক নজর রাখছে। অন্য দুইজন পুরোপুরিভাবে খাওয়ায় মগ্ন, পেটের উপর শুয়ে তারা তরমুজের সদ্ব্যবহার করছে। কৃষ্ণাঙ্গ আর শ্বেতাঙ্গ বালকদের একত্রে এঁকে হোমার বর্ণসহিষ্ণুতা আর জাতিগত মিশ্রণে যে চিত্র এঁকেছিলেন, সেটি আমেরিকার বাস্তব থেকে খুবই ভিন্ন ছিল। ১৮৬৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হবার পরেও দেশটি তখনো গভীরভাবে বর্ণবাদে পৃথকীকৃত ছিল।

ফিলাডেলফিয়ার টমাস একিন্স (১৮৪৪-১৯১৬) গায়ের রং যে শুধু চামড়া পর্যন্ত বিস্তৃত সেটি আমেরিকানদের প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তার আঁকা 'দ্য গ্রস ক্লিনিক' চিত্রকর্মে একিন্স শারীরস্থান বিষয়ে তার প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতাটি উন্মোচন করেছিলেন শ্রদ্ধেয় শল্যচিকিৎসক স্যামুয়েল গ্রসকে বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত করে। এখানে আমরা একটি মিলনায়তনে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সামনে ডা. গ্রসকে একজন ব্যক্তির পা ব্যবচ্ছেদ করতে দেখি। চারজন সহকারী তাকে সহায়তা করছিলেন, যখন তার শিক্ষার্থীদের গ্রস ব্যাখ্যা করছিলেন কীভাবে তিনি মৃত হাড়ের একটি টুকরো অপসারণ করেছেন, সম্পূর্ণ পা কেটে ফেলার মতো ভবিষ্যত কোনো পরিস্থিতি এড়াতে। তখনো তার হাতে একটি রক্ত মাখা স্কালপেল, বাস্তবতার এই পর্যায় অবধি বিবরণ বহু দর্শককেই অস্বস্তিতে ফেলেছিল, এবং 'দ্য গ্রস ক্লিনিক' চিত্রকর্মটিকে ১৮৭৬ সালে ফিলাডেলফিয়ার 'সেন্টিনিয়াল' প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করতে অস্বীকার করা হয়েছিল, কারণ এটি ছিল 'সহিংস, কদর্য এবং অশ্লীল'। যখন ডা. গ্রস নিজে এই চিত্রকর্মটি প্রদর্শনের জন্য আহবান জানিয়েছিলেন, তখনই কেবল এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, এবং তারপরও সেটির জায়গা হয়েছিল মেডিকেল প্যাভেলিয়নে। এটিকে প্রদর্শন করা হয়েছিল শল্যচিকিৎসার একটি উদাহরণ হিসেবে, শরীরের ভিতর আর বাহিরের কোনো

প্রতিকৃতি হিসেবে নয়।

একিন্স শরীরের গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন, এর ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলো - সাদা কিংবা কালো - যে কোনো ক্ষেত্রেই সংস্কারমুক্ত একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু আমেরিকায় সমতার জন্য যুদ্ধটি যদি বর্ণবাদ আর বর্ণবৈষম্য নিরসনে হয়ে থাকে, রাশিয়ায় এটি ছিল শ্রেণিবৈষম্যসংক্রান্ত একটি বিষয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে আব্রাহাম লিংকনের ঘোষণার দুই বছর আগে রুশ জার দ্বিতীয় আলেক্সান্ডার সব কৃষকদের ‘সার্ফ’ বা ভূমিদাস প্রথা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন (দাসত্বের আরেকটি রূপ)। যদিও এই পদক্ষেপ কোনো পরিবর্তন আনেনি, এবং তাদের জীবন অবিশ্বাস্য মাত্রায় কঠোরই রয়ে গিয়েছিল। রুশ শিল্পীরা ক্রমশ অনুভব করতে শুরু করেছিলেন, সামাজিক উদ্দেশ্যে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করাই হচ্ছে তাদের মূল কর্তব্য, এবং তেরো জন শিল্পীর একটি দল প্রভাবশালী সেইন্ট পিটার্সবুর্গ আর্ট একাডেমির নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করেছিলেন, শিল্পকলার যে অ্যাকাডেমিটি তখনো নব্যধ্রুপদীবাদের সমর্থনে কাজ করে যাচ্ছিল। এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা নিজেদের ‘পিরিডভিজনিকি’ বা ‘ওয়ান্ডারারস’ (যাযাবর বা ভ্রাম্যমান) নামে চিহ্নিত করেছিলেন। দেশব্যাপী বহু ছোট শহরে তারা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন এবং তাদের বাস্তববাদী , জাতীয়তাবাদী শিল্পকলাকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। যখন উইসলার শুধুমাত্র নিজের নাম আর সুনাম বাঁচাতে যুদ্ধ করেছিলেন, ওই যাযাবর শিল্পীরা অবহেলিত, দরিদ্র নিপীড়িত মানুষদের সমস্যা সমাধানে অংশ নিয়েছিলেন, তাদের সমর্থনে যুদ্ধ করেছিলেন।

ইলইয়া রেপিনকে (ইল’ইয়া এফিমোভিচ রেপিন, ১৮৪৪-১৯৩০) প্রথম দৃষ্টিতে যাযাবর শিল্পী গোষ্ঠীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে এমন কোনো শিল্পী হিসেবে মনে হয় না। তিনি তিন বছর প্যারিসে কাটিয়েছিলেন যখন ইমপ্রেশনিস্টরা একত্রিত হতে শুরু করেছিলেন, এবং ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনিও এই দলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি দলটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যে পরিণত হয়েছিলেন, এবং যার গুণমুগ্ধ ছিল অন্য বহু শিল্পী এবং লেখকরা, যার মধ্যে অন্যতম রুশ বাস্তববাদী লেখক লিও টলস্টয়, যাকে রেপিন বহুবারই তার চিত্রকর্মের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছিলেন। ফ্রান্সে কুরবের মতো রেপিন এবং

যাযাবর গোষ্ঠীর শিল্পীরা তাদের শিল্পকলাকে সমাজ নিয়ে মন্তব্য করতে ব্যবহার করেছিলেন, দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও শ্রমিকদের দুঃখ উন্মোচিত করেছিলেন, যেমন রেপিনের 'বার্জ হাউলারস' (১৮৭০) চিত্রকর্মটি। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে আঁকা তার বড় মাত্রার 'দে ডিড নট এক্সপেক্ট হিম' চিত্রকর্মে একজন 'নারোডনিক' বা সংস্কার-আন্দোলনকর্মীর বাড়ি ফিরে আসার দৃশ্য এঁকেছিলেন, যাকে সরকার সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে প্রেরণ করেছিল। ক্ষুদ্র একটি বৈঠকখানায় তিনি দাড়িয়ে আছেন, তখনো আগন্তুকের মতোই কোট পরে আছেন, তার মুখ ছায়ায় প্রায় হারিয়ে গেছে, অন্ধকার শূন্য কোঠর তার চোখ। তার সন্তানরা তারদিকে তাকিয়ে আছে যেন তিনি নতুন কৌতূহলের কোনো বিষয়, তারা তাকে চিনতে পারেনি। এবং শুধু তার মা, বিধবার বেশে চেয়ার থেকে উঠে দাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেছেন। খালি মেঝে ইঙ্গিত করছে তার নির্বাসনে যাবার পর তার পরিবারের জন্য জীবন খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল।

শিল্পীরা কেন এই ধরনের মানুষদের আঁকতে নির্বাচন করেছিলেন? পিরিডভিজনিকি বা যাযাবর শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্যরা চেয়েছিলেন এই ধরনের চরিত্রগুলোর ওপর আলোকপাত করতে, তাদের একটি কণ্ঠ দিতে, যেভাবে কুরবে ফ্রান্সে করেছিলেন। এছাড়াও তারা এই মানুষগুলোর জীবনকে সম্মান করতে চেয়েছিলেন, তারা সচেতন ছিলেন যে, আধুনিক পৃথিবী এখন সেই সব ঐহিত্যে নির্বাপন করছে, যা বহু শত বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এসব অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে প্রাচীন এই উপায়গুলো ধারণ করতে শিল্পীরা নতুন স্থাপিত রেলপথ ব্যবহার করে দেশে প্রান্তিক এলাকাগুলো ভ্রমণ করেছিলেন, যেখানে ভূমি সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। ব্রিটানির পন্ট-আভেন,

নেদারল্যান্ডসে জানভুর্ট এবং ইংল্যান্ডের নিউলিনে। এইসব উপকূলীয় গ্রামে সল্প খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, এবং ইতোমধ্যেই প্রস্তুত আঁকারও বহু বিষয় ছিল -মাঝি, নারী , ঐতিহ্যবাহী পোষাকে গ্রামবাসীরা চার্চে যাচ্ছেন, ছবির মত গ্রাম্য পটভূমি। আধুনিক শহরের সব কোলাহল থেকে বহু দূরে ছিল যাদের অবস্থান, যে জীবন ইমপ্রেশনিস্টদের দারুণ আকৃষ্ট করেছিল, এবং প্রথাগত জীবনচিত্র ক্যানভাসে ধারণ করার জন্য শিল্পীদের সুযোগ করে দিয়েছিল।

এলিজাবেথ ফর্বস (জন্ম নাম এলিজাবেথ আর্মস্ট্রং, ১৮৫৯-১৯১২) কানাডায় জন্ম নেয়া একজন শিল্পী ছিলেন, তবে তিনি প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন লন্ডন এবং নিউ ইয়র্কে, পরে তিনি পন্ট আভেন এবং জান্ডভুর্টে এসেছিলেন, এখানে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ‘এ জানভুর্ট ফিশারগার্ল’ এঁকেছিলেন। এখানে আমরা একজন তরুণীকে দাড়িয়ে থাকতে দেখি, তার কোমরের উপর একটি হাত বিশ্রাম নিচ্ছে, তার ডান হাত মাছসহ একটি ট্রে ধরে আছে। ফর্বস তাকে সাদামাটা একটি দেয়ালের সামনে স্থাপন করেছিলেন , যেন আমাদের মনোযোগ তার আপোসহীন দৃষ্টির ওপর স্থির হতে পারে। তরুণীটি আমাদের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে, তার চুল, পরনের অ্যাপ্রোন ভোরের সূর্যের আভায় একটি জোতির্বলয় সৃষ্টি করেছে।

ভ্রমণের সময়ে ফর্বসের মাও তার সঙ্গী হতেন, এবং একত্রে কর্নওয়ালে নিউলিনে এসে তারা স্থায়ী বসতি গড়েছিলেন, যেখানে তিনি তার স্টুডিও ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন মাছধরার জালের একটি বিশাল স্তূপের সাথে। কর্নওয়ালে থাকাকালীন সময়ে তার স্বামী স্ট্যানহোপ ফর্বসের (১৮৫৭-১৯৪৭) সাথে তার দেখা হয়েছিল। স্ট্যানহোপ ফর্বসের

আঁকা ‘এ ফিশ সেল অন এ কর্নিস বিচ’ (১৮৮৪-৫) চিত্রকর্মটির কর্নওয়াল উপকূলীয় মাঝি-জেলেদের ব্যস্ত জীবনের একটি চিত্র, জেলেদের মাছ ধরার নৌকাগুলো তীরে ফিরেছে, জেলেরা তাদের দিনব্যাপী ধরা মাছগুলো নিলামে বিক্রি করছেন। একটি রে, একটি ম্যাকারেল এবং অন্য কিছু মাছ দুই তরুণীর পায়ের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, য ারা একজন কাচাপাকা চুলের মাঝির সাথে কথা বলছেন, যে তখনও তার পানিনিরোধী পেছনে প্রশস্ত মাথার আচ্ছাদন পরে আছেন (সুওয়েস্টার)। অন্য নারীদের আমরা মাছে ভারী ঝুড়ি বহন করতে দেখি, ধূসর ঢেউ যাদের পায়ে আছড়ে পড়ছে। স্ট্যানহোপ ফর্বস লন্ডনে তার কাজ প্রদর্শন করেছিলেন এবং শীঘ্রই ‘নিউলিন স্কুলের’ অস্তিত্ব নিয়ে একটি বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল। স্ট্যানহোপ এবং এলিজাবেথ চিত্রকর্ম শেখার স্কুল ও একটি গ্যালারী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এখন যা নিউলিন আর্ট গ্যালারী নামে পরিচিত, এবং নিউলিন স্কুল এই এলাকাটিকে শিল্পীদের শক্তিশালী উপস্থিতির ভিত্তি তৈরি করেছিল, যা এখনো চলমান।

বহু ফরাসী শিল্পী আবার দেশের বাইরে ভ্রমণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তারা সচেতন ছিলেন, শিল্পকলার জগতে সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ পরিবর্তন আর আন্দোলনগুলো তাদের দরজার সামনে অর্থাৎ প্যারিসেই ঘটছে। ইমপ্রেশনিস্টরা তাদের প্রিয় রাজধানীকে এঁকেছিলেন, এবং ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাদের সর্বশেষ প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে জর্জ স্যুরা’র (১৮৫৯-১৮৯১) ‘এ সানডে আফটারনুন অন দ্য আইল্যান্ড অব লা গ্রন্ড জাট’ (১৮৮৪-৬) চিত্রকর্মটি প্রদর্শিত হয়েছিল, এবং এটি সম্পূর্ণ

নতুন এবং যুগান্তকারী একটি শৈলীতে আঁকা হয়েছিল। ইমপ্রেশনিস্টদের মতোই স্যুরাও একই বৈজ্ঞানিক রঙের তত্ত্ব ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তিনি এটিকে নিজের মতো করে ভিন্ন একটি দিকে পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যদি আপনি দুটি রং একত্রে মিশ্রিত করেন, ধরুন লাল এবং হলুদ, আপনি একটি নতুন রং পাবেন, এই ক্ষেত্রে কমলা। কিন্তু কী হতে পারে যদি আপনি রংগুলোকে ক্যানভাসে মিশ্রিত না করেন, এবং সেগুলো পাশাপাশি অবস্থান করা লাল আর হলদু বিন্দু হিসেবে ব্যবহার করেন, আর যদি এই রংগুলোকে চোখে অর্থাৎ দেখার প্রক্রিয়ার সময় মিশ্রিত হবার সুযোগ করে দেয়া হয়? কী হতে পারে যদি আপনি রঙের এই বিন্দুগুলোর ওপর পরিপূরক রঙের বিন্দুগুলোর বাড়তি স্তর বিছিয়ে দেন, যেন রংগুলো আসলেই উত্তেজনাপূর্ণ আর আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে?

আর এর পরিণতি হচ্ছে 'এ সানডে অন দ্য আইল্যান্ড অব লা গ্রন্ড জাট' - প্রায় তিন মিটারেরও চেয়ে প্রশস্ত সুবিশাল একটি চিত্রকর্ম।

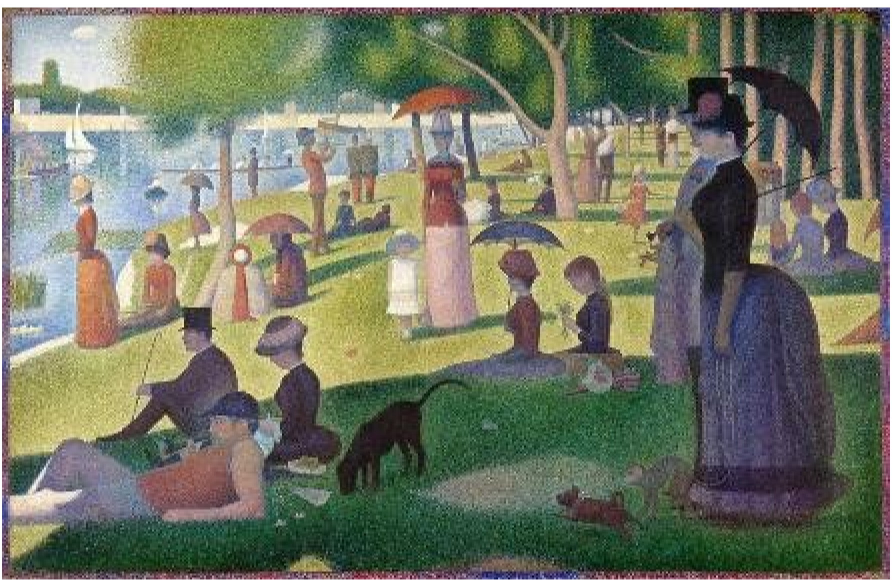

'লা গ্রন্ড জাট' হচ্ছে প্যারিসের উপকণ্ঠেই সাইন নদীর ওপর অবস্থিত বড় একটি দ্বীপ। স ্যুরা'র চিত্রকর্মে মধ্যবিত্ত এক দম্পতি ছায়ার মধ্যে দাড়িয়ে দূরে আলোয় ঝলমল করা নদীর দিকে তাকিয়ে আছেন, তাদের পিঠ ঋজু, রবিবারের সেরা পোষাকে আনুষ্ঠানিক। তাদের পাশেই আমরা বানর, কুকুর আর শিশুদের দৌড়াতে দেখি, ফুলের তোড়া বানানো একজন নারী, কর্মজীবী বিশ্রামরত একজন পুরুষ। সমালোচক ফেলিক্স ফেনেওন বিস্মিত হয়েছিলেন, 'পুরো পরিবেশ অসাধারণভাবেই স্বচ্ছ এবং সপ্রাণ, এর উপরিপৃষ্ঠ মনে হচ্ছে যেন কম্পমান'। স্যুরা পুরো ক্যানভাসটি এঁকেছিলেন, সেই সাথে এর ফ্রেমটিও এঁকেছিলেন বিন্দু (ফোটা বা ফুটকি) ব্যবহার করে। ফ্রেম হিসেবে আঁকা লাল ফোটাগুলো মূল চিত্রকর্মের ঘাসের পাশেই একটি রেখা সৃষ্টি করেছে, যা সবুজ পৃষ্ঠটিকে আরো স্পষ্ট

হয়ে ফুটিয়ে তুলেছে, এমনই জীবন্ত মনে হয় যেন এটি হিস হিস শব্দ করছে। এর ব্যতিক্রম মানুষগুলোকেই মনে হয় স্থবির আর প্রাণহীণ। মূলত প্রোফাইল বা এক পাশ থেকে যাদের আঁকা হয়েছে, দেখে মনে হয় যেন কোনো রিলিফ ভাস্কর্যে খোদাই করা ফিগার, তারা বসে আছে কিংবা একা দাড়িয়ে আছে, তাদের নিজস্ব ছায়ার বৃত্তে। আধুনিক শহুরে জীবনের বিচ্ছিন্নতা আর নামহীনতার একটি প্রতিফলন।

স্যুরা'র এই চোখ ধাঁধানো নতুন শৈলী, যা 'পয়েন্টিলিজম' নামে পরিচিতি পেয়েছিল, ইমপ্রেশনিজম থেকে একটি সুস্পষ্ট বিযুক্তি এবং প্রস্থানের উপায় উপস্থাপন করেছিল, এবং বহু অনুসারী এটি অনুপ্রাণিত করেছিল। ফেনেওন এটিকে নতুন একটি শিল্পকলা আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, এবং নাম দিয়েছিলেন 'নিও-ইমপ্রেশনিজম'। তিনি দাবি করেছিলেন, এটি ইমপ্রেসিনিজমের 'পলায়নপর' উপস্থিতির একটি প্রত্যাখ্যান, এবং এটি কোনো দৃশ্যের চিরন্তন মূলসারটি ধারণ করার কামনা প্রদর্শন করে। যে শিল্পীরা পরে তাকে অনুসরণ করেছিলেন তাদের আমরা এখন 'পোস্ট -ইমপ্রেশনিস্ট' বলে থাকি: ভ্যান গো, গগ্যাঁ, সেজান। পৃথিবীতে এখন তাদের সৃষ্ট চিত্রকর্মগুলো সবচেয়ে মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু জীবদ্দশায় তারা কদাচিৎ তাদের চিত্রকর্ম বিক্রয় করতে পেরেছিল। জনসমর্থনের অভাব সত্ত্বেও শিল্পকলার প্রতি তাদের আত্মনিবেদন প্রায়শই বিপজ্জনক এবং এমনকি প্রাণঘাতী প্রমাণিত হয়েছিল।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে)

(১) James Abbott McNeil Whistler, Nocturne in Black and Gold
(২) James Abbott McNeil Whistler, Nocturne
(৩) James Abbott McNeil Whistler, Arrangement in Grey and Black No. 1,
(৪) Winslow Homer, Breezing Up (A Fair Wind)
(৫) Winslow Homer, Watermelon Boys
(৬) Thomas Eakins, The Gross Clinic or The Clinic of Dr. Gross
(৭) Ilya Repin, Barge Haulers on the Volga
(৮) Ilya Repin, They Did Not Expect Him
(৯) Elizabeth Forbes, The Zandvoort Fishergirl,
(১০) Stanhope Forbes - A Fish Sale on a Cornish Beach
(১১) Georges Seurat, A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte

অধ্যায় ২৯ - পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্ট

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ, সেপ্টেম্বর মাসের শেষে, ভিনসেন্ট ভ্যান গো দক্ষিণ ফ্রান্সের আর্লে তার স্টুডিওতে একটি টেবিলে বসে আছেন। তার সামনে ভাই থিওকে লেখা একটি অসমাপ্ত চিঠি, শিল্পকলা সংগ্রহ এবং ক্রয়বিক্রয়ের সাথে যিনি জড়িত। এক বছরে ভ্যান গো বহু শত চিঠি লিখতেন, এবং এর অধিকাংশই ছিল থিওকে লেখা। তার ভাই থিও শিল্পী হিসেবে তাকে তখনো প্রয়োজনীয় সহায়তা করতেন, তার বাড়ি ভাড়া, তার জন্য রং কিনে দেয়া। মে মাসে ভ্যান গো থিওর পাঠানো টাকা দিয়ে এই ঘরটি ভাড়া করেছিলেন, যেখানে এখন তিনি বসে আছেন। তিনি এটির নাম দিয়েছিলেন 'ইয়েলো হাউজ' বা হলুদ বাড়ি এবং এটিকে তার 'দক্ষিণের স্টুডিও' হিসাবে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন অন্যরা, যেমন, তার বন্ধু পল গগ্যাঁ, তার সাথে যোগ দিতে সেখানে আসবেন , এবং আর্লে তিনি শিল্পীদের একটি সমাজ গড়ে তুলবেন।

কিন্তু এখন তিনি একাই বসে আছেন, হাতে কলম নিয়ে, থিওকে একটি চিত্রকর্ম নিয়ে লিখছিলেন, যা তিনি কেবলই শেষ করেছেন। চিত্রকর্মটির নাম 'দ্য নাইট ক্যাফে', আর্লে সারারাত খোলা থাকে এমন একটি পানশালার রাতের দৃশ্য, যার ওপর তলায় একটি ঘরে তিনি একসময় থাকতেন। বিলিয়ার্ড টেবিলের পাশে এর মালিক দাড়িয়ে আছেন এবং কয়েকজন ভাগ করে নেয়া একটি টেবিলের ওপর মদের উপর ঝুকে আছেন। বেশ পেছনের দিকে এক যুগল অন্তরঙ্গভাবে কথা বলছে। ঘড়িটি সময় দেখাচ্ছে , মধ্যরাতের খানিকটা পরে। গ্যাসের বাতি নতুন কৃত্রিম আলোয় ক্যাফেটি আলোকিত করেছে, যা ছাদ থেকে এককেন্দ্রিক বৃত্তাকার পথে বিকিরিত হচ্ছে। তিনি লিখেছিলেন, 'আমার এই ছবিতে, আমি সেই ধারণাটি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি, ক্যাফে হচ্ছে এমন একটি জায়গা যেখানে কেউ নিজেকে ধ্বংস করতে পারে, পাগল হয়ে যেতে পারে, কিংবা অপরাধ করতে পারে'। তিনি তার ব্যবহার করা কড়া সবুজ আর গন্ধক-সদৃশ হলুদ রং এবং সেই উন্মত্ত নষ্টচেতন পরিবেশ নিয়ে থিওকে লিখেছিলেন, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। ক্যাফেতে বসে এই দৃশ্যটি আঁকতে তিনি তিন রাত সম্পূর্ণ জেগে ছিলেন, মত্ত খদ্দেরদের আবেগ ও তাদের নেশাগ্রস্ত বিহ্বলতা প্রকাশ করতে তিনি পার্থক্যসূচক রং, লাল ও সবুজ ব্যবহার করেছিলেন।

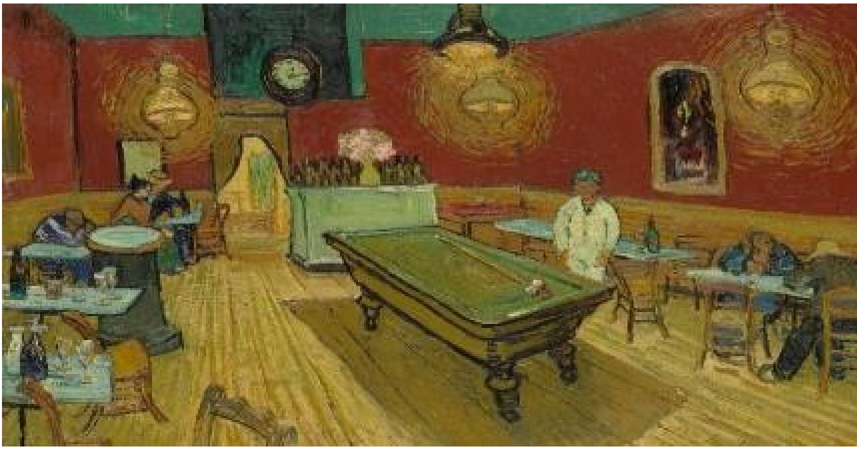

*

ভিনসেন্ট ভ্যান গো (১৮৫৩-১৮৯০) প্রারম্ভিক চিত্রকর্মগুলো ছিল ডাচ কৃষকদের বিষণ্ন চিত্র। যখন তিনি দক্ষিণে এসেছিলেন, নেদারল্যান্ডস থেকে প্যারিস এবং তারপর আর্ল, তার চিত্রকর্ম আরো উজ্জ্বল আর সাহসী হয়ে উঠেছিল। তিনি ইয়েলো হাউজে তার সাথে কিছু জাপানি ছাপচিত্র নিয়ে এসেছিলেন, যার মধ্যে ছিল উটাগাওয়া হিরোশিগে'র 'দ্য রেসিডেন্স উইথ প্লুম ট্রিজ ইন ক্যামেইডো' (১৮৫৭) এবং সাটো টোরাকিও'র 'গেইশাস ইন এ ল্যান্ডস্কেপ' (১৮৭০-এর দশক)। অ্যান্টওয়ার্প আর প্যারিসের বাজার থেকে তিনি এই ছাপচিত্রগুলো কিনেছিলেন, এবং এগুলো তার চিত্রাঙ্কন শৈলীকে প্রভাবিত করেছিল, যখন তিনি তার কাজ থেকে ছায়া অপসারণ করে, কোনো কিছুর বহিঃরেখা নির্দেশ করতে তিনি মোটা গাড় রঙের রেখা ব্যবহার করতে শুরু করেছিলন , যেমন 'দ্য নাইট ক্যাফে'।

পশ্চিমে অনেক শিল্পী জাপানি ছাপচিত্রে কেন অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন? আপাতদৃষ্টিতে এই ছাপচিত্রগুলো পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির সীমানা ছাড়িয়ে দেখার নতুন একটি উপায় উপস্থাপন করেছিল, যা মসৃণ অ্যাকাডেমি নির্ভর রক্ষণশীল অনুকরণ বা মাইমেসিস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। শিল্পীদের মুগ্ধ করেছিল যেভাবে তাদের জাপানি সহকর্মীরা ভূদৃশ্যচিত্র এঁকেছিলেন - অনুভূমিক দ্বিমাত্রিক দৃশ্য সৃষ্টি করেছিলেন, যা দেখতে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করেনি, বরং এর পরিবর্তে প্রকৃতির সার্বিক ভিত্তিমূলক সঙ্গতি আর অবিরোধিতাকে ধারণ করতে পেরেছিল। এই ছাপচিত্রগুলো নতুন কিছু উপায় উপস্থাপন করেছিল, যা ব্যবহার করে ত্রিমাত্রিক বিশ্বকে সমতল দ্বিমাত্রিক চিত্র রূপান্তরিত করা যেতে পারে। ভ্যান গো জাপানি ছাপচিত্রগুলোর প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলেন, মাউন্ট ফুজির পটভূমিসহ 'গেইশাস ইন এ ল্যান্ডস্কেপের' একটি সংস্করণ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তার নিজের 'সেল্ফ প্রোর্টেট উইথ ব্যানডেজড ইয়ার' প্রতিকৃতির মধ্যে এঁকে।

'সেলফ পোর্ট্রেইট উইথ ব্যানডেজড ইয়ার' আত্মপ্রতিকৃতিটি ভ্যান গো এঁকেছিলেন যখন

পল গগ্যাঁ (১৮৪৮-১৯০৩) আর্লে ভ্যাগ গো'র সাথে যোগ দিয়েছিলেন, এবং তিনি ইয়েলো হাউস ছেড়ে দিয়েছিলেন দুই মাসব্যাপী পারস্পরিক বাকবিতন্ডার পরে। ভ্যান গো রাগ করেই তার নিজের কানের লতি কেটে ফেলেছিলেন। তার মানসিক স্বাস্থ্যের দ্রুত অবণতি হয়েছিল এবং হাসপাতাল আর মানসিক নিরাময় আশ্রমে আসা যাওয়া করেই তাকে বাকি জীবনটা কাটাতে হয়েছিল। যদিও তিনি তার আঁকা অব্যাহত রেখেছিলেন। ' দ্য নাইট ক্যাফে' আঁকার দুই বছরের মধ্যেই তিনি মারা যান, দুর্ঘটনাবশত নিজের ছোড়া গুলিতে আহত হয়ে সেই শস্যক্ষেতে, যে শস্যক্ষেতটি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রাণবন্তভাবে এঁকেছিলেন তার 'হুইট ফিল্ড উইথ দ্য ক্রোজ' চিত্রকর্মে। জীবদ্দশায় তিনি মাত্র একটি চিত্রকর্ম বিক্রয় করতে পেরেছিলেন।

ভ্যান গো ছিলেন এমন একজন শিল্পী যিনি মূলত বিচ্ছিন্ন ও একাকী কাজ করে গেছেন, কিন্তু এখন আমরা তার অভিব্যক্তিময় আবেগ দ্বারা পরিপৃক্ত চিত্রকর্মগুলোর সমান্তরাল উদাহরণগুলো দেখতে পাই অন্যান্য উত্তর ইউরোপীয় শিল্পীদের কাজে, বিশেষ করে এডভার্ড মুঙ্ক (১৮৬৩-১৯৪৪)। মুঙ্ক জন্মগ্রহন করেছিলেন নরওয়েতে, তবে তিনি শিল্পকলায় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন প্রথমে প্যারিসে, এরপর তিনি জার্মানির বার্লিনে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। তার জীবন ও শিল্পকলা ভ্যান গো'র মতোই একত্রে যুক্ত ছিল। এবং তার সবচেয়ে বিখ্যাত চিত্রকর্ম, ১৮৯৩ সালে আঁকা 'দ্য স্ক্রিম' খুলি সদৃশ মাথা থেকে নির্গত একটি নিপীড়িত আর্তনাদ উপস্থাপন করেছিল। পেছনে রক্ত লাল আকাশ ফুটন্ত, আর নীচে সাগরের ঘুর্ণি, একটি অস্থির উৎকণ্ঠিত পরিস্থিতি, যা কেন্দ্রীয় চরিত্রটির আবেগগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করছে, মনে হয় যেন তিনি তার আত্মার অন্তস্থল থেকেই চিৎকার করছেন।

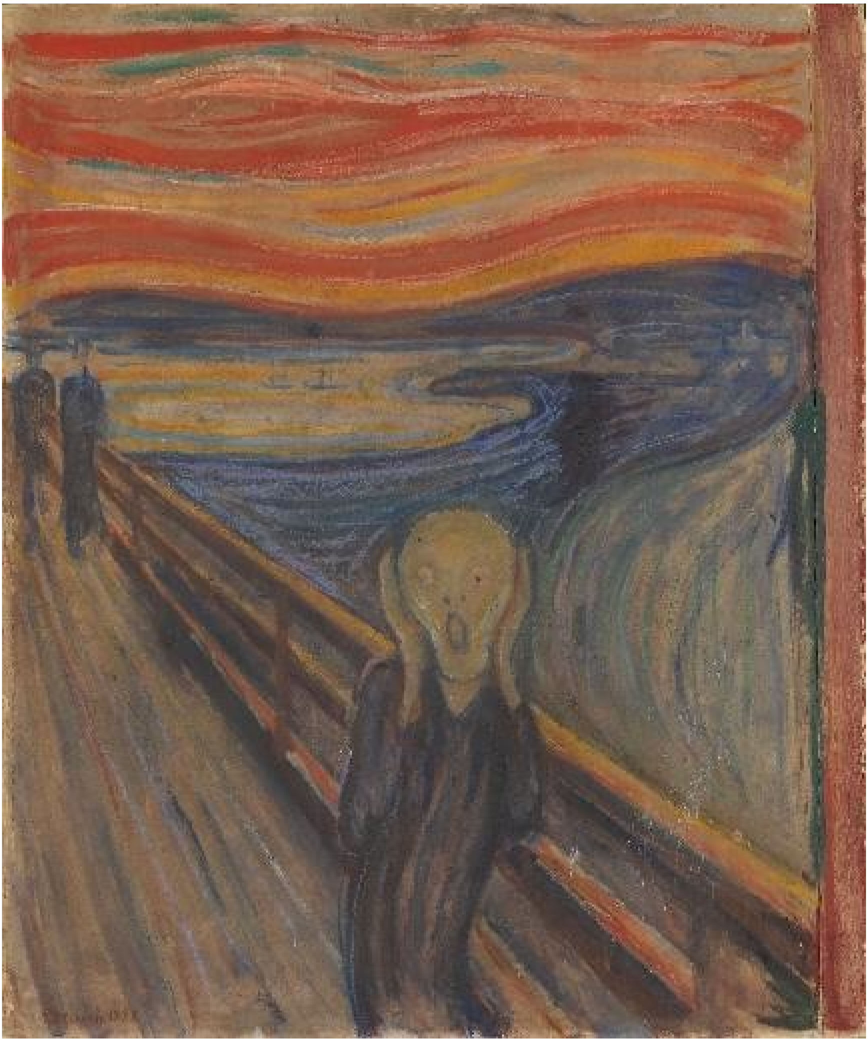

'দ্য স্ক্রিম' ছিল মুঙ্কের 'ফ্রিজ অব লাইফ' ধারাবাহিকের চূড়ান্ত ফলাফল। যে ধারাবাহিকটি পুরুষের যন্ত্রণা, নারীদের রহস্যময়তা, এবং মৃত্যুর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি প্রকাশ করেছিল। মুঙ্ক জার্মান এক্সপ্রেশনিজম বা অভিব্যক্তিবাদের গুরুত্বপূর্ণ একজন পথিকৃত ছিলেন - যে ধারার শিল্পীরা এমন শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছিল যেখানে অভ্যন্তরীণ আবেগীয় জগত ভৌত দৃশ্য বা বস্তুর চেয়ে চিত্রকর্মে অগ্রাধিকার পেয়েছিল। অসুস্থতা আর প্রিয়জনের মৃত্যুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন, এবং তার নিজের বিষণ্নতাও তার শিল্পকলাকে এর বৈশিষ্ট্যসূচক রূপ দিয়েছিল। তিনি তার ডায়েরিতে লিখেছিলেন, শিল্পকলা শুধু মানুষের বই পাঠ কিংবা বুননির কাজ করার শান্ত দৃশ্য হওয়া উচিত নয়, বরং 'সত্যিকারের মানুষগুলোকে', এটির প্রদর্শন করা উচিত

'যারা শ্বাস নিয়েছে, কষ্টভোগ করেছে এবং অনুভব করেছে ও ভালোবেসেছে'।

ভ্যান গো এবং মুঙ্ক দুজনে আধুনিক জীবনের উদ্বেগ আর চাপের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেছিলেন। দুজনেই মানসিক স্বাস্থ্য ও প্রত্যাখ্যান নিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন তাদের জীবদ্দশায়, কিন্তু এখন তাদের কাজ মানুষের সাথে আরো তীব্র আবেগময়তা নিয়ে কথা বলে, কারণ এগুলো আমাদের নিজেদের আবেগ আর উদ্বেগ স্পর্শ করে। তাদের শিল্পকলা ইমপ্রেশনিজম থেকে সরে এসেছিল, যখন এটি গোপন আবেগ আর অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করেছিল।

পল সেজানও (১৮৩৯-১৯০৬) ইমপ্রেশনিজমের ক্ষণকালীন দৃশ্যচিত্রগুলোর সীমানা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিলেন, যেন তিনি 'আবশ্যিক' সত্যগুলো প্রকাশ করতে পারেন। তিনি প্যারিসে পড়াশুনা করেছিলেন কিন্তু পরে দক্ষিণ ফ্রান্সে এইক্স-অ-প্রভন্সে ফিরে এসেছিলেন, যেখানে তার জন্ম হয়েছিল। তিনি তার চিত্রকর্ম নিয়ে সারাজীবনই সংগ্রাম করেছিলেন, ১৮৬৩ সালে তিনি মানে'র সাথে 'সালোন দে রোফ্যুজেতে' প্রদর্শন করেছিলেন, এরপর ইমপ্রেশনিস্টদের সাথে এবং তারপর ছাপ্পান্ন বছর বয়সে প্যারিসে তার একক চিত্রপদর্শনী করার আগে তিনি আর কোনো প্রদর্শনীতে অংশগ্রহন করেননি। আকৃতি মূল সার - তাদের রং, ভার আর আকৃতি - প্রকাশ করার প্রচেষ্টার ওপর তার মনোযোগ ঘনীভূত করতেশিল্পকলার ব্যস্ত জগত থেকে তিনি প্রস্থান করেছিলেন ।

সেজানের বেশ কিছু সুপরিচিত চিত্রকর্মে আমরা একটি মাত্র স্থানীয় দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করতে পারি, মন্ট সেইন্ট-ভিক্টোয়ার। জাপানি ছাপচিত্র শিল্পীদের কাছে যেমন মাউন্ট ফুজি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এটি তার কাছে ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি প্রোভন্সের ভৌগলিক প্রতীক - যে দৃশ্যটিকে ১৮৮০-এর দশকে তিনি পাইন গাছের কাঠামো দিয়ে

বিন্যস্ত একটি চিত্রে প্রকাশ করেছিলেন, ১৮৯০-এর দশকে বেগুনি রঙ দিয়ে, ১৯০০-এর দশকে শুরুতে এটিকে আরো বাহুল্যবর্জিত করে হ্রস্বীকৃত করেছিলেন শুধুমাত্র কাগজ আর ক্যানভাসের ওপর কিছু রঙ্গীন দাগ ব্যবহার করে। পুরো ভূদৃশ্যটিকে একত্রে আত্মীকৃত করে নেবার অভিজ্ঞতা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় নীচে বিস্তৃত প্রান্তরে বাক্সের মতো বাড়ীগুলো আর দূরের পর্বত, আকাশ এবং পুরোভূমির গাছগুলোর সাথে একত্রিত হয়ে গিয়েছিল তার 'মন্ট সেইন্ট ভিক্টোয়ার উইথ লার্জ পাইন' (আনু. ১৮৮৭) ভূদৃশ্যচিত্রে, যেন পুরোটাই আসলে বিভিন্ন আকার ও রঙের জোড়াতালি দেয়া একটি চাদর। সেজান প্রকৃতিকে 'সিলিন্ডার, গোলক এবং কোন বা মোচাকৃতির বস্তু' দিয়ে দেখার ইচ্ছার কথা বলেছিলেন , চিত্রকর্ম আঁকার এই নতুন ধরনের কৌশল প্রতিটি বস্তুকে একটি আবশ্যিক অংশে হ্রাস করে সরলীকরণ করেছিল। ইমপ্রেশনিজমের বলয় অতিক্রম করে যাবার যাবার জন্য এটি আরো একটি উপায় উপস্থাপন করেছিল এবং বহু শিল্পীকে এটি প্রভাবিত করেছিল, যার মধ্যে ছিলেন পাবলো পিকাসো, যিনি সেজানের শৈলীকে ব্যবহার করেছিল 'কিউবিজম' সৃষ্টি করতে, পরে অধ্যায়ে আমরা সেটি দেখবো।

তার শিল্পকলা চর্চা করতে পল গগ্যাঁও প্যারিস ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এবং তার চিত্রকর্মগুলো ইমপ্রেশনিজমের সীমানা পেরিয়ে যাবার তৃতীয় উপায়টি উপস্থাপন করেছিল, এবার প্রতীকীবাদের প্রতি পুনর্নবায়িত একটি আগ্রহের মাধ্যমে। তিনি প্রথমে শিল্পীদের গ্রীষ্মকালীন অভিপ্রয়ানের অংশ হিসেবে ব্রিটানি এসেছিলেন, ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে, পন্ট অ্যাভেনে কিছুদিন ছিলেন স্থানীয় নারী ও তাদের নানা আচারের নানা দৃশ্য এঁকেছিলেন। এখানে তিনি জাপানি ছাপচিত্র থেকে সংগৃহীত কিছু অনুপ্রেরণা ব্যবহার করেছিলেন, এবং অনুজ্জ্বল সমতল রঙ আর শক্তিশালী বহিঃরেখা ব্যবহার করে একটি শৈলী আবিষ্কার করেছিলেন, যাকে তিনি বলেছিলেন 'সিনথেটিজম'। সেই

সময়ের বহু শিল্পীর মতো, গগ্যাঁ দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকা আধুনিক পৃথিবীর থেকে তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, এবং ব্যস্ত শহর থেকে বহু দূরের বাসিন্দাদের ঐতিহ্যবাহী আর দৈনন্দিন প্রথা আর আচার ওপর মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এইসব জীবনেগুলো যাপিত হয় আরো সরলতার সাথে, প্রকৃতির সাথে যা আরো ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। তবে গগ্যাঁর জন্য ব্রিটানি শহর থেকে যথেষ্ট দূরে ছিল না।

গগ্যাঁ আরো 'আদিম' কিছু কামনা করেছিলেন, তার নিজস্ব বাস্তবতা থেকে পালাতে, এমন একটি জায়গায় তিনি যেতে চেয়েছিলেন, যেখানে সময়হীন কল্পনার জগতে তিনি আসলেই স্বাধীন হতে পারবেন এবং সেই কারণে তিনি তাহিতির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন - ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম হজেস প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় যে দ্বীপের চিত্র এঁকেছিলেন, এবং তেইশতম অধ্যায়ে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরে পলিনেশিয়ার অংশ, তাহিতি, ১৮৮০-এর দশকে একটি ফরাসী উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। এর এগারো বছর পরে গগ্যাঁ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তার দীর্ঘদিনের ভুক্তভোগী স্ত্রী মেট্টেকে - যিনি ইউরোপেই রয়ে গিয়েছিলেন - লিখেছিলেন, 'আমার কাছে মনে হয়েছে ইউরোপে যা কিছু জীবনকে সমস্যাযুক্ত করেছে সেগুলোর এখানে কোনো অস্তিত্ব নেই, এবং আগামীকাল এখানে গতকালের মতো একই, এবং এভাবে, অনন্তকাল এমনই থাকবে'।

গগ্যাঁর চিত্রকর্মে যে তাহিতিকে দেখা যায় সেটি কাল্পনিক তাহিতি। তিনি তাহিতিকে এঁকেছিলেন যেন এটি এখনো স্পর্শ করা হয়নি এমন কোনো স্বর্গ, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনের মধ্যে কিংবা সমূদ্রের বেলাভূমিতে অলস শয়নে সুন্দর, যৌনকামনা চরিতার্থ করার জন্য লভ্য তরুণী দিয়ে পূর্ণ - এমন একটি জায়গা যেখানে তিনি তার কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন এবং প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে পারেন। বাস্তবতা ছিল ভিন্ন - ফরাসী উপনিবেশ পরিণত হওয়া তাহিতি যৌনরোগের মহামারিতে আক্রান্ত এলাকায় পরিণত

হয়েছিল (যে রোগগুলো নিজেদের অজান্তেই বিস্তার করেছিল ইউরোপীয়রা), এবং এছাড়াও সেখানে ছিল প্রোটেস্টান্ট ধর্মপ্রচারকদের বাহুল্য। গগ্যাঁ মেট্টের কাছে চিঠি লেখা অব্যাহত রেখেছিলেন, যখন তিনি তেহেমানার সাথে বসবাস করছিলেন - ১৩ বছর বয়সী তাহিতির একজন বালিকা, যে তার 'ভাহিন' বা তাহিতিয়ান স্ত্রীতে পরিণত হয়েছিল। গগ্যাঁ পৌনঃপুনিকভাবে তাকে তার মডেল হিসাবে এঁকেছিলেন। অমসৃণ ক্যানভাসে প্রকৃতি, নারীর যৌনতা ও স্থানীয় আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সংমিশ্রণ করে তিনি তেহমানা ও তাহিতির নারীদের এঁকেছিরেন, যেন তিনি তার বিচিত্র ঔপনিবেশিক কল্পনা সৃষ্টি করতে পারেন। যৌনতার উদ্দেশ্যে অপ্রাপ্তবয়স্কদের ব্যবহার, জায়গা হিসেবে তাহিতির প্রতি তার ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি যা তিনি তার প্রয়োজন মতো পুনঃসৃষ্টি করে নিতে পেরেছিলেন, সেই সব কিছু আজ আমাদের কাছে তাকে একজন সমস্যাপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

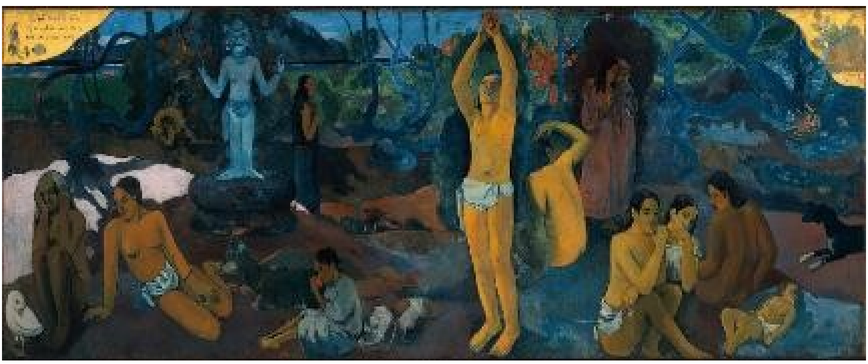

গগ্যাঁর সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী কাজ 'হোয়্যার ডু উই কাম ফ্রম? হোয়াট আর উই? হোয়্যার আর উই গোয়িং' (১৮৯৭) প্রায় ৬ মিটার প্রশস্ত, তাহিতিতে তার নির্মাণ করা স্টুডিওটির পুরোটাই যা দখল করে রেখেছিল। এই চিত্রকর্মে নারীরা মানবতার বিভিন্ন স্তরকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। কেন্দ্রীয় ফিগারটি একটি আপেল পাড়ছেন, যেন তিনি বাইবেলে স্বর্গোদ্যান ইডেনে, কিন্তু তিনি এমন একটি ভূদৃশ্যে দাড়িয়ে আছেন যা তাহিতীয় দেবতাদের দ্বারা জনাকীর্ণ। এই চিত্রকর্মটি একটি স্বপ্নের মতো, গোপনীয় বহু অর্থে পরিপূর্ণ। এটি বাস্তব কোনো দৃশ্যকে প্রতিনিধিত্ব করছে না, বরং প্রতীকী একটি দৃশ্য। প্রকৃতিবাদ থেকে শিল্পকলাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার আরেকটি উপায় ছিল প্রতীকীবাদ - যে খানে শুধু বস্তুগুলো পুনঃসৃষ্টি করাই হয় না, ধারণা আর আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সেই বস্তুগুলোর প্রতীকী ব্যবহার হয়।

যখন গগ্যাঁ তাহিতি অভিমূখে তার দুই মাস দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা শুরু করেছিলেন, তখন আমেরিকার শিল্পী হেনরি ওসাওয়া ট্যানার (১৮৫৯-১৯৩৭) গগ্যাঁর পূর্ববর্তী বিরতিস্থান পন্ট অ্যাভেনে প্রথম গ্রীষ্ম কাটানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ট্যানার প্রায় পঞ্চাশ বছর ফ্রান্সে বসবাস করেছিলেন, আমেরিকার চেয়ে যেখানকার পরিবেশ তার

কাছে কম বর্ণবৈষম্য দ্বারা প্রভাবিত মনে হয়েছিল। একজন আফ্রিকান-আমেরিকান, তিনি ফিলাডেলফিয়ায় বড় হয়েছিলেন, যেখানে তার বাবা পরবর্তীতে একটি আফ্রিকান মেথোডিস্ট এপিসকোপাল চার্চের বিশপ হয়েছিলেন। যদিও ট্যানার পেনসিলভেনিয়া অ্যাকাডেমি অব আর্টসে পড়াশুনা করেছিলেন, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন, শ্বেতাঙ্গ শিক্ষার্থীরা তাকে তাদের সমতূল্য ভাবতে পারছে না। টমাস একিন্সের কিছু প্রাথমিক সহায়তা সত্ত্বেও (যার সাথে আমাদের আগের অধ্যায়ে দেখা হয়েছে), তিনি ক্রমশ আরো বেশি বর্ণবাদী আচরণের শিকার হতে শুরু করেছিলেন আমেরিকায়। তার কিছু আগের আগে কাজ বিক্রি থেকে সংগৃহীত অর্থ সঞ্চয় করে তিনি প্যারিস অভিমূখে একমুখী যাত্রার একটি টিকিট কিনেছিলেন।

শিকাগোতে আফ্রিকা নিয়ে বিশ্ব কংগ্রেসে যোগ দিতে ১৮৯৩ সালে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ট্যানার একবার আমেরিকায় এসেছিলেন। যেখানে 'দ্য আমেরিকান নিগরো ইন আর্ট' শিরোনামে তিনি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এই ভ্রমণের সময় তিনি 'দ্য ব্যানজো লেসন ' এঁকেছিলেন, আজ যা তার সবচেয়ে সুপরিচিত কাজ। এটি একজন বৃদ্ধ কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকার ব্যক্তির সহানুভূতিশীল প্রতিকৃতি, যিনি একজন বালককে ব্যানজো বাজানো শেখাচ্ছেন। শিল্পকলার ইতিহাসে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে, এবং সত্যিকার মানুষ হিসাবে গুরুত্বের সাথে তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে ট্যানার কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের জীবনের 'জনরা' বা প্রাত্যহিক দৃশ্যগুলো এঁকেছিলেন ।

ফ্রান্সে ট্যানার বেশ সফল একটি পেশাগত জীবন কাটিয়েছিলেন, কিন্তু এক মহাদেশ দূরে ঐতিহাসিক আফ্রিকার শিল্পকলা খুবই ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। ১৮৯৭ সালে ৯ ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ সৈন্যরা নাইজার বদ্বীপে উপস্থিত হয়েছিল। তারা জাহাজ থেকে নেমেই বেনিন সিটি অভিমূখে অগ্রসর হয়েছিল (বর্তমানে যে শহরটি দক্ষিণ নাইজেরিয়ার এডো রাজ্যে অবস্থিত)। একটি ক্ষুদ্র ব্রিটিশ অশ্বারোহী অনুসন্ধানী বাহিনির কয়েক জন সৈন্যকে বেনিন শহরের প্রতিরক্ষা বাহিনি সদস্যরা হত্যা করেছিল এর এক মাস আগে, এ বং এই নতুন আক্রমণ সেই হত্যাকাণ্ডের অতিরিক্ত মাত্রার একটি প্রতিশোধ। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত (রকেট লঞ্চার, মেশিন গানসহ) ব্রিটিশ সেনাবাহিনি এডো সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল, যারা এই যুদ্ধটিকে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে বেনিন সিটি দখল করে নেয়া হয়েছিল, এবং পদ্ধতিগতভাবে এর সব ধনসম্পদ লুন্ঠন করার পর রাজকীয় প্রাসাদ কমপ্লেক্সটিকে আগুনে পুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল বহুশত বেনিন ব্রোঞ্জ – ষোড়শ অধ্যায়ে যে ঐতিহাসিক ফলকগুলো দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম।

অপসারিত ভাস্কর্যগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক কোনো তালিকা বা ক্যাটালগ তৈরি করা হয়নি, যখন সেগুলো পবিত্রস্থান কিংবা গুদামঘরের ফলক থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। বরং সেগুলোকে জড়ো করা হয়েছিল উঠানে, এবং ভাগ করা হয়েছিল ব্যবহারিক মূল্যসংক্রান্ত পশ্চিমা ধ্যানধারণার উপর ভিত্তি করে। সবচেয়ে বেশি অলংকৃত কাজগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছিল রানি ভিক্টোরিয়ার জন্য, যেমন কপারের পাত বসানো এক জোড়া আইভরি চিতাবাঘ। এই সামরিক অভিযানের ব্যয় মেটাতে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে সবচেয়ে জটিল ব্রোঞ্জের ফলকগুলোকে লন্ডনে কলোনিয়াল অফিসে নিয়ে আসা হয়েছিল।

এইসব ফলকগুলোর দুই তৃতীয়াংশ ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহে প্রবেশ করেছিল, এবং সাত মাস পরে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। যখন দর্শকরা এই ব্রোঞ্জগুলো দেখেছিলেন তারা বিস্মিত হয়েছিলেন। আফ্রিকার শিল্পকলা এতো পরিশীলত, সূক্ষ্ম আর কারিগরীভাবে অগ্রসর হতে পারে সেটি ইউরোপীয়রা কখনোই ভাবেনি। এই সময় আফ্রিকার শিল্পকলাকে আদৌ শিল্পকলা হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। 'প্রিমিটিভ' বা আদিম হিসেবে চিহ্নিত করে এগুলো জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরগুলোয় সংরক্ষণ করা হতো। যদি এই শিল্পকলার প্রশংসা করা হতো সেটি করতেন সেই ব্যক্তিরা, যারা ভাবাতেন এই কাজগুলো মানুষ আর প্রকৃতির আরো নিবিড়তম একটি সম্পর্ক প্রকাশ করছে, প্রায় শিশুসুলভ সরলতা, যা তাহিতিতে গগ্যাঁ কামনা করেছিলেন। কিন্তু বেনিন ব্রোঞ্জগুলো একটি বিষয় সুস্পষ্ট করেছিল, পশ্চিমা শিল্পকলা থেকে স্বতন্ত্র, আফ্রিকায় উচ্চ মানের শৈল্পিক দক্ষতা আর নান্দনিকতা বিকশিত হয়েছে। প্রমাণ হয়েছিল যে আফ্রিকারও নিজস্ব শিল্পকলার ইতিহাস আছে। বেনিন ব্রোঞ্জগুলো ছিল এই মহাদেশের মাস্টারপিস, এবং ব্রিটিশরা যা বিবেকের দংশন অনুভব করা ছাড়াই চুরি করেছিল।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে)

(১) Vincent van Gogh, The Night Café
(২) Vincent van Gogh, Letter 10/23/1883
(৩) Vincent van Gogh, Self-Portrait with Bandaged Ear
(৪) Vincent van Gogh, Wheatfield with Crows
(৫) Edvard Munch, The Scream,
(৬) Paul Cézanne, Mont Sainte-Victoire with Large Pine
(৭) Paul Cézanne, The Card Players
(৮) Paul Gauguin, Tahitian Women on the Beach,
(৯) Paul Gauguin, Where Do We Come From?
(১০) Henry Ossawa Tanner, The Thankful Poor
(১১) Henry Ossawa Tanner, The Banjo Lesson
(১২) Henry Ossawa Tanner, The Banjo Lesson
(১৩) Benin Bronzes on display at the British Museum

অধ্যায় ৩০ - খ্যাতিমানদের কাধে দাড়িয়ে

১৯০৩ সাল, জার্মানীর বার্লিন, ক্যাথে কোলভিৎস ড্রেসডেন প্রিন্ট রুমের পরিচালক ম্যাক্স লেয়ার্সের প্রবন্ধসহ তার ছাপচিত্র নিয়ে সদ্য প্রকাশিত ক্যাটালগটি দেখছিলেন। ছাপচিত্র জার্মানীতে খুবই জনপ্রিয় একটি মাধ্যম এবং কোলভিৎস এই মাধ্যমের অন্যতম সেরা একজন শিল্পী। তার ছাপচিত্রগুলো বার্লিন, প্যারিস এবং লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে তার কাজ ক্রয় করতে সংগ্রাহক এবং জাদুঘরগুলো পরস্পরে প্রতিযোগিতা করতো।

কোলভিৎসের শক্তিশালী ছাপচিত্রগুলো মূলত জীবনের দুর্ভোগ আর কষ্টকর পরিস্থিতিগুলোরই বার্তা বহন করে - কৃষকরা শস্যক্ষেতে পরিশ্রম করছে, অভুক্ত দিন কাটাচ্ছে, বাড়িতে অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাদের সন্তানদের মৃত্যু দেখছে। স্বামী ডাক্তার হবার কারণে এই মানুষগুলোর কাছাকাছি তিনি আসতে পেরেছিলেন - ভিসেনবারগারস্ট্রাসে (আজ যে রাস্তাটির নাম কোলভিৎসস্ট্রাসে) তাদের বাড়ির নীচতলায় তার সার্জারিতে তিনি দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিতেন। কোলভিৎসের প্রিন্টগুলো সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি নয়, বরং এটি একটি গোষ্ঠীর সমষ্টীগত দুর্দশা আর দুঃখের একটি চিত্র। চেহারাগুলো প্রায়শই অদৃশ্য কারণ দুঃখভারাক্রান্ত এই মুখগুলো প্রায়শই আবৃত হয়ে থাকে হাতে। ম্যাক্স লেয়ার্স বলেছিলেন অভিব্যক্তি প্রকাশে তার ক্ষমতা আর দক্ষতার অপ্রতিদ্বন্দী শক্তির মাধ্যমে তিনি বিশ্বজনীন দুঃখকে ধারণ করতে পেরেছিলেন।

কোলভিৎস তার হাত থেকে ক্যাটালগটি নামিয়ে রেখে তার সাম্প্রতিক এচিং নিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন, ‘উওম্যান উইথ এ ডেড চাইল্ড’। প্রায়শই তিনি তার কাজগুলো ধারাবাহিক হিসেবে প্রকাশ করতেন কিন্তু এই চিত্রটি একক ও স্বতন্ত্র। ছাপচিত্রের অধিকাংশ অংশই পূর্ণ করেছে একজন নারী, তার নগ্ন পাগুলো আড়াআড়ি বিন্যস্ত, তার কাধ সামনের দিকে ঝুকে আছে। নারীটি একটি শিশুকে দুই হাতে আলিঙ্গন করে আছেন, যার মাথাটি পেছন দিকে ঝুলে আছে এবং শরীরটি বাঁকা হয়ে আছে নারীটির শেষ আলিঙ্গনে। তার দুঃখ আমাদের কাছে অসীম অনুভূত হয়। কোলভিৎস তার সাত বছরের ছেলে পিটার এবং নিজেকে এই প্রিন্টের মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু এই স্পর্শযোগ্য হয়ে ওঠা বেদনা এসেছে শৈশবে তার ছোট ভাই বেনইয়ামিনের

মৃত্যুর অভিজ্ঞতা থেকে।

*

ক্যাথে কোলভিৎস (১৮৬৭-১৯৪৫) ছিলেন প্রথম নারী যাকে বার্লিনের অ্যাকাডেমি অব আর্টস-এর সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রেট বার্লিন শিল্পকলা প্রদর্শনীতে তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ 'এ উইভারস রিভোল্ট' ছাপচিত্র-ধারাবাহিকটির জন্য বিচারকরা তাকে স্বর্ণপদক পুরষ্কার দিতে চেয়েছিলেন – তবে সম্রাট দ্বিতীয় ভিলহেল্ম তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের বলছি, ভদ্রমহোদয়গন, একজন নারী স্বর্ণপদক পাবে, এটি খুব বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে'। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তখনো নারী শিল্পীদের জন্য পরিস্থিতি বেশ সংকটপূর্ণ ছিল। জার্মান একটি পত্রিকার সম্পাদক হান্স রোজেনহাগেন নারী শিল্পীদের সৃষ্ট সবধরনের শিল্পকর্মেরই সমালোচনা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন নারীদের সৃষ্ট শিল্পকর্মে 'শক্তিশালী অভিব্যক্তি, উদ্ভাবনের মৌলিকত্ব এবং অনুভূতির গভীরতা অনুপস্থিত', কিন্তু স্পষ্টত এই সব বৈশিষ্ট্য প্রবলতম শক্তি নিয়ে উপস্থিত ছিল কোলভিৎসের সব কাজে। তার নিঃশেষিত ক্লান্ত শ্রমিক, শোকার্ত মায়েদের ছাপচিত্রগুলোর দিকে একবার তাকালেই আমরা অনুধাবন করতে পারি, তিনি তার প্রজন্মে সবচেয়ে অভিব্যক্তিময় শিল্পীদের একজন ছিলেন। সামাজিক অসাম্যতা নিয়ে তার প্রবল ক্ষমতাপূর্ণ চিত্রগুলো তিনি ঐতিহাসিক বিবরণ এবং সমসাময়িক উদাহরণ

ব্যবহার করেই সৃষ্টি করেছিলেন। আর সেখানে এডভার্ড মুঙ্কের কাজের মতো সমপরিমানে আবেগ আর অভিব্যক্তির উপস্থিতি আছে।

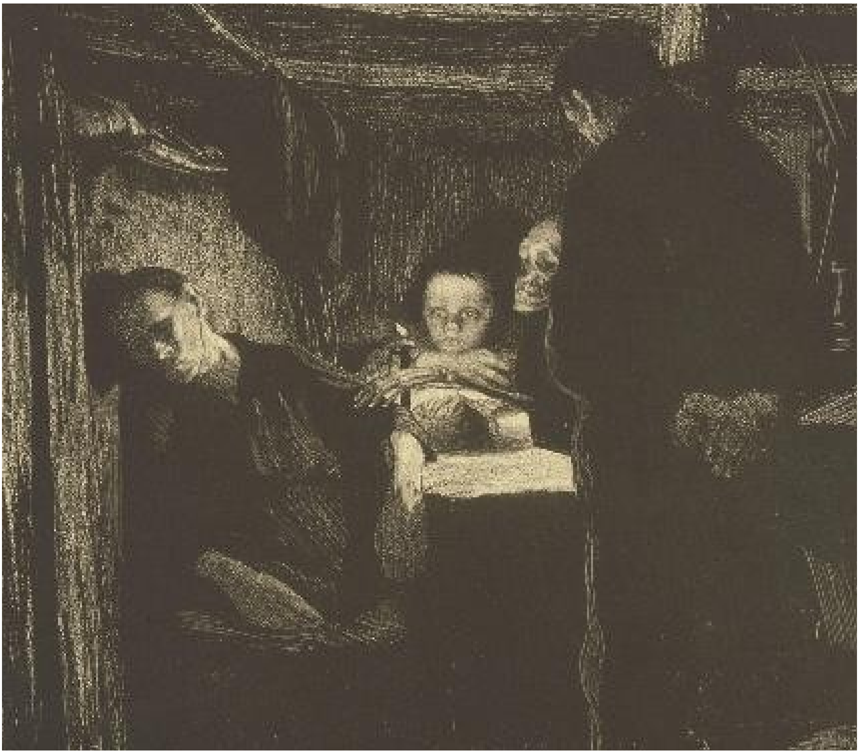

জার্মান শিল্পীরা তাদের অভ্যন্তরীণ মানসিক অবস্থাকে প্রকাশ করা অব্যাহত রেখেছিলেন , এবং এর সাথে যুক্ত করেছিলেন একটি সাহসী অমসৃণ শৈলী, যা জার্মান এক্সপ্রেশনিজম বা অভিব্যক্তিবাদের সূচনা করেছিল। ড্রেসডেন আর মিউনিখে শিল্পীরা একত্রিত হয়েছিলেন এবং তাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য বা ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে তারা তাদের বিশ্বাসগুলো উপস্থাপন করেছিলেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে আর্নস্ট লুডভিগ কার্চনারসহ (১৮৮০-১৯৩৮) শিল্পকলার চার শিক্ষার্থী 'ডাই ব্রুকে' (দ্য ব্রিজ বা সেতু) গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। ডাই ব্রুকের ম্যানিফেস্টো দাবি করেছিল: 'আমরা তরুণরা ভবিষ্যত বহন করি এবং বহু দীর্ঘ দিন ধরে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন শক্তির বিরুদ্ধে আমরা আমদের জন্য জীবন ও কাজ করার স্বাধীনতা সৃষ্টি করতে চাই'। কার্চনার নিঃসঙ্গ মানুষসহ ব্যস্ত রাস্তার দৃশ্য এঁকেছিলেন চটকদার রং এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে ধারালো কৌণিক রেখা ব্যবহার করে, যে চিত্রকর্মগুলো এর তীব্র ধারালো শক্তি দিয়ে আপনার চোখের ওপর সরাসরি আক্রমণ করে।

১৯১১ সালে আরেক দল শিল্পী ‘ডের ব্লো রেইটার’ (দ্য ব্লু রাইডার) শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ভাসিলি কানডিনস্কি (১৮৬৬-১৯৪৪), গাব্রিয়েল মুনটার (১৮৭৭-১৯৬২) এবং ফ্রান্জ মার্ক (১৮৮০-১৯১৬) এবং শিল্পকলা কী হতে পারে সেই ধারণাটিকে তারা আরো সম্প্রসারিত করেছিলেন কাচের ওপর সৃষ্ট চিত্রকর্ম, রুশ লোকায়ত এবং শিশুদের শিল্পকলাকে অন্তর্ভুক্ত করে। নিজেদেরকে প্রতিনিধিত্বমূলক বিদ্যায়তনিক শিল্পকলা থেকে যত দূর সম্ভব তত দূরে নিয়ে যাবার জন্য তারা এই বিচিত্র অনুপ্রেরণাগুলো ব্যবহার করেছিলেন। জাপানি ছাপচিত্রের প্রতি ভ্যান গোর মুগ্ধতার মতো এইসব শিল্পীরা প্রথাগত বিদ্যায়তনিক উপায়ে কোনো কিছু দেখার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যতিক্রম কিছু অনুসন্ধান করেছিলেন, এবং বিংশ শতাব্দী শিল্পকলা কী হতে পারে, এবং কী হওয়া উচিত সেই সীমানাটিকে আরো বহু দূরে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন।

জার্মানী এবং পার্শ্ববর্তী অষ্ট্রিয়ায় শিল্পীরা অন্য ইউরোপীয় শৈল্পিক প্রবণতাগুলোর প্রতিও প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেছিলেন। ফ্রান্সে পন্ট অ্যাভেনের মতো উত্তর জার্মানীর ওয়ার্পসুইডে শিল্পীদের একটি যৌথ সমাজ গড়ে উঠেছিল। ওয়ার্পসুইডের শিল্পীরা বাহ্যিক দৃশ্যাবলি এঁকেছিলেন এবং গ্রামীন জীবনের ধীর গতিময়তাকে আত্মীকৃত করে নিয়েছিলেন। বাইশ বছর বয়সে শিল্পী পাউলা মোডেরশন-বেকার (১৮৭৬-১৯০৭) সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত গগ্যাঁর রেস্ট্রোস্পেকটিভ (যে প্রদর্শনী শিল্পীর পুরো পেশাগত জীবনের চিত্রকর্ম স্থান পায়) প্রদর্শনী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও ভারী বহিঃরেখাসহ ঘন বিশালাকার নারীদের চিত্র এ্ঁকেছিলেন গগ্যাঁর মতো উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করে। তবে তিনি গগ্যাঁর চেয়ে আরো বেশি আবেগময় গভীরতা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, তার লক্ষ্য ছিল তার কাজে যেন ভ্যান গো অভিব্যক্তিময়তা প্রকাশ পায়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আঁকা তার ‘মাদার অ্যান্ড চাইল্ড লাইয়িং

নুড' চিত্রকর্মে আমরা একজন নারীকে তার পাশ ফিরে শুয়ে থাকতে দেখি, একটি ঘুমন্ত শিশু তার শরীর ঘেষে শুয়ে আছে। আমরা ঘুমন্ত মায়ের স্তন আর যৌনকেশ দেখতে পাই কিন্তু এই নগ্নতায় যৌনানুভূতি সৃষ্টি করার কোনো উপাদান নেই, যা গগ্যাঁর কাজের ব্যতিক্রম। এটি মায়ের ভালোবাসা, উর্বরতা, নির্ভরশীলতা আর শক্তিময় দৃঢ়তার একটি চিত্রকর্ম। ওয়ার্পসুইড শিল্পীরা অজ্ঞাতনামা যান্ত্রিক শহর জীবনের বিকল্প হিসেবে 'পৃথিবী মা' ধারণাটির উপর গুরত্ব দিয়েছিলেন। দুঃখজনকভাবে মোডেরশন-বেকারের জন্য মাতৃত্বের বাস্তব অভিজ্ঞতাটি বেশ ভিন্ন ছিল, এবং তিনি প্রসব করার কয়েকদিনের মধ্যেই মারা গিয়েছিলেন।

জার্মানী এবং অষ্ট্রিয়ান শহরগুলোয় যেভাবে শিল্পীরা বিদ্যায়তনিক শিল্পকলা শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, ইউরোপের বহু দেশেই শিল্পীরা তার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। সেসেশন (বিচ্ছিন্নতাবাদী) নামে তারা বিকল্প কিছু প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছিলেন, যেখানে তারা নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ চিত্রকর্ম প্রদর্শন করতে পারতেন, যা অনুপ্রাণিত করেছিল গগ্যাঁ, ভ্যান গো আর সেজান। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের আগে ইমপ্রেশনিস্ট এবং পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্টদের কাজ জার্মানী প্রদর্শিত হয়নি। সেই কারণে শ িল্পীদের প্যারিসে যেতে হতো এই সব উত্তেজনাপূর্ণ নতুন ধরনের শিল্পকর্মগুলো উপভোগ করতে। যেভাবে এর আগের শতাব্দীগুলোয় শিল্পীরা রোম ভ্রমণে আসতেন, কারণ সময়ের এই পর্বে প্যারিস ইউরোপের শিল্পকলা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

প্যারিসে শৈল্পিক বিল্পব ও উদ্দীপনা নবব্যধ্রুপদীবাদ থেকে সরে এসে আরো অভিব্যক্তিময় হয়ে উঠতে ভাস্করদেরও অনুপ্রাণিত করেছিল। প্যারিসে কর্মরত ষাট বছর বয়সী ভাস্কর অগুস্ত রদ্যাঁ (১৮৪০-১৯১৭) ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের বিশ্বমেলায় তার কাজ প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি নিজেই এই প্রদর্শনী আয়োজন করেছিলেন এবং এই প্রদর্শনীতে পালিশ করা মার্বেল ফিগার ছিল, এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল এটি যেন শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে নিজেকে জীবন্ত করে তুলেছে। এমনই ছিল তার 'দ্য কিস', ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে যে ভাস্কর্যটির কাজ তিনি সমাপ্ত করেছিলেন।

তিনি আরো কিছু পরীক্ষামূলক ভাস্কর্যও প্রদর্শন করেছিলেন। রদ্যাঁ তার হাত দিয়ে ভেজা প্লাস্টার ও কাদা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কীভাবে ভাস্কর্যটি তৈরি করা হয়েছে তার চিহ্ন এর উপরিতলে রেখে যেতে ভালোবাসতেন। তার 'মনুমেন্ট টু বালজাক' ভাস্কর্যে (১৮৯২-৭) তিনি ফরাসী ঔপন্যাসিক অনোরে দ্য বালজাককে তার কাধের ওপর দিয়ে বিস্তৃত ক্লোক বা আচ্ছাদনের মতো বিশালকার একটি ড্রেসিং গাউন দিয়ে আবৃত করেছিলেন। এই ভাস্কর্যটি এখন ব্রোঞ্জে ঢালাই করা হয়েছে এবং প্যারিসের বুলেভার্ড দ্যু মন্টপারনাসে এটি স্থাপন করা হয়েছে (এরই আরেকটি ব্রোঞ্জ ঢালাই আমরা দেখতে পাই রদ্যাঁ শিল্পকর্ম নিয়ে নির্মিত মিউজিয়াম - ম্যুজে রদ্যাঁর বাগানে)। কিন্তু সেই সময়ে শুধু পূর্ণাঙ্গ আকারের প্লাস্টার সংস্করণটি প্রদর্শিত হয়েছিল। এই প্লাস্টার সংস্করণটি বেশ সমালোচনার সৃষ্টি করেছিল, সমালোচকরা এটিকে দেখেছিলেন অসমাপ্ত, অগঠিত একটি শরীর হিসাবে, যা একটি অমসৃণ ড্রেসিং গাউনের নীচে প্রায় অদৃশ্য। রদ্যাঁ বলেছিলেন শারীরিক সাদৃশ্যতা সৃষ্টি করার বদলে তিনি শিল্পীর প্রাণশক্তি, তার সুবিশাল সৃজনশীলতাকে পুনঃসৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। আজ 'মনুমেন্ট টু বালজাক' আমাদের কাছে এত বেশি শক্তিশালী আর প্রভাবশালী অনুভূত হয় যে, আমাদের জন্য কল্পনা করা কঠিন হয়ে পড়ে, কেন মানুষ এটিকে সেই সময় এভাবে অনুভব করতে ব্যর্থ হয়েছিল। আজ এটিকে প্রথম আধুনিক ভাস্কর্য হিসেবে দেখা হয়। প্রথমবারের মতো কোনো পশ্চিমা ভাস্কর উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে শারীরিকভাবে সদৃশ কোনো রূপ সৃষ্টি করা থেকে ভিন্ন পথে সরে গিয়েছিলেন।

অন্য শিল্পীরাও রদ্যাঁর ভাস্কর্য সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে সাহস সঞ্চয় করেছিলেন, ক ামিল ক্লডেল (১৮৬৪-১৯৪৩) তার স্টুডিওতে কাজ করেছিলেন এবং তিনি নিজের ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছিলেন যা শারীরিক অনুপুঙ্খের সাথে আরো বেশি অভিব্যক্তি ও মুক্তভাবে প্রবাহমান অংশ যুক্ত করেছিলেন, যেভাবে আমরা দেখি তার ১৮৯৫ সালে সৃষ্টি করা 'দ্য ওয়ালজ' ভাস্কর্যে। রদ্যাঁ নারী ভাস্করদের সহায়তা করেছিলেন এবং আফ্রিকান আমেরিকান ভাস্কর মেটা ভক্স ওয়ারিক ফুলারকে (১৮৭৭-১৯৬৯) তিনি সহায়তা

করেছিলেন, আমেরিকায় ফিরে আসার আগে যিনি প্যারিসে কাজ করেছিলেন। ফুলার আফ্রিকান-আমেরিকানদের ওপর অন্যায় আর অবিচারকে তার কাজের মূলভাবনা হিসেবে গ্রহন করেছিলেন এবং হেনরি ওসাওয়া ট্যানারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন (য ার সম্বন্ধে আমরা আগের অধ্যায়ে জেনেছি)।

রদ্যাঁর স্টুডিওতে বহু শিল্পীই এসেছিলেন, যেমন অঁরি মাতিস (১৮৬৯-১৯৫৪), মাতিস একই সাথে ভাস্কর এবং চিত্রশিল্পী ছিলেন। তিনি খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন শিল্পীদের একটি গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে যারা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে একত্রে একটি প্রদর্শনী করেছিলেন। খুব শীঘ্রই তাদের একটি নামে ডাকা শুরু হয়েছিল - 'ফভস' বা বন্য প্রাণী, আর এই নামটি দিয়েছিলেন একজন বিচলিত সমালোচক।'দ্য উওমেন উইথ দ্য হ্যাট' চিত্রকর্মে মাতিস তার স্ত্রী আমেলিকে নাকের বদলে একটি সবুজ দাগ দিয়েছিলেন! সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাহক গারট্রুড স্টাইন এটি এবং মাতিসের আঁকা অন্য কাজগুলো কিনেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যদিও আসলেই তিনি একটি বেশ গাঢ় একটি সবুজ রঙের দাগ ব্যবহার করেছিলেন তার স্ত্রীর নাক অনুসরণ করে, কিন্তু তিনি এটি করেছিলেন শুধুমাত্র ছায়ার ধারণাটি প্রকাশ করতেই নয়, এছাড়াও লাল উপরের ঠোঁটটির সাথে একটি পার্থক্য সৃষ্টি করতে। আর এটাই লাল আর সবুজ, দুটি পরিপূরক রঙ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

তার দীর্ঘ পেশাগত জীবনে মাতিস রংকে অগ্রাধিকার দেয়া অব্যাহত রেখেছিলেন, তার শুরুর দিকের প্রতিকৃতিগুলো থেকে পরবর্তীতে তার কোলাজগুলোর অভ্যন্তরীণ পরিসরেও, যা তিনি তৈরি করেছিলেন উজ্জ্বল রঙের কাগজের আকৃতি কেটে।

তার সমসাময়িক তরুণ স্প্যানিয়ার্ড পাবলো পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩), যিনি ১৯০৪ থেকে স্থায়ীভাবে প্যারিসে বসবাস করছিলেন, তিনিও রং অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করা শুরু করেছিলেন এবং সেই প্রারম্ভিক ধারাবাহিকগুলো তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, যা আজ

আমাদের কাছে পরিচিত তার রোজ এবং ব্লু পিরিয়ড নামে। কিন্তু ক্রমশ পিকাসোর পরীক্ষামূলক ক্যানভাসগুলো হাতে টেনে আঁকা রেখার উপর নির্ভরশীল এবং অপশ্চিমা ভাস্কর্যসহ নতুন ধরনের শিল্পকলার রূপগুলো দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেছিল।

মাতিসই প্রথম পিকাসোকে আফ্রিকার শিল্পকলার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। পিকাসো একদিন গারট্রুড স্টাইনের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, যখন মাতিস সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন তার হাতে কঙ্গো থেকে আসা কাঠের 'ভিলি' ফিগারের ক্ষুদ্র একটি ভাস্কর্য হাতে নিয়ে, যার খানিকটা ওপরদিকে ফেরানো মুখোশ সদৃশ একটি মুখ ছিল। মাতিস কিছুক্ষণ আগেই দুর্লভ ও বিচিত্র সামগ্রীর একটি দোকান থেকে সেটি কিনেছিলেন। (লোয়াঙ্গো উপকূলে ভিলি কংগো জাতিগোষ্ঠীর বাস, ঐতিহাসিকভাবে তারা পরিচিত ছিল বণিক এবং ভাস্কর হিসেবে, স্থানীয়ভাবে সুপরিচিত ছিল তাদের আইভরি খোদাই আর শক্তিশালী মিনকিসি বা ক্ষমতাবান ফিগার সৃষ্টি করতে)। আগ্রহী পিকাসো প্যারিসের ট্রোকাডেরোয় মানব নৃতত্ত্ব অধ্যয়নে নিবেদিত নৃতাত্ত্বিক জাদুঘরে তাৎক্ষণিকভাবেই অপশ্চিমা শিল্পকর্মের আরো বহু উদাহরণ খুঁজে বের করেছিলেন। অধিকাংশ অপশ্চিমা ভাস্কর্য আর মুখোশ যা পিকাসো এবং মাতিস প্যারিসে দেখেছিলেন, সেগুলো প্যারিসে প্রেরণ করা হয়েছিল পশ্চিম আর বিষুবীয় আফ্রিকা, গ্যাবন, মালি, কঙ্গো এবং আইভরি কোস্টে প্রতিষ্ঠিত ফ্রান্সের নতুন উপনিবেশগুলো থেকে। শিল্পকলা নয়, এগুলোকে মানবনির্মিত বস্তু বা প্রত্নবস্তু হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছিল। মাতিম আর

পিকাসোর কাজের ওপর এইসব ভাস্কর্য আর মুখোশের প্রভাব অতিরঞ্জিত করে বলা সম্ভব নয়। 'ভ্যান গো'র ছিল জাপানি প্রিন্ট', পিকাসো বলেছিলেন, 'কিন্তু আমাদের ছিল আফ্রিকা'। আফ্রিকার শিল্পকলার (এছাড়া ওসিয়ানিক ও আইবেরিয়ান শিল্পকলা) যে বিষয়টি তাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল বেশি সেটি ছিল মূলত স্থানিক ও আকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে এগুলোর খুবই ব্যতিক্রমী ধারণা। শরীরের ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছিল অবাস্তব আকৃতি ব্যবহার করে - চোখের বদলে সিলিন্ডার বা নলাকৃতির কোনো কিছু, আর মুখের বদলে কিউব বা ঘনক। রক্ষণশীল কোনো অনুকরণ নয়, আফ্রিকার শিল্পকলা এর বিষয়বস্তুর মূল সারটি শুধু প্রকাশ করেছিল।

মাতিস ও পিকাসো অপশ্চিমা শিল্পকলার আনুষ্ঠানিক আকারগুলো অধ্যয়ন করেছিলেন এর মূল সাংস্কৃতিক মূল্যগুলো সম্বন্ধে সামান্য বিবেচনাসহ। এই নতুন ঔপনিবেশিক জাদুঘরগুলোয় কোনো ইঙ্গিত ছিল না যে এগুলো রাজা নাকি রানি, কিংবা দেবতা বা শামান। তারা জানতেন না কোনো একটি বিশেষ গ্রেবো মুখোশ যেমন, বনের দেবতার শক্তিকে জাগ্রত করতে পারে কিনা (পিকাসো নিজে পরে আইভরি কোস্টের একটি গ্রেবো মুখোশ সংগ্রহ করেছিলেন, এবং স্টুডিওতে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন)। প্রতিটি মুখোশ আর ভাস্কর্যকে এর মূল প্রাসঙ্গিকতা ও সময় থেকে শিকড়চ্যুত করা হয়েছিল এবং পশ্চিমে উপস্থাপন করা হয়েছিল তারিখহীন আফ্রিকার কৌতুহলোদ্দীপক প্রত্নবস্তু হিসেবে।

পিকাসো পর্যবেক্ষণ করেছিলেন কীভাবে সেজান তার উপাদানগুলোকে ক্যানভাসের ওপর রঙের সমতল ক্ষুদ্র এলাকায় সরলীকরণ করেছিলেন, এবং এখন তিনি এটিকে অপশ্চিম শিল্পকলা নিয়ে তার ভাবনাগুলোর সাথে সংমিশ্রণ করেছিলেন। তিনি কোনো বিশেষ মুখোশ আর ভাস্কর্য সরাসরি অনুকরণ করেননি, কিন্তু তিনি উপলব্ধি

করেছিলেন, সমষ্টীগতভাবে এই মুখোশগুলো তাকে পৃথিবীকে নতুন ভাবে দেখার সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি উপায় প্রদর্শন করেছে। তিনি পরীক্ষা করতে শুরু করেছিলেন - কীভাবে শরীরকে রেখা আর আকারের একটি বিন্যাসে রূপান্তরিত করা যায়, তারপরও যা অনুধাবন করা যেতে পারে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তার এই ভাবনাগুলো পরিণতি পেয়েছিল একটি বিস্ফোরক চিত্রকর্মে ‘লে ডেমোয়াজেল ডা’ভিনিয়ঁ’ (আভিনিয়ঁ সড়কের তরুণীরা)। এই চিত্রকর্মে পাঁচজন নারীকে আমরা বার্সেলোনার আভিনিয়ঁ সড়কের ওপরে একটি কক্ষে দাড়িয়ে থাকতে দেখি, এবং তারা বাইরে, আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন তারা একটি মঞ্চে অথবা জানালায় দাড়িয়ে নিজেদের প্রদর্শন করছেন। এরা সবাই নগ্ন যৌনকর্মী, শরীর প্রদর্শন করার দেহভঙ্গিমা নিয়ে দাড়িয়ে আছেন, কিন্তু তাদের বড় চোখগুলোর দৃষ্টি প্রাণহীন - যেখানে কোনো আবেগের প্রকাশ নেই। তাদের দুজনের অসম্ভাব্য দীর্ঘ অবতল নাক আছে এবং তাদের মুখগুলো গ্যাবোনের মুখোশগুলোর মতো, পিকাসো যেগুলো ট্রোকাডেরোতে দেখেছিলেন।

'লে ডেমোয়াজেল ডা'ভিনিয়ঁ' চিত্রকর্মটি পিকাসোর স্টুডিওতে প্রায় এক দশক অবধি গোপন অবস্থায় ছিল। সমালোচক এবং শিল্পী, পিকাসোর স্টুডিওতে যারাই এটি দেখেছিলেন, তারা সবাই অনুভব করেছিলেন, শিল্পকলায় এটি অতি আকস্মিক আর আক্রমণাত্মক একটি বিদারণ। যখন জর্জ ব্রাক এটি দেখেছিলেন, তিনি বলেছিলেন এটি দেখে মনে হয়ে পিকাসো 'তারপেন্টাইন পান করে তার মুখ দিয়ে আগুন নির্গত করেছিলেন'। যদিও বিবেচনা করা হয়েছিল যে এই চিত্রকর্মটি উন্মুক্তভাবে প্রদর্শন করলে বেশ সংক্ষোভের কারণ হতে পারে, কিন্তু ব্রাক এবং পিকাসো আরো বহু চিত্রকর্ম সৃষ্টির অনুপ্রেরণা হিসেবে এটির শক্তি ব্যবহার করেছিলেন, এবং 'একই দড়িতে বাধা পর্বতারোহীদের' মতো পাশাপাশি একত্রে কাজ করে তারা তাদের শিল্পকলাকে এর জ্ঞাত সীমানা পেরিয়ে অনেক দূর অবধি টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের সেই অনুপ্রেরণা

যে শিল্পকলা আন্দোলন শুরু করেছিল সেটির পরিণতি হচ্ছে ‘কিউবিজম’ - চিত্রকর্ম সৃষ্টি করার একটি শৈলী, যা শরীর ও বস্তুকে নানা সমতলে অগ্রথিত করে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত একগুচ্ছে কৌণিক সমতল ব্যবহার করে সেগুলোকে পুনর্নির্মাণ করে। ১৯১০ সাল নাগাদ তাদের ক্যানভাসে চিত্রকর্মের বিষয়বস্তুর শুধু ইঙ্গিত অবশিষ্ট ছিল, যেমন, একটি গোফ এবং একজোড়া পরস্পরাবদ্ধ হাত, যা আমরা দেখি পিকাসোর আঁকা শিল্পকলা-ব্যবসায়ী ডানিয়েল-অঁরি কানভাইলারের প্রতিকৃতিতে, অথবা ব্রাকের ‘ভায়োলিন অ্যান্ড পিচার’ চিত্রকর্মে বেহালা আর জগের হাতলের কুণ্ডলীতে। ক্যানভাসে বাকি অংশে ছিল অধিক্রমণ করা ধূসর আর বাদামী রঙের নানা আকৃতির অমসৃণ সমতল। ক্যানভাসে অবশিষ্ট থাকা ক্ষুদ্র ইঙ্গিত থেকেই কেবল সেখানে আসলেই কী আঁকা হতে পারে সেটি আপনি পুনর্নির্মাণ করার আশা করতে পারেন।

কিউবিস্ট শিল্পীরা বিশেষভাবে বিস্মিত হয়েছিলেন জেনে কীভাবে কোনো একটি ঘনক বিষয়ে আমাদের উপলব্ধিগুলো মূলত নির্মিত হয় স্মৃতি থেকে। যখন আমরা কোনো একটি মুখকে এক পাশ থেকে দেখি, এবং একটি চোখ দেখি, আমরা জানি আরো একটি চোখ সেখানে আছে আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। কারণ আমরা মুখগুলো আগেই দেখেছি। কিউবিস্টরা আমরা আসলে যেভাবে দেখি, তার আরো নিকটে আসতে চেয়েছিলেন, কীভাবে সময়ের সাথে সংগৃহীত আংশিক অসমাপ্ত দৃশ্যগুলো থেকে কোনো একটি বস্তুর দৃশ্য নির্মাণ করি। তাদের কাজে, জ্ঞাত কোনো বস্তুকে আঁকার পরিবর্তে তারা ক্ষুদ্র ইঙ্গিত অথবা চিহ্ন এঁকেছিলেন, যেগুলো ব্যবহার করে আমরা সেই বস্তুটিকে আমাদের মনে তৈরি করে নিতে পারি। পরের অধ্যায়ে আমরা দেখবো কীভাবে ভাস্কররা এই কিউবিস্ট কৌশল এবং পশ্চিমের বাইরে সৃষ্ট শিল্পকলা থেকে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন, যখন তারা তাদের ক্ষেত্রটিকেও উত্তেজনাপূর্ণ নতুন দিক বরাবর পরিচালিত করেছিলেন।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে)

(১) Käthe Kollwitz, Woman with Dead Child
(২) Käthe Kollwitz, Death, A Weavers' Revolt
(৩) Ernst Ludwig Kirchner, Street, Berlin
(৪) Paula Modersohn Becker, Reclining Mother And Child
(৫) Auguste Rodin, The Kiss
(৬) Auguste Rodin, Monument to Balzac
(৭) Camille Claudel, The Waltz or The Waltzers
(৮) Meta Vaux Warrick Fuller,Emancipation
(৯) Henry Matisse, Woman with a Hat
(১০) Vili figure (Republic of Congo) once owned by artist Henri Matisse
(১১) Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon,
(১২) Pablo Picasso, Portrait of Daniel-Henry Kahnweiler
(১৩) Georges Braque, Violin and Pitcher comes

অধ্যায় ৩১ - নিয়মের বই ছিড়ে ফেলা

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ, মেঘলা একটি দিন, তরুণ ফরাসী ভাস্কর অঁরি গাউডিয়ের-ব্রেস্কা এবং আমেরিকান কবি এজরা পাউন্ড লন্ডনে জ্যাকব এপস্টাইনের স্টুডিওতে প্রবেশ করলেন , তারা এপস্টাইনের নতুন ভাস্কর্য 'রক ড্রিল' দেখতে এসেছেন।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাছেই এপস্টাইনের স্টুডিও একসময় একটি গ্যারেজ হিসেবে ব্যবহৃত হতো, এবং এটি স্যাঁতসেতে এবং শীতল। এপস্টাইন একটি বিশাল কাঠামোর পাশে খানিকটা বিষাদ আর হতাশা নিয়ে দাড়িয়ে ছিলেন। এই দুই জন তার স্টুডিওতে প্রবেশ করতে তিনি এক টানে তার নতুন ভাস্কর্যটিকে ঢেকে রাখা ত্রিপলের আবরণটি সরিয়ে দিলেন। এবং অবশেষে এটি উন্মুক্ত হয়েছিল, প্রায় তিন মিটার উঁচু, একটি সাদা বর্মে আবৃত ফিগার, যা এটি কালো ড্রিলিং মেশিনের ওপর দুই পাশে পা দিয়ে দাড়িয়ে আছে। ফিগারটি এই পাথর ভাঙ্গার রক ড্রিলের উপর সওয়ার হয়ে আছে যেন এটি ঘোড়া, যন্ত্রের সাথে একীভূত, এটির নিয়ন্ত্রক। এর বুকের মধ্যে আশ্রিত একটি ভ্রূণ, যেন এটি একটি নতুন প্রজাতির সংকর জীবের জন্ম দেবে, আংশিক মানুষ এবং আংশিক যন্ত্র। এটি নির্মিত হয়েছিল সাদা প্লাস্টারে কিন্তু এখানে কোনো মানব নির্মাতার চিহ্ন ছিল না, কোনো শিল্পীর হাতের ছাপ অথবা অসমাপ্ত কোনো অংশ। এই দানবীয় প্রাণীটি শুধুমাত্র যন্ত্র, এর ঘাড় আর মাথা বর্ম দিয়ে আবৃত, এর আঙ্গুলগুলো দৃঢ়ভাবে ড্রিলের নিয়ন্ত্রণ ধারণ করে আছে, যেন এটি কোনো যান্ত্রিক বন্দুক। এটি একটি ভিনগ্রহবাসী চরিত্র , ড্রিলের তিনটি পায়ের উপর তার ভারসাম্য রক্ষা করছে, মাটি, প্রকৃতি এবং জীবনকে নিশ্চিহ্ন করতে সে প্রস্তুত।

পাউন্ড এটি নিয়ে উৎসাহের সাথে কথা বলতে শুরু করেছিলেন কিন্তু গাউডিয়ের-ব্রেস্কা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি কিছুই বুঝতে পারোনি'। এপস্টাইন এরপর গাউডিয়ের-এর দিকে তাকিয়েছিলেন, একজন ভাস্করের মুখোমুখি আরেকজন ভাস্কর, এবং গাউডিয়ের জানতেন এই ভাস্কর্যটি সবকিছুই বদলে দেবে।

*

জ্যাকোব এপস্টাইন (১৮৮০-১৯৫৯) নিউ ইয়র্কে জন্মগ্রহন করেছিলেন, কিন্তু প্যারিসে তিন বছর প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ১৯০৫ সালে লন্ডনে এসেছিলেন। যদিও তিনি নব্যধ্রুপদীবাদী ভাস্কর্য নির্মাণে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু ভাস্কর্য নির্মাণের সেই প্রথাগত পদ্ধতি তিনি বেশ দ্রুত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যেভাবে রদ্যাঁ করেছিলেন, এবং এর পরিবর্তে পিকাসোর মতো তিনিও জাদুঘরে গিয়ে আফ্রিকা বা মিসরীয় শিল্পকলা অধ্যয়ন করছিলেন। শুরুর দিকে তার কাজ ছিল বিশাল ঘনবিন্যস্ত খণ্ডের মতো, এবং সেগুলো পশ্চিমে সৃষ্টি হয়নি এমন ভাস্কর্য ও সেগুলোর ধারণকৃত নানা আকৃতির মূলসার নিয়ে তার আকর্ষণ আর মোহাবিষ্টতা প্রতিফলিত করেছিল। এপস্টাইন, গাউডিয়ের-ব্রেসকা (১৮৯১ -১৯১৫), আমাডেও মডিলিয়ানি (১৯৯৮৪-১৯২০), কনস্টান্টিন ব্রানকুসি (১৮৭৬-১৯৫৭) এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাস্করদের মধ্যে এটি উঠতি প্রবণতা ছিল, এবং প্রত্যেকেই পরস্পরের পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ‘রক ড্রিল’ ভাস্কর্যটি একই সাথে যান্ত্রিক যুগ এবং কল-কারখানার প্রতি এপস্টাইনের বাড়তি আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তার এই ভাস্কর্যের কাঠামোটির অর্ধেক অংশ ছিল প্রকৃতার্থে যন্ত্র, যা তিনি ওয়েলসের একটি পাথর খনি থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কর্যটি সমালোচকদের ক্ষিপ্ত করেছিল যখন একটি প্রদর্শনীতে এটি প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল, এমন কিছু যা কিনা ইতোমধ্যেই

নির্মিত, সেটি কীভাবে শিল্পকলা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে?

এই প্রদর্শনীর কিছুদিন পরেই এপস্টেইন ফিগারটিকে কোমর থেকে কেটে 'রক ড্রিল' ভাস্কর্যটির অংশগুলো বিযুক্ত করেছিলেন। তিনি একটি বাহু সরিয়ে নিয়েছিলেন এটিকে ব্রোঞ্জে ঢালাই করার পর, এবং পরবর্তীতে ড্রিল ছাড়াই এই বিকৃত শরীরের ওপরের অংশটি প্রদর্শন করেছিলেন। ১৯১৪ সালে শুরু হওয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভবিষ্যতমূখী যন্ত্র নিয়ে তার সব আগ্রহ কেড়ে নিয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, 'রক ড্রিল ফিগারটি এখন বর্তমান ও ভবিষ্যতের সশস্ত্র, ভীতিকর একটি ফিগারের প্রতিনিধিত্ব করছে। মানবতাহীন , আমরা নিজেদেরকে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের ভয়ঙ্কর দানবে রূপান্তরিত করেছি'। স্টার ওয়ারস চলচ্চিত্র ধারাবাহিকে যুদ্ধের সৈন্য বা ড্রোইডগুলো এপস্টাইনের মূল ফিগারটির সাথে রহস্যময় সাদৃশ্য বহন করে - অমানবিক রোবট যারা প্রত্যেকেই স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধাস্ত্রে সশস্ত্র।

যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, ভবিষ্যতবাদী 'ফিউচারিস্ট' শিল্পীরা পাঁচ বছর ধরে যন্ত্র, যুদ্ধ এবং গতির উপাসনা করেছিলেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের 'লা ফিগারো' সংবাদপত্রের ২০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রথম পাতায় ইটালিভিত্তিক শিল্পীদের এই গোষ্ঠী তাদের ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেছিল। তাদের মুখপাত্র ছিলেন কবি ফিলিপো মারিনেট্টি, যিনি ঘোষণা করেছিলেন: 'অতীত, আমরা এর কোনো অংশই কামনা করি না, আমরা তরুণ, শক্তিশালী ভবিষ্যতবাদী - ফিউচারিস্ট'! মারিনেট্টি তারুণ্য, ঝুঁকি, দ্রুতগতির গাড়ির সমর্থন এবং ইতিহাসের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেছিলেন – 'আমরা সেই সুবিশাল জনতার গান গাইবো, যারা কাজ, আনন্দ আর বিদ্রোহে উত্তেজিত', তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন 'আমরা আধুনিক রাজধানীগুলোয় বহুবর্ণিল বহুশব্দের বিপ্লবের গান গাইবো' ।

ফিউচারিস্ট শিল্পী, যেমন জ্যাকোমো বালা (১৮৭১-১৯৫৮) এবং জিনো সেভেরিনি (১৮৮৩-১৯৬৬) মারিনেট্টির শব্দগুলো চিত্রকর্মের ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, ঘূর্ণায়মান অস্পষ্ট দৃশ্য সৃষ্টি করেছিলেন, যা দ্রুত গতির শহুরে জীবনের দৃশ্যের প্রতিনিধিত্ব করে, উমবার্টো বচ্চিওনি (১৮৮২-১৯১৬) তার 'ইউনিক ফর্মস অব কন্টিনিউটি ইন স্পেস' (১৯১৩) ভাস্কর্যে একই ধরনের গতি ধরার চেষ্টা করেছিলেন। তার হাতহীন ফিগার মাথা নীচু করে পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, যেন প্রবল বাতাসের বিরুদ্ধে সেটি হাঁটছে। এর পুরো শরীর বহু খাজ, প্রক্ষেপ আর সমতলে তৈরি, ত্রিমাত্রিক কিউবিস্ট চিত্রকর্মের মতো, এই ফিগারটির সামনে এগিয়া যাবার তাড়া যার বিশেষ আকৃতি দিয়েছে।

ফিউচারিস্টরা ইটালির শিল্পকলাকে পশ্চিমা শিল্পজগতের কেন্দ্রে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লক্ষ করুন কোথা থেকে তারা তাদের সেই আন্দোলনটি শুরু

করেছিলেন - প্যারিস। শহরটি তখন দৃঢ়ভাবেই আভোঁ-গার্ড (সেই সব শিল্পীদের চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত একটি সমষ্টীগত শব্দ, যারা কোনো একটি সময়ে প্রথাগত শিল্পকলা জগতের সীমানাগুলো আরো সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করেছিলেন) শিল্পকলা জগতের হৃৎপিণ্ড ছিল। রুশ-শিল্পী ল্যুবোভ পপোভা (১৮৮৯-১৯২৪) এবং নাটালিয়া গনচারোভা (১৮৮১-১৯৬২) প্যারিসে থাকাকালীন কিউবিজম এবং ফিউচারিজম আত্মীকৃত করেছিলেন। তারা এই সংকর আন্দোলনকে রাশিয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন, যা 'কিউবো-ফিউচারিজম' এবং 'র‍্যায়োনিজম' পরিচিত হয়ে উঠেছিল। গনচারোভার ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের 'সাইক্লিস্ট' চিত্রকর্মে আমরা সাইকেল চালকের 'ফিউচারিস্ট' চাকাগুলোকে পাথুরে রাস্তার উপর ঘুরতে দেখি। রুশ বিজ্ঞাপনপূর্ণ একটি শহুরে দৃশ্যের প্রক্ষেপটে সে চলমান, যে দৃশ্যটি কিউবিস্ট চিত্রকর্মের মত খণ্ডবিখণ্ড।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর প্যারিসে সূচিত শিল্পকলার আন্দোলনগুলোর সুদূরপ্রসারি প্রভাব ছিল। কিউবিজম দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এশিয়া অবধি শিল্পীদের প্রভাবিত করেছিল, গ গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২০-এর দশকে ভারতের প্রথম কিউবিস্ট শিল্পীতে পরিণত হয়েছিলেন। অমৃতা শের-গিল গগ্যাঁর 'সিনথেটিজমের' দ্বিমাত্রিক সমতল বিন্যাসগুলোর সাথে মুগল মিনিয়েচারের উষ্ণ রঙের সংমিশ্রণ করেছিলেন। তিনি ভারতীয় গৃহস্থ জীবনের দৃশ্যাবলি এঁকেছিলেন, এবং অসময়ে তার মৃত্যু সত্ত্বেও যা একটি সময় তাকে ভারতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক শিল্পী হিসাবে পরিচিতি দিয়েছিল।

এতো বেশি সংখ্যক শিল্পী বৈচিত্র্যময় এতো নতুন কাজ সৃষ্টি করেছিলেন যে তাদের নিজস্ব কাজগুলোকে স্বতন্ত্র করে তুলতে ক্রমশ তারা নিজেদের নানা গোষ্ঠীতে বিন্যস্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারা তাদের গোষ্ঠীগুলোর নামকরণ করেছিলেন, প্রায়শই যা শেষ হয়েছে 'ইজম' দিয়ে। আর সেটি তাদের সেই দাবির প্রতি ইঙ্গিত করতো যে তারা সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের শিল্পকলা আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আর নাম প্রায়শই সেই আন্দোলনের গতিপথ ইঙ্গিত করতো: 'ফিউচারিজম' হচ্ছে সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ বিষয়ক, 'ইমপ্রেশনিজম' ক্ষণকালীন অভ্যন্তরীণ অনুভূতির প্রকাশ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বহু সংখ্যক এমন 'ইজমের' আবির্ভাব হয়েছিল, কিন্তু সার্বিকভাবে তাদের কেবল একটি নামের অধীনে বিন্যস্ত করা যেতে পারে, আর সেটি হচ্ছে 'মডার্নিজম' বা আধুনিকতাবাদ , শিল্পকলার জগতে শতবর্ষব্যাপী যে পর্বটি বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে এসে শেষ হয়েছিল। এই পর্বটি শিল্পীদের শিল্পকলা জগতের সীমানাটিকে সম্প্রসারণ করার নিরন্তর প্রচেষ্টার সাক্ষী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফিউচারিস্ট শিল্পীরা সব নতুনত্বকে গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করেছিলেন, এবং যুদ্ধ উদযাপন করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শিল্পীদের প্রতি কোনো সন্মান প্রদর্শন করেনি, বরং তাদের উলটো গ্রাস করেছিল। বচ্চিওনি মারা গিয়েছিলেন, গউডিয়ের-ব্রেস্কা, ফ্রান্জ মার্ক এবং কিউবিস্ট ভাস্ক রেমন্ড ডুশ্যা-ভিলো (১৮৭৬-১৯১৮) প্রাণ হারিয়েছিলেন। অন্য শিল্পীরা যুদ্ধ এড়াতে মহাদেশ পরিবর্তন করেছিলেন, যেমন মার্সেল ডুশ্যাঁ (১৮৮৭-১৯৬৮), তিনি রেমন্ডের ভাই ছিলেন, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিউ

ইয়র্কে এসেছিলেন। প্যারিস ছাড়ার আগে ডুশ্যাঁ তার ‘ন্যুড ডিসেন্ডিং এ স্টেয়ারকেস (নং . ২)’ চিত্রকর্মটি শেষ করেছিলেন। এটিয়েন-জুল মারে’র বৈজ্ঞানিক আলোকচিত্র থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে কিউবিজম আর এবং ফিউচারিজম শৈলীর মিশ্রণে তিনি এটি এঁকেছিলেন । আলোকচিত্রী মারে একাধিক এক্সপোজার বেশ খানিকটা সময় ধরে গ্রহন করেছিলেন একটি একক প্রিন্টে সরল চলনের প্রক্রিয়াটি উন্মোচন করতে, যেমন, একজন ব্যক্তি হাঁটছেন। ডুশ্যাঁ এটি চিত্রকর্মে অনুবাদ করেছিলেন, একটি নগ্ন শরীরকে ধারবাহিকভাবে সজ্জিত গতিময় তলে রূপান্তরিত করেছিলেন, যেন একটি ফিগার সিড়ি দিয়ে ক্রমশ নীচে নামছে।

‘ন্যুড ডিসেন্ডিং এ স্টেয়ারকেস (নং. ২)’ বহু মানুষকে চমকে দিয়েছিল। যখন ড্যুশাঁ এটি প্যারিসে প্রদর্শন করার চেষ্টা করেচিলেন, কিউবিস্ট শিল্পীরা (তার নিজের ভাই রেমন্ডসহ) তাকে বাধা দিয়েছিলেন। আটলান্টিকের দুই পাশেই এটি প্ররোচনাদায়ক একটি চিত্রকর্ম ছিল। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নিউ ইয়র্কের আরমরি শোতে যখন এটি প্রদর্শন করা হয়েছিল নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকাটি এটিকে ‘কাঠের তক্তি কারখানায় একটি বিস্ফোরণ’ বলে বাতিল করে দিয়েছিল। পরবর্তীতে ‘ন্যুড ডিসেন্ডিং এ স্টেয়ারকেস (নং ২)’ খুবই প্রভাবশালী শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। এবং এটি প্রদর্শন করেছিল একটি চিত্রকর্ম গতি আর সময়কে কীভাবে বন্দি করতে পারে, কিন্তু সেই সময়ে ড্যুশাঁ এই সমালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন ছবি আঁকা ছেড়ে দেবার মাধ্যমে, প্রাত্যহিক জীবনের নানা বস্তু দিয়ে ভাস্কর্য নির্মাণে তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন।

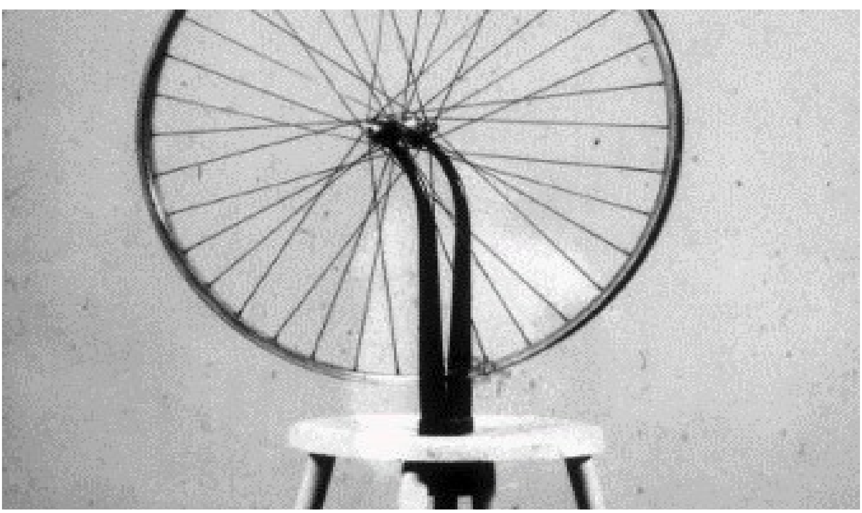

তার ভাস্কর্যের একটি প্রথাবিরোধী ভিত্তি তৈরি করতে এপস্টেন একটি রক ড্রিল মেশিন ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু ড্যুশাঁ এমনকি আরো দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৯১৩ সালে ‘ব াইসাইকেল হুইল’ ভাস্কর্যে তিনি সাইকেলের একটি চাকাকে এর ফর্ক বা ধারকের রেখে একটি টুলের উপর সেটিকে উলটো করে স্থাপন করেছিলেন। এই দুটি বস্তুকে একত্রে

পাশাপাশি আনার মাধ্যমে তিনি তাদের একটি ভাস্কর্যে পরিণত করেছিলেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এমনকি আরো বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়েছিলেন, কারখানায় তৈরি করা সিরামিকের একটি ইউরিনাল বা মূত্রাধার সংগ্রহ করে এটির নাম দিয়েছিলেন 'ফাউন্টেন ', এবং এটির উপর স্বাক্ষর করেছিলেন (মিথ্যা নামে - আর. মাট), এবং নিউ ইয়র্কে একটি প্রদর্শনীতে এটি প্রদর্শন করেছিলেন। এমনকি যদিও এই প্রদর্শনীটি সবার জন্য উন্মুক্ত হবার কথা ছিল, তারপরও তার 'ফাউন্টেইন' ভাস্কর্যটিকে প্রদর্শন করার সুযোগ দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছিল। ড্যুশাঁ, যিনি নিজেই প্রদর্শনী কমিটির একজন সদস্য ছিলেন , পদত্যাগ করেছিলেন এবং একটি লিখিত প্রতিবাদ প্রকাশ করেছিলেন এমন দাবি করে যে, "মি. মাট এই ফাউন্টেইনটিকে নিজ হাতে বানিয়েছেন কিনা সেটি আদৌ গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়, তিনি এটি 'নির্বাচন' করেছেন"।

ফাউন্টেইন পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিখ্যাত ভাস্কর্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু কেন? ডুশ্যাঁ তার ভাস্কর্যকে 'রেডিমেডস' বা তৈয়ারি হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, কারণ সেগুলো সৃষ্টি করা হয়েছিল এমন কোনো বস্তু ব্যবহার করে, যা অন্য কেউ ইতোমধ্যেই তৈরি করেছিল। যদি শিল্পী বলেন এটি শিল্পকলা, তাহলে যে-কোনো কিছুই শিল্পকলা হতে পারে - আর এটি প্রদর্শন করার মাধ্যমে এগুলো ভাস্কর্য ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। একটি কাজের পেছনে 'কনসেপ্ট' বা ধারণা আসল যে বস্তুটিকে প্রদর্শন করা হচ্ছে সেটির মতোই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

ইউরোপের সর্বত্রই বহু শিল্পী তাদের শিল্পকলার সীমানাটিকে ক্রমশ ভিন্ন একটি দিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছিলেন: বিমূর্ততা বা অ্যাবস্ট্রাকশনের দিকে। বি মূর্ত শিল্পকলা আসলে কী? এটি হচ্ছে একটি শিল্পকলা, এর বাইরে যার আর কোনো বিষয়বস্তু নেই। এটি কোনো ব্যক্তি, বা কোনো একটি বেহালা বা কোনো একটি ঘোড়াকে

প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করছে না। বরং রঙ, আকার, আলো, রেখা হিসেবে আমাদেরকে এটির কী দেবার আছে শুধু এই বিষয়টি নিয়ে এই শিল্পকলা আগ্রহী । উইসলার, আর তার ‘অ্যাসথেটিক’(নন্দনতাত্ত্বিক) আন্দোলন, যার সাথে আঠাশতম অধ্যায়ে আমাদের দেখা হয়েছিল, অ্যাবস্ট্রাকশন বা বিমূর্তনের খুব নিকটে এসেছিলেন এবং তাদের কৌশলের মূলনীতি ‘শিল্পকলার জন্যই কেবল শিল্পকলা’ পশ্চিমা বিমূর্ততার ধারণাটিকে সংক্ষেপিত করেছে। পশ্চিমের বাইরে সৃষ্ট সব শিল্পকলায় বিমূর্ততা কিন্তু নতুন কোনো ধারণা নয়, কিন্তু রেনেসাঁ থেকেই পশ্চিমা শিল্পকলা রক্ষণশীল অনুকরণ ও বাস্তবতার প্রতি সর্বান্তকরণে নিবেদিত ছিল। বিংশ শতাব্দীতে শিল্পীরা প্রথাগত শিল্পকলা নির্মাণের সব দিকগুলোকে যখন চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, অনেকেই অনুধাবণ করেছিলেন বিমূর্ততা উত্তেজনাপূর্ণ একটি নতুন সম্ভাবনা দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

১৯১০-এর দশকে বিমূর্ত শিল্পকলা রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, ইটালি, আমেরিকা এবং আরো বহু দেশেই আবির্ভূত হয়েছিল। রাশিয়ায় জন্ম নেয়া কানডিনস্কি, ‘ডের ব্লো রাইটের’ শিল্পীগোষ্ঠীর একজন সদস্য হিসেবে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য গত অধ্যায়ে যার সাথে আমাদের একবার দেখা হয়েছিল, দুই দশকের বেশি সময় ধরে জার্মানিতে কাজ করেছিলেন। রুশ এবং জার্মান লোকায়ত শিল্পকলা এবং কাহিনী তার শিল্পকর্মগুলোকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি ক্রমান্বয়ে তার ক্যানভাস দখল করে থাকা ঘোড়া আর দূর্গগুলোকে মুক্ত প্রবাহমান আকার, আকৃতি, রেখা , রঙের বিন্দু এবং জ্যামিতিক আকৃতি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে শুরু করেছিলেন। তার প্রভাবশালী ‘কনসার্নিং দ্য স্পিরিচ্যুয়াল ইন আর্ট’ (১৯১১) বইয়ে তিনি দাবি করেছিলেন

শিল্পকলা কিছু একান্ত আবশ্যিক অথবা আধ্যাত্মিকতা থেকে এর অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করে । তিনি এটি আফ্রিকা আর অসিয়ানিক শিল্পকলার মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করতে গিয়ে দেখেছিলেন, যেমন ‘‘টি’আই’’ ভাস্কর্য, যা আমরা তেইশতম অধ্যায়ে দেখেছিলাম। তিনি লিখেছিলেন, ‘ঠিক আমাদের মতো, ঐসব বিশুদ্ধ শিল্পীরা তাদের কাজে কোনো কিছুর অন্তর্যাস ধারণ করতে চেয়েছিলেন, যা নিজেই সব বাহ্যিকতা প্রত্যাখানের কারণে পরিণত হয়েছিল’।

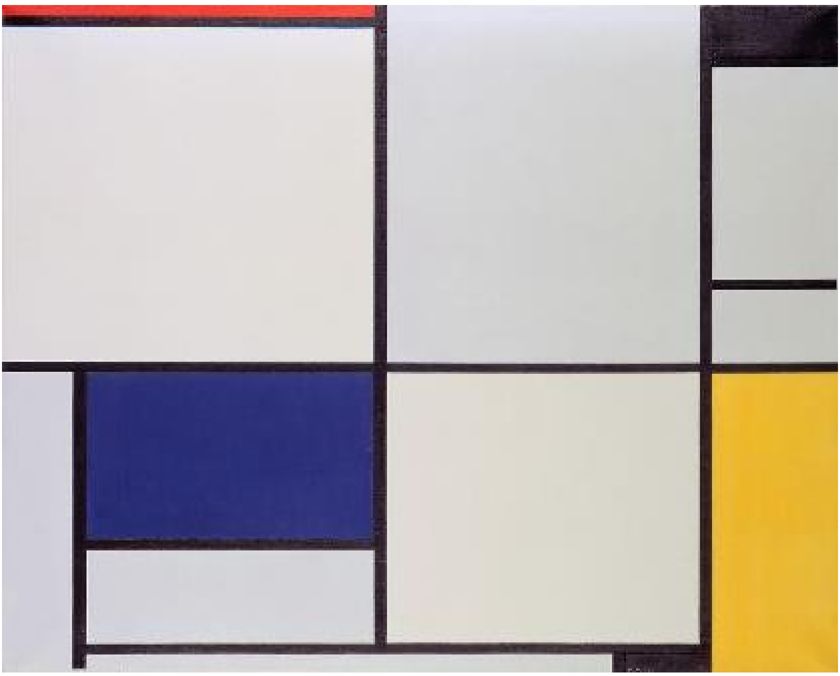

নেদারল্যান্ডসে পিট (পিটার কর্নেলিয়াস) মনড্রিয়ান (১৮৭২-১৯৪৪) তার আঁকা প্রতিটি বিষয়ের মূল নির্যাসকে - একটি আপেল গাছ, সমুদ্রে একটি জাহাজ-ঘাটা - ধারাবাহিক কিছু অনুভূমিক ও উল্লম্ব রেখায় পাতন করতে ১৯০৮ থেকে ১৯১৩ - পাঁচটি ধৈর্য্যশীল বছর কাটিয়েছিলেন। মনড্রিয়ান বিশ্বাস করতেন বিমূর্ততা বিশ্বজনীন কিছু আঁকার অনুমতি দেয়। তিনি পৃথিবীকে সমতল রেখায় অনুবাদ করতে, এর বিশুদ্ধ চূড়ান্ত সত্য আঁকতে চেয়েছিলেন, কারণ তার চোখে এই মসৃণ সমতল স্থানিক বিভ্রম সৃষ্টি করার চেয়েও অনেক বেশি সৎ। তার চিত্রকর্মগুলো অবশেষে কদাচিৎ লাল, নীল অথবা হলুদ বর্গাকার এলাকাসহ অপ্রতিসমভাবে ক্যানভাসে বিন্যস্ত সাদা আর কালো বর্গজালিতে পরিণত হয়েছিল, আর তিনি এই শৈলীর নাম দিয়েছিলেন ‘নিওপ্লাস্টিসিজম’।

কিন্তু এই সব শিল্পীদের পশ্চিমা বিমূর্তবাদের অগ্রপথিক হিসেবে নিজেদের দাবি করার এক দশক আগেই সুইডিশ শিল্পী হিলমা আফ ক্লিন্ট (১৮৬২-১৯৪৪) প্রবাহমান রেখা, লক্ষ্যবিন্দু, প্রিজম, উপবৃত্ত, সর্পিলাকার নানা আকারের বিন্যাসসহ অতীন্দ্রীয়বাদী বিমূর্ততার সুবিশাল ক্যানভাস সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি একত্রে এই কাজগুলোর নামকরণ করেছিলেন 'দ্য পেইন্টিংস ফর দ্য টেম্পল'। ১৯০৬ থেকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আঁকা প্রায় ২০০ টি চিত্রকর্মের তার এই ধারাবাহিক আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক এবং শৈল্পিক জীবনের সুগভীর এবং বিশ্লেষণী একটি অনুসন্ধানে পরিপৃক্ত ছিল। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে আঁকা তার 'অল্টারপিস ন. ১' মূলত চিত্রকর্ম আঁকার প্রক্রিয়াটিকেই উদযাপন করেছিল। একটি ক্রমানুসারের সজ্জিত রঙের রেখাচিত্র, যা একটি পিরামিডের মতো ওপরে উঠতে থাকে, যার চারিদিকে আবৃত করে আছে বেগুনী জ্যোতির্বলয়সহ একটি সোনালী গোলক। আফ ক্লিন্ট তার জীবদ্দশায় চিত্রকর্মগুলো কখনো প্রদর্শন করেননি। তিনি নিজে একজন আধ্যাত্মিক মাধ্যম বা 'মিডিয়াম' ছিলেন, এবং 'সিয়ন্সে' যে আত্মাদের সাথে তিনি 'কথা ' বলেছিলেন তারা তাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, এই ধারাবাহিকের চিত্রকর্মগুলো অনেক অগ্রসর প্রকৃতির, এবং এগুলো বোঝার মতো ক্ষমতা এখনো কারো হয়নি। তিনি হিসাবে করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, অন্তত তার মৃত্যুর পর বিশ বছর অতিক্রান্ত না হলে এগুলো প্রদর্শন করা উচিত হবে না। এবং এই কাজগুলো শুধু একবিংশ শতাব্দীতে এসেই বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছিল। এর ব্যতিক্রম বিমূর্ততাকে নির্বাচন করার মাধ্যমে তার পুরুষ সমকালীন শিল্পীরা তাদের পেশাগত জীবনে খ্যাতি এবং পরবর্তীতে লেখা প্রতিটি শিল্পকলার ইতিহাসের বইয়ে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন।

রুশ শিল্পী কাসিমির মেলভিচ (১৮৭৮-১৯৩৫) এবং ভ্লাদিমির টাটলিন (১৮৮৫-১৯৫৩) তাদের বিমূর্ত চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্য কক্ষের কোনো একটি কোণে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করে রুশ অর্থোডক্স চার্চের আইকনগুলোর মতো প্রথাগত উপস্থাপন অনুকরণ করেছিলেন । তারা যা উপস্থাপন করেছিলেন সেটি প্রচলিত অর্থে ধর্মীয় নয়। টাটলিন ‘কনস্ট্রাক্টিভিস্ট ’ আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন, ত্রিমাত্রিক কিউবিস্ট চিত্রকর্মের মতো, ধাতুর চ্যাপটা পাত ব্যবহার করে তিনি ঘরের কোণে স্থাপন করার মতো রিলিফ ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন। মেলভিচ ছিলেন ‘সুপ্রিমেটিস্ট’ আন্দোলনের নেতা, যার সূচনা হয়েছিল পেট্রোগ্রাড (বর্তমান সেইন্ট পিটার্সবুর্গ) ১৯১৫ সালে ‘০.১০’ শীর্ষক একটি প্রদর্শনীর মাধ্যমে। দশজন অংশগ্রহনকারী এই প্রদর্শনীতে প্রচেষ্টা করেছিলেন শিল্পকলাকে আবার শূন্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, যেখানে শিল্পকলার অস্তিত্ব আছে শুধু এর আবশ্যিক নির্যাস রূপে। এর পরিণতি ছিল মেলভিচের ‘ব্ল্যাক স্কোয়ার’ চিত্রকর্ম, সাদা ক্যানভাসের ওপর কাল রঙের চ্যাপটা একটি বর্গক্ষেত্র।

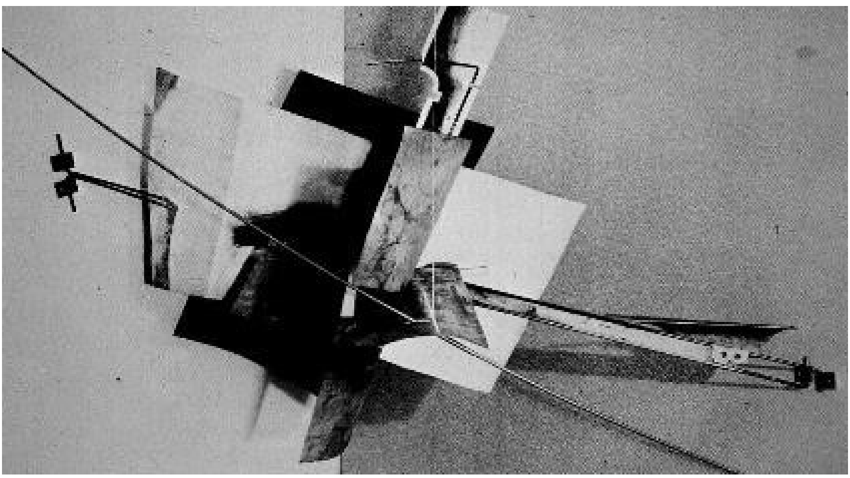

বিমূর্ত চিত্রকর্ম প্রায় একই সাথে ইউরোপব্যাপী আবির্ভূত হয়েছিল। বস্তু বা বিষয়ের পুনসৃষ্টি করার সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যেতে শিল্পীরা এই দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, যখন তারা বিশ্বজনীন একটি সত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। অনেকটাই যেন কোনো একটি ভৌত উপস্থিতি আঁকার বদলে তারা বৈশ্বিক একটি ধারণা আঁকার চেষ্টা করেছিলেন (বিশ্বাস বা সৌন্দর্য আঁকার চেষ্টা করার মতো)। বিমূর্তন কাব্যিক আর মার্জিত হতে পারে , যেমন কানডিনস্কি আর আফ ক্লিন্টের চিত্রকর্ম, অথবা এটি হ্রস্বীকরণের একটি অনুশীলন হতে পারে, যেমন মনড্রিয়ানের জ্যামিতিক দাগগুলো, এবং মেলভিচের কালো বর্গক্ষেত্র। এর কোনো বিষয়বস্তু (শুধু শিল্পকলা ছাড়া) না থাকা সত্ত্বেও এই শৈলী এর জনপ্রিয়তা হারায়নি, এবং এখনো যার অনুশীলন অব্যাহত আছে।

পশ্চিমা বিমূর্তবাদের উত্থানের পাশাপাশি ডাডা আন্দোলনও বিকশিত হয়েছিল, একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রভাবশালী শিল্প আন্দোলন ডাডা বহু নতুন ধরনের শৈলীর সূচনা করেছিল , যেমন সুরিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদ ও ফটোমন্তাজ, আমরা পরবর্তী অধ্যায় যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে)

(১) Jacob Epstein, Rock Drill
(২) Henri Gaudier-Brzeska, Mermaid
(৩) Giacomo Balla, Speeding Automobile
(৪) Umberto Boccioni , Unique Forms of Continuity in Space
(৫) Natalia Goncharova, The Cyclist
(৬) Amrita Sher-Gil, Bride's Toilet
(৭) Gaganendranath Tagore Movement
(৮) Marcel Duchamp, Nude Descending a Staircase, No. 2
(৯) Marcel Duchamp, Bicycle Wheel
(১০) Marcel Duchamp, Fountain
(১১) Wassily Kandinsky, Composition 8
(১২) Piet Mondrian Tableau I
(১৩) Hilma af Klint - Altarpiece No. 1 Group X
(১৪) Vladimir Tatlin, Counter-Relief
(১৫) Kazimir Malevich, Black Square

অধ্যায় ৩২ - রাজনৈতিক শিল্পকলা

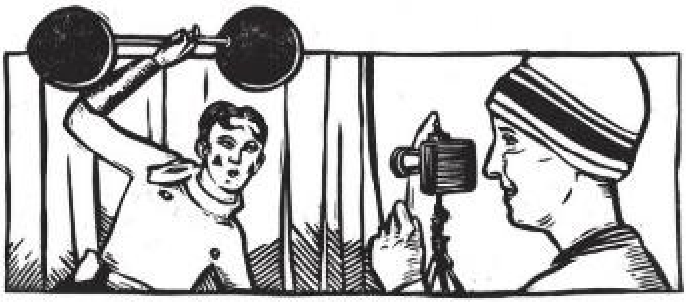

১৯২০ সাল, জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ, প্রায় মাসখানেক আগে বার্লিনে প্রথম আন্তর্জাতিক 'ডাডা' মেলার (প্রদর্শনী) উদ্বোধন হয়েছে। প্রদর্শনীর প্রতিটি কক্ষ চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্যে পূর্ণ, এবং ছাদ থেকে সামরিক উর্দি পরিহিত একটি শূকর ঝুলে আছে। দেয়াল সাটা পোষ্টারগুলো চিৎকার করেই জানান দিচ্ছে 'ডাডা হচ্ছে রাজনৈতিক', এবং 'ডাডা প্রলেতারিয়েত বিপ্লবীদের সহযোদ্ধা!'। একটি দেয়ালে জর্জ গ্রোসের (গিওর্গ গ্রোস) 'এ ভিক্টিম অব সোসাইটি' ঝুলছে, আত্মহত্যাপ্রবণ এক আবিষ্কারকের বিষণ্ন প্রতিকৃতি। একটি প্রদর্শনী কক্ষের কেন্দ্রে রাউল হাইজমানের 'মেকানিকাল হেড (স্পিরিট অব দ্য এজ)' একটি ভিত্তির উপর বসে আছে, পরচুলা নির্মাতাদের ব্যবহার করা একটি কাঠের ' ডামি' মাথা, মগজের শক্তিকে বর্ধিত করতে সেখানে মাপার জন্য ব্যবহৃত একটি ফিতা, রুলার, ওয়ালেট আর একটি টাইপরাইটারের কিছু অংশ সেটে দেয়া হয়েছে। হানা হশের 'কাট উইথ দ্য কিচেন নাইফ থ্রু দ্য বিয়ার বেলি অব ভাইমার রিপাবলিক' নিকটে দেয়ালে ঝুলছে, বহু সংখ্যক মুখের ছবির একটি কোলাজ, যন্ত্রাংশ এবং শব্দ, যা খবরের কাগজ থেকে কাটা হয়েছে, কাটা অংশগুলোর মাত্রা অথবা গভীরতার বোধগম্য কোনো সংযোগ ও ধারণা ছাড়া।

সব মিলিয়ে প্রায় দুইশ শিল্পকর্ম সেই প্রদর্শনীর গ্যালারী কক্ষে একত্রিত করা হয়েছিল। মেলার ক্যাটালগ কেবলই হাতে এসে পৌঁছেছে, এবং এর প্রচ্ছদে হাউসমান ঘোষণা করছেন: ‘ডাডাবাদী ব্যক্তি নির্বুদ্ধিতাকে ঘৃণা করে এবং অর্থহীনতাকে ভালোবাসে’। ডাডাবাদীরা আশা করেছিলেন এই ক্যাটালগ দর্শনার্থীদের সংখ্যা বাড়াতে সহায়তা করবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছবি তুলতে এবং আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় ছবি পাঠাতে পেশাজীবী একজন আলোকচিত্রীকে ভাড়া করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এইসব ছবির পাশাপাশি পর্যালোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশই ছিল সমালোচনামূলক, এবং দর্শনার্থীদের সংখ্যাও আশানুরূপ হয়নি।

সুইজারল্যান্ড এবং নিউ ইয়র্কে **১৯১৬** খ্রিস্টাব্দে ডাডা শিল্পকলা আন্দোলনটির সূচনা হয়েছিল এবং খুব দ্রুত এটি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনের নাম - ডাডা- মূলত অর্থহীন একটি শব্দ। তবে একটি ব্যাখ্যা ইঙ্গিত করে, উদ্দেশ্যহীনভাবে শব্দটিকে নির্বাচন করা হয়েছিল ফরাসী-জার্মান একটি অভিধান থেকে (ডাডা শব্দটি ফরাসী ভাষায় দুলতে পারে এমন খেলনা ঘোড়াকে ইঙ্গিত করে)। ডাডা শিল্পীরা ছিলেন নৈরাজ্যবাদী ও বন্য। তারা অর্থহীনতাকে উদযাপন করতেন, যুদ্ধ ঘৃণা করতেন এবং অ্যান্টি-আর্ট অর্থাৎ আরো সুনির্দিষ্টভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পকলার বিরোধী ছিলেন। বার্লিনে ডাডা শিল্পী গোষ্ঠীটি এভাবে গজিয়ে ওঠা ডাডা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এর প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানিতে নতুন একটি গণতান্ত্রিক সরকার, ভাইমার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। যুদ্ধ পরবর্তী জার্মানী ব্যাপক অর্থনৈতিক সমস্যায় আক্রান্ত একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল, এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর সহিংস বিক্ষোভ অস্থিতিশীল একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

শিল্পীরা রাজনীতিবিদ আর সমাজ নিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, যে সমাজ প্রায় ১৬ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যুর কারণ হওয়া একটি ভয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবার অনুমতি দিয়েছিল। ডাডাবাদী শিল্পীদের লক্ষ্য ছিল এই সমাজের সৃষ্টি করা সব প্রথাগত শিল্পকলাকে ধ্বংস, এবং নতুন কিছু যেন এগুলো প্রতিস্থাপিত করতে পারে তার একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রথম আন্তর্জাতিক ডাডা মেলা ছিল বার্লিনে ডাডা শিল্পীদের সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী, এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা সবাই মনে করেছিলেন যে এটি সফল হবে। কিন্তু এই 'সফলতা' শব্দটি দিয়ে তারা আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? বাণিজ্যিকভাবে, অবশ্যই এটি ব্যর্থ হয়েছিল, এবং পরবর্তীতে অশোভন শিল্পকর্ম প্রদর্শনের অপরাধে শিল্পীদের মধ্যে দুজনকে কাঠগড়ায় দাড়াতে হয়েছিল। অনধিক হাজার দর্শনার্থী টিকিট কেটেছিলেন প্রদর্শনীতে প্রবেশ করতে, যদিও প্রদর্শনীটি আট সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু ডাডা গোষ্ঠীর শিল্পীরা এর ব্যর্থতাকে মানতে চাননি, বরং তারা দাবি করেছিলেন, খোদ শিল্পকলাকে অবমূল্যায়ন ও শিল্পকলার বাজার ধ্বংস করাই ছিল তাদের সফলতা।

ক্যাটালগে জন হার্টফিল্ডকে 'ছবির শত্রু' হিসেবে সমর্থন করা হয়েছিল। জন হার্টফিল্ড (হেলমুট হার্জফেল্ড নামে যিনি জন্মগ্রহন করেছিলেন, ১৮৯১-১৯৬৮) এবং জর্জ গ্রোস (জন্ম নাম গিওর্গ গ্রোস, ১৮৯৩-১৯৫৯) দুজনেই সৈন্য ছিলেন, এবং পরবর্তীতে যারা প্রতিশ্রুতবদ্ধ যুদ্ধ-বিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন। ক্রমবর্ধিষ্ণু জার্মান জাতীয়তাবাদের

প্রতিবাদ করে তারা এমনকি তাদের নাম সমতূল্য ব্রিটিশ নামে পরিবর্তন করেছিলেন। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের ব্যর্থতাগুলো উন্মোচন করার উদ্দেশ্যে এই গ্রুপে একমাত্র নারী শিল্পী হানা হশের (১৮৮৯-১৯৭৮) সাথে রাউল হাউসমান (১৮৮৬-১৯৭১) 'ফটোমন্টাজ' মাধ্যমের - কোলাজ করা আলোকচিত্র - প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। আর এর মাধ্যমে তারা ফটোমন্টাজকে শিল্পকলার একটি স্বতন্ত্র রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর এটিকে নিয়তির পরিহাসই বলতে হবে, কারণ চারুকলার বিপরীত বলেই কিন্তু ডাডাবাদীরা প্রথমত কোলাজ ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন।

তাদের কোলাজগুলো ছিল যুদ্ধক্ষেত্র, এবং কাচি ছিল তাদের অস্ত্র। নতুন সম্পর্ক আর সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে তারা তৈরি করা সামগ্রী আর চিত্র একত্রে বিন্যস্ত করতে শুরু করেছিলেন। তারা আলোকচিত্র ব্যবহার করেছিলেন যেভাবে ড্যুশাঁ - যিনি নিজেও একজন ডাডাবাদী ছিলেন - বাইসাইকেলের চাকা আর টুল ব্যবহার করেছিলেন। সেখানে ত্রিমাত্রিক কোনো দৃশ্য সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা ছিল না, কারণ আকস্মিক বা দৈবাৎ পারস্পরিক অবস্থানে রাখার কারণে সেটি দর্শনানুপাত কিংবা যুক্তি অপসারণ করেছিল। কোনো সুস্পষ্ট বিবরণ কিংবা কোনো আধ্যাত্মিক বার্তা সেখানে ছিল না। এর পরিবর্তে, এইসব চিত্রগুলো আধুনিক বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করেছিল - দ্রুতগতিসম্পন্ন, বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন, রাজনৈতিক, খণ্ডিত, প্ররোচক। শিল্পকলার আন্দোলন হিসেবে ডাডা স্বল্পস্থায়ী প্রমাণিত হয়েছিল, ১৯২০-এর মধ্য দশকে এটি প্রায় নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছিল, কিন্তু প্রথাবিরোধী এর বৈপ্লবিক প্রকৃতি এখনো শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করা অব্যাহত রেখেছে।

শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে আলোকচিত্রের ব্যবহারও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলফ্রেড স্টাইগলিৎস (১৮৬৪-১৯৪৬) দ্রুত আধুনিক হতে থাকা নিউ ইয়র্ক শহরের আলোকচিত্র তুলেছিলেন। শিল্পকলার একটি রূপ হিসেবে আলোকচিত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক

পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্য নিয়ে তিনি ১৯০২ সালে 'ফটো-সেসেশন' গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং প্রভাবশালী '২৯১' গ্যালারিতে গোষ্ঠীর সদস্যদের কাজ প্রদর্শন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি আলোকচিত্রকে শিল্পীদের জন্য শুধু উপযোগী উপকরণ হিসেবেই দেখেননি, বরং এই মাধ্যমটিকে এর নিজস্ব অধিকারেই শিল্পকলা হিসেবে দেখেছিলেন। আলোকচিত্র শিল্পকলার প্রভাবশালী সমর্থক হিসেবে তিনি বহু আলোকচিত্র শিল্পীকে তাদের পেশাগত জীবনে সফল ও প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছিলেন।

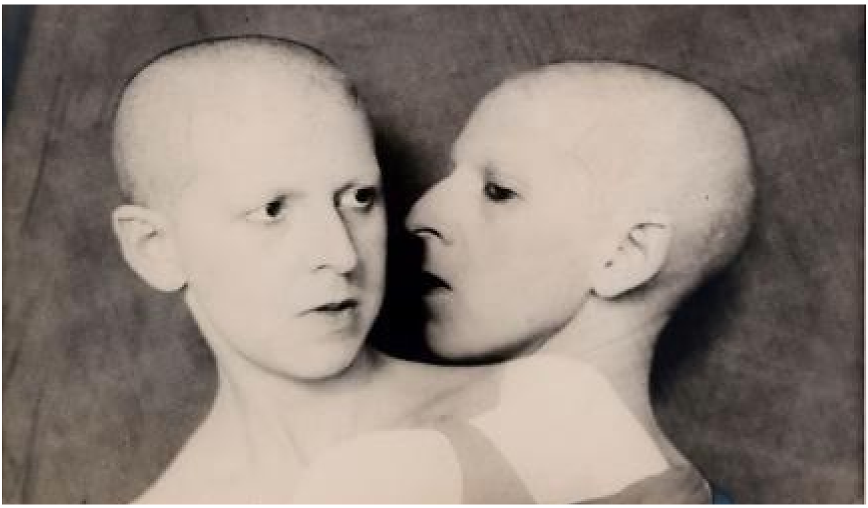

ইউরোপে, ম্যান রে (ইমানুয়েল রাডনিৎস্কি ১৮৯০-১৯৭৬) এবং ক্লড কাহুনের (১৮৯৪-১৯৫৪) মতো শিল্পীরা এক ধরনের হাইব্রিড বা সংকর চিত্র সৃষ্টি করতে আলোকচিত্র মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ল্যুসি শোব নিজেকে তার লৈঙ্গিক পরিচয়ের উর্ধে স্থাপন করতে ক্লড কাহুন নাম গ্রহন করেছিলেন (তাকে দেখা হয়েছিল বাইনারি হিসেবে - নারী/পুরুষ একই সাথে)। কাহুনের সঙ্গী ও অংশীদার সুজান মালহেরবেও উভলিঙ্গ নাম গ্রহন করেছিলেন, মারসেল মুর (১৮৯২-১৯৭২), এবং আলোকচিত্রের জন্য তারা একত্রে আত্মপ্রতিকৃতি মঞ্চস্থ করতেন। 'কে মে ভো-টু?' (আমার কাছে তুমি কী চাও?) (১৯২৮) আলোকচিত্রে তারা দুজন কামানো মাথাসহ পরস্পরের অনুলিপি হিসেবে এবং কাহুন তার 'পোর্ট্রেইট অব ক্লড কাহুন' (১৯২৭) সার্কাসের শক্তিশালী মানব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন (১৯২৭), যেখানে তিনি হাফপ্যান্ট পরে ভারের গোলক এবং একটি জামাসহ উপস্থিত, কিন্তু তাকে দেখলে মনে হবে যেন তিনি বুক উন্মুক্ত করা একজন পুরুষ, এছাড়াও তিনি চুলের বিশেষ কুঞ্চন বা কিস কার্লও প্রদর্শন করেছিলেন, গালের উপর হৃৎপিণ্ডের চিহ্ন, এবং ঠোট স্পষ্টভাবে ফুলিয়ে আছেন, তিনি একই সাথে নারী ও পুরুষ, নাটকীয়ভাবে পুরুষোচিত, তার বুকের ওপর লেখা 'আমার প্রশিক্ষণ চলছে, আমাকে চুমু খেয়ো না'। এই আলোকচিত্রগুলো

ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল। ১৯৮০-এর দশকে কেবল এগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। এই সব আলোকচিত্র এখন পরিচয়, সামাজিক লিঙ্গ, লৈঙ্গিক নমনীয়তা এবং আলোকচিত্রমূলক পারফরম্যান্স শিল্পকলার গুরুত্বপূর্ণ পূর্ববর্তী উদাহরণ হিসেবে দেখা হয়, এমন কিছু যা সাম্প্রতিক সময়ের নারী শিল্পীরাও অনুসরণ করছেন, যেমন সিন্ডি শেরমান (জন্ম ১৯৫৪), এবং জানেল মুহোলি (জন্ম ১৯৭২), সাইত্রিশ ও চল্লিশতম অধ্যায়ে যাদের নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

ম্যান রে আলোকচিত্র নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি দাবি করেছিলেন, 'আমি অবশেষে চিত্রকর্মের আঠালো মাধ্যম থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছি এবং সরাসরি আলো নিয়েই কাজ করছি'। তিনি আলোকসংবেদী কাগজের ওপর নানা বস্তু রেখে সূর্যে উন্মুক্ত করতেন আর এভাবে তিনি 'রেয়োগ্রাফ' সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯১৪ সালে স্টাইগলিৎসের ২৯১ গ্যালারীতে একটি পদর্শনী দেখার পর তিনি আফ্রিকার শিল্পকলারও ছবি তুলেছিলেন। তার 'নোয়া এ ব্লন্স' (কালো ও সাদা) (১৯২৬) আলোকচিত্রে আমরা তার শ্বেতাঙ্গ মডেল কিকিকে আইভরি কোস্টের একটি কালো 'বাউলে' মুখোশ ধরে থাকতে দেখি। আর পেন্সিলে আকা ভ্রূসহ তার বন্ধ চোখসহ ডিম্বাকৃতির মুখ যেন মুখোশটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিধ্বনিত করছে। ম্যান রে এই চিত্রটিকে উলটে দিয়েছিলেন, সুতরাং কিকির চেহারা কালোয় পরিণত হয়েছিল এবং মুখোশটি সাদায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

ম্যান রে এবং কাহুন দুজনে প্যারিস-কেন্দ্রীক সুরিয়ালিস্ট বা পরাবাস্তববাদী শিল্পী গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৪ সালে পরাবাস্তববাদ বা সুরিয়ালিজম নিয়ে প্রথম উন্মুক্ত ঘোষণা দিয়েছিলেন বর্ণাঢ্য চরিত্রের একজন কবি - আন্দ্রে ব্রেতোঁ, যিনি নিজেকে এর স্বঘোষিত নেতা হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। শুরুতে 'সুরিয়ালিজম' অর্থাৎ পরাবাস্তববাদ একটি সাহিত্যিক আন্দোলন ছিল, কিন্তু খুব শীঘ্রই ব্রেতোঁ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক শিল্পীকে তার 'লা রেভ্যুলুশিয়ঁ সুররিয়ালিস্ট' ম্যাগাজিনে অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করেছিলেন, এবং ডাডা আন্দোলনের বহু শিল্পীও পরাবাস্তববাদী শিল্পীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

ব্রেতোঁ জার্মান শিল্পী ম্যাক্স আর্নস্ট (১৮৯১-১৯৭৬) ও স্প্যানিশ শিল্পী হুয়ান মিরোকে (১৮৯৩-১৯৮৩) তার ম্যাগাজিনে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। শুরুর দিককার চিত্রকর্মগুলোয় মিরো তার স্বপ্নের রং এবং সেখানে বসবাস করা বিমূর্ত আকার আর প্রতীকগুলো অনুসন্ধান করছিলেন ।

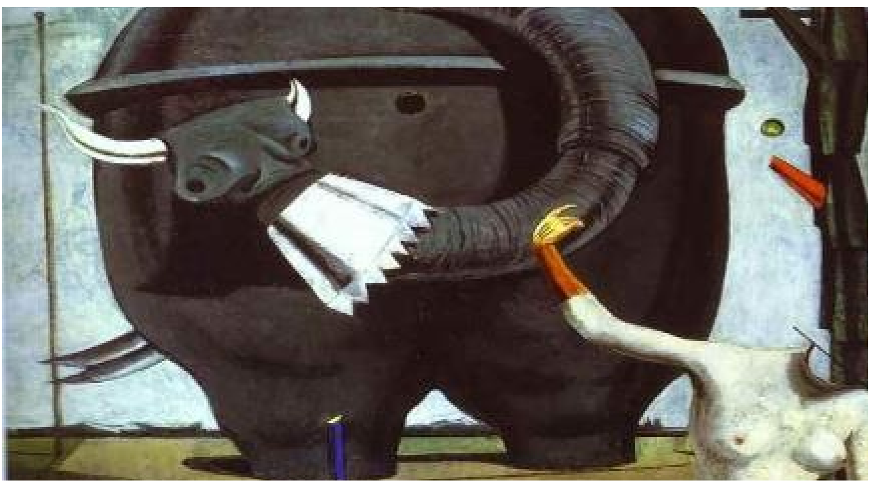

আর্নস্ট ছিলেন ডাডাবাদী, যিনি শিল্পকলা সৃষ্টির ‘স্বয়ংক্রিয়’ অবচেতন প্রক্রিয়াটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, রাবিং (কোনো একটি পৃষ্ঠের গঠন বিন্যাস সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া এর উপর কাগজ রেখে তারপর সেটি উপর দাগ রেখে যায় এমন কিছু দিয়ে ঘষে ছাপ সৃষ্টি করা) থেকে সংগৃহীত তৈরি সামগ্রীর কোলাজ অবধি। ১৯২০-এর দশকের শুরুর দিকে করা তার কাজগুলো এর চেতনায় পরাবাস্তববাদী ছিল। তার ‘সেলেবস’ (১৯২১) চিত্রকর্মে তিনি আফ্রিকার একটি ‘কর্ন বিন’ বা শস্যাধার এঁকেছিলেন, যেন এটি একটি হাতি। হাতিটি তার শিংসহ মাথাটি একদিকে ঘুরিয়ে রেখেছে, যেন সে হাতে লাল

দস্তানা পরা মস্তকহীন নগ্ন একটি নারীকে অনুসরণ করার ভাবছে।

অবচেতনের গভীরতর স্তরে প্রবেশ করে পরাবাস্তববাদী শিল্পীরা তাদের কল্পনাকে মুক্ত করে দিতে চেয়েছিলেন। যে স্তরটি আপনার মনের সেই অংশটি তৈরি করে, যা আপনি কোনো চিন্তা করা ছাড়াই ব্যবহার করেন, যখন আপনি স্বপ্ন দেখেন বা আনমনে আঁকিবুকি দাগ আঁকেন। সিগমন্ড ফ্রয়েডের প্রভাবশালী মনোবিশ্লেষণ এবং তার যৌনতা আর অবচেতন নিয়ে প্রস্তাবিত তত্ত্বগুলোর উপর ভিত্তি করে তারা তাদের ধারণাগুলো আরো সম্প্রসারিত করেছিলেন। তারা চেয়েছিলেন যেন যুক্তির কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়া ছবি আর শব্দগুলো প্রবাহিত হতে পারে। ব্রেতোঁ উনবিংশ শতাব্দীর লেখক কোমত দ্য লাউট্রেমোঁর একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন, যখন তিনি পরাবাস্তববাদকে আকস্মিকতা বা সম্ভাবনার প্রতি উন্মুক্ত হিসেবে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, এটি 'শল্যচিকিৎসার টেবিলে একটি সেলাই মেশিন আর একটি ছাতার দৈবাৎ ঘটা সাক্ষাৎকারের' মতোই সুন্দর।

এই আন্দোলনের সাথে যে শিল্পীরা সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন সালভাডর ডালি (১৯০৪-১৯৮৯), রেনে মাগ্রিট (১৮৯৮-১৯৬৭) এবং মেরেট ওপেনহাইম (১৯১৩ -১৯৮৫)। তারা প্রত্যেকেই বিচিত্র ধরনের বস্তু আর উপাদান একত্রিত করেছিলেন দর্শকদের বিস্মিত এবং সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলতে। ডালির 'লবস্টার টেলিফোন' (১৯৩৮) শীর্ষক যৌগিক এই শিল্পকর্মে একটি লাল প্লাস্টারে তৈরি লবস্টার সাধারণ একটি টেলিফোনের রিসিভারে উপর বাঁকা হয়ে শুয়ে আছে।

মাগ্রিটের ‘দ্য ট্রেচারি অব ওয়ার্ডস’ (১৯২৭) একটি পাইপের চিত্রকর্ম, যেখানে এর নীচে লেখা আছে ‘এটি পাইপ নয়’। ওপেনহাইমারের ১৯৩৭ সালের ‘অবজেক্ট’ শিল্পকর্মে গ্যাজেলের ফার বা লোমাশ চামড়া দিয়ে তিনি একটি চায়ের কাপ ও পেয়ালাকে আবৃত করেছিলেন, এমন কিছু যার উপর হাত বোলানো যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও খুব অস্বস্তিকর এবং নিত্য ব্যবহৃত একটি উপাদান থেকে তৈরি অদ্ভুত একটি বস্তু।

পরাবাস্তববাদ ছিল সুবিশাল একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন যা ১৯৩০-এর দশকে ক্রমশ আরো সম্প্রসারিত হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ ‘সুরিয়ালিস্ট’ গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আইলিন আগার (১৮৮৯-১৯৯১) সেই বছর লন্ডনে পরাবাস্তববাদী শিল্পীদের প্রথম প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন। আগার তার ‘অ্যানজেল অব অ্যানার্কি’ সৃষ্টি করতে একটি ম্যানিকুইনের মাথা কাপড় আর পালক দিয়ে আবৃত করেছিলেন । একটি ফিতা এর চোখ বেঁধে রেখেছে, যা ইঙ্গিত করছে অনুপ্রেরণার জন্য আমাদের ভিতরের দিকে তাকানোই উচিত হবে (বাইরের দিকে নয়)।

আফ্রো-কিউবান শিল্পী উইলফ্রেডো লাম (১৯০২-১৯৮২) একই ভাবে ১৯৩০-এর দশকে পরাবাস্তবতার জগতে প্রবেশ করেছিলেন, পিকাসোর মাধ্যমে তিনি ব্রেতোঁ ও মিরোর সাথে তার দেখা হয়েছিল, যখন ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্যারিসে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। সেই সময় নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমি আরো অনেক গভীরভাবে আঁকতে শুরু করেছিলাম.....আর এই অদ্ভুত জগত আমার ভিতর থেকে বাইরে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল'।

এর ব্যতিক্রম, ১৯৩০-এর দশকে আমেরিকা ও মেক্সিকোর শিল্পীরা এক ধরনের সামাজিক বাস্তবতাবাদ অনুসরণ করতে শুরু করেছিলেন (সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বার্তাসহ বাস্তববাদী শিল্পকর্ম)। আমরা তাদের শিল্পকলা নিয়ে আগামী অধ্যায়ে আলোচনা করব। কিন্তু এই সময়ে সামাজিক বাস্তবতাবাদ সবসময় স্বেচ্ছায় নির্বাচনের ভিত্তিতে গৃহীত হয়নি, ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে, ১৯২২ থেকে ১৯৯১ সাল

অবধি যে নামে রাশিয়া পরিচিত ছিল, সেই দেশটির শিল্পকলায় 'সামাজিক বাস্তবতাবাদ ' সরকারীভাবে স্বীকৃত শৈলী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে শিল্পকলাকে হতে হয়েছিল এমন কিছু - যা সহজে বোঝা সম্ভব, এবং যা কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বাসকে প্রচার করতে পারে - সুদৃঢ় জাতীয়তাবাদ এবং সমষ্টিগত মালিকানা ও শ্রম। শুধুমাত্র অনুপ্রাণিত করা প্রতিনিধিত্বমূলক শৈলী অনুমোদন করা হয়েছিল, বাকি সব ধরনের শিল্পকলাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ভেরা মুখিনার (১৮৮৯-১৯৫৩) সুবিশাল ভাস্কর্য, "ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার অ্যান্ড কালেকটিভ ফার্ম গার্ল" সোভিয়েত সামাজিক বাস্তবতাবাদের একটি উদাহরণ। ইস্পাতের পাত ব্যবহার করে নির্মিত আদর্শায়িত একজন নারী ও পুরুষ হাতে হাতুড়ী আর কাস্তে ওপরে ধরে ভবিষ্যত অভিমূখে বলিষ্ঠ একটি পদক্ষেপ নিয়ে দাড়িয়ে আছে। তাদের হাতে ধরা কাজের এই উপকরণগুলো নতুন সোভিয়েত পতাকার নির্বাচিত প্রতীকও ছিল। প্রায় ২৫ মিটার উচ্চতার একটি ভাস্কর্যটি একটি দানবীয় মাত্রার প্রচারণা শিল্পকর্ম। ১৯৩৭ সালের প্যারিসে বিশ্ব মেলায় এটি সোভিয়েত প্যাভেলিয়নের উপরে স্থাপন করা হয়েছিল, পরবর্তীতে মস্কো শহরে একটি উন্মুক্তভাবে প্রদর্শিত হয়ে আসছে।

জার্মানিতেও আধুনিক ও আভো-গার্ড শিল্পকলাও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের শিকার হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে অ্যাডোলফ হিটলারের নাৎসি পার্টি একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল, যার শিরোনাম ছিল 'এনটারটেটে কুনস্ট' (অধঃপতিত শিল্পকলা) এবং মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি রাষ্ট্রীয় কমিটি ১০০টি মিউজিয়াম থেকে হতবাক করে দেবার মতো ১৭,০০০ শিল্পকর্ম সংগ্রহ করেছিল (সেগুলো আর কখনোই ফেরত দেয়া হয়নি, এবং অধিকাংশই ধ্বংস করা হয়েছিল)। প্রায় ৬৫০ টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল, যা জার্মানির নানা শহর প্রদক্ষিণ করেছিল এবং তিন মিলিয়ন দর্শক সেগুলো দেখেছিল। এটি মূলত পরিকল্পিত হয়েছিল প্রদর্শন করতে যে, আভোঁ গার্ড ও আধুনিক শিল্পকলা কীভাবে অধঃপতিত অথবা নৈতিকভাবে ক্ষতিকর হতে পারে। নাৎসীরা যে-কোনো শিল্পকর্মই ঘৃণা করতো যা শরীরকে বিকৃত করতো, কিংবা একক কোনো ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করতো। শতাধিক শিল্পীকে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন জার্মান অভিব্যক্তিবাদী শিল্পী, যেমন আর্নস্ট এবং মার্ক। পিকাসো, মনড্রিয়ান এবং কানডিনস্কির কাজও প্রদর্শিত হয়েছিল। শিল্পকর্মগুলোকে নিন্দাজ্ঞাপন করে প্রদর্শনী কক্ষের দেয়ালগুলো আবৃত করে ছিল নানা স্লোগান এবং প্রচারণামূলক লেখা।

এই 'অধঃপতিত শিল্পকলা' প্রদর্শনীর সাথে আরেকটি প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়েছিল, 'গ্রেট জার্মান আর্ট এক্সজিবিশন' - যে প্রদর্শনীটির উদ্বোধন একদিন আগে হয়েছিল, এবং সেখানে জায়গা পেয়েছিল নিওক্ল্যাসিকাল বা নব্যধ্রুপদী শিল্পকর্মগুলো, যা নাৎসিরা মনে করতো জার্মান অনুভূতিতে পরিপৃক্ত। তবে এই প্রদর্শনীর দর্শক সংখ্যা 'অধঃপতিত' শিল্পকলার প্রদর্শনীর মাত্র এক পঞ্চমাংশ ছিল, যেখানে প্রতিদিন ২০,০০০ দর্শনার্থী ভিড় করেছিলেন। এই প্রদর্শনীতে দর্শক প্রতিক্রিয়াও ছিল বিচিত্র, চিত্রকর্মের উপর কারো থুতু নিক্ষেপ থেকে শুরু করে কারো কারো বার বার ফিরে আসা। শিল্পী হশ মোট চার বার প্রদর্শনীটি দেখেছিলেন। এটি এখনো অবধি সর্বোচ্চ দর্শনার্থী ভ্রমণ

করেছেন এমন একটি আধুনিক শিল্পকলা প্রদর্শনী।

৩

একই বছর প্যারিসে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের বিশ্বমেলায় জার্মান প্যাভেলিয়নটি উন্মোচন করা হয়েছিল । এটি খুবই কঠোর দর্শন চুনাপাথরের ভবন, যার উপরে স্থাপন করা হয়েছিল একটি বিশাল সোনালী ঈগল। এটির স্থাপত্য শক্তির শূন্য অভিব্যক্তি ও সোভিয়েত প্যাভিলিয়ন এবং মুখিনার সুবিশাল ফিগারিটিভ ভাস্কর্য মুখোমুখি অবস্থান করে ছিল। শান্তিরক্ষক হিসেবে তাদের মধ্যে দাড়িয়ে ছিল আইফেল টাওয়ার, যা সোভিয়েত কম্যুনিস্টদের স্বৈরতন্ত্রকে নাৎসিদের থার্ড রাইখ স্বৈরতন্ত্র থেকে পৃথক করে রেখেছিল। এর ব্যতিক্রম স্প্যানিশ প্যাভিলিয়ন ছিল বেশ নীচু আধুনিক স্থাপত্যের একটি নির্মাণ, বাতাস ও কাচের উন্মুক্ত পরিসর। এখানে মিরো এবং পিকাসোর রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত দুটি চিত্রকর্ম স্থাপন করা হয়েছিল, গৃহযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দুটোই কমিশন দিয়েছিল স্প্যানিশ সরকার। যে গৃহযুদ্ধটির সূচনা করেছিল ডানপন্থী জাতীয়তাদীদের একটি সামরিক অভ্যুত্থান, যার নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল ফ্রাঙ্কো, এবং তখনো গৃহযুদ্ধটি স্পেনে চলমান ছিল।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ২৬ এপ্রিল নাৎসি এবং ইটালির ফ্যাসিবাদী সরকার ফ্রাঙ্কোকে সহায়তা করেছিল ‘গেরনিকা’ নামক একটি বাস্ক শহরের উপর বোমা বর্ষণ করে, যেখানে বহু শত বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করা হয়েছিল। পিকাসোর প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়ঙ্করভাবে তীব্র চিত্রকর্ম - ‘গেরনিকা’। প্রায় আট মিটার প্রশস্ত, এবং পুরোটাই সাদা আর কালো রঙে আঁকা হয়েছিল। আকারে ও রঙে এটি নিউজ রিলের ফুটেজ বা দৃশ্যচিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি একটি ঘৃণ্য বোমা হামলাকে আগুনের শিখা, চিৎকাররত নারী আর প্রাণী, মৃত শিশু, নিহত সৈন্যদের কিউবিস্ট দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছিল, একটি সুবিশাল যুদ্ধ বিরোধী বার্তা যা পরবর্তীতে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেছিল।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে)

(১) George Grosz, A Victim of Society
(২) Raoul Hausmann, Spirit of the Age: Mechanical Head
(৩) Hannah Höch, Cut with the Kitchen Knife Dada through the Beer-Belly of the Weimar Republic,
(৪) Alfred Stieglitz, Reflections: Night
(৫) Claude Cahun, Que me veux-tu?
(৬) Man Ray, Noire et Blanche
(৭) Joan Miró ,The Hunter (Catalan Landscape)
(৮) Max Ernst, The Elephant Celebes
(৯) Salvador Dalí, Lobster Telephone (also known as Aphrodisiac Telephone)
(১০) René Magritte, The Treachery of Images
(১১) Meret Oppenheim. Object
(১২) Eileen Agar, Angel of Anarchy
(১২) Wifredo Lam, Hurricane
(১৩) Vera Mukhina Worker and Kolkhoz Woman
(১৪) Soviet pavilion opposite to the pavilion of Nazi Germany at the 1937 World's Fair in Paris
(১৫) Pablo Picasso, Guernica

অধ্যায় ৩৩ - স্বাধীন মানুষদের দেশ?

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ, ফ্রিডা কাহলো তার স্বামী ডিয়েগো রিভেরাকে ডেট্রোয়েট ইন্সস্টিটিউট অব আর্টের পক্ষ থেকে ডেট্রোয়েটের গাড়ি কারখানা আর শ্রমিকদের জীবন নিয়ে সুবিশাল একটি ম্যুরাল (দেয়ালচিত্র) আঁকতে দেখছিলেন। ফ্রিডা কাহলো ও ডিয়োগো রিভেরা দুজনেই মেক্সিকোর অধিবাসী, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে তারা প্রায় তিন বছর অবস্থান করেছিলেন। রিভেরা দেশটির বিভিন্ন এলাকায় ম্যুরাল তৈরি করেছিলেন, এবং কাহলো তার শক্তিশালী মর্মস্পর্শী আত্মপ্রতিকৃতিগুলো এঁকেছিলেন।

রিভেরাকে প্রথম দেখার দিনটির কথা ফ্রিডা স্মরণ করেছিলেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ রিভেরা মেক্সিকো সিটিতে তার স্কুলের মিলনায়তনের দেয়ালে একটি ম্যুরাল আঁকছিলেন। তার বয়স তখন ছত্রিশ, এবং প্যারিস থেকে সদ্য দেশে ফিরেছেন, যেখানে দক্ষ ও প্রতিভাবান একজন শিল্পী হিসেবে তিনি তার পরিচিতি অর্জন করেছিলেন, এবং পিকাসোর সাথে সময় কাটিয়েছিলেন। রিভেরা যখন প্রবাসে, মেক্সিকো তখন অস্থিতিশীল রাজনৈতিক একটি পর্বের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিল, কিন্তু নতুন একটি সমাজতান্ত্রিক সরকার মেক্সিকোর নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লড়াই করতে বদ্ধপরিকর ছিল , এবং সরকার রিভেরা মতো শিল্পীদের দেশব্যাপী পরিবর্তন অনুপ্রাণিত করতে কাজে লাগিয়েছিলেন। রিভেরা ছিলেন সেই সব মেক্সিকান ম্যুরাল শিল্পীদের একজন, নতুন একটি জাতীয় পরিচয় প্রতিপালন করার লক্ষ্যে স্থানীয় ইতিহাস থেকে অনুপ্রাণিত করার মতো কাহিনী ব্যবহার করে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দেয়াল ম্যুরালে আবৃত করতে যাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল এর মাধ্যমে তারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করতে পারবেন, এবং উপনিবেশিক নির্মাণ কিংবা ইউরোপীয় প্রভাবে পরিবর্তে রিভেরা অ্যাজটেক মন্দির, প্রাক-কলম্বিয়ান ভাস্কর্য এবং মেক্সিকোর শ্রমজীবী মানুষদের এঁকেছিলেন ।

কাহলো স্মরণ করেছিলেন, অস্থায়ীভাবে নির্মিত মাচার ওপরে দাড়িয়ে রিভেরা সেদিন স্কুলের মিলনায়তনে তার 'ক্রিয়েশন' ম্যুরালের জন্য বিশাল আকারে মেক্সিকোবাসীদের আঁকছিলেন, এবং রিভেরা অবশ্য লক্ষ করেননি সেখানে অন্য কেউ প্রবেশ করেছে। মিলনায়তনে তখন শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার ছিল না, কিন্তু ফ্রিডা সেই নিষেধাজ্ঞাটি উপেক্ষা করেছিলেন। তার বয়স তখন পনেরো, তখনো তিনি স্কুলে। মাথায়

স্টেটসন টুপি আর শ্রমিকের পোষাক পরণে বিশালাকৃতি এই ব্যক্তি ফ্রিডাকে কৌতূহলী করে তুলেছিল। যদিও ফ্রিডার মনে হয়েছিল লোকটি একটি ব্যাঙের মতোদেখতে। সেই দিন ফ্রিডা তার মধ্যাহ্ন ভোজনের কিছু অংশ চুরি করেছিলেন। এরপর তিনি প্রায়ই মিলনায়তনে ফিরে এসেছিলেন রিভেরার ছবি আঁকা দেখতে, কিন্তু তখনো তিনি নিজে গুরুত্বের সাথে আঁকতে শুরু করেননি, এর তিন বছর পরে যা তিনি শুরু করেছিলেন যখন একটি বাস দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে একটি অনুষ্ঠানে তার সাথে রিভেরার আবারো দেখা হয়েছিল, এবং বয়সে অনেক ব্যবধান সত্ত্বেও তারা পরস্পরকে ভালোবেসেছিলেন এবং বিয়ে করেছিলেন।

নিজের কাজে ফিরে আসার তীব্র আগ্রহসহ সেখান থেকে বিদায় নেবার আগে কাহলো ডেট্রোয়েট ম্যুরাল আঁকার মঞ্চে বেশ উঁচুতে দাড়ানো রিভেরার দিকে একবার শেষবারের মতো তাকালেন।

*

যখন ডিয়েগো রিভেরা (১৮৮৬-১৯৫৭) তার ‘ডেট্রোয়েট ইন্ডাস্ট্রি ম্যুরালস’ শেষ করছিলেন, ফ্রিডা কাহলো (১৯০৭-১৯৫৪) তার ‘সেল্ফ পোর্ট্রেইট অন দ্য বর্ডারলাইন বিটউইন মেক্সিকো অ্যান্ড দ্য ইউনাইটেড স্টেটস’ এঁকেছিলেন। দুটি পার্থক্যসূচক দৃশ্যের মাঝখানে মেঝে অবধি দীর্ঘ গোলাপী রঙের একটি জামা পরে ফ্রিডা তার এই আত্মপ্রতিকৃতিতে দাড়িয়ে আছেন। ডানে সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারসহ মেক্সিকোর উর্বর ভূমি, এবং তার বামে শিল্পায়িত আমেরিকা, যেখানে আমেরিকার জাতীয় পতাকাটি ফোর্ডের গাড়ি নির্মাণ কারখানা থেকে নির্গত ধোয়ার পেছনে অস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। তিনি

তার হাতে মেক্সিকোর জাতীয় পতাকা ধরে আছেন, এবং মেক্সিকোর মাটিতে মরুভূমির উদ্ভিদগুলোর গভীর শিকড় দেশটির সাথে তার নিজের অঙ্গীভূত অনুভব করার বোধটিরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তিনি আমেরিকায় কাজ করেছিলেন, রিভেরার পাশাপাশি, কিন্তু তার হৃদয় , তাদের হৃদয়, আসলে তারা মেক্সিকোয় রেখে এসেছিলেন।

আঠারো বছর বয়সে ভয়ঙ্কর একটি বাস দুর্ঘটনার পরে, কাহলো তার বাকি জীবনের প্রতিটি দিনই শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় কাটিয়েছিলেন। তার মেরুদণ্ডের একাংশ, কোমর, ডান-পা একাধিক জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছিল, এবং বহু মাস ধরেই তিনি প্লাস্টারে আবৃত হয়ে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। যখন তিনি প্রথম আহত হয়ে বিছানায়, তার মা তাকে একটি বিশেষ ইজেল তৈরি করে দিয়েছিলেন, যেন তিনি বিছানায় শুয়ে ছবি আঁকতে পারেন। তিনি প্রধানত তীব্র অভিব্যক্তিপূর্ণ আত্মপ্রতিকৃতি এঁকেছিলেন, যা সরাসরি তার আবেগের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল, এবং এছাড়াও প্রায়শই সেগুলো তার ভেঙ্গে যাওয়া শরীরকে প্রতিফলিত করেছে। কখনো তিনি তার হৃৎপিণ্ড এঁকেছেন, ধমনীগুলো সাপের মতো তার শরীর ও হাত-পা ঘিরে বিস্তৃত হয়ে আছে, অথবা তিনি তার মেরুদণ্ডকে এঁকেছেন, যেন কোনো গ্রিক মন্দিরের ভেঙ্গে ধ্বসে পড়া স্তম্ভ। অন্য একটি চিত্রকর্মে তার চোখ থেকে আমরা অশ্রু ঝরতে দেখি, অথবা তিনি রক্তে সিক্ত কিংবা তীরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত। তার চিত্রকর্মে তিনি ঠিক কী অনুভব করছেন সেটি প্রকাশ করতে কখনোই সংকোচবোধ করেননি, কিন্তু তিনি কখনোই চাননি যে, মানুষ তাকে

করুণা করুক। তাদের জীবদ্দশায় রিভেরার খ্যাতি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু কাহলোর ক্যানভাসে উপস্থিত বলিষ্ঠ আবেগের সেই উষ্ণতাই আজ আমাদের সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ করতে পারে।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে নিউ ইয়র্কে সদ্য উদ্বোধন করা মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টে রিভেরার পেশাগত জীবনে বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি করা শিল্পকর্ম নিয়ে একটি বড় রেট্রোস্পেকটিভ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমেরিকানরা তার শিল্পকর্ম ভালোবেসেছিল: ইউরোপ থেকে আমেরিকায় পরিশ্রুত হতে থাকা বিমূর্ত শিল্পকলার ব্যতিক্রম রিভেরার কাজ সহজবোধ্য ছিল। রিভেরা ও কাহলো 'সেলেব্রিটি' হিসাবে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

একই সময়ে ডরোথি ডান (১৯০৩-১৯৯২) নিউ মেক্সিকোর সান্টা ফে ইন্ডিয়ান স্কুলের অংশ হিসেবে একটি স্টুডিও স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছিলেন। তার চিত্রকর্ম প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে যোগ দিতে আদিবাসী আমেরিকানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, এবং অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন, যেমন, পপ চালি (মেরিনা লুহান, ১৯০৬-১৯৯৩), পরে হোসে ভিনসেন্টে আগিলার (সুয়া পিন, জন্ম ১৯২৪)। ডান ভারী বহিঃরেখা এবং রঙের সমতল বিস্তারসহ ছবি আঁকার বিশেষ ধরনের একটি কৌশলের প্রশিক্ষণ দিতেন। তবে ধারণা আর বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসন্ধান করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। যদিও স্কুলের শিক্ষার্থীদের সবারই প্রায় একই ধরনের আঁকার

শৈলী অনুসরণ করার ঝুঁকি ছিল, কিন্তু এই স্কুল থেকে প্রশিক্ষিত বহু শিল্পী গুরুত্বপূর্ণ ও ভিত্তিমূলক নির্দেশনা দেবার জন্য স্টুডিও স্কুলের প্রশংসা করেছিলেন । এটি ছিল এমন একটি জায়গা, যেখানে তারা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করার অনুমতি পেয়েছিলেন। তাদের কাজ আরো বিস্তৃতভাবে জনপ্রিয় সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছিল। অ্যানিমেটর এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক ওয়াল্ট ডিজনি এই স্কুল পরিদর্শন করেছিলেন এবং চালির চিত্রকর্ম তাকে দারুণ আকর্ষণ করেছিল, বিশেষ করে তার দীর্ঘ পায়ের ঘোড়া আর হরিণ যারা কল্পনার বনে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি তার একটি জল রঙ কিনেছিলেন, এবং তার ১৯৪২ সালের চলচ্চিত্র ‘বাম্বি’ চালির কাজের প্রতি অনেকাংশেই ঋণী।

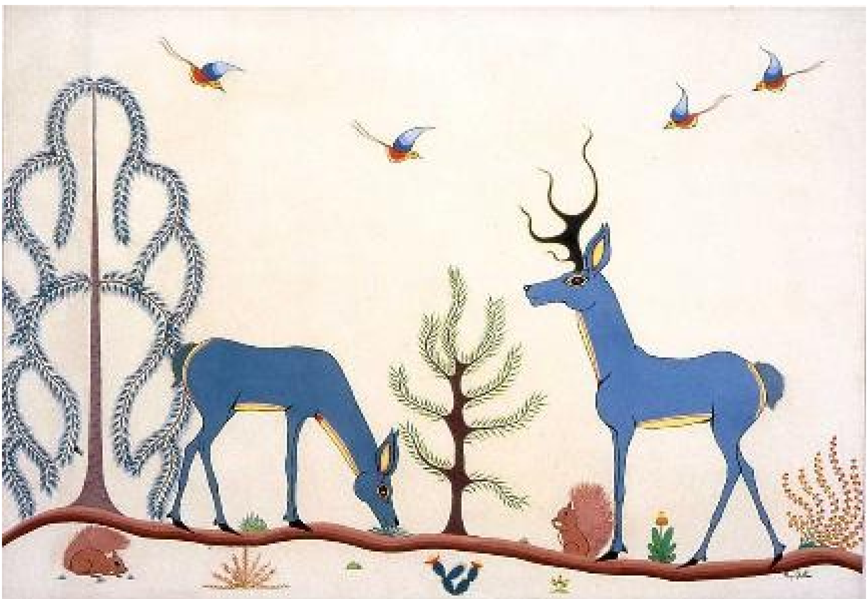

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে রিভেরা সুবিশাল ‘ডেট্রোয়েট ইন্ডাস্ট্রি মিউরালস’ শেষ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন এটাই তার জীবনের সবচেয়ে সেরা কাজ। এটি ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় কমিশন, ২০,০০০ ডলার, এবং এই পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন ডেট্রোয়েটে ফোর্ড গাড়ি নির্মাণ কারখানার প্রতিষ্ঠাতার ছেলে এডসেল ফোর্ড। এর বিষয়বস্তু ছিল ফোর্ড পরিবারের নিজস্ব কারখানা, সেই সময়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গাড়ি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান। রিভেরা ইস্পাত ধুসর সুবিশাল উচ্চতার যন্ত্রগুলো এঁকেছিলেন, কারখানার মেঝেতে যখন ওভারঅল আর চ্যাপটা টুপি পরা শ্রমিকরা গাড়ির অংশগুলো প্রক্রিয়াজাত করছে, তখন সেগুলো যেন সশব্দে ঘূর্ণিত আর আবর্তিত হচ্ছে। গম্ভীর পুরুষরা টাই পরে উৎপাদন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করছেন, তাদের হাতে ধরা ক্লিপবোর্ডগুলো অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করছে। এটি স্পষ্ট কাদের প্রতি বামপন্থী রিভেরার সহানুভূতি ছিল, এবং সেটি অবশ্যই মালিক পক্ষ ছিল না।

রিভেরা তিন বছর আমেরিকায় ছিলেন এবং এই সময়ে ফোর্ডের কারখানায় শ্রমিকদের সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস করা হয়েছিল, সেই সাথে কমেছিল তাদের বেতনও। ডেট্রয়েটে শ্রমিকদের প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল এবং ক্রমশ গ্রেট ডিপ্রেশন বা মহামন্দা আমেরিকার অর্থনীতি আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা প্রধানতম বৈদেশিক বিনিয়োগকারীতে পরিণত হয়েছিল, এবং পরিণতিতে এর অর্থনীতি দারুণ সাফল্য দেখেছিল। যন্ত্রনির্মাণ এবং উৎপাদনে এটি সারা পৃথিবীকে পথ দেখিয়েছিল এবং পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৯ সালে আমেরিকার পুঁজি বাজারে ধ্বস নেমেছিল, শেয়ার বাজারে ব্যাপক পতন শুরু হয়েছিল, আমরা এখন যা কুখ্যাত ‘ওয়াল স্ট্রিট ক্র্যাশ’ হিসেবে চিনি, কারখানাজাত দ্রব্যের সরবরাহ দ্রুত কমে এসেছিল। যে সময় নাগাদ রিভেরা ‘ডেট্রোয়েট ইন্ডাস্ট্রি মিউরালস’ শেষ করেছিলেন, আমেরিকার সমৃদ্ধির চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছিল। সরকারকে উদ্যোগ নিতে হয়েছিল নানা প্রকল্প উদ্ধার ও সংস্কার করতে, যখন গণ বেকারত্ব বহু মিলিয়ন মানুষকে চরম দারিদ্রসীমার নীচে ঠেলে দিয়েছিল। ‘ফার্ম সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের’ মতো প্রকল্পগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল গ্রামীন দারিদ্র মোকাবেলা করতে, এবং ডরোথি ল্যাঞ্জ (১৮৯৫-১৯৬৫) এবং ওয়াকার ইভান্সের (১৯০৩-১৯৭৫) মতো আলোকচিত্রীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল কৃষক পরিবারগুলোর ভাগ্য লিপিবদ্ধ করতে, যারা পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়া অভিমূখে অভিপ্রয়াণ করেছিল, যান্ত্রিক আগ্রাসন আর অনাবৃষ্টি যাদের নিজেদের ভূমি থেকে উৎখাত করেছিল।

১৯৩০-এর দশকে আমেরিকার শিল্পকলায় ‘দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন’ অর্থনৈতিক মহামন্দার উল্লেখযোগ্য একটি প্রভাব পড়েছিল, যা বাস্তবানুগ চিত্রকর্ম আঁকার প্রবণতার দিকে শিল্পীদের পরিচালিত করেছিল, আজ যেগুলো একত্রে ‘রিজিয়নালিজম’ শিরোনামের অধীনে বিন্যস্ত করা হয়। পত্রপত্রিকাগুলো এইসব শিল্পকর্মগুলোকে প্রকৃত ‘আমেরিকান ’ শিল্পকলা হিসেবে সমর্থন করেছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে গ্রান্ট উডের (১৮৯১ -১৯৪২) আঁকা ‘আমেরিকান গথিক’ এই সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত ও বৈশিষ্ট্যসূচক চিত্রকর্ম। একজন পুরুষ খসখসে মোটা ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া সুতির কাপড় (ডুংগারি) পরিহিত, যা র হাতে একটি পিচফর্ক (আঁচড়া), যা আলো প্রতিফলিত করছে, এবং আমাদের দিকে তিনি সরাসরি তাকিয়ে আছেন, গোলাকার ধাতুর ফ্রেমের চমশা তার শান্ত বাদামী চোখ ঘিরে আছে, আঁটসাট রেখার মতো করে আঁকা যার প্রশস্ত মুখ। তার পাশেই দাড়িয়ে আছেন একজন নারী, কাপড়ের উপর একটি ‘পিনাফোর’, ঢিলা আঙরাখা, যা ইঙ্গিত করছে তিনি কাজ করছিলেন এবং কাপড় যেন ময়লা না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক ছিলেন। পুরুষটির মতো তিনি বাইরে সরাসরি দর্শকদের দিকে নয় বরং এক পাশে তাকিয়ে আছেন, কোনো দুশ্চিন্তা তার ভ্রূ কুঞ্চনের কারণ হয়েছে। নারীটি পুরুষটির খানিকটা পেছনে দাড়িয়ে আছেন, যেন পুরুষটি তার সুরক্ষার দায়িত্বে আছেন, সে কি তার স্ত্রী অথবা তার কন্যা? তাদের সম্পর্ক অস্পষ্ট, এবং এটাই এই চিত্রকর্মটিকে এর শক্তি প্রদান করেছে। আমরা চিত্রকর্মটি দেখি এবং সেটি খোঁজার চেষ্টা করি। তিনি কী সুরক্ষা করছেন ? তাদের পেছনের কাঠের বাড়িটি কী তাদের বাড়ি? তার অস্ত্র কী শুধু এই পিচফর্কটি। শিল্পী কী চেয়েছেন আমরা তাদের নিয়ে হাসি, নাকি তাদের প্রশংসা করি। ১৮৯০-এর দশকের কেতায় তারা কাপড় পরেছেন, এবং উড তার বোন ন্যান ও স্থানীয় দন্তচিকিৎসককে এই চিত্রকর্মে মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু বিস্তারিত যে সতর্কতার সাথে উড তাদের এঁকেছিলেন সেটি এই চিত্রকর্মটিকে বাস্তবতার একটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল, সেটি আমরা বিশ্বাস না করে পারি না।

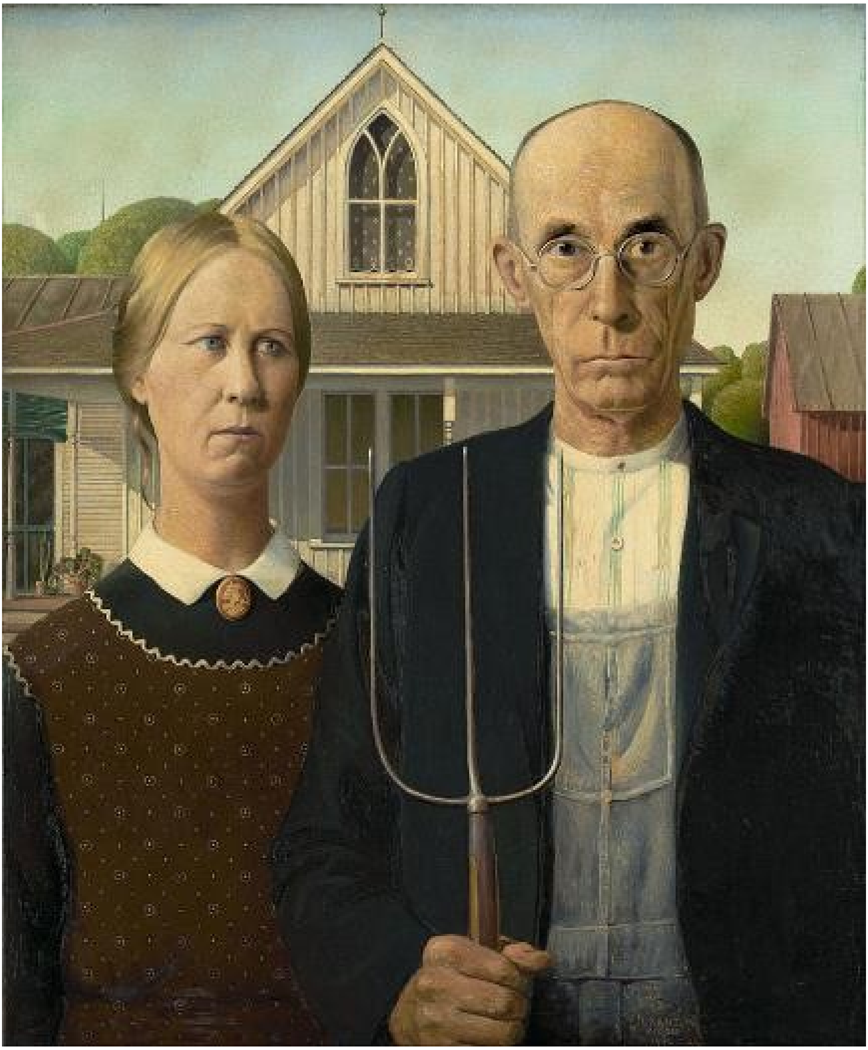

একজন শিল্পী এমনকি ১৯৩০-এর আমেরিকার ঘটনাপঞ্জি ইতিবৃত্তকার হিসেবে 'রিজিয়নালিজম' ঘরানার শিল্পীদেরও হারিয়ে দিয়েছিলেন। এডওয়ার্ড হপার (১৮৮২-১৯৬৭) সম্পূর্ণভাবে শিল্পী হিসেবে জীবন শুরু করার আগে অলঙ্করক হিসেবে কাজ করেছিলেন, তার এই রূপান্তরটি এসেছিল বিয়াল্লিশ বছর বয়সে। হপার সিনেমা ও মঞ্চ ভালোবাসতেন, তার শিল্পকলায় সিনেমার পোস্টার ডিজাইন করার পূর্বতন প্রশিক্ষণের খানিকটা ছাপ ছিল - যেভাবে তিনি তার পটভূমি নির্মাণ করতেন, অনেকটা মঞ্চের মতো, এবং তার চরিত্রগুলো এর মধ্যে স্থাপন করতেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তার 'নিউ ইয়র্ক মুভি' চিত্রকর্মে অল্পকিছু দর্শকতে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে একটি সাদা কালো চলচ্চিত্র দেখতে

দেখি। পাশের করিডোরে নীল জ্যাকেট আর ট্রাউজার পরা একজন নারী 'আশার' (প্রেক্ষাগৃহে যারা দর্শকদের আসন দেখিয়ে দেয়), দেয়ালে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে আছেন, তার হিল পরা ক্লান্ত পাগুলোকে স্বস্তি দিচ্ছেন ভার খানিকটা কমিয়ে। কিন্তু তিনি চিন্তায় নিমগ্ন, তার মুখ নীচের দিকে ঝুকে আছে, যিনি বহির্গমনের পথের সামনে দাড়িয়ে আছেন সিনেমা শেষ হবার অপেক্ষায়। হপার তার বিষণ্নতা আর একাকীত্ব ধারণ করেছিলেন, এবং এমনভাবে এটি বিবর্ধিত করেছিলেন, যেন পুরো শহর, পুরো একটি দেশের নিঃসঙ্গতা আজও আমরা অনুভব করতে পারি।

১৯৩০-এর দশকে হপার দারুণ সফলতা অর্জন করেছিলেন। 'দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন' আমেরিকার অকৃত্রিম আর বাস্তবানুগ চিত্রকর্মের চাহিদায় জ্বালানি হিসেবে কাজ করেছিল। হপারের পৃথিবী - কেপ কডের বাতিঘর, গ্রামীন গ্যাস স্টেশন, নিউ ইয়র্কের সংকীর্ণ অ্যাপার্টমেন্ট এবং গভীর রাতের ক্যাফে, এই সবকিছু একটি ব্যপক আবেদন সৃষ্টি করেছিল। বড় জাদুঘরগুলো তার চিত্রকর্ম কিনেছিল এবং বহু প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি প্রাত্যহিক দিনের সৌন্দর্যটি ধরেছিলেন, যেভাবে আলো একটি দেয়ালকে আলোকিত করে অথবা অন্ধকার জানালায় প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পরিশেষে আধুনিক আমেরিকান জীবনের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতাকে ধারণ করার কারণেই তিনি মূলত নজরে এসেছিলেন।

জ্যাকব লরেন্স (১৯১৭-২০০০) অর্থনৈতিক মহামন্দার ভিন্ন একটি ইতিহাসের ইতিবৃত্তকার ছিলেন, যার শিকড় প্রোথিত ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, এবং যা অব্যাহত ছিল ১৯৭০ অবধি। 'দ্য গ্রেট মাইগ্রেশন' বা মহা অভিপ্রয়াণে প্রায় ছয় মিলিয়ন আফ্রিকান-আমেরিকান মানুষ আমেরিকার গ্রামীণ দক্ষিণ থেকে উত্তরের শিল্পোন্নত শহরগুলোয় স্থানান্তরিত হয়েছিল কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ পাবার আশা অথবা প্রতিশ্রুতি নিয়ে। এই অভিপ্রয়াণকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল, অনাবৃষ্টি আর মড়ক, যা ক্ষেতের ফসল ধ্বংস

করেছিল, আর সেই কারণে দরিদ্র বর্গাচাষীদের জীবিকাও সমাপ্ত হয়েছিল। এই চলমান অভিপ্রয়াণের প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪০-এর দশকে লরেন্স চিত্রকর্মের ষাটটি প্যানেল সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন, সাথের ক্যাপশনগুলো এই স্থানান্তরের কারণ, এবং যারা এই কষ্টসাধ্য যাত্রাটি করেছিলেন তাদের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছিল, এবং যার মধ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল 'লিন্চিং' (ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা) এবং নতুন স্তরের বর্ণবিদ্বেষ যা তারা উত্তরে খুঁজে পেয়েছিলেন।

নিউ ইয়র্কের হারলেমে আফ্রিকান-আমেরিকান শিল্পী লরেন্স বড় হয়েছিলেন হারলেম রেনেসাঁ পর্বে - সৃজনশীল কৃষ্ণাঙ্গ প্রতিভা বিস্ফোরণের যে পর্বে শিল্পকলার প্রতিটি ক্ষেত্রে অসাম্যতাও বৈষম্য নিয়ে ক্রমবর্ধমান সচেতনতাটিকে শিল্পীরা কৃষ্ণাঙ্গ জীবনের আত্মমর্যাদা ও গর্বের সাথে যুক্ত করেছিলেন। ১৯৩০-এর দশকে হারলেম দক্ষিণ থেকে আসা বহু আফ্রিকান-আমেরিকার পরিবারকে আকর্ষণ করেছিল। লরেন্স তাদের এই উত্তরে অভিপ্রয়াণের ('কামিং আপ') কাহিনী শুনেছিলেন এবং চিত্রকর্মে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিলেন। বিরল পটভূমি আর শূন্য পাত্র যা কিছু তিনি এঁকেছিলেন সেগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় এই পরিবারগুলো স্বেচ্ছায় নয়, বরং বাধ্য হয়ে তাদের পরিচিত ভূমি আর বাসস্থান ত্যাগ করেছিল। লাল, হলুদ, সবুজাভ-নীল, সবুজ - উজ্জ্বল রঙের পোষাক পরিহিত অজ্ঞাতনামা কালো এই চরিত্রগুলো একক ব্যক্তি হিসেবে শনাক্তযোগ্য নয়। আর সেই কারণে কাহিনীটি ছিল সামগ্রিকভাবে অভিবাসীদের নিয়ে, সমষ্ঠীগত সেই যাত্রা, কোনো বিশেষ চরিত্রের বিবরণ নয়। শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিরা কদাচিৎ তার ক্যানভাসে আবির্ভূত হয়েছিল, কিন্তু যখন তারা সেখানে প্রবেশ করেছিল, তারা ক্ষমতার প্রতিভূ অথবা বর্ণবাদী নিপীড়নের সাথে যুক্ত চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।
বেশ সংবেদনশীল এবং অস্বস্তিকর একটি বিষয় সত্ত্বেও 'দ্য মাইগ্রেশন সিরিজ' বেশ

সাদরে গৃহীত হয়েছিল যখন ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে নিউ ইয়র্কে এডিথ হলপার্টস গ্যালারিতে প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল। দুঃখজনকভাবে সিরিজটি পরে ভেঙ্গে ফেলা হয়, বেজোড় সংখ্যক প্যানেলগুলো যখন ওয়াশিংটন ডিসির ফিলিপ কালেকশন সংগ্রহ করেছিল, এবং জোড় সংখ্যক প্যানেলগুলো নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টের সংগ্রহে প্রবেশ করেছিল। প্রদর্শনীর জন্য এগুলো এখন প্রায়শই একত্রিত করা হয়।

অন্য শিল্পীরা সামাজিক প্রসঙ্গ আর সমস্যাগুলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এবং তারা আমেরিকান ভূদৃশ্যের বিশালত্ব বিবেচনা করেছিলেন। জর্জিয়া ও'কিফ (১৮৮৭-১৯৮৬) শিকাগো এবং নিউ ইয়র্কে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন এবং তার শুরুর চিত্রকর্মগুলো মূলত শহুরে দৃশ্যপটে আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলো প্রাধান্য পেয়েছিল, যেগুলো কেবলই নির্মাণ হতে শুরু হয়েছিল। কিন্তু যখন তিনি প্রথম বারের মতো রেলপথে নিউ মেক্সিকো ভ্রমণ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, 'তখন থেকে তিনি সেখানে বার বার ফিরে গেছি'। প্রতি বছর কিছু সময় তিনি সেখানে কাটিয়েছিলেন রাজ্যটির ফুল আর ভূদৃশ্যচিত্র এঁকে, প্রায়শই বিশাল ক্যানভাসে। ও'কিফ প্রকৃতির নিরন্তর চক্র, নতুন সৃষ্টি, পুনর্জনন আর ক্ষয় নিয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

পাহাড়ের সারির ওপর প্রাচীন কোনো তালিসমান বা তাবিজের মতো একটি প্রাণী খুলি শূন্যে ভাসমান, যেমন আমরা দেখি তার 'র‍্যামস হেড, হোয়াইট হলি- হক লিটল হিলস, নিউ মেক্সিকো' (১৯৩৫) চিত্রকর্মে। তার আইরিস, পপি আর নানা ফুল নিয়ে অনুশীলন অসংখ্য ইন্দ্রিয়ঘণ ভাজে পূর্ণ। তিনি টাওসের কাছে গোস্ট র‍্যাঞ্চে বসবাস করতেন, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে সেখানে ছোট একটি বাড়ি (বা অ্যাডোবি) কিনেছিলেন। স্টুডিওর জানালা দিয়ে দেখা একটি দৃশ্য আরেকজন শিল্পীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বর্ণনা করেছিলেন: 'মাটি গোলাপী আর উত্তরে হলুদ পাহাড়, একটি পূর্ণ ম্লান চাঁদ অস্তগামী ভোরের ফ্যাকাসে বেগুনি রঙের আকাশ'। নিরানব্বই বছর বয়সে তার মৃত্যু অবধি এখানে এই শুষ্ক মরু ভূদৃশ্যে নিমজ্জিত হয়েই তিনি বসবাস ও কাজ করেছিলেন।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে)

(১) Diego Rivera, The great Tenochtitlan
(২) Frida Kahlo, Self-Portrait Along the Border Line Between Mexico and the United States
(৩) Frida Kahlo, The Two Fridas
(৪) Pop Chalee, Blue Deer
(৫) Diego Rivera, Detroit Industry Murals (detail)
(৬) Dorothea Lange, Migrant mother, California
(৭) Grant Wood, American Gothic
(৮) Edward Hoppe, New York Movie
(৯) Jacob Lawrence, The Migration Series, Panel 3
(১০) Georgia O'Keeffe, Ram's Head and White Hollyhock
(১১) Georgia O'Keeffe, Oriental Poppies

১৯৪৩ সাল, বারবারা হেপওয়ার্থ বাড়ির পেছনেই নিজস্ব স্টুডিওতে ‘ওভাল স্কাল্পচার’ ভাস্কর্যটি স্থানান্তরিত করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কর্নওয়ালে কারবিস বে শহরে তার বাড়ির বাগানে তিনি এটি খোদাই করছিলেন। এখান থেকে তিনি নীচে দূরে মৎসজীবীদের শহর সেইন্ট ইভস, আর সবুজ, আলোয় ঝলমল সমুদ্র দেখতে পারছিলেন। চার বছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর তার করা প্রথম কাজগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে এই ‘ওভাল স্কাল্পচার’। এর ডিম-সদৃশ বর্হিদেশ খোদাই করা হয়েছে মসৃণ বাদামী রঙের কাঠ থেকে , এবং সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতে মসৃণ হয়ে যাওয়া নুড়ির আকারে এটি খোদাই করা হয়েছিল। হেপওয়ার্থ কাঠের মধ্যে ছিদ্র সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তিনি এই ছিদ্র অংশটি সাদা রঙে আবৃত করবেন। যদিও তার ভাস্কর্য আক্ষরিকার্থে প্রকৃতিকে পুনঃসৃষ্টি করবে না , কিন্তু সেগুলো সবসময়ই প্রকৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল, এবং এগুলো তাকে সমুদ্রের বেলাভূমির বালুর ওপর আছড়ে পড়া ফেনিল সমুদ্র ঢেউ, কোনো স্ফটিকে অভ্যন্তর, কিংবা মাথার আকৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বছরের শুরুতে এবং চলমান যুদ্ধ সত্ত্বেও তার জন্ম শহর ইয়র্কশায়ারে হেপওয়ার্থের প্রথম রেট্রোস্পেকটিভ প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং এখন তিনি ওয়েকফিল্ড সিটি আর্ট গ্যালারিতে একটি প্রদর্শনীর জন্য কাজ করছেন । কিন্তু তাকে তার সন্তানদেরও দেখাশুনা করতে হতো, খাবার তৈরি করতে হতো, গহস্থালীর নানা কাজ, এবং প্রচুর পরিমানে চিঠি লিখতে হতো। তারপরও তিনি মনে করতেন, তাকে অবশ্যই কাজ করে যেতে হবে। আজ রাতে তার স্বামী বেনকে তিনি একটি চিঠি লিখবেন, যিনি বর্তমানে লন্ডনে অবস্থান করছেন, তাকে বলবেন তার প্রিয় কিছু কাগজ আর রং নিয়ে আসতে, কারণ যুদ্ধকালীন সময়টা মূলত তিনি ছবি এঁকেই কাটিয়েছিলেন। আপাতত তিনি 'ওভাল স্কাল্পচার' ভাস্কর্যটিকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেছেন, এবং আয়ার সাথে দেখা করতে গেলেন, কারণ তার তিন সন্তান স্কুল থেকে ফিরে এসেছে।

*

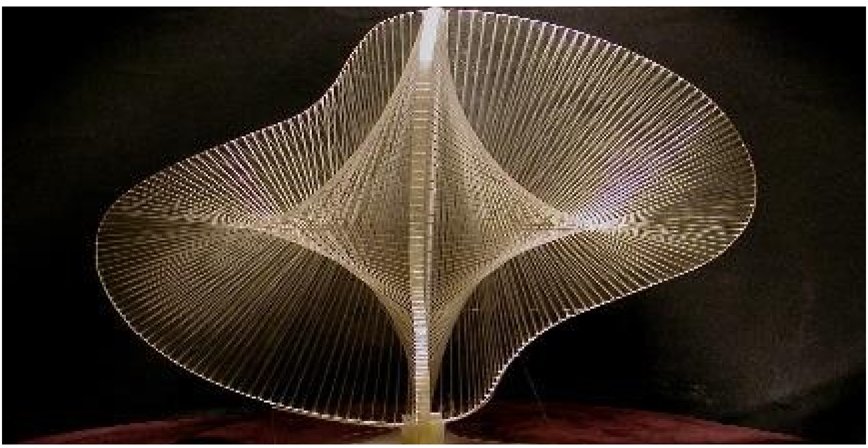

যুদ্ধের আগে বারবারা হেপওয়ার্থ (১৯০৩-১৯৭৫) এবং বেন নিকোলসন (১৮৯৪-১৯৮২) একত্রে উত্তর লন্ডনে হ্যাম্পস্টিডে বসবাস করতেন, সেখানে তারা শিল্পীদের একটি গোষ্ঠীর অংশ ছিলেন, যার মধ্যে ছিলেন নাউম গাবো (নাউম নিমিয়া পেভসনার, ১৮৯০-১৯৭৭) এবং মনড্রিয়ান। নিকোলসন এবং গাবো 'সার্কল' নামে স্বল্পস্থায়ী একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন, যা মূলত ইউরোপীয় 'কনস্ট্রাকটিভিস্ট' শিল্পীদের প্রচারণা করতো। লন্ডন বহু রুশ এবং জার্মান শিল্পীদের নিরাপদ গন্তব্যে পরিণত হয়েছিল, যারা স্বদেশে সৃজনশীল ব্যক্তিদের উপর ক্রমবর্ধিষ্ণু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। 'কনস্ট্রাক্টিভিস্ট' শিল্পীরা জ্যামিতি এবং বিমূর্তন ব্যবহার করে তাদের কাজ সৃষ্টি করতেন । গাবোর স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ভাস্কর্যগুলোয় তার ব্যবহার করা হয়েছিল এর অভ্যন্তরীণ পরিসরটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, এবং নিকোলসন বৃত্ত আর বর্গক্ষেত্রের রিলিফ তৈরি করেছিলেন। ১৯৩০-এর দশকে হেপওয়ার্থ 'কনস্ট্রাক্টিভিজম' এবং বিমূর্ত নানা বিষয় তার কাজে অনুসন্ধান করে দেখেছিলেন, এবং কখনো কখনো তার পাথর আর কাঠের

খোদাইগুলো প্রায় জ্যামিতিক রূপ নিয়েছিল। এরপর তিনি তার কাজে সুতা এবং তার ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু আরো অন্তর্গত ও সহজাত উপায়ে ভাস্কর্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় তিনি পৌনঃপুনিকভাবেই ফিরে এসেছিলেন, প্রাকৃতিক, জৈবিক সুগঠিত মসৃণ বক্র পৃষ্ঠের নানা আকৃতি সৃষ্টি করে, যা মা-শিশুর সম্পর্ক অথবা প্রাকৃতিক বিশ্বের কোনো বস্তুর ইঙ্গিতবহ। এই একই ধরনের সংবেদনশীলতা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন ইয়র্কশায়ার থেকে আসা আরেকজন প্রসিদ্ধ ভাস্কর, হেনরি মুর (১৮৯৮-১৯৮৬), তিনিও কাছেই হ্যাম্পস্টিডে বসবাস করতেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায়, বহু শিল্পী লন্ডন ত্যাগ করেছিলেন। হেপওয়ার্থ, নিকোলসন এবং তাদের পাঁচ বছরের একত্রে জন্ম নেয়া তিন সন্তানসহ সেইন্ট ইভসে এসে বসতি গড়েছিলেন। নাউম গাবো এবং তার স্ত্রী মিরিয়াম এক বছর পরে সেখানে তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৮০-এর দশক থেকে শিল্পীরা সেইন্ট ইভসে আসতে শুরু করেছিলেন এর অবিশ্বাস্য আলো, সৃজনশীল সমাজ এবং দূরবর্তিতার সুযোগ নিতে। আর এই দূরবর্তিতা তার কাজ অব্যাহত রাখতে হেপওয়ার্থকে সুযোগ করে দিয়েছিল, এবং যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য উপায়ে তার বিষয়বস্তু নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি, যদিও কাঠ আর পাথর খণ্ড সরবরাহে ঘাটতি সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধের পরে তিনি সেইন্ট ইভসে ট্রেউইন স্টুডিওতে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন এবং সেখানেই তিনি ছিলেন ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে স্টুডিওতে একটি অগ্নিকাণ্ডের দূর্ঘটনায় প্রাণ হারাবার আগ পর্যন্ত।

যুদ্ধের শুরুতে ফ্রান্সিস বেকন (১৯০৯-১৯৯২) ইংল্যান্ডের দক্ষিণে বিডেলস স্কুলের সীমানায় একটি লজে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। জার্মান বোমারু বিমানে হামলায় সৃষ্ট ধুলা তার শ্বাসকষ্টজনিত রোগে দুর্বল ফুসফুসকে আরো কাবু করে ফেলেছিল। কিন্তু ১৯৪৩ সাল নাগাদ তিনি লন্ডনে ফিরে এসেছিলেন। একটি বাড়ির নীচ তলা ভাড়া করেছিলেন, যা একটি সময়ে সফল 'প্রি- র‍্যাফায়েলাইট' শিল্পী মিলের বাসস্থান ছিল। বেকন বাড়িটির পুরানো বিলিয়ার্ড রুমে তার স্টুডিও তৈরি করে নিয়েছিলেন, এবং এর পরের বছর 'থ্রি স্টাডিজ অব ফিগারস অ্যাট দ্য বেস অব এ ক্রুসিফিক্সন' শেষ করেছিলেন। মাঝখানের প্যানেলে আমরা উড়তে অক্ষম চোখ বাধা একটি পাখিকে মুখ বিকৃত করে থাকতে দেখি, ডান দিকে পশু সদৃশ একটি প্রাণী চিৎকার করছে উজ্জ্বল কমলা আকাশের পটভূমিতে, এবং বাম দিকের প্যানেলে তৃতীয় ফিগারটি একটি টেবিলে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। এই সব সংকর রূপগুলো মানুষকে প্রাণিতে রূপান্তরিত করেছিল, যেন পুরো বিশ্বই উন্মাদ হয়ে গেছে।

১৯৪৫ সালে লোফেব গ্যালারিতে বেকন 'থ্রি স্টাডিজ' প্রদর্শন করেছিলেন। এটি খুব সাহসী একটি পদক্ষেপ ছিল, তিনি সুপরিচিত শিল্পী ছিলেন না, এবং চিত্রকর্মটি ছিল বন্য , ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম এমন একটি চিৎকারের মতো - রাগ, যন্ত্রণা, দুঃখ এবং

শোকের অনিয়ন্ত্রযোগ্য ও অপ্রশম্য একটি অভিব্যক্তি। সমালোচক রেমন্ড মর্টিমার অভিযোগ করে মন্তব্য করেছিলেন, 'বেকনের চিত্রকর্ম শিল্পকর্মের চেয়ে বরং ক্ষোভের প্রতীক'। অবিচলিত বেকন পরবর্তীতে তার প্রজন্মের সবচেয়ে শক্তিশালী 'ফিগারেটিভ' চিত্রশিল্পীতে পরিণত হয়েছিলেন (আধুনিক চিত্রকলা যে-কোনো রূপ বর্ণনা এই শব্দটি করা হয়, যা বাস্তব পৃথিবী এবং বিশেষ করে মানব ফিগারের প্রতি শক্তিশালী তথ্যনির্দেশ ধারণ করে)। তার চিৎকাররত পোপ আর বিচ্ছিন্ন ফিগারগুলো সেই রং দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছিল, যে রং তাদের সৃষ্টি করেছিল। আর এই আক্রমণে তাদের মুখ ও শরীর তরলীভূত হতে শুরু করেছে। দর্শকরা বেকনের চিত্রকর্মে বিংশ শতাব্দীর নিষ্ঠুরতা আর নামহীনতার মর্মভেদী অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন।

বেকন তার ফিগারগুলোর চারপাশে খাঁচা বা 'স্পেস-ফ্রেম' আঁকতে প্রায়শই রেখা ব্যবহার করতেন, যেন তাদের তিনি কোথাও জোর করে আটকে রাখছেন, বন্দি করছেন। ভাস্কর জেরমাইন রিচিয়েরও (১৯০২-১৯৫৯) স্পেস-ফ্রেমের একটি রূপ ব্যবহার করেছিলেন তার ফিগারগুলোকে সক্রিয় এবং নিয়ন্ত্রণ করতে। তার কাজে যেমন পায়ের সাথে কব্জি, হাটুর সাথে আঙুল যুক্ত করেছিল ধাতব দণ্ড - যা এগুলোর মধ্যবর্তী পরিসরটিতে শক্তি সঞ্চালিত করতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে প্যারিসে রিচিয়ার তার নিজস্ব প্রথাগত একটি স্টুডিও পরিচালনা করতেন, কিন্তু ১৯৪০-এর দশকে তার কাজ গুরুত্বপূর্ণভাবে বদলে গিয়েছিল, তার সৃষ্ট ফিগারগুলো রূপান্তরিত হতে শুরু করেছিল, সেগুলো ব্যাঙ আর বাদুড়ে পরিণত হয়েছিল, তাদের হাটুর নীচে সামনের অংশে গাছের বাকল গজিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। তার ভাস্কর্যগুলো যেন রূপান্তরের সেই মুহূর্তগুলো ধরার চেষ্টা করেছিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্টি করা তার 'প্রেইং ম্যানটিস' ভাস্কর্যে যেমন আমরা দেখি, একজন নারীর হাত-পা বেঁকে টান টান হয়ে আছে, এবং এটি এই পতঙ্গটির (ম্যানটিস) আক্রমণ করার দেহ ভঙ্গিমায় স্থির। রিচিয়ার তার শৈশবের রূপান্তর আর পুরাণের কাহিনি স্মরণ

করছিলেন, নাকি চলমান যুদ্ধের প্রতি এটি তার তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল? বাস্তবতা থেকে পালানোর মরিয়া একটি প্রচেষ্টায় তার ফিগারগুলো কী পতঙ্গ আর পাখিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল,?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং নাৎসীদের বন্দি শিবিরের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা আবিষ্কৃত হবার পর মানবতা আসলেই সবচেয়ে ভঙ্গুরতম একটি অবস্থানে দিকভ্রান্ত ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। তখনো ইউরোপের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে বিবেচিত প্যারিসে শিল্পীরা নিজেদের প্রশ্ন করেছিলেন, এই নিষ্ঠুরতা আর অমানবিক নিপীড়ন আর ধ্বংসলীলার পরে শিল্পকলা আসলেই আর কী হতে পারে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে জ্যা-পল সার্ত্রের ‘বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস’ প্রকাশিত হয়েছিল, এবং যা ছিল অস্তিত্ববাদী দর্শনের একটি নিবিড় বিশ্লেষণী অনুসন্ধান। অস্তিত্ববাদী দর্শন যাপিত অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল, অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজেদের কর্ম, এবং তাদের নিজেদের জীবনের অর্থ দেবার জন্য দায়ী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো দীর্ঘমেয়াদী ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার পরে অস্তিত্ববাদ একটি উপায়ে পরিণত হয়েছিল, যার মাধ্যমে প্যারিসবাসীরা তাদের জীবন পরিচালনা করতে শুরু করেছিলেন। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি এখানে কেন?, আমার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কী?

ভাস্কর আলবার্টো জিয়াকমেট্টি (১৯০১-১৯৬৬) একজন কিউবিস্ট এবং সুরিয়ালিস্ট ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের পরে তার ভাস্কর্যের শরীরগুলো কঙ্কাল সদৃশ একটি রূপ নিয়েছিল, এবড়ো থেবড়ো সরু অস্থিসন্ধি আর প্রলম্বিত ঘাড়সহ সব ফিগার, যেন ফিগারগুলোকে টেনে এতটাই দীর্ঘায়িত করা হয়েছে যে এটি প্রায় ভেঙ্গে যাবার মতো একটি অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। এগুলো আপাতদৃষ্টিতে ইঙ্গিত দিয়েছিল - মানবতার অস্তিবাদী কেন্দ্র হচ্ছে এটি, শুধু এটাই অবশিষ্ট আছে। প্যারিসের উপকণ্ঠে মানসিক রোগীদের হাসপাতাল এলাকায় একটি স্টুডিওতে জ্যাঁ ফাউট্রিয়ের (১৮৯৮-১৯৬৪) যুদ্ধকালীন কিছু সময় কাটিয়েছিলেন। তিনি জার্মান গোয়েন্দা বাহিনী নজরদারী থেকে আত্মগোপন করেছিলেন , যারা ধারণা করেছিল, তিনি ফরাসী প্রতিরোধ বাহিনীতে সক্রিয়। তার লুকিয়ে থাকার স্থানের চারপাশে বনভূমিতে তিনি বন্দিদের চিৎকার শুনতে পেতেন, জার্মান বাহিনী যাদের নির্যাতন ও হত্যা করেছিল। এই স্মৃতিগুলোই ১৯৪৫ সাথে প্রথম প্রদর্শিত হওয়া তার ‘হোস্টেজ’ ধারাবাহিকের চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্যগুলো সৃষ্টির মূল ভিত্তি ছিল। তিনি ঘন মোটা আঠালো পেস্ট হিসেবে তেল রং মিশ্রণ করতেন যেন এটি দেখতে ক্ষতচিহ্নিত মাংসের মত অনুভূত হয়। ছিন্ন মাথাগুলো রক্তাক্ত মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, তাদের মুখ চোখহীন বিকৃত, নিষ্ঠুর যুদ্ধের শিকার। তার ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য, যেমন ‘লার্জ ট্র্যাজিক হেড’, (১ ৯৪২) আমাদের আহত সৈন্যদের কথা মনে করিয়ে দেয়, যার অর্ধেক মুখ যেন উড়িয়ে নিয়ে গেছে কোনো বোমা বিস্ফোরণ।

যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা আর ভয়াবহতার প্রতি ইউরোপের শিল্পীরা বিচিত্র উপায়ে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেছিলেন। জ্যাঁ ডুবুফে (১৯০১-১৯৮৫) শিশু, শিল্পকলায় স্বশিক্ষিত , এবং মানসিকভাবে অসুস্থদের আঁকা শিল্পকলায় অনুপ্রেরণা খুঁজেছিলেন। ডুবুফে এটিকে বলেছিলেন ‘আর্ট ব্রুট’ (শৈল্পিকভাবে স্থুল শিল্পকলা), আর তিনি এই কাজগুলোকে শৈল্পিক সংস্কৃতির প্রভাব মুক্ত হিসেবে দেখেছিলেন। ডুবুফে অনুভব করেছিলেন, প্রশিক্ষিত শিল্পীরা যুদ্ধের এই ভয়াবহতার অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে যেতে পারবেন না, কিন্তু মূলধারার বাইরে সৃষ্ট শিল্পকলা পর্যবেক্ষণ করে তিনি অনুভব

করেছিলেন, ‘সবকিছুই সম্ভব হতে পারে... কারণ স্বীকৃত সাংস্কৃতিক কাঠামোর বাইরে বহু মিলিয়ন সংখ্যক অভিব্যক্তির সম্ভাব্য অস্তিত্ব আছে’। যুদ্ধের পরে তিনি আর্ট ব্রুটের নমুন সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন। হাসপাতালে রোগীদের কাছে তিনি গিয়েছিলেন, যেমন সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত আলোইজ কোরবাজ (১৮৮৬-১৯৬৪), যিনি নারী রাজকীয় চরিত্রদের ব্যস্ত কল্পদৃশ্য আকতেন রঙীন পেন্সিল ব্যবহার করে, এবং সখের শিল্পী হোয়াকিম ভিসেন্স জিরোনেলা (১৯১১-১৯৯৭), যিনি কর্কের মধ্যে খোদাই করে দৃশ্য সৃষ্টি করতেন যখন তিনি প্যারিসে একটি কর্ক কারখানায় চাকরী করতেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ডুবুফের পুরো সংগ্রহ, ১০০ জন শিল্পীর প্রায় ১২০০ কাজ, আমেরিকায় প্রেরণ করা হয়েছিল, যেখানে এটি এক দশকের বেশি সময় ধরে ছিল এবং যে সংগ্রহটি আমেরিকান শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

যুদ্ধের পরে ডুবুফের নিজের কাজ আর্ট ব্রুট এবং গ্র্যাফিটি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তার ‘ওয়াল উইথ ইনস্ক্রিপশন’ (১৯৪৫) চিত্রকর্মে তিনি স্লোগান আর কার্টুনে আবৃত অপরিচ্ছন্ন কংক্রিটের একটি দেয়াল এঁকেছিলেন। একটি সরলীকৃত ফিগার, দুই পাশে আটকে থাকা হাত, এক পাশে ফিরে থাকা মাথা, যিনি স্লোগান পড়তে দেয়ালটির সামনে থেমেছেন এবং সেই দেয়ালটির অংশে পরিণত হয়েছেন। তার আরেকটি কাজে ডুবুফে রঙের মধ্যে আচড় দিয়ে ফরাসী লেখকদের ব্যঙ্গাত্মক চিত্র এঁকেছিলেন। তিনি একটি শিশুর দেখার সহজাত উপায় পুনরায় সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন, অনুপাতে বেঢপ মাথা এঁকে, আর যে অংশগুলোর ব্যাপারে তার আগ্রহ কম ছিল, যেমন পা, সেগুলো সংকুচিত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল প্রথম মহাযুদ্ধ যা সরাসরিভাবে অস্ট্রেলিয়ার ওপরে প্রভাব ফেলেছিল, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে যখন জাপানি বোমারু বিমানগুলো ডারউইন আর উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় ওপর বোমা হামলা করেছিল। সেই সময় অবধি শুধু সমুদ্র তীরবর্তী

শহরগুলোয় ঔপনিবেশিক অস্ট্রেলিয় শিল্পকলা মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে ক্রমশ শিল্পীরা তাদের মহাদেশের অভ্যন্তরে তাকাতে এবং দেশজ ভূদৃশ্যে নিজেদের নিমজ্জিত করতে শুরু করেছিলেন।

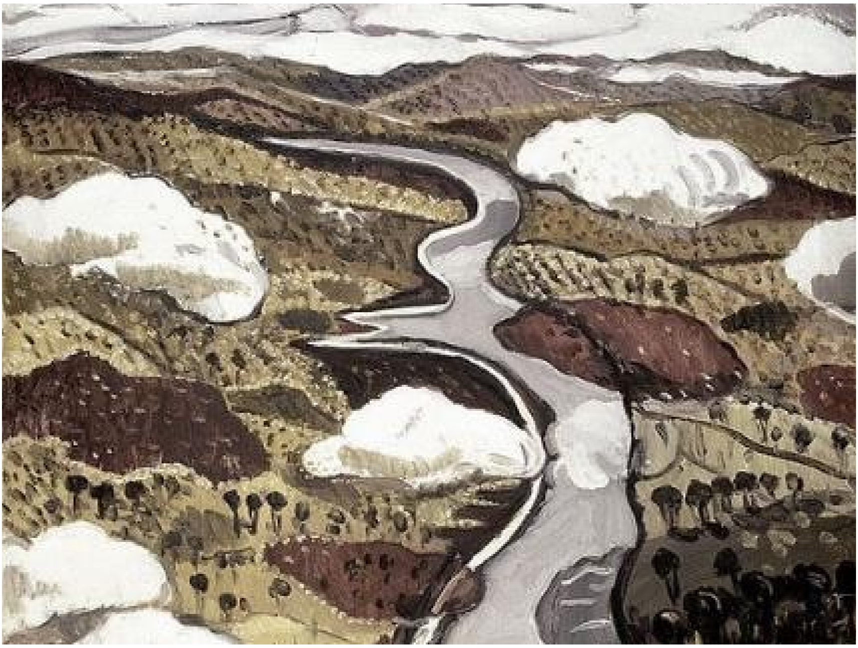

১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেইন অস্ট্রেলিয়ায় এর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু আরো ৫০ ,০০০ বছর আগে থেকেই আদিবাসীরা ও টরিস প্রণালীর দ্বীপবাসী জনগোষ্ঠী এই মহাদেশে বসবাস করে আসছিল। বহু সহস্রাব্দ ধরেই তাদের শিল্পকলা বিবর্তিত হয়েছিল এবং প্রতিটি গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্যসূচক শৈলী বিকশিত করেছিল। শুরুতে যে চিত্রগুলো আঁকা হয়েছিল পাথরের আশ্রয়স্থলে, এই নকশাগুলোই আনুষ্ঠানিক ও আচারিক শারীরিক শিল্পকলা কিংবা বালির উপর আঁকা সুবিশাল অস্থায়ী মেঝে হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। অসংখ্য বিন্দু ব্যবহার করে সর্পিল কুণ্ডলী, বৃত্ত আর রেখাগুলোকে প্রায়শই সংযুক্ত করা হয় , জীবনের স্পন্দনে যা স্পন্দিত মনে হয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা বিশ্বাস করেন, যে ভূখণ্ডে তাদের বসবাস, সেই ভূখণ্ডই তাদের মালিক, এই ধারণাটি স্পষ্টতই ভূমির মালিকানা নিয়ে পশ্চিমা ধ্যানধারণা থেকে যা সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন। এর ওপর কোনো অধিকার দাবি না করে ভূখণ্ডের সাথে একাত্ম একটি অস্তিত্বের ধারণা সেই কারণে তাদের কাছে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের চিত্রকর্মগুলো দেখতে পশ্চিমা দৃষ্টিতে বিমূর্ত মনে হতে পারে কিন্তু পৃথিবীর সাথে গভীর সংযোগের মধ্যে এগুলোর শিকড় প্রোথিত, যেভাবে তাদের সৃষ্টিপুরাণের কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে, বর্তমানে যা ‘ড্রিমিং’ বা ড্রিম-টাইম নামে পরিচিত।

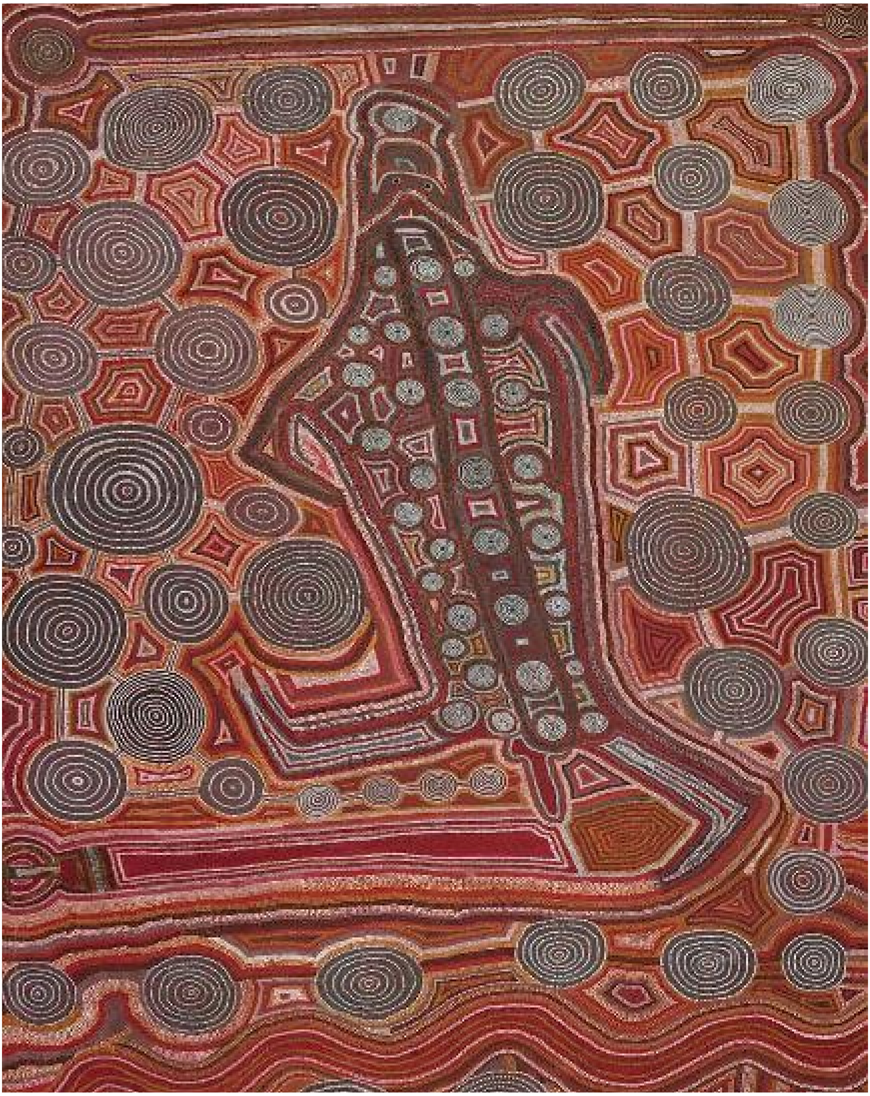

মার্গারেট প্রেস্টন (১৮৭৫-১৯৬৩) ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রকৃত দৈশিক শৈল্পিক ঐতিহ্য হিসাবে আদিবাসী অর্থাৎ 'অ্যাবোরিজিনাল' শিল্পকলা যেন স্বীকৃতি পায়। যদিও প্রেস্টন সিডনিতে বসবাস করতেন, কিন্তু তিনি সিডনির শিল্পকলার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃত্বময় দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন, যে প্রতিষ্ঠানগুলো উপনিবেশিত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শিল্পকলার চেয়ে উপনিবেশকারীদের শিল্পকলাকেই মূলত অগ্রাধিকার দিয়েছিল। তিনি বহু আদিবাসী সমাজ ভ্রমণ করেছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন অষ্ট্রেলিয় শিল্পকলার

জাতীয় একটি পরিচয় সৃষ্টি করতে তাদের সৃষ্ট শিল্পকলারই কেন্দ্রীয় ভূমিকা থাকা উচিত। তার নিজের কাজে তিনি এশিয়, আদিবাসী, ইউরোপীয় শিল্পকলার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণ করেছিলেন গতিময় কিছু ভূদৃশ্যচিত্র সৃষ্টি করতে, যেমন, ১৯৪২ সালে তার আঁকা 'ফ্লাইয়িং অভার দ্য শোলহ্যাভেন রিভার'।

প্রেস্টন যখন আদিবাসীদের সৃষ্ট শিল্পকলাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহন করার জন্য আন্দোলন করছিলেন, কিছু আদিবাসী শিল্পী পশ্চিমা শিল্পকলায় প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন, যেমন, আলবার্ট নামাটজিরা (১৯০২-১৯৫৯)। তার প্রসারণশীল জলরঙে আঁকা ভূদৃশ্যচিত্রগুলো অষ্ট্রেলিয়ার রোদে পোড়া আভ্যন্তরীণ ভূপ্রকৃতি প্রদর্শন করছিল, এবং সেগুলো বেশ জনপ্রিয় প্রমাণিত হয়েছিল।

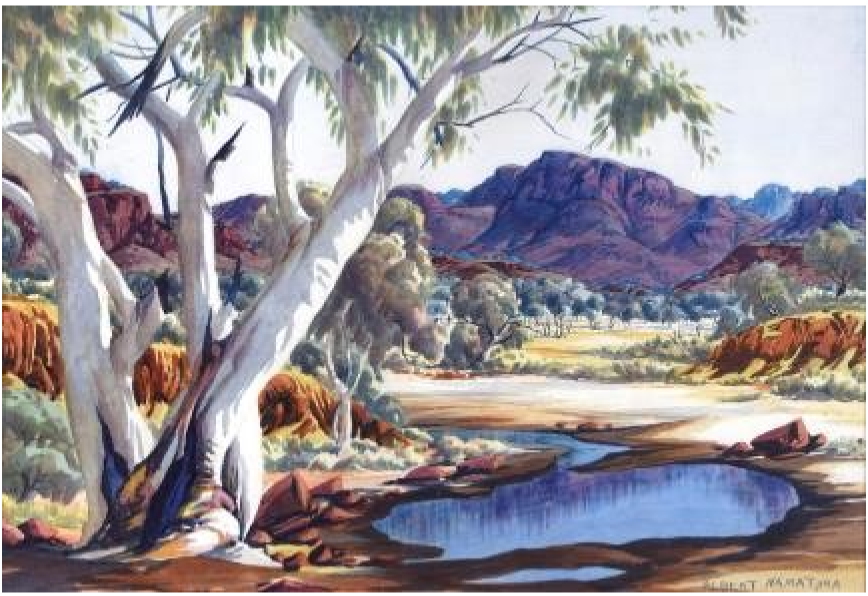

তবে অস্ট্রেলিয়ার প্রথাগত আদিবাসী শিল্পকলা ক্যানভাসের ওপর আঁকা শুরু হতে ১৯৭০-এর দশক অবধি আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং বিশ্বব্যাপী সেগুলো রফতানী হয়েছিল। আদিবাসীদের উদ্বেগ ছিল, এভাবে তাদের গল্পগুলো সবার সাথে ভাগাভাগি হয়তো তাদের 'ড্রিমিং' দুর্বল করে দেবে, কিন্তু শিল্পীরা যারা আগে সাময়িক ডিজাইন হিসেবে সেগুলো সৃষ্টি করতেন, তারা নতুন এবং স্থায়ী ক্যানভাস সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন। বিন্দু দিয়ে আঁকা বেশ জটিল একটি চিত্রকর্ম 'ওয়ারলুগুলং' '(১৯৭৭) এঁকেছিলেন ক্লিফোর্ড পসাম টিজাপাল্টজারি (১৯৩২-২০০২), এখন এটি ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

সিডনি নোলানের (১৯১৭-১৯৯২) মতো অস্ট্রেলিয়ার অনাদিবাসী শিল্পীরা দেশটি উপনিবেশিক অতীত অনুসন্ধান করেছিলেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি উনবিংশ শতকের একজন কুখ্যাত ফেরারী অপরাধী ও কিছু মানুষের কাছে বীরে রূপান্তরিত নেড কেলির জীবন নিয়ে একটি ধারাবাহিক শুরু করেছিলেন। দীর্ঘ দিন আইনের হাত এড়িয়ে থাকা কেলিকে পুলিশের সাথে তার একটি যুদ্ধের পরে অবশেষে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছিল। এই যুদ্ধে তিনি হাতে বানানো বুলেট-নিরোধী বর্মের আচ্ছাদন পরে তাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। নোলান কেলিকে পুরো ধারাবাহিকে তার সেই বর্মে আচ্ছাদিত রূপে এঁকেছিলেন, তবে তিনি কেলির শিরস্ত্রাণটি নুতন করে কল্পনা করে নিয়েছিলেন, উজ্জ্বল পটভূমির বিপরীতে যা একটি দ্বিমাত্রিক কালো বর্গক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। হেলমেটটি দেখতে মেলভিচের সেই বিমূর্ত ‘ব্ল্যাক স্কোয়ারের’ মতো মনে হয়, একত্রিশতম অধ্যায়ে যার সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, যা ততদিনে পশ্চিমা বিমূর্তনের সবচেয়ে সহজে শনাক্তযোগ্য একটি চিত্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এই বর্গাকার ক্ষেত্রটি অস্ট্রেলিয়ার সুবিশাল ভূপ্রকৃতির বিস্তৃতিকে ধারণ করতে পারে না, যা এর সব প্রান্ত ছাড়িয়ে যায়। নোলান যেন বলছেন বিমূর্ততা আমাদের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসলেই একটি বৈশ্বিক মহাবিপর্যয় ছিল। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে যখন এটি শেষ হয়েছিল, কিছু দেশ, যেমন, অস্ট্রেলিয়া, অর্থনৈতিকভাবে এর সমৃদ্ধি ফিরে পেয়েছিল , কিন্তু ইউরোপ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল, এবং এর কয়েক বছরের মধ্যে প্রথমবারের নিউ ইয়র্ক পশ্চিমা শিল্পকলার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে)

(১) Barbara Hepworth, Oval Sculpture
(২) Naum Gabo, Linear Construction in Space No. 2,
(৩) Barbara Hepworth, Mother and Child
(৪) Henry Moore, Reclining mother & child
(৫) Francis Bacon,Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion
(৬) Francis Bacon, Screaming Pope
(৭) Germaine Richier, Praying Mantis
(৮) Alberto Giacometti, Man Pointing
(৯) Jean Fautrier, Large Tragic Head
(১০) Jean Dubuffet, Wall with Inscriptions
(১১) Margaret Preston, Flying over the Shoalhaven River
(১২) Uta Uta Tjangala, Yumari
(১৩) Albert Namatjira, Western Macdonnell Landsca
(১৪) Clifford Possum Tjapaltjarri, Warlugulong
(১৫) Sidney Nolan, Ned Kelly

১৯৪৭ সাল, মেক্সিকো সিটির পিপলস গ্রাফিক আর্ট ওয়ার্কশপে বসে ভাস্কর ও ছাপচিত্রশিল্পী এলিজাবেথ কাটলেট 'দ্য ব্ল্যাক উওমেন' শিরোনামে তার একগুচ্ছ নতুন ছাপচিত্র দেখছিলেন। কাটলেট তার এই নতুন ধারাবাহিকটির ওপর কাজ করতে এক বছর আগে আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত এই কেন্দ্রে এসেছিলেন। তিনি মেক্সিকান নন, বরং আফ্রিকান-আমেরিকান। কয়েক বছর আগে, শিকাগো শহরে কিছু দিন অবস্থানের পরে তিনি রাজনৈতিক-বার্তাপূর্ণ কাজ করতে শুরু করেছিলেন। শিকাগোয় তিনি দেখেছিলেন কীভাবে শিল্পীরা সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে তাদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছিলেন। তারা দেখাতে চেয়েছিলেন, আফ্রিকান-আমেরিকার জনগোষ্ঠীর সদস্যরা এখনো সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এই শিল্পীদের একজনকে তিনি বিয়ে করেছিলেন, চার্লস হোয়াইট, এবং ছয় বছর তারা পাশাপাশি কাজ করেছিলেন। কাটলেট যুক্তি দিয়েছিলেন, 'মানুষের কাছ থেকেই শিল্পকলার আসা উচিত, এবং মানুষের জন্যেই শিল্পকলা....এটিকে অবশ্যই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, অথবা, কাউকে জাগিয়ে তুলবে, অথবা সঠিক দিক - আমাদের স্বাধীনতা - বরাবর পরিচালিত করতে ধাক্কা দেবে'।

এই ধারাবাহিকে অন্তর্ভুক্ত কাটলেটের পনেরোটি ছাপচিত্রের সবগুলোই ছিল লাইনোকাট (এই বইতে প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনামে ব্যবহৃত অলংকরণের মতো)। তিনি এগুলো তৈরি করেছিলেন লিনোলিয়ামের ওপর কেটে খোদাই করে। লিনোলিয়াম হচ্ছে মেঝে তৈরিতে ব্যবহৃত সস্তা একটি উপকরণ, এটি শিল্পীদের জন্য কাঠ-খোদাইয়ের একটি সস্তা এবং দ্রুত বিকল্প উপস্থাপন করেছিল। ফিগারগুলোর অভিব্যক্তির সর্বোচ্চ প্রকাশ করতে তিনি বেশ সাধারণ বিন্যাস ব্যবহার করেছিলেন। চারজন নারী একটি বাসে বসে আছে 'কালার্ড অনলি' (শুধুমাত্র কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য) লেখা একটি সাইনের পেছনে। আরেকটিতে আমরা দেখি একজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ মৃত শুয়ে আছে , তার গলায় দড়ির ফাঁস এখনো যুক্ত, তার ওপরে আরো তিন জন ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে । কাটলেট তার ছাপচিত্রগুলোকে পৃথকভাবে শিরোনাম দিয়েছিলেন, যা একত্রে কৃষ্ণাঙ্গরা নারীদের প্রতি সংঘটিত অন্যায় আর অবিচারের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন, 'আই হ্যাভ এ স্পেশাল রিজার্ভেশন' ছাপচিত্রে বাসে সামাজিকভাবে পৃথকীকরণ 'অ্যান্ড এ স্পেশাল

ফিয়ার ফর মাই লাভড ওয়ানস' ছাপচিত্রে তাদের স্বামী, ভাই আর পিতাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

এখন কাটলেট এই ধারাবাহিকের পঞ্চম চিত্র 'আই হ্যাভ গিভেন দ্য ওয়ার্ল্ড মাই সঙ্গস' ছাপচিত্রটির দিকে তাকিয়ে আছেন। গিটার হাতে একজন নারী, তার মুখে আমরা দুঃখের বলিরেখা দেখতে পাই। কাটলেট গিটারটির পাশে নীল রং ব্যবহার করেছিলেন, হয়তো ইঙ্গিত করেছিলেন নারীটি সম্ভবত ব্লুজ সঙ্গীত বাজাচ্ছেন। আর এটি করার তার কারণ আছে - আমরা তার স্মৃতিগুলো পেছনে ভাসতে দেখি, ছাপচিত্রে সেগুলোও নীল রং দিয়ে চিত্রিত, এটি জ্বলন্ত একটি ক্রুশ প্রদর্শন করছে, একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে মুগুর দিয়ে প্রহার করছে, শ্বেতাঙ্গ সেই ব্যক্তিটির পরণে সুপিরিচত মাথার ঢাকনীসহ আলখেল্লা, কুখ্যাত কু ক্লাক্স ক্লানের সদস্যরা যে কাপড় পরতো।

*

এলিজাবেথ কাটলেট (১৯১৫-২০১২) ওয়াশিংটন ডিসিতে শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন। এমনকি যখন সেই সময়ে খুবই অল্প কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী পেশাগতভাবে শিল্পী হিসাবে কাজ করছিলেন। তখন বর্ণবিভাজন আর বৈষম্য ছিল প্রকট এবং দক্ষিণে বহু প্রতিষ্ঠানে তাদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না, যেমন শিল্পকলার জাদুঘর। এই সমস্যা এড়াতে মিউজিয়াম যখন সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ থাকতো, তিনি সেই সময়ে নিউ অর্লিয়েন্সে তার কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন মিউজিয়াম ভ্রমণ করার অনুমতি সংগ্রহ করতেন। তিনি তার লক্ষ্য প্রকাশ করেছিলেন 'দ্য ব্ল্যাক উওম্যান' ধারাবাহিকের শেষ ছাপচিত্রে: 'মাই রাইট ইজ এ ফিউচার অব ইকুয়ালিটি উইথ দ্য আদার আমেরিকানস'(অন্য আমেরিকানদের সাথে সাম্যতার ভবিষ্যত হচ্ছে আমার অধিকার)।

সব আফ্রিকান-আমেরিকান শিল্পীরা তাদের শিল্পকলাকে এত প্রত্যক্ষভাবে বার্তা প্রকাশে ব্যবহার করেননি। নরমান লিউইস (১৯০৯-১৯৭৯) যেমন তার চিত্রকর্মগুলোকে বিমূর্তন অভিমূখে নিয়ে গিয়েছিলেন যখন তিনি নিউ ইয়র্কের হারলেমে ব্যস্ত রাস্তার অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন, যেখানে তিনি বাস করতেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তার আঁকা চিত্রকর্ম 'ক্যাথিড্রাল' ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট কালো দাগের বর্গজালিকা

উপস্থাপন করেছিল, যেখানে আকস্মিকভাবে যেন প্রবেশ করেছে ঘুর্ণি, বিন্দু আর আঁকাবাঁকা দাগ। একটি উষ্ণ লাল দীপ্তি আরো উজ্জ্বল করেছিল সাদা, নীল আর হলুদের ক্ষুদ্র এলাকা, যা কিনা মনে হয় ভেতর থেকে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে। 'ক্যাথিড্রাল' দেখতে মনে হয় রঙ্গীন কাচের তৈরি একটি জানালা, অথবা যেন সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়েছে নিউ ইয়র্কে সুউচ্চ স্কাইস্ক্র্যাপার আর বাসভবনগুলো থেকে।

লুইস ছিলেন নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক শিল্পীদের একটি গোষ্ঠীর সদস্য - যারা পরবর্তীতে 'অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিস্ট' (বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদী) নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে যখন একজন শিল্প-সমালোচক তাদের চিত্রকর্মগুলোকে অভিব্যক্তিবাদের একটি বিমূর্ত রূপ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। অন্যরা এই গোষ্ঠীটিকে 'নিউ ইয়র্ক স্কুল' ন ামে তথ্যনির্দেশ করে থাকেন। তবে শিল্পীরা নিজেরা সবসময় দাবি করেছিলেন, একক কোনো আন্দোলনের কখনো অস্তিত্ব ছিল না, এবং বাস্তবিকভাবে তাদের কাজ আসলেই খুব বিচিত্র ধরনের ছিল। লি ক্র্যাসনার (লেনা ক্র্যাসনার, ১৯০৮-১৯৮৪) এবং তার স্বামী জ্যাকসন পোলোক (১৯১২-১৯৫৬), মার্ক রথকো (১৯০৩-১৯৭০), বার্নেট নিউম্যান (১৯০৫-১৯৭০) এবং এলেইন (১৯১৮-১৯৮৯) এবং ভিলেম ডে কুনিং (১৯০৪-১৯৯৭) নাইনথ স্ট্রিটের আশেপাশে লোয়ার ম্যানহাটনের শিল্পকলা গ্যালারীগুলোয় একত্রে প্রদর্শনী করতে শুরু করেছিলেন। তাদের সবাই কিন্তু বিমূর্ত চিত্রকর্ম সৃষ্টি করেননি।

এলেইন ডে কুনিং চেয়ারে আসীন পুরুষদের প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন, যাদের চারপাশে রং বিস্ফোরিত হচ্ছে, তবে ভিলেম ডে কুনিং চুলহীন মাথাসহ নগ্ন নারীদের পশুর মতো খণ্ডিত পায়ের ক্ষুরসহ এঁকেছিলেন। তবে অনেকেই বিমূর্ত চিত্রকর্মের শিল্পী ছিলেন। নিউম্যান লাল আর নীলের উল্লম্ব ব্লক এঁকেছিলেন, যেগুলোকে পৃথক করে ছিল বৈষম্যসূচক রঙের সংকীর্ণ 'জিপস', যখন রথকো রঙের বায়বীয় এলাকাকে পরস্পরের উপর ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তার ক্যানভাসগুলো প্রায়শই আধ্যাত্মিক। যার সামনে কিছুক্ষণ দাড়ালে মনে হবে এর রংগুলো আপনাকে শুষে নিচ্ছে, আপনাকে ক্রমশ উপরের দিকে টেনে তুলছে, যেন আপনি ভাসমান।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ক্র্যাশনারের ক্যানভাসের উপরিতলগুলো ঘনভাবে খোচিত পর্দার মতো হয়ে উঠেছিল, যখন তিনি 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নং ২' এঁকেছিলেন। তার কাজে স্বতন্ত্র প্রাণশক্তির উপস্থিতি ছিল। 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নং ২' চিত্রকর্মে আমাদের চোখ লাল আর হলুদ বিন্দুগুলোকে অনুসরণ করে যেগুলো পরমাণুর মতো এদিক সেদিক ছুটে বেড়াচ্ছে, রেখার অস্পষ্ট জালিকার ভিতর বাইরে যেগুলো অনায়াসে যাতায়াত করছে, যে জালটি সেগুলো পুরোপুরিভাবে ধারণ করতে পারছে না।

পোলোক মেঝেতে বিছানো ক্যানভাসের উপর ফোঁটায় ফোঁটায় রং ফেলে আঁকতে শুরু করেছিলেন। ক্যানভাস স্পর্শ না করে আঁকার এটি একটি বৈপ্লবিক উপায় ছিল। এর আগে এমন কিছু আর কেউ করার চেষ্টা করেনি। ছন্দময় বিন্যাসের মতো দোদুল্যমান রঙের বৃত্তচাপগুলো ক্যানভাসের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারুলিপি নৃত্যের মতো, যেমন ‘সামারটাইম নাম্বার নাইন এ’ (১৯৪৮), এবং তার বিখ্যাত ‘ব্লু পোল’ (১৯৫২) চিত্রকর্মে , দুটোই প্রশস্তে প্রায় পাঁচ মিটার।

ইউ টিউবে পোলকের আঁকার একটি দৃশ্যচিত্র আছে, হান্স নামুথের ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র থেকে যা সংগ্রহ করা হয়েছে। পোলকের মুখে গোজা সিগারেট

, হাতে রঙের একটি টিন, এবং আপনি দেখবেন যে, তার পুরো শরীর আন্দোলিত করেই তিনি রঙ করছেন। বারবার একটি লাঠি রঙের মধ্যে ডোবাচ্ছেন এবং সেই রঙ তার নীচে বিছানো ক্যানভাসের উপর ছুড়ে দিচ্ছেন। সমালোচক হ্যারোল্ড রোজেনবার্গ এটিকে 'অ্যাকশন পেইন্টিং' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। এই প্রামাণ্যচিত্রে পোলক বলেছিলেন, ' মাটির উপর ক্যানভাস রাখলে আমি নিজেকে এর নিকটে অনুভব করতে পারি, এটি আরো বেশি চিত্রকর্মের অংশ, এভাবে আমি এর চারপাশে হাঁটতে, এর চারদিক থেকে কাজ করতে পারি, এই চিত্রকর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি'। দর্শকরাও তার ক্যানভাসগুলো 'ফিল্ডস' বা ক্ষেত্র হিসেবে বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন, কাজগুলো এতো বিশাল যে এটি আপনার দৃষ্টিসীমার পুরো ক্ষেত্রটি পূর্ণ করে, আর আপনি আর কিছুই দেখতে পাবেন না। পোলকের মতো আপনিও সেই চিত্রকর্মে প্রবেশ করবেন।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ক্র্যাশনার এবং পোলোক বিয়ে করেছিলেন, এবং নিজের পেশাগত শিল্পী জীবন উৎসর্গ করেই ক্র্যাশনার তার স্বামী পোলোকের কাজ বিরতিহীনভাবেই সমর্থন ও প্রচার করে গেছেন। এখন যদিও তাকে পোলকের সমকক্ষ হিসেবে শনাক্ত করা হয়, কিন্তু সেই সময়ে শিল্পী হিসেবে ক্র্যাসনারে উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলো গ্রাস করেছিল পোলকের সেই পুরাণ, যা তিনি নিজেই সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রভাবশালী আমেরিকান সমালোচক ক্লিমেন্ট গ্রিনবার্গ সাহসের সাথেই পোলককে সমকালীন আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী চিত্রশিল্পী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। দুই বছর পরে 'লাইফ' ম্যাগাজিন এর পাঠকদের জিজ্ঞাসা করেছিল, তিনি কী আমেরিকার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম জীবিত শিল্পী?

ক্র্যাশনারের জন্য পরিস্থিতি সর্বক্ষণই প্রতিকূল ছিল। তিনি ইচ্ছা করেই কোনো সন্তান না নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যেমন করেছিলেন এলেইন ডে কুনিং। তারা অনুভব করেছিলেন, তারা নিজেদের শিল্পকলা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট পরিমান সময় দিতে পারবেন না। তাদের কাছে এটি খুব সুস্পষ্ট আর কঠোর একটি নির্বাচন মনে হয়েছিল - শিল্পী হিসেবে সফল পেশাজীবন অথবা সন্তান প্রতিপালন (পুরুষ শিল্পীরা যদিও দুটোই পেতে সক্ষম হয়েছিলেন)। নারী শিল্পীরা তখনো নিয়মিতভাবে লৈঙ্গিক বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রদর্শনী তাদের উপেক্ষা করেছিল, এবং প্রকাশনায় তাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। ক্র্যাশনার যেমন তার নাম সংক্ষেপিত করেছিলেন, আরো বেশি উভলিঙ্গ একটি নামে - লি, এবং তার কাজ 'এল. কে' নামে স্বাক্ষর করতেন, যেন তিনি এই পক্ষপাতিত্ব পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন। শিল্পী হিসেবে তার দক্ষতা দিয়েই তাকে বিচার করা হোক, নারী হিসেবে নয়, এমনটাই তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও প্রায়শই তাকে 'মিসেস পোলোক' অথবা 'প্রাক্তন লি ক্র্যাশনার' নামে তথ্যনির্দেশ করা হতো, বিশেষ করে শুধু তার স্বামীর কাজ উল্লেখ করা প্রবন্ধগুলোয়।

১৯৫৬ সালে অ্যালকোহলে আচ্ছন্ন পোলোক একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন। এই সময় নাগাদ আমেরিকা, এবং বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক পশ্চিমা শিল্পকলার বৈশ্বিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এখানেই তখন ছিল সবচেয়ে বড় সংগ্রাহক , সমৃদ্ধ মিউজিয়াম, বহু সংখ্যক শিল্পকলা ব্যবসায়ী, এবং উচ্চাভিলাসী, উদগ্র

আত্মবিশ্বাসী আর দুঃসাহসী বহু বিচিত্র ধরনের শিল্পী। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে শীতল যুদ্ধকালীন সময়ে আয়োজিত বৈদেশিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমেরিকান সরকার সমকালীন শিল্পকলাকে প্রচারণা হিসেবে ব্যবহার করেছিল। সীমাহীন শৈল্পিক স্বাধীনতার স্মারক এইসব চিত্রকর্ম এবং ভাস্কর্য সোভিয়েত শৃঙ্খলে হ্যাচকা টান দিতে বিশেষভাবে পরিকল্পিত ছিল, কারণ কমিউনিজম ব্যক্তিগত অভিব্যক্তিকে সমর্থন করতো না। সহানুভূতিশীল বার্তাটি ছিল, আমেরিকার শিল্পকলা (এবং সেই অর্থে আমেরিকা) এখন নতুন পথের দিশারী।

গ্রিনবার্গ বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের বিকাশকে আধুনিক শিল্পকলা ও আধুনিকতাবাদের শীর্ষবিন্দু হিসেবে দেখেছিলেন, তার কাছে এটি ছিল বিশুদ্ধ চিত্রকর্মের একটি রূপ, যা শুধুমাত্র রং আর উপাদানগুলোর সাংগঠনিক বিন্যাস নিয়ে চিন্তিত এবং যে পৃথিবীতে এটির উৎপত্তি, সেটি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু একটি নতুন প্রজন্মের আমেরিকান শিল্পীরা খুব দ্রুত বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ এবং শিল্পকলার অস্তিত্ব সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন একটি শূন্যে - এমন ধারণার প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে শুরু করেছিলেন এমন শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে যে সেগুলো আর যা-ই কিছু হোক না কেন, অবশ্যই বিমূর্ত নয়। জ্যাসপার জনস (জন্ম ১৯৩০) বিমূর্তনের চিহ্নগুলো ব্যবহার করেছিলেন সমতল আকৃতি ও বিন্যাস আঁকতে, কিন্তু একই সাথে দৈনন্দিন জীবনে যেগুলোর অর্থ ছিল, যেমন ১৯৫৪ -৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান পতাকা নিয়ে সৃষ্টি করা তার একটি ধারাবাহিক। রবার্ট রাউশেনবার্গ (১৯২৫-২০০৮) তার চিত্রকর্ম বাস্তব পৃথিবীকে নিয়ে এসেছিলেন ভৌত একটি উপায়ে, সংগৃহীত তৈরি সামগ্রী, যেমন বিজ্ঞাপনের সাইনবোর্ড, পুরানো টায়ার ইত্যাদি ব্যবহার করে। তিনি এমনকি সংরক্ষিত করা একটি ছাগলকে আটকে দিয়েছিলেন

তার মেঝের উপর স্থাপিত ‘মনোগ্রাম’ (১৯৫৫-৯) ক্যানভাসে। তিনি তার এইসব কাজের নাম দিয়েছিলেন ‘কম্বাইনস’ - চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্যের একটি মিশ্রণ। পরে তিনি খবরের কাগজ আর পত্রিকা থেকে আলোকচিত্র ব্যবহার করেছিলেন যেন প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও নভোশ্চররা কোকো কোলার প্রতীকের পাশে আবির্ভূত হয় একত্রে ‘আমেরিকান ড্রিম’ ধারণাটির একটি প্রতীক হিসেবে।

তার ক্যানভাসে আলোকচিত্র স্থানান্তর করতে রাউশেনবার্গ সিল্ক স্ক্রিন প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছিলেন। খুব সুক্ষ্ম একটি জালিকা, যা ‘স্ক্রিন’নামে পরিচিত, প্রথমে ক্যানভাসের উপর স্থাপন করা হতো, তারপর একটি স্টেনসিল এর সাথে যুক্ত করা হতো যেন স্ক্রিনের কিছু অংশ ক্যানভাসের পৃষ্ঠে রঙের যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো। এরপর চাপ প্রয়োগে স্ক্রিনের মধ্য দিয়ে রং পরিচালনা করা হতো একটি ‘স্কুইজি’ ব্যবহার করে, এবং প্রিন্টটি তৈরি করা হতো। এই স্ক্রিন প্রিন্ট কৌশল ব্যবহারে দক্ষ একজন শিল্পী ছিলেন অ্যান্ডি ওয়ারহোল (১৯২৮-১৯৮৭)। তিনি চেয়েছিলেন তার শিল্পকর্মগুলো দেখে যেন অনুভূত হয়, কোনো যন্ত্র সেগুলো তৈরি করেছে। তার দক্ষ সহকারীরা প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান ব্যক্তিদের আলোকচিত্র স্ক্রিনে স্থানান্তর করতেন, যেন তিনি সেগুলো তার রুপালী পাতে আবৃত স্টুডিওতে প্রিন্ট করতে পারেন। কেন সেলব্রিটির ছবি ব্যবহার করা হতো? কারণ খ্যাতির স্বরূপ ও সেই ধারণাটি তাকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল - যে-কোনো বিখ্যাত কেউ অনন্য, কিন্তু তাদের ছবি বহু সহস্রবার পুনরুৎপাদন করা যেতে পারে। তিনি মেরিলিন মনরো আর এলভিস প্রিসলির সুপরিচিত চিত্রগুলো ব্যবহার করেছিলেন, একটি একক ক্যানভাসে যা বহুবার প্রিন্ট করেছিলেন, তাদের চুল, ঠোঁট আর চামড়ার রং পরিবর্তন করে। তিনি মৃত্যু নিয়েও আচ্ছন্ন ছিলেন, গাড়ি দুর্ঘটনা এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলনে নানা আলোকচিত্রও (সংবাদপত্র থেকে) ব্যবহার করেছিলেন, এই চিত্রগুলোর পুনরাবৃত্তি

করেছিলেন যতক্ষণ না এটি অভিঘাত বা 'শক' সৃষ্টি করার ক্ষমতা না হারায়।

ওয়ারহোল রয় লিখটেনস্টাইনের (১৯২৩-১৯৯৭) মতো একজন 'পপ' শিল্পী ছিলেন। লিখটেনস্টাইন কার্টুন থেকে দৃশ্য আঁকতেন, ডোনাল্ড ডাক আর মিকি মাউস দিয়ে তার বহু ক্যানভাস পূর্ণ করেছিলেন. এছাড়া সেখানে বোমারু বিমান বিস্ফোরিত হচ্ছে বিকট ' হোয়্যাম' শব্দ করে কিংবা স্বর্ণকেশী সুন্দরী বিস্মিত হয়ে বলছেন, 'কেন ব্র্যাড ডার্লিং, এই পেইন্টিং তো মাস্টারপিস'। ব্রিটিশ 'পপ' শিল্পী রিচার্ড হ্যামিলটন (১৯২২-২০১১) 'পপ ' শিল্পকলাকে ব্যয়সাশ্রয়ী, গণউৎপাদনযোগ্য, জনপ্রিয় এবং বুদ্ধিদীপ্ত শিল্পকর্ম হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। গ্রিনবার্গের নাক উঁচু আধুনিকতাবাদের শিল্পের খাতিরে কেবল শিল্পের মন্ত্র থেকে এটি সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। 'পপ' ছিল সবার জন্য শিল্পকলা, বাস্তব পৃথবীতে যার শিকড় গাথা, এবং এগুলো ছিল কৌতূহলোদ্দীপক ও আনন্দপূর্ণ। এটি সেই সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত করেছিল, যা ইতোপূর্বে শিল্পকলা হিসেবে আদৌ কখনো বিবেচিত

হয়নি: আমেরিকার বিজ্ঞাপন, কার্টুন, নিত্যদিনের ভোগ্যপণ্যের ব্র্যান্ড, যেমন ক্যাম্পবেল স্যুপের কৌটা এবং ব্রিলো বক্স।

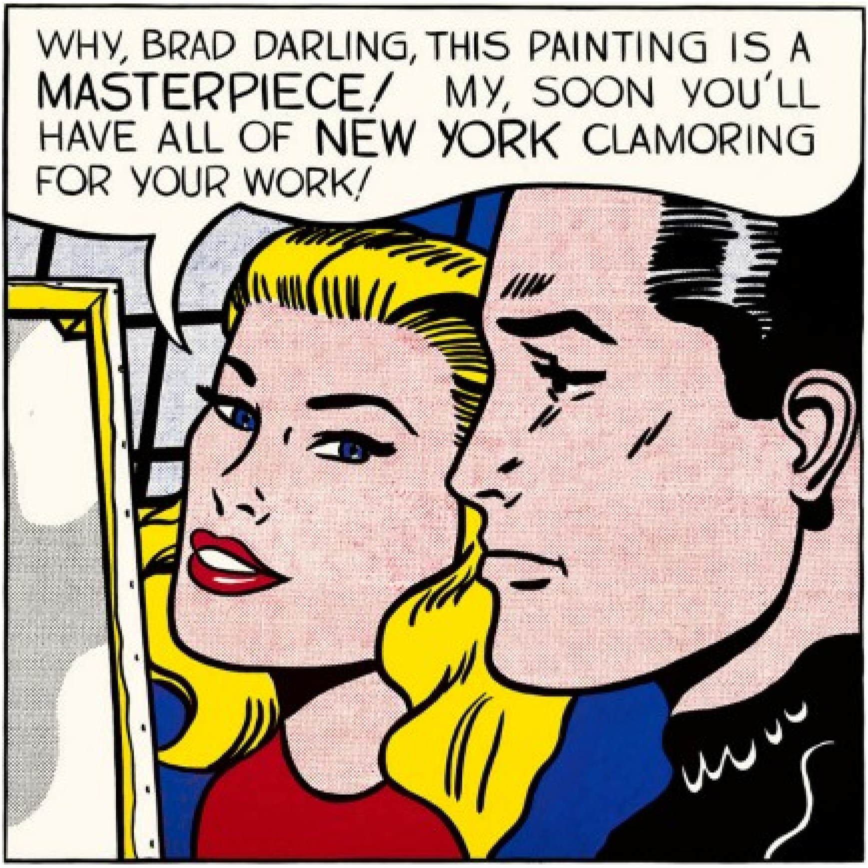

যদিও প্রায়শই ভাবা হয়ে থাকে 'পপ' শিল্পকলা আমেরিকান একটি প্রপঞ্চ, কিন্তু এটির সূচনা হয়েছিল ব্রিটেইনে। ১৯৫৬ সালে হ্যামিলটনের একটি কোলাজ ব্রিটিশ 'পপ' শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছিল। এটির শিরোনাম ছিল 'জাস্ট হোয়াট ইজ ইট দ্যাট মেকস টুডেজ হোমস সো ডিফারেন্ট, সো অ্যাপিলিং'? ম্যাগাজিন থেকে ছবি কাটা হয়েছে এমন একটি আধুনিক দম্পতিকে আমরা হালফ্যাশনের অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থান করতে দেখি। পেছনের জানালার বাইরে দিয়ে একটি সিনেমা হল দেখা যাচ্ছে, 'ইয়ং রোমান্স' ম্যাগাজিনের একটি প্রচ্ছদ শিল্পকলা হিসেবে দেয়ালে ফ্রেমবন্দী। আর কার্পেটটি দেখতে সন্দেহজনকভাবে বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদী কোনো চিত্রকর্মের মতো, এর ওপর দিয়ে হাঁটার জন্য যা বিছানো হয়েছে। আপনার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সাম্প্রতিক ও অবশ্য-কাম্য কিছু গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি কেতাদূরস্ত সোফায় আসীণ নগ্ন নারীটির সাথে প্রতিযোগিতা করছে। একটি বিশাল আকারে ললিপপ, যার নামকরণ করা হয়েছে 'পপ',

 সেটিকে ধরে আছে পেশীবহুল একজন বডিবিল্ডার, যেন এটি উলটো করে ধরা একটি ডাম্ববেল। এই কাজটি ছিল লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল আর্ট গ্যালারি আয়োজিত প্রভাবশালী 'দিস ইজ টুমোরো' শিল্পকলা প্রদর্শনীর একটি অংশ। হ্যামিলটনের কোলাজ টি এই প্রদর্শনীর পোষ্টার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছিল।

পিকাসো এবং ব্রাক কোলাজ নিয়ে প্রথম পরীক্ষা করেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে , এবং এর পরেই ডাডাবাদী শিল্পীরা 'ফটোমন্টাজ' ব্যবহার করেছিলেন। 'পপ' শিল্পীরা এইসব খুঁজে পাওয়া চিত্র ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন, এবং আফ্রিকান-আমেরিকান বিমূর্ত শিল্পী রোমারে বিয়ারডেন (১৯১১-১৯৮৮) কোলাজ ব্যবহার করেছিলেন যখন ১৯৬২ সালে তার শিল্পকলা বৈপ্লবিক একটি দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতে শুরু করেছিল। তিনি কৃষ্ণাঙ্গ এলাকার সমকালীন জীবনের চিত্র নিয়ে ফটোমন্টাজ করতে শুরু করেছিলেন - চেহারা, শরীর, রাস্তার আসবাব এবং আফ্রিকার মুখোশ পরস্পরে যুক্ত করে, যেমন আমরা দেখি তার ১৯৬৪ সালের 'দ্য ডোভ' শিল্পকর্মে একটি ব্যস্ত রাস্তার দৃশ্যে। প্রদর্শনীর জন্য তিনি আলোকচিত্রের বিবর্ধন কৌশল ব্যবহার করে তার কোলাজগুলো আকারে বড় করতেন, যতক্ষণ না সেগুলো বিশাল পোস্টারের মতো হয়। বিমূর্ত থেকে ফটোমন্টাজে তার এই আকস্মিক পরিবর্তন, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন এই বলে যে, 'শিল্পকলা কোনো বিষয়কে যতটা বাস্তবতা দিতে পারে, তার চেয়ে বরং নিগ্রোরা আরো বেশি মাত্রায় বিমূর্তনের শিকার হচ্ছে'। চারিদিকে ক্রমশ সংগঠিত হতে থাকা কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক

অধিকার আন্দোলনে অবদান রাখতে তিনি লিউইসের সাথে 'স্পাইরাল' শিল্পী গোষ্ঠী সহপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি তার কাজে কৃষ্ণাঙ্গদের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে দৃশ্যমান করতে চেয়েছিলেন, যা আমেরিকার শিল্পকলা গ্যালারি আর জাদুঘরগুলোয় তখনো মূলত অদৃশ্য ছিল।

'পপ' শিল্পকলা ছিল চিত্রের একটি সংমিশ্রণ, যে পর্বে দর্শকরা জনপ্রিয় সংস্কৃতি থেকে সংগৃহীত বিচিত্র চিত্র নামকরা গ্যালারির দেয়ালে শোভা পেতে দেখেছিল। ম্যাগাজিন থেকে আলোকচিত্র, খবরের কাগজ থেকে কার্টুনের স্ট্রিপ, কোক বোতলের লেবেল, কোনো কিছুই 'পপ' শিল্পীদের নাগালের বাইরে ছিল না। কিন্তু সবাই এই উন্মাতাল ছবি আর রঙের বিস্ফোরণ আত্মীকৃত করে নিতে পারেননি। কিছু শিল্পী যারা পরে 'মিনিমালিস্ট' হিসেবে পরিচিত পেয়েছিলেন, তারা শিল্পকলাকে ভিন্ন একটি দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন, যন্ত্রে তৈরি উপকরণ আর জ্যামিতিক আকৃতি ব্যবহার করে, যা আধুনিকতাবাদের শিল্পকলার খাতিরে শিল্পকলা মন্ত্রটিকে চূড়ান্তবারের মতো একটি সুযোগ দিয়েছিল।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে)

(১) Elizabeth Catlett, and a special fear for my loved ones

(২) Elizabeth Catlett, I have given the world my songs
(৩) Norman Lewis, Cathedral
(৪) Willem de Kooning, Woman And Bicycle
(৫) Elaine de Kooning, Robert de Niro Sr.
(৬) Mark Rothko, No. 61 (Rust and Blue)
(৬) Lee Krasner's Abstract No. 2
(৭) Jackson Pollock, Blue Poles
(৮) Jasper Jones, Three flags
(৯) Robert Rauschenberg, Monogram,
(১০) Andy Warhol, Shot Marilyns,
(১১) Roy Lichtenstein Why Brad darling, this painting is a Masterpiece
(১২) Richard Hamilton' Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?
(১৩) Romare Bearden, The Dove

অধ্যায় ৩৬ - ছাঁচ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা ভাস্কর্য

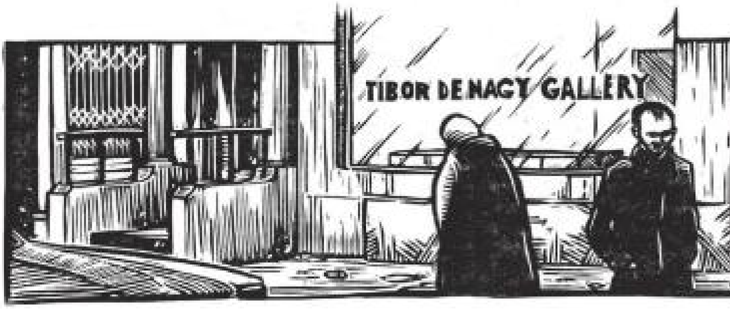

১৯৬৬ খ্রস্টাব্দ, মার্চ মাস, নিউ ইয়র্কের টিবোর ডে ন্যাগি গ্যালারিতে কেবল শিল্পী কার্ল আন্দ্রের একক প্রদর্শনী ‘ইকুইভ্যালেন্ট’ শেষ হলো। তিনি মোট আটটি ভাস্কর্য প্রদর্শন করেছিলেন, সেগুলোর কোনোটি বিক্রি হয়নি।

আন্দ্রে চেয়েছিলেন তার সব ভাস্কর্যগুলো যেন সৎ হয়, কী উপাদান দিয়ে সেগুলো নির্মিত হয়েছে তা যেন প্রদর্শন করে। আর সেই কারণে এই সিরিজের জন্য একটি ইটের কারখানা থেকে তিনি তৈরি বালু-চুনাপাথরের ইট সংগ্রহ করেছিলেন । তার প্রতিটি ভাস্কর্যে তিনি ১২০টি ইট ব্যবহার করেছিলেন, গ্যালারীর কাঠের মেঝেতে সেগুলো বিভিন্ন সজ্জায় বিন্যস্ত করেছিলেন। দুই স্তরে ঘনসন্নিবিষ্ট ইটগুলো আটটি ভিন্ন আকারের আয়তক্ষেত্রে বেশ নিখুঁতভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল। ‘ইকুইভ্যালেন্ট এইট’ লম্বালম্বিভাবে সাজানো দশটি ইট সমান দীর্ঘ এবং প্রশস্তে যা ছিল ছয়টি ইটের সমান। ইকুইভ্যালেন্ট ফাইভ অন্য দিকে বারোটি ইটের সমান তবে আড়াআড়ি সজ্জিত, সেই কারণে কম দৈর্ঘ্যের মনে হয়। একটি ভাস্কর্য ছিল বর্গাকৃতির, আরেকটি দেখতে লম্বা সংকীর্ণ একটি আয়তক্ষেত্রের মতো। আর এটাই ছিল এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে

কৌতূহলোদ্দীপক অংশ, যদিও এগুলো দেখতে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হয় এবং গ্যালারির মেঝেতে এগুলো ভিন্ন ধরনের রূপ বা ‘ফুটপ্রিন্ট’ নিয়ে অবস্থান করছে, কিন্তু সমপরিমান একই উপাদান ব্যবহার করেই এগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো পরস্পরের সমতূল্য। আন্দ্রে এই পার্থক্য নিয়ে মূলত আগ্রহী ছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে কিছু জিনিস ভিন্ন মনে হলেও সেগুলো মূলত একই।

আপাতত আন্দ্রেকে অবশ্য বেশ কিছু ঋণ শোধ করতে হবে, এই ভাস্কর্যগুলো থেকে ৮৪০ টি ইট খুলে লং আইল্যান্ড সিটি ব্রিকওয়ার্ক ফ্যাক্টরিতে ফেরত পাঠাতে হবে, যেন তিনি তার টাকা ফেরত পান। একটি ভাস্কর্য বানাবার মতো ইট তিনি কাছে রাখবেন, এর বেশি তার আর দরকার নেই।

*

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ‘ইকুইভ্যালেন্ট’ ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে কোনো ভাস্কর্য হয়তো বিক্রি হয়নি, কিন্তু এর কয়েক বছরের মধ্যে কার্ল আন্ড্রে (জন্ম ১৯৩৫) তার ‘ইক্যুইভ্যালেন্ট এইট’ ভাস্কর্যটি লন্ডনের টেট গ্যালারীর কাছে বিক্রি করেছিলেন। ‘ইক্যুইভালেন্ট’ ভাস্কর্যগুলো ছিল তার প্রথম মেঝের উপর স্থাপিত চ্যাপটা কাজ, যেখানে ভাস্কর্যগুলো সরাসরি গ্যালারীর মেঝে অবস্থান করে ছিল, কোনো একটি প্লিন্থ বা ভিত্তিবেদীর (একটি ব্লক, যার উপর সাধারণত ভাস্কর্য প্রদর্শনের জন্য স্থাপন করা হতো) ওপরে নয়। প্রদর্শনে এই পরিবর্তনটি আজ খুব সামান্য একটি পার্থক্য মনে হতে পারে, কিন্তু ১৯৬০-এর দশকের আগ অবধি এটি আর কখনোই করা হয়নি। ডুশ্যাঁ মূলত দায়ী ছিলেন শিল্পীদের মনে সেই উপলব্ধিটি প্ররোচিত করতে - তারা তৈরি কোনো বস্তু (রেডি-মেড) ভাস্কর্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে শিল্পীরা ভিত্তিবেদী থেকে ভাস্কর্যগুলোর লাফিয়ে নীচে নেমে আসার জন্য দায়ী ছিলেন, যা ক্রমে বিস্তৃত হতে শুরু করেছিল গ্যালারির মেঝে এবং পুরো কক্ষে, সরাসরিভাবে সেগুলো আমাদের জগতে প্রবেশ করেছিল।

ভিত্তিবেদী থেকে ভাস্কর্যকে সরিয়ে ফেলা প্রথম শিল্পী কিন্তু আন্ড্রে ছিলেন না। ই ংল্যান্ডে আন্থনি কারো (১৯২৪-২০০৩) ১৯৬০-এর দশক থেকেই তার ধাতব ভাস্কর্যগুলোকে গ্যালারি কক্ষের মেঝের ওপর সরাসরি স্থাপন করতে শুরু করেছিলেন। তার উজ্জ্বলভাবে রঞ্জিত ভাস্কর্য ‘আর্লি ওয়ান মর্নিং’(১৯৬৩) দেখতে ত্রিমাত্রিক একটি চিত্রকর্মের মতো ছিল, যখন আপনি এর নীচ দিয়ে হাঁটবেন তখন এর ইস্পাতে তৈরি গার্ডারগুলোকে তুলির লাল আঁচড়ের মতো বাতাসে মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে দেখবেন। আমেরিকায়, ভাস্কর ডেভিড স্মিথ (১৯০৬-১৯৬৫) একই ভাবে ভিত্তিবেদী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তিনি তার ক্রমশ বিমূর্ত ভাস্কর্যগুলো গ্যালারীর বাইরে ও ভিতরে স্থাপন করতে শুরু করেছিলেন।

১৯৬৬ সাল নাগাদ সমালোচকরা আন্দ্রে এবং ডোনাল্ড জাড (১৯২৮-১৯৯৪) এবং ড্যান ফ্লাবিনসহ (১৯২৩-১৯৯৬) আরো কয়েকজন তরুণ শিল্পীদের একটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছিলেন, এবং তাদের 'মিনিমালিস্ট' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। 'মিনিমালিজম' ছিল নতুন একটি শব্দ এবং যে শব্দটির সাথে শিল্পীরা কেউই কোনো সংযোগ অনুভব করতে পারেননি। এর অর্থই বা কী হতে পারে? শিল্পীরা সবাই শিল্পকারখানার উপাদান এবং জ্যামিতিক বস্তু - ইট, আলোর টিউব, ধাতুর বাক্স ব্যবহার করেছিলেন, এবং প্রায়শই যেগুলো ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত ছিল। আজ আমরা মিনিমালিজমকে বিমূর্ত শিল্পকলার একটি রূপ হিসেবে বিবেচনা করি, হয়তো এর চূড়ান্ত রূপ, যেখানে যে উপাদান বা বস্তু দিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছে এবং যে পরিসর এটি দখল করে আছে সেটির বাইরে আর কিছুই নেই। এটি কোনো ঢেউ বা যুদ্ধের ভয়াবহতার ধারণা প্রকাশ করে না। এটি আসলেই যা সেভাবেই এটি উপস্থাপিত।

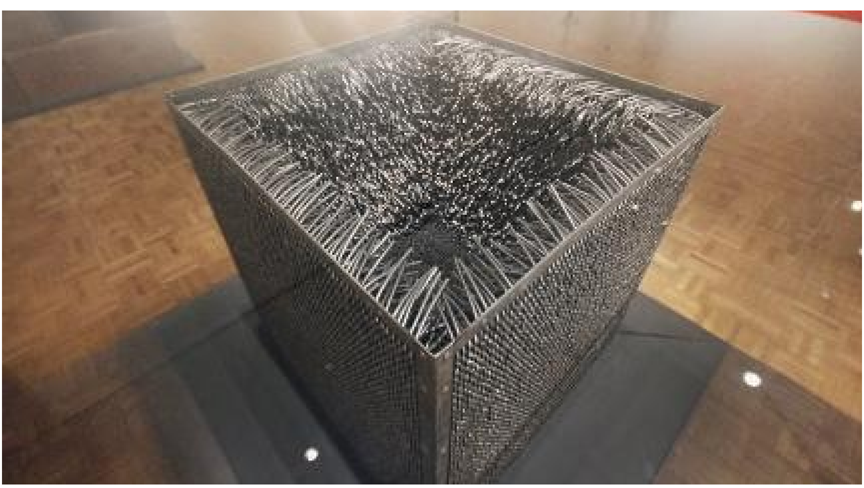

মিনিমালিজম ভাস্কর্যে ব্যবহৃত শিল্পজাত কঠিন উপাদানগুলোর ধারালো প্রান্ত সবাইকে

আকর্ষণ করেনি। ইভা হেস (১৯৩৬-১৯৭০) কাপড়, প্লাস্টিক, লেটেক্স, রেজিন এবং বহু মিটার দীর্ঘ তার বা সুতা ব্যবহার করেছিলেন তার জৈবিক আর খামখেয়ালি ভাস্কর্য সৃষ্টি করতে। সেগুলো দেয়াল থেকে ঝুলানো হতো, কিন্তু মেঝের ওপর রাখা যেত। যদিও তিনি মিনিমালিজমের কিছু ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, জ্যামিতিক ঘনক্ষেত্র, পুনরাবৃত্তি হওয়া একক, কিন্তু তিনি একই সাথে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও দেখিয়েছিলেন এবং তার ভাস্কর্যগুলো প্রায়শই অগোছালো, ত্রুটিযুক্ত, অসমভাবে বিস্তৃত এবং ভঙ্গুর। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তার সৃষ্ট ‘অ্যাকসেশন ২’ ভাস্কর্যটি ছিল গ্যালারির মেঝেতে স্থাপিত একটি কিউব। প্রথম দৃষ্টিতে এটিকে একটি মসৃণ মিনিমালিস্ট কাজ হিসেবে মনে হতে পারে, কিন্তু এর ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, অ্যানিমোন শুড়ের মত অসংখ্য প্লাস্টিকে নল আপনার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়াচ্ছে। এগুলো অপ্রত্যাশিত, বত্রিশতম অধ্যায়ের সেই লোমশ পশুচর্মের মতো, যা ওপেনহাইমের পরাবাস্তববাদী কাপ ও প্লেট আবৃত করে ছিল - একই সাথে অদ্ভুত, প্রলুব্ধকর এবং অস্তিত্বকর একটি অনুভূতির উদ্রেক করে।

লিন্ডা বেঙ্গলিস (জন্ম ১৯৪১) তার সৃষ্টির উপাদানগুলো সরাসরি গ্যালারির মেঝেতে ঢেলে, ছড়িয়ে কিংবা নিঃসরণ করেছিলেন প্রদর্শনীর জন্য, রঙ্গীন রাবার দিয়ে মেঝে প্লাবিত করেছিলেন, সম্পসারণশীল ফোম দেয়ালের কোণ পূর্ণ করেছিলেন। ১৯৭০ সালে তার সৃষ্ট ‘ফর কার্ল আন্দ্রে’ ভাস্কর্যে একের পর এক স্তরে কালো ফোম নিঃসরিত করেছিলেন। বেঙ্গলিস বলেছিলেন তিনি তার এই কাজের নাম দিয়েছিলেন আন্দ্রের ইট দিয়ে তৈরি একটি ভাস্কর্য দেখে, এবং অনুভব করেছিলেন কীভাবে সেটি গ্যালারির পরিসরে শক্তি সঞ্চালিত করেছিল। একই সাথে এটি প্ররোচনামূলক একটি শিরোনাম - এই কাজটি আপাতদৃষ্টিতে সেই সব কিছুই যা মিনিমালিজম নয়। এটি বিশৃঙ্খল এবং হাতে তৈরি, কাঠের ওপর এগুলো জমা হচ্ছে, দেখতে অনেকটা লাভার প্রবাহের মতো যা কক্ষের এক কোণ থেকে বুদ্বুদ হিসেবে নির্গত হয়েছিল এবং তারপর সেখানে সেটি শীতল হবার জন্য রাখা হয়েছিল।

রিচার্ড সেরা (জন্ম ১৯৩৮) মিনিমালিজমের আরেকটি বিকল্প উপস্থাপন করেছিলেন। বেঙ্গলিস এবং হেসের মতো তিনি ভাস্কর্য তৈরি করার ভৌত প্রক্রিয়ার সাথে পুনসংযোগ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তিনি তার ভাস্কর্যের উপাদানগুলোকে তাদের আবেগীয় শক্তি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, যদি কোনো কিছু আবহাওয়াসহিষ্ণু ইস্পাত মিশ্রণ থেকে তৈরি হয়, সেটি শুধু ইস্পাতের মতোই দেখতে হবে না, এটিকে আরো ভারী, তীব্র, ভীতিকর মনে হবে। ১৯৬৯ সালে সৃষ্ট তার 'ওয়ান টন প্রপ (হাউজ অব কার্ডস)' ভাস্কর্যে তিনি মিনিমালিস্টদের কিউবের অংশগুলো বিযুক্ত করেছিলেন, এর চার পাশকে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন ভারী সীসার পাত দিয়ে, যেগুলো পরস্পরের এই অবস্থানে ধরে রাখতে ভিতরের দিকে হেলে আছে। এই ভাস্কর্যটি ঝালাই করে যুক্ত করা হয়নি, বরং এর ভারসাম্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাশের ঘরের মতো। গ্যালারির মেঝেতে এটি দেখলে আপনার ভয় হবে, কী হবে এটি যদি পড়ে যায়? আপনি কী এর নীচে চাপা পড়বেন? এটি আপনার আবেগের সাথে যেভাবে কথা বলে, মিনিমালিস্ট কাজগুলো সেভাবে কখনো বলে না।

এইসব শিল্পীরা তাদের কাজে বিচিত্র ধরনের সব উপাদান ব্যবহার করেছিলেন , এবং গ্যালারির প্রতিটি পৃষ্ঠে তারা কাজ করেছিলেন, মেঝে, দেয়াল, কোণ, দরজা। তবে , এই সময়ে বেশ কিছু শিল্পী এমন কাজ করতে শুরু করেছিলেন, যা আদৌ গ্যালারির মধ্যে প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। এখন যা পরিচিত 'ল্যান্ড আর্ট' হিসেবে, এটি ছিল আমেরিকান ভাস্কর্য এর সর্বোচ্চ মাত্রা। শিল্পীরা নিউ মেক্সিকোয় নেভাদার উপত্যকার দেয়াল কেটেছিলেন, এবং এর মধ্যে ধাতব দণ্ড স্থাপন করেছিলেন লাইটনিং বা বিদ্যুচ্চমকের ক্ষেত্র তৈরি করতে এবং তারা কংক্রিটের নলে চিত্র করেছিলেন সুর্য সুড়ঙ্গ তৈরি করতে।

তারা একটি মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন, উত্তর ক্যারোলাইনায় বিলুপ্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ রোডেন ক্রেটারটিকে সুবিশাল একটি শিল্পকর্মে পরিণত করেছিলেন। তারা মরুভূমি, সল্ট ফ্ল্যাট ও তাদের জানামতে সব দূর্গম এলাকায়

গিয়েছিলেন, উনবিংশ শতকে যেমন টমাস কোল গিয়েছিলেন (যদিও তিনি পর্বত ভালোবাসতেন, পচিশতম অধ্যায়ে যেমন আমরা দেখেছি)। ‘ল্যান্ড আর্ট’ শিল্পীরা মনে করতেন, শিল্পকলা এর পথ হারিয়ে ফেলেছে, এবং শুধু নিজেকেই নিয়েই আগ্রহী হয়ে উঠেছে, যেমন শিল্পের খাতিরে শিল্প। বিমূর্ত ভাস্কর্য শুধুমাত্র এর উপাদান আর আকার আর পরিসরের কথা বলে, এই পৃথিবী বা এর প্রয়োজন নিয়ে নয়। ক্রমশ মানুষ তাদের এই গ্রহ সুরক্ষা করার গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেছে - আধুনিক পরিবেশবাদের জন্ম হয়েছিল, এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিলে আমেরিকায় প্রথম বার্ষিক পৃথিবী দিবস উদযাপিত হয়েছিল। এই বছরেই রবার্ট স্মিথসন (১৯৩৮-১৯৭৩) তার ‘স্পাইরাল জেটি’ তৈরি কাজ শেষ করেছিলেন (ইউটাহ প্রদেশের গ্রেট সল্ট লেকের রোজেল পয়েন্টে)।

সেই সময়ের অধিকাংশ ‘ল্যান্ড আর্ট’ শিল্পকর্মের মতো, যখন ‘স্পাইরাল জেটি’ প্রথম তৈরি করা হয়েছিল, তখন বলতে গেলে কেউই সেটি দেখেননি, কারণ এটি সবচেয়ে নিকটবর্তী শহর আর বিমান বন্দর থেকেও বহু মাইল দূরে অবস্থিত। এটির অস্তিত্ব ছিল শুধু আকাশ থেকে তোলা আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র এবং ম্যাগাজিন প্রবন্ধে। ইউটাহ অঙ্গরাজ্যের গ্রেট সল্ট লেকের মধ্যে বহু হাজার টন আগ্নেয় শিলা ব্যবহার করে স্মিথসন একটি ‘স্পাইরাল’ তৈরি করেছিলেন। একটি দেখতে বিশাল আকারের টেনড্রিল বা আকর্ষীর মত, ৫০০ মিটার দীর্ঘ এই আকর্ষীটি তীর থেকে বাহিরে দিকে সম্প্রসারিত হয়ে আছে। পরবর্তী দশকগুলোয় যখন এই জেটি হয় নিমজ্জিত হয়েছিল কিংবা খরার সময় পানি নেমে গিয়ে শুষ্ক রূপ নিয়েছিল। স্মিথসন হয়তো এই পরিবর্তনগুলো পছন্দ করতেন। এনট্রোপি - প্রাকৃতিক বিশ্ব কীভাবে শৃঙ্খলা থেকে বিশৃঙ্খলতার দিকে অগ্রসর

হয় - তার বিশ্বাসের কেন্দ্রে ছিল।

আপনি এখনো ‘স্পাইরাল জেটি’ ভ্রমণ করতে পারবেন, এবং পায়ের নীচে লবন স্ফটিক পিষ্ট হবার শব্দ শুনতে পারবেন। ব্রাজিলে ১৯৬০-এর দশকে কাজ এবং দর্শকের মধ্যে সরাসরি সংযোগের ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে ১৯৬৪ সালে, যখন একটি সামরিক ক্যু শৈল্পিক স্বাধীনতায় কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল। হেলিও ওইচিসিকা (১৯৩৭-১৯৮০) সাংস্কৃতিক একটি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন, যে আন্দোলনটি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী একটি অবস্থান নিয়েছিল, এবং ব্রাজিলের সৃজনশীলতাকে উদযাপন করেছিল। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তার এই নামের একটি কাজ থেকে এই গোষ্ঠীটি ‘ট্রপিকালিয়া’ নামে পরিচিতি পেয়েছিল। ‘ট্রপিকালিয়া’ সৃষ্টি করতে রঙীন পর্দা ব্যবহার করে তিনি অস্থায়ী একটি কাঠামো তৈরি করেছিলেন, যা রিও ডি জানেরিওর পরিচিত ‘ফাভেলা’ বা ঝুপড়ির প্রতিনিধি, এবং এগুলোকে তিনি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় নানা উদ্ভিদ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তার ‘ট্রপিকালিয়া’ যেন ব্রাজিলের মতো দেখতে হয়, এমন কোনো শিল্পকর্ম, যা আর কোথাও যেন নির্মাণ করা সম্ভব না হয়। তিনি দর্শকদের আমন্ত্রণ করেছিলেন সেখানে সময় কাটাতে, টিভি দেখতে অথবা আড্ডা মারতে। সেই সময় এই সবকিছুই ছিল বৈপ্লবিক, কারণ সামরিক শাসন এই ধরনের বহু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল। এটি ছিল ইনস্টেলশন বা স্থাপনা শিল্পকলার একটি আদি উদাহরণ, যেখানে একটি শিল্পকর্ম সম্পূর্ণ একটি পরিবেশে পরিণত হয়।

লিজিয়া ক্লার্ক (১৯২০-১৯৮৮) এবং লিজিয়া পাহপে (১৯২৭-২০০৪) এবং ব্রাজিলের অন্যান্য শিল্পীরা দর্শকদের তাদের কাজে সংযুক্ত করেছিলেন। ক্লার্ক বিমূর্ত ধাতব ভাস্কর্য তৈরি করেছিলেন, যাদের নাম দিয়েছিলেন ‘বিচোস’ (বাগস - পোকা), যেগুলো দর্শকরা তাদের ইচ্ছামত ভাজ কিংবা বাঁকিয়ে নানা ধরনের আকৃতি দিতে পারতেন। ১৯৬৮ সালে লিজিয়া পাহপে‘ডিভাইডার’ সৃষ্টি করেছিলেন, সুবিশাল ৩০ মিটার প্রশস্ত একটি বর্গাকার কাপড়, যেখানে সমান দূরত্বের ব্যবধানে কাটা অংশ ছিল। যার মধ্য দিয়ে দর্শকরা তাদের মাথা বের করতে পারতেন এবং একটি গোষ্ঠীর অংশ হতে পারতেন, যেখানে কোনো একজনের গতিবিধি সমগ্র গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে।

ব্রাজিলের শিল্পীরা দর্শকদের সক্রিয়, এবং তাদের শিল্পকর্মের অংশে পরিণত করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু অনত্র শিল্পীরা নিজেরাই শিল্পকলার সক্রিয় একটি অংশে পরিণত হয়েছিলেন। একটি চিত্রকর্ম কিংবা একটি ভাস্কর্য সৃষ্টি করার পরিবর্তে তারা নিজেদের শরীর আর ক্রিয়া ব্যবহার করে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছিলেন। এটি 'পারফর্মেন্স আর্ট' (কৃৎকলা) হিসেবে পরিচিত পেয়েছিল। জাপানের গুটাই গোষ্ঠীর শিল্পীরা তাদের পায়ে রং করেছিলেন, কাগজের পর্দার মধ্যে দিয়ে দৌড়েছিলেন, কাদায় সাতার কেটেছিলেন, ১৯৫০-এর দশকে তাদের প্রদর্শনীর উদ্বোধনী দিনে বৈদ্যুতিক বাল্বের তৈরি কাপড় পরেছিলেন।

আমেরিকায় অ্যালান কাপ্রো (১৯২৭-২০০৬) একাধিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন -‘ হ্যাপেনিংস’, যেখানে শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ এবং কবিরা দর্শকদের সাথে মিথস্ক্রিয়া করেছিলেন এক ধরনের পরীক্ষামূলক মঞ্চে, যার শিকড় ছিল ডাডা শিল্প আন্দোলনের গভীরে। ইউরোপে ১৯৬০-এর দশকে ভিয়েনিজ অ্যাকশনিস্টরা কাচা মাংস এবং রক্ত ভরা বালতি ব্যবহার করেছিলেন সেই সব কৃৎকলা সৃষ্টি করতে, যেগুলো আসলেই রক্তাক্ত আচার ছিল।, জাপান এবং কোরিয়া থেকে ইউরোপ এবং আমেরিকা অবধি বিস্তৃত আন্তর্জাতিক ‘ফ্লুক্সাস’ গোষ্ঠী পরীক্ষামূলক সঙ্গীত ও শিল্পকলার কনসার্ট আয়োজন করেছিলেন।

নিজেদের শরীর ব্যবহার করে শিল্পকলা সৃষ্টি করার আকস্মিক এই কামনা বিশ্বব্যাপী শিল্পীরা কেন অনুভব করেছিলেন? এটি কী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতি একটি প্রতিক্রিয়া ছিল , যেভাবে ‘ডাডা’ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতি প্রতিক্রিয়া, শিল্পকলার (এবং যুক্তির) জ্ঞাত সব সীমানা ছাড়িয়ে যাবার কোনো প্রয়োজনীয়তা? এটি কী শিল্পকলার গণ পুনরুৎপাদনের প্রতি একটি প্রতিক্রিয়া ছিল?। ছবি এখন সর্বত্র: বই, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র, টেলিভিশনে, বিজ্ঞাপনের সাইন, এবং পোস্টারে, যা কিনা আপনি আপনার দেয়ালেও লাগাতে রাখতে পারবেন। অথবা এটি কী পুঁজিবাদের বিরোধীতা ছিল? নিজের শরীর দিয়ে শিল্পকলা সৃষ্টিকে ভোগবাদের প্রতিষেধক হিসেবে দেখা যেতে পারে। বাস্তব জীবনে শুধু এই শিল্পকলার অভিজ্ঞতা নেয়া যেতে পারে, কারণ এটি স্থায়ী নয়, আর এই ‘পারফর্মেন্স’ কেউ নিজের সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারবে না।

একটি পুরো প্রজন্মের শিল্পীদের জন্য পারফর্মেন্স আর্ট বা কৃৎকলা অভিব্যক্তি প্রকাশের শক্তিশালী উপায়ে পরিণত হয়েছিল। আমাদের সৌভাগ্য, শিল্পীদের এই পারফর্মেন্স বা কৃৎকলাগুলোর প্রায়শই আলোকচিত্র এবং ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছিল। আর এভাবেই আমরা এখনো তরুণ ইয়োকো ওনোর (জন্ম ১৯৩৩) ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের একটি কৃৎকলা - ‘কাট পিসের’ অভিজ্ঞতা নিতে পারি। ওনো একজন ফ্লুক্সাস

(আন্তর্জাতিক শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার শিল্পীদের একটি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী, যার শিল্পকলার চূড়ান্ত রূপটির চেয়ে শিল্পকলা সৃষ্টির শৈল্পিক প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন) শিল্পী ছিলেন, এই পারফর্মেন্সের সময় প্রিয় কালো পোষাক পরে তিনি মেঝেতে নতজানু হয়ে বসেছিলেন। নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা আর আস্থা সংক্রান্ত অপেক্ষাকৃত বড় ধারণা সংযোগ করতে তিনি প্রায়শই তার নিজের শরীর ব্যবহার করেছিলেন। 'কাট পিস ' পারফর্মেন্সে দর্শকদের আহবান জানানো হয়েছিল একটি কাচি নিয়ে তার পরনের কাপড়ের কোনো একটি অংশ কেটে নিতে। শুরুতে দর্শক নারী ও পুরুষরা শ্রদ্ধার সাথে তার এই আহবান অনুসরণ করেছিলেন, তার হাতা কিংবা কলার থেকে ক্ষুদ্র কোনো অংশ কেটে নিয়ে, কিন্তু এই পারফর্মেন্সের শেষে তিনি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অন্তর্বাস পরণে বসে ছিলেন , আর দর্শকদের হাতে ছিল তার পরনের কাপড়ের অবশিষ্টাংশগুলো। তার এই নগ্নতার জন্য কী দর্শকদের দায়ী করা যেতে পারে? প্রত্যেকেই যারা তার কাপড় থেকে ক্ষুদ্র কোনো অংশ কেটে নিয়েছিল, তারা সবাই এর সাথে জড়িত ছিল।

'কাট পিস' শুরুর দিককার পারফর্মেন্স আর্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, কারণ এটি শিল্পী আর দর্শকের মধ্যকার আবেগপূর্ণ সম্পর্কটিকে উন্মোচন করেছিল। শিল্পকলার দিকে তাকানো এখানে শিল্পকলায় সক্রিয় অংশগ্রহনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, এবং পরিণতিতে পারফর্মেন্স আর্ট বা কৃৎকলা এমন কিছু যার অভিজ্ঞতা সহজে ভুলে যাবার মতো কোনো বিষয় নয়।

কনসেপচুয়াল বা ধারণাগত শিল্পকলাও দর্শকদের সক্রিয় অংশগ্রহনের ওপর নির্ভরশীল। এই নতুন ধরনের শিল্পকলা মূলত ধারণা বিষয়ক ছিল। জোসেফ কোসুথের (জন্ম ১৯৪৫) 'ওয়ান অ্যান্ড থ্রি চেয়ারস' (১৯৬৫) এর একটি উত্তম

উদাহরণ। এটি তার কনসেপচুয়াল শিল্পকলার প্রথম সৃষ্টিগুলোর একটি। এটি মূলত ছিল একটি কাঠের চেয়ার, যা গ্যালারির দেয়াল ঘেষে রাখা হয়েছিল, এবং এর পাশেই দেয়ালে লাগানো ছিল একটি সাদা-কালো আলোকচিত্র, একই চেয়ারের একই অবস্থানে, এবং অভিধান থেকে নেয়া 'চেয়ার' শব্দটির সংজ্ঞা। আমরা এই শিল্পকর্মটির কী অর্থ করতে পারি? এই চেয়ারটিকে কী আমরা শিল্পকলা বিবেচনা করতে পারি, এবং অন্য দুটি উপাদান তাহলে এর বিবরণমূলক দলিল? বেশ, না, এটি তা বোঝাচ্ছে না। এর তিনটি অংশই সমপরিমানে গুরুত্বপূর্ণ। এই শিল্পকর্মটি সমাজের ভিত্তি নির্মাণ করা ভাষার সেই কাঠামো পদ্ধতিটিকে বিবেচনা করতে বলে। এখানে একটি চেয়ার আছে - একটি ভৌত বস্তু, শিরোনামের সেই একটি চেয়ার, কিন্তু একই সাথে বস্তু , আলোকচিত্র এবং বিবরণ হিসেবে তিনটি চেয়ারই অস্তিত্বশীল। ধারণামূলক শিল্পকলা মূলত ধারণা নিয়েই কাজ করে – কনসেপ্ট বা ধারণা - যে বস্তুর দিকে আমরা তাকাই সেটি আমাদের সেই ধারণাটি বুঝতে সহায়তা করে (অর্থাৎ, শিল্পকলা)।

ধারণাগত শিল্পকলার শিল্পীরা ভাষার সাম্প্রতিক তত্ত্বগুলো নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন , বিশেষ করে 'সেমিওটিক্স' (লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত প্রতীক ও সাংকেতিক চিহ্নসংক্রান্ত বিদ্যা - সংকেতবিজ্ঞান)। শিল্পীদের কাছে এইসব প্রতীক (শব্দ) অধ্যয়ন এবং এগুলোর কি অর্থ হতে পারে সেই বিষয়ে আমরা কীভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছাই সেটি চিত্রের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। সেমিওটিক্স জানতে চায় কীভাবে আমাদের প্রত্যাশা ও মূল্যবোধগুলো আমাদের বিচারিক মানসিকতাকে প্রভাবিত করে, যখন আমরা কোনো চিহ্ন বা প্রতীক পাঠ করি। কীভাবে সমাজ তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ও পূর্বসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং পুরুষ শিল্পী, বিজ্ঞাপনদাতা, পরিচালক এবং টেলিভিশন প্রযোজকদের দ্বারা কীভাবে নারী শরীর বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, সেটি উন্মোচন করতে নারী শিল্পীরা সেমিওটিক্স ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। আন্দোলন হিসেবে

নারীবাদ যখন আরো সংগঠিত হতে শুরু করেছিল, নারী শিল্পীরা তাদের নিজেদের জন্য নিজেদের শরীরের ওপর পুনরায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে):

(১) Carl Andre, Equivalent VIII
(২) Eva Hesse, Accession II
(৩) Lynda Benglis, For Carl Andre
(৪) Richard Serra, Equal (Corner Prop Piece)
(৫) James Turrell, An interior scene at the Roden Crater complex
(৬) Robert Smithson, Spiral Jetty
(৭) Hélio Oiticica's 'Tropicália', 2020 installation view
(৮) Lygia Clark, Bicho-Maquete (Creature-Maquette)
(৯) Lygia Pape, Divisor, 1968.
(১০) Allan Kaprow, Words
(১১) Murakami Saburo, Passing Through
(১২) Yoko Ono, Cut Piece 1964, https://vimeo.com/106706806
(১৩) Joseph Kosuth, One and Three Chairs

অধ্যায় ৩৭ - আমাদের আর কোনো বীরের প্রয়োজন নেই

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ, মার্থা রোজলার রান্নাঘরের একটি টেবিলের পাশে দাড়িয়ে আছেন এবং পেছনে পরনের অ্যাপ্রোনটির ফিতা বাধছেন, তিনি বললেন, 'অ্যাপ্রোন'। এরপর তিনি একটি পাত্র হাতে তুলে নিলেন, কাল্পনিক একটি চামচ দিয়ে পাত্রটির মধ্যে কাল্পনিক উপাদানগুলো সজোরে নাড়তে শুরু করলেন। তিনি বললেন 'বৌল' অর্থাৎ পাত্র, তারপর , তিনি হার্ব (স্বাদগন্ধ বৃদ্ধিতে উদ্ভিদ, যেমন পুদিনা, মৌরি, ধনেপাতা) কাটার একটি ছুরি হাতে নিয়ে সেটি দিয়ে সজোরে পাত্রের মধ্যে আঘাত করে বললেন, 'চপার'। এভাবে তিনি ইংরেজি বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণ ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন রান্নাঘরের কোনো না কোনো উপকরণের নাম উচ্চারণ এবং সেটির ব্যবহার প্রদর্শন করে, যেমন তিনি এরপর ডিশ, এগ বিটার, ফর্ক, গ্রেটার... এভাবে অগ্রসর হতে থাকলেন।

একটি ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার করে রোসলার নিজেকে রেকর্ড করছিলেন। তিনি ছয় মিনিটের একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন, যার শিরোনাম ছিল 'সেমিওটিক্স অব দ্য কিচেন'। একজন নারী একটি রান্নাঘরে দাড়িয়ে আছেন, সাদা কালো ভিডিওতে নিজেকে রেকর্ড করছেন, দেখে মনে হতে পারে টিভির কোনো রান্নার অনুষ্ঠান, কিন্তু এটি আদৌ এমন কিছু ছিল না। এখানে কোনো খাদ্য ছিল না, কোনো রেসিপি বা রন্ধণপ্রণালী ছিল না। যা ছিল সেগুলো শুধু নানা ধরনের যন্ত্র ও উপকরণ, যা রোজলার প্রদর্শন করেছিলেন ভাবলেশহীন, তবে আক্রমণাত্মক একটি উপায়ে। তিনি সামনে ক্যামেরার দিকে আচমকা ছুরি দিয়ে আক্রমণ করার ভঙ্গি করেছিলেন । তিনি কাল্পনিক স্যুপ ছুড়ে মেরেছিলেন তার কাধের ওপর দিয়ে, এবং কাটা চামচ দিয়ে বাতাসে ছুরিকাঘাত করেছিলেন, যেন তিনি কোনো শরীরকে ছুরি দিয়ে আঘাত করছেন।

এখন তিনি বর্ণমালার চূড়ান্ত কিছু বর্ণের নিকটে পৌঁছালেন। তার কাছে কোনো রন্ধনসামগ্রী ছিল না, যা কিনা 'ভি', 'ডাবলিউ', 'এক্স' বর্ণ দিয়ে শুরু হয়। সুতরাং তিনি মাংস কাটার একটি ছুরি আর একটি কাটা চামচ নিয়ে সেই বর্ণগুলোর আকার তার শরীরের ওপর এঁকে দেখালেন। যখন তিনি 'ওয়াই' উচ্চারণ করেছিলেন তিনি তার মাথা পেছনে দিকে খানিকটা বাকিয়ে ছিলেন, সেটি শুনতে মনে হয়েছিল 'হোয়াই'? এবং বাতাসের মধ্যে ছুরি চালিয়ে তিনি অবশেষে একটি 'জেড' বা জি এঁকেছিলেন, তারপর তিনি সেখানে দাড়িয়ে রইলেন, বাকরুদ্ধ, দুই হাত ভাজ করে, একটি সামান্য কাধ ঝাকানো সমাপ্ত করেছিল এই 'ডেমোস্ট্রেশন'।

*

মার্থা রোজলারের ‘সেমিওটিক্স অব দ্য কিচেন’ ১৯৭০-এর দশকে আমেরিকার রান্নার অনুষ্ঠানগুলোকে প্যারোডি করেছিল, যে অনুষ্ঠানগুলো সুসজ্জিত রান্নাঘরে নানা কিছু বেকিং করতে সুখী নারীদের উপস্থাপন করতো। এখানে রোজলার সাংকেতিক ভাষার অধ্যয়ন ব্যবহার করেছিলেন - সেমিওটিক্স - রান্নাঘর হচ্ছে নারীদের জায়গা, এই সামাজিক কৃত্রিম নির্বাচনটির ওপর গুরুত্বারোপ করতে। তিনি যখন নিউ ইয়র্কের একটি লফট অ্যাপার্টমেন্টে টেবিলের সামনে দাড়িয়ে বর্ণানুক্রমিকভাবে ক্রমান্বয়ে রান্নাঘরের উপকরণে প্রদর্শন করছিলেন, যে লৈঙ্গিক দায়িত্ব তিনি পালন করবেন বলে সমাজ প্রত্যাশা করছে, সেটির প্রতি তার ক্রোধ আর ক্ষোভ আমরা ক্রমশ অনুভব করতে শুরু করি। ইউ টিউবে বর্তমানে আপনি ইচ্ছা করলেই ‘সেমিওটিক্স অব দ্য কিচেন’ দেখতে পারবেন, এটি নারীবাদী শিল্পকলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

নারীবাদ কী? আজ এটি বিশ্বব্যাপী একটি আন্দোলন, যার সুস্পষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে সকল লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অবসান। ১৯৭০-এর দশকে এটি শুরু হয়েছিল বৈপ্লবিক একটি বিশ্বাস কাঠামো হিসেবে, পুরুষদের জন্য পুরুষদেরই তৈরি করা সমাজে সমঅধিকারের দাবিতে যা বহু দেশের নারীদের একত্রিত করেছিল। ইয়োকো অনো এবং ইয়াওই কুসামা (জন্ম ১৯২৯) - দুজনকে প্রায়শই সূচনা পর্বের নারীবাদী শিল্পী হিসেবে দেখা হয়ে থাকে, তবে ১৯৭০-এর দশকে নারী শিল্পীরা সক্রিয়ভাবে নারীবাদের সাথে তাদের শিল্পকর্মের যোগসূত্র তৈরি করেছিলেন, এছাড়াও সহযোগিতাপূর্ণ নারী সংগঠন, ম্যাগাজিন প্রকাশনা, শিক্ষা পাঠ্যসূচি পরিচালনা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদের যুক্ত

করেছিলেন। কাজের জন্য তারা বহু বিচিত্র ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন, এবং প্রায়শই তারা নতুন শিল্পকলা মাধ্যমের দিকে ঝুকে পড়েছিলেন, যেমন ভিডিও এবং পারফরমেন্স আর্ট - কারণ এই মাধ্যমগুলোর সাথে পুরুষ-আধিপত্যের দীর্ঘ ইতিহাস সংশ্লিষ্ট নেই (চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্যের ব্যতিক্রম)।

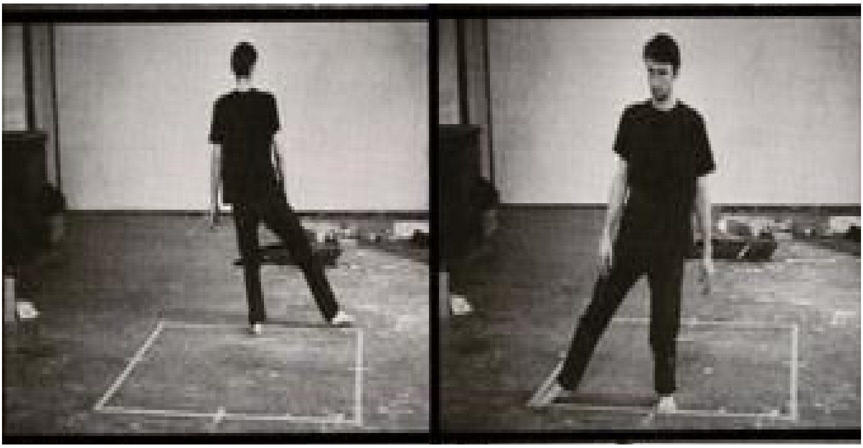

ব্রুস নাউম্যানের মতো শিল্পীদের জন্য ভিডিও একটি নতুন মাধ্যম ছিল (জন্ম ১৯৪১) এ বং ১৯৬০-এর দশকে শেষের দিকে শিল্পকলার একটি রূপ ও মাধ্যম হিসেবে তিনি এটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে শুরু করেছিলেন। স্টুডিওতে একটি ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার করে তিনি তার নিজের দৈনন্দিন নানা কর্মকাণ্ড রেকর্ড করেছিলেন - হা ঁটা, লাফানো, মাটিতে পা দাপানো ইত্যাদি। কোনো একটি ঘটনা সময়ে সাথে কীভাবে ঘটছে ভিডিও ক ্যামেরার সেটি রেকর্ড করার ক্ষমতা আছে আর সেই কারণে ভিডিও একটি নতুন ধরনের পরিসর উন্মুক্ত করেছিল, যেখানে শিল্পীরা তাদের নানা কর্মকাণ্ড প্রদর্শন বা ‘পারফর্মেন্স ’ প্রদর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। নারীবাদী শিল্পীদের কাজের মঞ্চ হিসেবে, যেমন রোজলারের ‘সেমিওটিক্স অব দ্য কিচেন’, এবং তাদের ‘পারফর্মেন্স’ রেকর্ড করার জন্য ভিডিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বহু নারীবাদী শিল্পীরা নিজেদের শরীরকে তাদের শিল্পকলায় ব্যবহার করেছিলেন, প্রায়শই তারা নিজেদের চূড়ান্ত পর্যায় অবধি নিয়ে যেতেন, যেমন আমরা দেখি ক্যারোলি শ্নিমান (১৯৩৯-২০১৯), আনা মেনডিয়েটা (১৯৪৮-১৯৮৫) এবং মারিনা আব্রামোভিচ (জন্ম ১৯৪৬) প্রমূখ শিল্পীদের পারফর্মেন্স আর্ট বা কৃৎকলায়। মূল অনুষ্ঠানের সময় গৃহীত ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে আজ আমরা এইসব পারফর্মেন্সের অভিজ্ঞতা নিতে পারি।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নাম জুন পাইক (১৯৩২-২০০৬) একটার ওপর একটা সাজিয়ে রাখা টেলিভিশনে সঙ্গীতজ্ঞ শার্লোট মুরমানের ভিডিও চালিয়েছিলেন এবং 'কনসার্টো ফর টিভি, চেলো অ্যান্ড ভিডিওটেপস' ভিডিওচিত্রে মুরম্যান নিজেই এই টেলিভিশনগুলো 'বাজিয়েছিলেন' যেন সেগুলো একত্রে একটি চেলো তৈরি করেছে। এই কাজটি আপনি যা কিছু দেখছেন সেই বাস্তবতাকে প্রশ্ন করেছিল - কোনটি বেশি বাস্তব, মুরম্যান ভিডিওতে একটি চেলো বাজাচ্ছেন, নাকি মুরম্যান আপনার সামনে বসে টেলিভিশন দিয়ে তৈরি একটি চেলো বাজাচ্ছেন? এখন আমরা যখন ১৯৭০-এর দশকের পারফর্মেন্স আর্ট বা কৃৎকলা দেখি, আমরা কী মূল সেই পারফর্মেন্সটি দেখি (কীভাবে এটি রেকর্ড করা হয়েছে সেটি উপেক্ষা করে) নাকি এর একটি উপস্থাপনা (স্বীকার করে নেই যে কীভাবে এটি রেকর্ড করা হয়েছে এবং শিল্পকর্ম হিসেবে চলমান জীবনের অংশ হিসেবে) দেখছি?

কিন্তু সব নারীবাদী শিল্পীরা তাদের কাজের জন্য ভিডিও ব্যবহার করেননি। আমেরিকান

শিল্পী মেরি কেলি (জন্ম ১৯৪১) ভিন্ন একটি পন্থা বেছে নিয়েছিলেন তার 'পোস্ট পারটাম ডকুমেন্ট' কাজটির জন্য (১৯৭৩-৭৯)। তখন তিনি ইংল্যান্ডে বসবাস করতেন এবং কেবলই সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। ব্যবসায়িক বা আনুষ্ঠানিক (পুরুষের) ভাষা ব্যবহার করে - এর চার্ট আর লগ বইসহ – তিনি বহু উপাদানের বিশাল একটি আর্কাইভ তৈরি করেছিলেন, যা তার ছেলের বেড়ে ওঠার সময়ক্রমটিকে লিপিবদ্ধ করেছিল: কখন সে তার প্রথম খাওয়া খেয়েছে, হাঁটতে শিখেছে, কাগজের ওপর দাগ কেটেছে। 'পোস্ট পারটাম ডকুমেন্ট' তার ছেলের জীবনের প্রথম পাঁচ বছর এবং ছেলের প্রতিপালনে তার নিজের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছিল। এটি অদৃশ্য এবং পারিশ্রমিকহীন মাতৃত্বের কাহিনী উন্মোচিত করেছিল। রোজলারের মতো, কেলি সেই সংকেতগুলো প্রকাশ করেছিলেন যা নারীরা 'স্ব াভাবিক' হিসেবে মেনে নিতে প্রশিক্ষিত হয়েছেন – প্রাত্যহিক জীবনের রক্ষণাবেক্ষণ, রান্না, শিশু প্রতিপালন।

১৯৭০-এর দশকে নারীবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিল অ্যামেরিকা, সিলভিয়া স্লেই (১৯১৬-২০১০) ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেইন ছেড়ে অ্যামেরিকায় এসেছিলেন। তিনি শিল্পকলার ইতিহাসের ঐতিহ্যবাহী প্রথাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন নগ্নচিত্র উপস্থাপনকে তার চিত্রকর্মে সম্পূর্ণভাবে উলটো করে দিয়ে, যখন তিনি সোফায় আসীন কিংবা তুর্কি স্নানে নগ্ন পুরুষ এঁকেছিলেন। আমেরিকান শিল্পী অ্যালিস নিল (১৯০০-১৯৮৪) নগ্ন ও গর্ভবতী নারীদের জীবনঘনিষ্ঠ সৎ প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। অন্য শিল্পীরা প্রদর্শনীর আয়োজন, যেমন 'উওম্যানহাউজ' (১৯৭২) এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিল্প-স্থাপনা সৃষ্টিতে অন্য শিল্পীরা একত্রে কাজ করেছিলেন ।

১৯৭৯ সালে উপস্থাপিত জুডি শিকাগোর (জন্ম ১৯৩৯) 'দ্য ডিনার পার্টি' এই ধরনের একটি 'ইনস্টলেশন' বা স্থাপনা শিল্পকর্ম। এটি 'হিসস্টোরি'র পরিবর্তে 'হারস্টোরি'র উদযাপন। জর্জিয়া ও'কিফ, ভার্জিনিয়া উলফ এবং ইজাবেলা দে'স্টেসহ ই তিহাস থেকে নির্বাচিত উনচল্লিশ জন নারীর জন্য একটি বিশালাকার ত্রিকোণ ডিনার

টেবিল সাজানো হয়েছে। প্রতিটি পাশে মোট তের জন করে, অর্থাৎ ‘লাস্ট সাপারের’ তিনগুণ। বসার প্রতিটি জায়গা ছিল ভিন্ন, ইতিহাসে সেই নারীর অনন্য অবস্থানটির স্বীকৃতি দিয়েই শিকাগো সেগুলো পরিকল্পনা করেছিলেন। এই সজ্জা ‘অল্টার’ বা গির্জার প্রার্থনার বেদীতে বেমানান মনে হবে না, কারণ এখানে প্রত্যেকের জন্য একটি ক্যালিস বা পেয়ালা এবং সূচীকর্ম করা ম্যাট আছে। এবং এগুলোর ঠিক মাঝখানে একটি অলংকৃত পোরসেলিনের প্লেট আছে, এর কেন্দ্রীয় মোটিফটি প্রায়শই যোনি সদৃশ যা নারীর শক্তিকে উদযাপন করছে, এছাড়াও আমরা নীচে টাইল বিছানো মেঝেতে বিখ্যাত আরো এক সহস্র নারীর নাম লেখা দেখতে পাই।

তবে সব নারী কিন্তু অনুভব করেননি যে, নারীবাদী আন্দোলন থেকে তারা উপকৃত হয়েছেন। দুটি ক্ষেত্রে আফ্রিকান-আমেরিকান নারীদের পরিস্থিতি ছিল প্রতিকূল - তারা প্রথমত নারী এবং দ্বিতীয়ত তারা কৃষ্ণাঙ্গ, সুতরাং তারা দুটি ক্ষেত্রে বৈষম্য আর সংস্কারগুলো নিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন। নারীবাদকে তারা সংকীর্ণ একটি আদর্শ হিসেবে আবিষ্কার করেছিলেন, শুধু শ্বেতাঙ্গ নারী শিল্পীদের যা সহায়তা করেছিল। সুতরাং তারা নিজেরাই সংগঠিত হয়ে বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ নারী শিল্পীদের নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন।

১৯৭২ সালে বেটইয়ে সার (জন্ম ১৯২৬) সান ফ্যান্সিসকোর একটি কৃষ্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ‘রেইনবো সাইনে’ একটি প্রদর্শনীতে অংশ নিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন । এটি ছিল সেই জায়গা, যেখানে এলিজাবেথ কাটলেট আর কবি মায়া অ্যাঞ্জেলুর মতো বিখ্যাত ব্যক্তিরা ‘ব্ল্যাক প্যানথার’ (একটি জঙ্গী রাজনৈতিক সংগঠন) দলের সদস্যদের সাথে ওঠাবসা করতেন। সার সেখানে ‘দ্য লিবারেশন অব আন্ট জেমাইমা’ কাজটি প্রদর্শন করেছিলেন, ছোট একটি কাচের বাক্সে বন্দী কোলাজ, যেখানে আমরা মাথায় স্কার্ফসহ কৃষ্ণাঙ্গ একজন নারীর ক্ষুদ্র ফিগারিন বা মূর্তি দেখি, যিনি একটি ঝাড়ু আর একটি

বন্দুক ধরে আছেন। সার পরবর্তীতে প্রদর্শনীর জন্য এই কাজটি তৈরি করার কথা স্মরণ করেছিলেন এভাবে: ‘আমি একটি ক্ষুদ্র আন্ট জেমাইমার তথাকথিত ম্যামি - কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপন - মূর্তি খুঁজে পেয়েছিলাম, সেই চিত্রগুলোর মতো যা পরে প্যানকেকের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছিল। তার এক হাতে ধরা ছিল একটি ঝাড়ু , অন্য হাতে আমি একটি রাইফেল দিয়েছিলাম .... তাকে বিপ্লবী হিসেবে রূপান্তরিত করে একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে আমি সেই অপমানজনক চিত্রটি ব্যবহার করেছিলাম... যেন তিনি তার অতীত দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছেন’। তার অধিকার আদায় করার লক্ষ্যে লড়াই করতে আন্ট জেমিমা এখন সশস্ত্র, এবং সার অন্য কৃষ্ণাঙ্গ নারী শিল্পীদের সেই পথ আর উপায় দেখিয়েছিলেন, যেন তারাও তাদের কাহিনির ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ আনতে পারেন।

এর কয়েক বছর আগে, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে চলমান জাতিগত দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় ফেইথ রিংগোল্ড (জন্ম ১৯৩০) ‘আমেরিকান পিপল সিরিজ #২০: ডাই’ এঁকেছিলেন। এটি পিকাসোর ‘গেরনিকা’র মাত্রায় আঁকা বিশাল একটি কাজ - একটি নৃশংস আন্তঃবর্ণ ধ্বংসলীলা ও তাণ্ডবের চিত্র। একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি বন্দুক থেকে গুলি ছুড়ছেন এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি ছুরি নিয়ে আক্রমণ করছেন। তাদের রক্তাক্ত শিশুদের নিয়ে শ্বেতাঙ্গ

ও কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা সেখানে থেকে পালানোর চেষ্টা করছেন। তাদের কেতাদুরস্ত কাপড় ইঙ্গিত করছে তারা প্রত্যেকেই শহুরে কর্মী। রিংগোল্ড প্রস্তাব করেছিলেন, সবাই আমরা বর্ণবাদী সহিংসতার শিকার, এখানে এমন কেউ নেই যে-কিনা অপরাধী নয়, তেমনি এককভাবেও কাউকে দায়ী করা সম্ভব নয়। তার অন্য কাজে তিনি আমেরিকান পতাকা ব্যবহার করেছিলেন। আমেরিকান বর্ণবাদী অবিচারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেল তিনি কালো এবং সবুজ রং ব্যবহার করে এর রং পরিবর্তন করেছিলেন - কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়বাদী পতাকার রঙ।

১৯৭০-এর দশকে প্রথম দিকে বর্ণবাদ এবং লিঙ্গবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যখন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, রিংগোল্ড এই যুদ্ধে সশরীরে অংশ নিয়েছিলেন, তিনি 'উওমেন স্টুডেন্টস অ্যান্ড আর্টিস্ট ফর ব্ল্যাক আর্ট লিবারেশন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি সেই সব প্রদর্শনীর বাইরে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করতো, যে প্রদর্শনীগুলো নারী এবং কৃষ্ণাঙ্গ শিল্পীদের অন্তর্ভুক্ত করতো না। এর এক দশক পরে যখন 'ব্ল্যাক আর্ট' আন্দোলন যখন ব্রিটেইনে শুরু হয়েছিল, তরুণ শিল্পী লুবাইনা হিমিদ (জন্ম ১৯৫৪) লন্ডনে বেশ কিছু প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন, যেমন 'ব্ল্যাক উওমেন টাইম নাও' (১৯৮৩-৪) এবং 'দ্য থিন ব্ল্যাক লাইন' (১৯৮৫)। এই প্রদর্শনীগুলো কৃষ্ণাঙ্গ এবং এশিয় নারীদের শিল্পকর্ম দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করেছিল, যেমন মড সুলটার (১৯৬০-২০০৮), সোনিয়া বয়েস (জন্ম ১৯৬২) এবং সুতপা বিশ্বাস (জন্ম ১৯৬২), যাদের প্রত্যেকেই পরবর্তীতে সফল শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ২০১৭ সালে, হিমিদ নিজেই টার্নার পুরষ্কার জয় করেছিলেন, ব্রিটেইনের যা সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সমকালীন শিল্পকলার পুরষ্কার।

এইসব শিল্পীদের প্রত্যেকের কাজ অবিশ্বাস্য মাত্রায় বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু প্রায়শই সমাজের প্রচলিত মুল্যবোধগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মধ্যে একগুলোর শিকড় প্রোথিত ছিল। এইসব মূল্যবোধ আর সংস্কারগুলো সংকেতাবদ্ধ হয়ে আছে পৃথিবীর শব্দ আর চিত্রে

– বিজ্ঞাপনে, ম্যাগাজিনে, সিনেমায় এবং শিল্পকলায়। নারীদের যেখানে প্রায়শই দেখানো হয় নিষ্ক্রিয় - দেখার ও উপভোগের বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। নিউ ইয়র্কে ১৯৭০-এর দশকে শেষে নারী শিল্পীরা এইসব উৎসকে সরাসরি মোকাবেলা করেছিলেন, চিত্র আর শ্লোগানগুলোকে পরিবর্তন করে, এবং সেগুলো পুনরায় তারা বিলবোর্ডে স্থাপন করেছিলেন যেখান থেকে এগুলো এসেছে, যেন সবাই সেই সংশোধনীটি দেখতে পায়।

বারবারা ক্রুগার (জন্ম ১৯৪৫) এবং জেনি হোলজার (জন্ম ১৯৫০) দুজনই ভাষা ব্যবহার করেছিলেন বৈশিষ্ট্যসূচক প্রচলিত ধারণাগুলোকে প্রশ্ন করতে ভাষা ব্যবহার করেছিল। ক্রুগার ম্যাগাজিন থেকে ছবি সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলো পুনর্ব্যবহার করেছিরেন। ত িনি সাদা কালো চিত্র নির্বাচন করতেন, এবং ছবি অপরিবর্তিত রেখে এর ওপর নিজের শব্দগুলো যুক্ত করতেন, যা প্রায়শই উজ্জ্বল লাল পটভূমির ওপর সাদা রঙে লেখা হতো। ভাঙ্গা আয়নায় একজন নারী মুখের ছবির উপর তিনি লিখেছিলেন ‘ইউ আর নট ইয়োরসেলফ’। একজন নারীর পুরো শরীরের এমন একটি এক্স-রে চিত্রে , যেখানে তার হাইহিল এবং হাতের চুড়িও দৃশ্যমান, তিনি লিখেছিলেন, ‘স্মৃতি হচ্ছে ত্রুটিহীনতা নিয়ে আপনার ধারণা’। তার কাজগুলো আপনাকে থমকে দেয়, ভাবায়। আপনি কী দেখছেন তা প্রশ্ন করতে প্ররোচিত করে। ১৯৫০-এর দশকে একটি বালকের চিত্রে আমরা দেখি সে তার বাইসেপ বা বাহুর মাংসপেশি প্রদর্শন করছেন বিস্মিত একজন বালিকাকে, যার নিখুঁত বেনি করে বাধা চুল এবং বিন্দু বিন্দু ছাপের কাপড়টিকে ঢেকে রেখেছে একটি শ্লোগান, ‘আমাদের আর কোনো বীরের প্রয়োজন নেই’। ক্রুগার মূল চিত্রটিকে এতোটাই বিবর্ধিত করতে যে, আমরা ‘বেন-ডে ডটস’ বা যে বিন্দুগুলো একত্রে সংবাদপত্রের কাগজে ছবি সৃষ্টি করে, সেগুলো দেখতে পারি। যদি এই চিত্রটি ভেঙ্গে যেতে থাকে, তাহলে যে ধারণাটি এর ভিত্তিতে আছে সেটিরও একই পরিণতি হবে (তার সহায়তার

মাধ্যমে)।

ক্রুগার বেশ বড় পরিসরে কাজ করতেন এবং তার শিল্পকলা প্রায়শই গ্যালারীর বাইরে প্রদর্শিত হতো, বিলবোর্ডের ওপরে বা ভবনের বাইরের দেয়ালে। হোলজারও একই কাজ করতেন, তার 'ট্রুইজমস' (১৯৭৭-৯) তিনি কোনো নাম ছাড়াই লোয়ার ম্যানহাটানে দেয়ালে সেটে দিয়েছিলেন: 'ক্ষমতা অপব্যবহার নিয়ে বিস্মিত হবার কিছু নেই', 'অর্থ রুচি সৃষ্টি করে', 'একজন পুরুষ জানে না একজন মা হতে কেমন লাগে', এগুলো এমনকি নিউ ইয়র্কের টাইম স্কোয়ারে ইলেকট্রনিক সাইন হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছিল: 'আমি যা চাই তা থেকে আমাকে সুরক্ষা করো', জ্বলে উঠেছিল যখন ক্রেতারা নীচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন।

হোলজার প্রযুক্তি আর ভাষার শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলেন তার ধারণাগুলো প্রকাশ করতে। 'আমি ভাষা ব্যবহার করেছি, কারণ আমি একটি বিষয় উপস্থাপন করতে চাই, সেটি যেন মানুষ - শিল্পকলার সাথে সংযুক্ত মানুষরা নয় - বুঝতে পারে', তিনি

বলেছিলেন। আর সেই কারণে টি শার্ট থেকে কন্ডোমের প্যাকেট, প্রায় সব কিছুর ওপর তিনি তার শ্লোগানগুলো ছাপিয়ে ছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন তার শিল্পকলা প্রাত্যহিক জীবনের আরো গভীরে প্রবেশ করুন, এবং সংবাদপত্র আর বিজ্ঞাপনে তারা কী 'সত্য' হিসেবে পড়ছেন সেটি নিয়ে তারা প্রশ্ন করুক।

একইভাবে সিন্ডি শেরম্যানও (জন্ম ১৯৫৪) চেয়েছিলেন, যেন মানুষ যা কিছু দেখে সেই সবকিছুকেই যেন প্রশ্ন করে, বিশেষ করে চলচ্চিত্রে। নারী অভিনেত্রীদের সাধারণত চলচ্চিত্রে যে চরিত্রগুলোয় অভিনয় করার সুযোগ দেয়া হয়, সেই বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করে তার শিল্পী জীবনের প্রথম দিককার একটি ধারাবাহিক কাজ ছিল - 'আনটাইটলড (ফিল্ম স্টিলস)' (১৯৭৭-৮০)। প্রায় সত্তরটি সাদা কালো আলোকচিত্রে তিনি চলচ্চিত্র তারকাদের বেশে ও ভঙ্গিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং চরিত্রগুলো তিনি অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন: প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকা, বন্ড গার্ল, বাড়ি থেকে পলাতক তরুণী , সাধারণ গৃহবধু, সমস্যায় পড়া পরিচারিকা। তিনি হোটেল রুম, লাইব্রেরি, রান্নাঘর এবং বিছানার চাদরে নিজেকে স্থাপন করেছিলেন। তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন প্ররোচক, প্রশ্নকর্তা, আবেগময়, হতভম্ব, দুষ্কর্মে সহযোগী রূপে। তাহলে আসল সিন্ডি শেরমান কে ? তিনি এইসব নারী এবং তাদের কারো মতোই নন। তিনি আর শরীর ব্যবহার করেছিলেন প্রদর্শন করতে কীভাবে 'ছবি' প্রতারণা করতে পারে। কীভাবে সেগুলো কৌশলে আপনাকে এমন কিছু বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করে - যা কিছু আপনি দেখছেন সেটি হচ্ছে বাস্তব। অন্য ধারাবাহিকে তিনি শিশু, পুরুষ, ম্যাডোনা ও ক্লাউন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তার বয়স বাড়িয়েছিলেন, ওজন বাড়িয়েছিলেন, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রদর্শন করেছিলেন, এমনকি দাড়ি ব্যবহার করেছিলেন। আমরা তার সৃষ্ট চরিত্রগুলো সম্বন্ধে আগ্রহী হই, এবং তাদের সম্বন্ধে নিজস্ব একটি কাহিনি তৈরি করে নেই , এমনকি যদিও অতিরিক্ত মেকাপ এবং নানা ধরনের পরচুলাসহ তিনি প্রদর্শন করছেন যে , কত বেশি অবিশ্বাস্য এই চরিত্রগুলো। অন্য শিল্পীরা সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত মূল্যবোধগুলোকে নিয়ে প্রশ্ন করা অব্যাহত রেখেছিলেন ১৯৮০-এর দশকব্যাপী, আমরা পরের অধ্যায়ে সেটি দেখবো।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবি (ক্রমানুসারে)

(১) Martha Rosler - Semiotics of the Kitchen,
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZympOIGC0
(২) Bruce Nauman, Dance or Exercise on the Perimeter of a Square,
https://vimeopro.com/user3539702/ubuweb/video/121825713
(৩) Carolee Schneemann, Eye Body # 24 from Eye Body: 36
(৪) Nam June Paik, 'TV cello',
https://www.youtube.com/watch?v=-9lnbIGHzUM
(৫) Sylvia Sleigh, The Turkish Bath
(৬) Judy Chicago, The Dinner Party
(৭) Betye Saar, "The Liberation of Aunt Jemima
(৮) Faith Ringgold, American People Series #20: Die, 1967
(৯) Lubaina Himid. Freedom and Change
(১০) Barbara Kruger, Untitled (We don't need another hero)
(১১) Jenny Holzer, Truisms
(১২) Cindy Sherman, Untitled Film Stills

অধ্যায় ৩৮ - উত্তর-আধুনিক বিশ্ব

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ, জুন মাসের প্রথম দিন, নিউ ইয়র্কে ‘টাইমস স্কোয়ার শো’ কেবলই উদ্বোধন করা হয়েছে। শহরের অন্য যে-কোনো প্রদশর্নী চেয়ে ব্যতিক্রম একটি প্রদর্শনী। এটি আয়োজন করেছিল ‘কোলাবরেটিভ আর্টিস্ট ইনকরপোরেটেড’ নামে শিল্পীদের একটি গোষ্ঠী, যারা সংক্ষেপে কেবল ‘কোলাব’ নামেই পরিচিত ছিলেন, এবং জীর্ণ এন্টারটেইনমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট-এর কেন্দ্রে অব্যবহৃত চার তলা একটি ভবনে এটি আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় একশ শিল্পী এতে অংশ নিয়েছিলেন, এবং ভবনের সর্বত্রই ছিল শিল্পকর্ম। ভিডিও প্রদর্শিত হচ্ছিল মনিটরে এবং পুরুষ টয়লেটেও রাখা হয়েছিল ভাস্কর্য। ফ্যাশন, চলচ্চিত্র এবং পারফর্মেন্স বা কৃৎকলা প্রদর্শনীর পরিকল্পনাও করা হয়েছিলেন। প্রত্যাশা ছিল এটি অশেষ একটি পার্টিতে পরিণত হবে, একটি চলমান অনুষ্ঠান, যা পুরো মাসব্যাপী দিন-রাত উন্মুক্ত থাকবে।

কোলাবের শিল্পীরা পারস্পরিক সহযোগিতা, সমঅধিকারের ভিত্তিতে অংশগ্রহন ও অন্তর্ভুক্তি, এবং সৃজনশীলতার নিরপেক্ষ প্রদর্শনীতে বিশ্বাস করতেন। এককভাবে কোনো একজন ব্যক্তি দায়িত্বে ছিলেন না, এবং কোনো শিরোনাম ছাড়াই প্রদর্শিত শিল্পকর্মগুলো যেন একটি থেকে আরেকটিতে অনায়াসে রূপান্তরিত হয়েছিল। ক ে কোনটি সৃষ্টি করেছেন? এটি শিল্পকলা, নাকি গ্র্যাফিটি? কার কী যায় আসে! ‘কোলাব’ চেয়েছিল সেই সব দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে, শিল্পকলা গ্যালারিতে যাদের কখনোই দেখা যায় না। ক্ষণস্থায়ী গিফট শপে তারা সস্তায় শিল্পকর্ম বিক্রয় করেছিলেন, যেন যে-কে উই সেগুলো কিনতে পারেন। প্রথাগত গ্যালারির উন্নাসিকতা এড়িয়ে ‘কোলাব’ প্রশ্ন করেছিল: শিল্পকলা কোনটি, আর কোথায় সেটি প্রদর্শন করা যাবে, সেটি কে নির্ধারণ করবে?

‘টাইমস স্কোয়ার শো’ এখন বেশ ব্যস্ত, দর্শকরা এমনকি রাস্তা অবধি ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রদর্শনীর শিরোনামটি বড় অক্ষরে লিখে প্রবেশ পথের উপরে টেপ দিয়ে সেটে দেয়া হয়েছে, এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় তাদের স্বনির্মিত পোষ্টার সেটে দিয়েছিলেন দর্শনার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে। ভিতরে, দর্শকরা নান গোল্ডিং -এর আলোকচিত্র এবং টয়লেটে দেয়ালে কিথ হ্যারিঙের আঁকা সরু ফিগারগুলোর নিয়ে একটি স্লাইড শো দেখছিলেন। ফ্যাব ফাইভ ফ্রেডি গ্র্যাফিটি এঁকে ভবনের বাইরের দেয়ালটি আবৃত করেছিলেন । মাত্র উনিশ বছর বয়সী শিল্পী জ্যাঁ-মিশেল বাসকিয়াত

এবং স্ট্রিট শিল্পী ‘সামো’র মতোই যে ইতোমধ্যে বিখ্যাত, তার প্রথম ক্যানভাস এঁকেছিলেন, যা দ্বিতীয় তলায় ফ্যাশন লাউঞ্জের ক্যাটওয়াকের পেছনে ঝোলানো হয়েছে। মডেলরা এর সামনে দিয়ে হেটে যাচ্ছেন ফোম আর রুপালী টেপ দিয়ে তৈরি কাপড় পরে। কোনো সন্দেহ নেই পুরো মাস জুড়েই সেখানে শিল্পকলার তান্ডব চলেছিল।

*

‘ভিলেজ ভয়েস’ সংবাদপত্র ‘টাইমস স্কোয়ার শো’ প্রদর্শনীটিকে ‘আশির দশকে প্রথম বৈপ্লবিক শিল্পকলা প্রদর্শনী’ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এটি জ্যাঁ-মিশেল বাসকিয়াত (১৯৬০-১৯৮৮) আর কিথ হ্যারিংকে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল (১৯৫৮-১৯৯০)। এক বছরের মধ্যেই এই দুই তরুণ ‘সেলেব্রিটি’ শিল্পী হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। দুজনেই খুব দ্রুতগতির একটি জীবন বেছে নিয়েছিলেন এবং তারুণ্যেই মারা গিয়েছিলেন। পনেরো বছর বয়সেই বাসকিয়াত বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন, এবং নিউ ইয়র্কের ইস্ট ভিলেজে এক বন্ধুর সোফায় ঘুমাতেন। স্প্রে পেইন্ট, অয়েল স্টিক এবং অ্যাক্রিলিক রং ব্যবহার করে তিনি তার চিত্রকর্মে রাস্তার দেয়াল লিখন ও গ্র্যাফিটি, আমেরিকান বিমূর্ততা, পাঠ্যপুস্তকের শারীরস্থান, কৃষ্ণাঙ্গ সংস্কৃতি, জ্যাজ এবং হিপ হপের একটি সংমিশ্রণ করেছিলেন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তার প্রথম একক প্রদর্শনীর প্রতিটি চিত্রকর্ম বিক্রি হয়ে হয়ে গিয়েছিল, সেই বছরই তিনি পপ তারকা ম্যাডোনার ছেলে বন্ধু ছিলেন। পরের বছর তিনি অ্যান্ডি ওয়ারহোলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন।

তার শিল্পকর্মে একটি নগ্ন অপরিশীলিত শক্তি ছিল, যা ১৯৮০-এর দশকে নিউ ইয়র্কের বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ শক্তি এবং নাইট ক্লাব, নাচ, গ্র্যাফিটি আর মাদকাসক্ত জীবনের সার্বিক একটি চিত্র ধারণ করতে পেরেছিল। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে মাত্রাতিরিক্ত হেরোইন সেবনের পরিণতিতে তিনি প্রাণ হারিয়েছিলেন। তার চিত্রকর্মগুলো এখনো সেই প্রাণবন্ততা ধারণ করে - সংগ্রাহকদের মধ্যে যার তীব্র চাহিদা আছে: ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে আঁকা কালো খুলি সদৃশ মাথার একটি চিত্রকর্ম 'আনটাইটলড' সাম্প্রতিক একটি নিলামে ১১০ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়েছে।

এর ব্যতিক্রম হ্যারিং পেনসিলভেনিয়ায় একটি রক্ষণশীল পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, কিন্তু গ্র্যাফিটি তাকে মন্ত্রমুগ্ধ ও সম্মোহিত করেছিল যখন তিনি পড়াশুনা করতে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে নিউ ইয়র্কে এসেছিলেন। 'টাইমস স্কোয়ার শো' প্রদর্শনীটির কিছুদিন পরেই তার একটি 'ইউরেকা' মুহূর্ত এসেছিল, যখন তিনি গ্র্যাফিটি আবৃত নিউ ইয়র্কের সাবওয়ে ট্রেনগুলো মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন, সাবওয়ের বিজ্ঞাপন লাগানোর জন্য নির্ধারিত প্যানেলগুলো নতুন কোনো বিজ্ঞাপন লাগানোর আগে কালো অমসৃণ একটি কাগজে আবৃত থাকে। এই খসখসে কাগজটি দেখতে ব্ল্যাকবোর্ডের মতোই মনে হয়, পরিচ্ছন্ন একটি তলদেশ যার ওপর আঁকা যেতে পারে। তিনি দ্রুত সাবওয়ে স্টেশনের বাইরে এসে সাদা চক কিনেছিলেন, এবং আবার সাবওয়ের গভীরে নেমে এসেছিলেন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি তার প্রথম 'স্ট্রিট আর্ট' সৃষ্টি করেছিলেন।

পরবর্তী পাঁচ বছর হ্যারিং নিউ ইয়র্কের সব সাবওয়ের বিজ্ঞাপন প্যানেলগুলো পূর্ণ করে ফেলেছিলেন তার কার্টুন সদৃশ ফিগার এঁকে, যারা আলিঙ্গন করছে, চুমু খাচ্ছে, নাচছে, হুলা হুপ নিয়ে খেলছে। এই কাজগুলোর মধ্যে তিনি ভালোবাসা, মৃত্যু, যৌনতা আর যুদ্ধ বিষয়ে তার ভাবনাগুলো প্রকাশ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তার শিল্পকলা রাস্তায় থাকুক , যেন প্রত্যেকেই সেটি দেখতে পারে। 'এগুলো বুঝতে, উপভোগ করতে অথবা তাকাতে শিল্পকলা সম্বন্ধে আপনার কিছুই জানতে হবে না', তিনি বলেছিলেন, 'এখানে কোনো গোপন তথ্য বা বিষয় নেই যা আপনাকে বুঝতে হবে'। তিনি একজন 'সেলেব্রিটি ' শিল্পী এবং সমকামী আইকনে পরিণত হয়েছিলেন, এবং তার কাজে এইডস মহামারী নিয়ে মতামত প্রকাশে তিনি কখনোই কুণ্ঠাবোধ করেননি, যে মহামারি ১৯৮০-এর দশকে সমকামী সমাজকে বিধ্বংস করেছিল। ১৯৯০ সালে তিনি নিজেও এইডস সংশ্লিষ্ট অসুখে মারা যান।

১৯৮০-এর দশকের শিল্পকলাকে স্থিতিস্থাপক একটি শিরোনামের অধীনে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছিল - পোস্টমডার্নিজম বা উত্তরআধুনিকতাবাদ। বেশ বিস্তৃত প্রায় সব কিছুকেই শ্রেণিভুক্ত করা এই নামটি সেই পর্বটির প্রতিনিধিত্ব করেছিল, যে পর্বটি ক্লিমেন্ট গ্রিনবার্গের উচ্ছসিত সমর্থনপ্রাপ্ত বিমূর্ত ক্যানভাস আর মিনিমালিস্ট ভাস্কর্য থেকে বর্তমান সময় অবধি বিস্তৃত। উত্তরআধুনিকতাবাদী শিল্পীরা আধুনিকতাবাদের আদর্শ এবং বিমূর্ত সত্যে এর বিশ্বাসের সমালোচনা করেছিল। বাস্তব পৃথিবী থেকেই তারা তাদের অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছিল, এবং তারা যা কিছু দেখেছিল সেগুলো প্রশ্ন করেছিল। তারা অন্যদের চিত্র ব্যবহার করেছিলেন, অন্যদের শৈলীর স্বাদ নিয়েছিলেন, তাদের শিল্পকলার খাতিরে , ও ঐতিহাসিক সীমানাগুলো মুছে ফেলতে তারা বর্তমান এবং অতীত থেকে সমপরিমানে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন। মূলত এটি ছিল বহু সংখ্যক দৃষ্টিকোণ আর বৈচিত্র্য বিষয়ক, শুধু একটি শৈলী কিংবা একটি মাধ্যমে কাজ করার আর কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।

১৯৮০-এর দশকব্যাপী একটি ‘পাবলিক’ বা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত গ্যালারি হিসেবে আমেরিকান শিল্পীরা রাস্তা ব্যবহার করা অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯৮৫ সালে নিজেদেরকে ‘গেরিলা গার্ল’ হিসেবে চিহ্নিত করা অজ্ঞাতনামা নারী শিল্পীদের একটি গোষ্ঠী শিল্পকলার প্রাতিষ্ঠানিক জগতে তখনো বিদ্যমান লিঙ্গবাদ, লৈঙ্গিক বৈষম্য আর বর্ণবাদের মুখোশ উন্মোচন করার লক্ষ্যে তাদের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রদর্শনের জন্য গণপরিবহনের পার্শ্বদেশ এবং বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড ব্যবহার করেছিলেন। এককভাবে এই গেরিলা গার্লের সদস্যরা প্রত্যেকেই সফল শিল্পী ছিলেন। তবে তারা তাদের

সমষ্টীগত অজ্ঞাত পরিচয়টি ধরে রেখেছিলেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ মাথা আবৃত করে রাখা গরিলার মুখোশ পরে, এবং তারা নিজেদেরকে 'শিল্পকলা জগতের বিবেক' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের সবচেয়ে বিখ্যাত পোষ্টার ভিত্তিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটি পোস্টার প্রশ্ন করেছিল, "মেট মিউজিয়ামে স্থান পেতে কী নারীদের নগ্ন হতে হবে"? এই পোস্টারে আঙ্গ্রের 'দ্য গ্রন্ড ওডালিস্ক' নগ্নচিত্রটির সম্পাদিত একটি সংস্করণ (পঁচিশতম অধ্যায়ে মূল আলোকচিত্রটি আমরা দেখেছিলাম) ব্য বহার করা হয়েছিল। ছবিটি উজ্জ্বল হলুদ একটি পটভূমির ওপর স্থাপন করা হয়েছিল, যার নীচে 'গেরিলা গার্ল' শিল্পীরা একটি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো পরিসংখ্যান উল্লেখ করেছিলেন - নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটান (মেট) মিউজিয়ামে প্রদর্শিত আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে নারী শিল্পীদের সংখ্যা পাঁচ শতাংশেরও কম, কিন্তু সেখানে প্রদর্শিত নগ্নচিত্রগুলোর পচাশি শতাংশই নারী নগ্নচিত্র (পরিবর্তনের গতি খুবই মন্থর, এমনকি আজো, মিউজিয়াম অব মর্ডান আর্টের মোট সংগ্রহের প্রায় দশ শতাংশ হচ্ছে নারী শিল্পীদের শিল্পকর্ম।)

আড্রিয়ান পাইপার (জন্ম ১৯৪৮) একইভাবে প্রথাগত গ্যালারির বাইরে কাজ করেছিলেন তার শিল্পকর্মের সাথে মিথস্ক্রিয়া করা দর্শকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া প্ররোচিত করে। সর্বক্ষণ নিজের সাথে বহন করার জন্য ১৯৮৬ সালে তিনি দুটি 'কলিং কার্ড' ডিজাইন করেছিলেন, একটি সাদা এবং একটি বাদামী। সাদাটি সেই পুরুষগুলোকে ঠেকাতে যারা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তার সঙ্গ কামনা করতে বিরক্ত করতো, আর বাদামী কার্ডটি যখন তিনি কোনো বর্ণবাদী মন্তব্য শুনতেন। হালকা রঙের ত্বকের আফ্রিকান-আমেরিকান হবার কারণে তাকে প্রায়শই শ্বেতাঙ্গ ভাবা হতো, সুতরাং যখন তিনি বর্ণবাদী মন্তব্য শুনতেন, যা অন্যদের প্রতি নির্দেশিত তিনি তার বাদামী কার্ডটি ব্যবহার করতেন, যেখানে লেখা ছিল : "প্রিয় বন্ধু , আমি কৃষ্ণাঙ্গ। আমি নিশ্চিত আপনি বিষয়টি অনুধাবন করেননি যখন আপনি ঐ বর্ণবাদী মন্তব্যটি করেছিলেন/ শুনে হেসেছিলেন/বা একমত হয়েছিলেন'। একটি কার্ডের প্রতিটি উপস্থাপন ছিল এক ধরনের 'পারফর্মেন্স' এবং 'কনসেপচুয়াল' বা

ধারণাগত শিল্পকলার একটি নিদর্শন, এটি একটি পরিস্থিতি বিবেচনা করে লিঙ্গবাদী এবং বর্ণবাদী নিপীড়ন প্রতিরোধে চলমান একটি প্রচেষ্টা।

১৯৬০-এর দশকে কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক অধিকার আদায় আন্দোলনের সফলতা সত্ত্বেও আমেরিকায় আন্তঃবর্ণ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি লক্ষ করা যায়নি। ১৯৭০-এর দশকের শেষাংশ থেকে ক্যারি মে উইমস (জন্ম ১৯৫৩) বর্ণবৈষম্যসংক্রান্ত অবিচারগুলোর যাপিত এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলোকে দৃশ্যমান করে তুলতে সাদা ও কালো আলোকচিত্র ব্যবহার করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের রাজ্যগুলো থেকে উত্তরের রাজ্যেগুলোয় কৃষ্ণাঙ্গদের মহাঅভিপ্রয়াণ অধ্যয়ন করতে তিনি তার 'ফ্যামিলি পিকচার অ্যান্ড স্টোরিজ' (১৯৭৮-৮৪) ধারাবাহিকে নিজের পারিবারিক ইতিহাস উপস্থাপন করেছিলেন। তার 'ফ্রম হেয়ার আই স হোয়াট হ্যাপেনড অ্যান্ড আই ক্রাইড' (১৯৯৫-৬) ধারাবাহিকে তিনি উনবিংশ শতাব্দী কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের আলোকচিত্র সংগ্রহ করেছিলেন, যারা ইতোপূর্বে দাস ছিলেন। তিনি এই ছবিগুলোর উপর তার বার্তা যুক্ত করেছিলেন যেন আমরা কিছু চিন্তা করতে পারি যখন এই ছবিগুলোর দিকে তাকাই, কারণ তিনি অজ্ঞাতনামা এই নারীদের যে কাজগুলো করতে বাধ্য করা হয়েছিল তার একটি তালিকা যুক্ত করেছিলেন - শিশুপরিচর্যাকারী থেকে পতিতা। মূল আলোকচিত্রগুলোকে সরাসরি প্রশ্ন করার মাধ্যমে তিনি প্রদর্শন করেছিলেন, ঔপনিবেশিক পুরুষরা কীভাবে একসময় এইসব নারীদের দেখতেন। ষোড়শ থেকে বিংশ শতাব্দী অবধি কঙ্গো থেকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে বলপূর্বক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ইউরোপীয় দেশগুলোর পশ্চিমা উপনিবেশবাদের প্রকৃতি নিয়ে উইমসের মতো শিল্পীরা উত্তর-ঔপনিবেশিক একটি দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছিলেন। উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদী এই অধ্যয়ন এই সময়ের সেই ইতিহাস অনুসন্ধান করেছিল, যখন মানুষ, সম্পদ, পণ্য, ভূমি এবং সেবা ইত্যাদি সব কিছুই ঔপনিবেশিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

এই সময় নাগাদ শিল্পীরা আলোকচিত্র এবং ভিডিও থেকে কলিং কার্ড এবং বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড ব্যবহার করে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করার বিচিত্র ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। ডগলাস ক্রিম্পের মতো শিল্পসমালোচকরা ঘোষণা করেছিলেন, ‘পেইন্টিং-এর পরিসমাপ্তি হয়েছে’। কিন্তু শিল্পীরা নিজেরা কখনোই চিত্রকর্ম সৃষ্টি এই মাধ্যমটি ত্যাগ করেননি, এবং ১৯৮০-এর দশকে পেইন্টিং বা চিত্রকর্ম মাধ্যমটি অসম্ভাব্য একটি পুনর্জন্ম ঘটেছিল। আনসেল্ম কিফারের(জন্ম ১৯৪৫) ভূদৃশ্যচিত্র এবং জর্জ বাসেলিৎসের ফিগারগুলো অভিব্যক্তিময় শক্তির স্পর্শযোগ্য স্পন্দন ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল। জার্মান এইসব চিত্রশিল্পীদের ‘নিও-এক্সপ্রেশনিস্ট’ বা নব্য অভিব্যক্তিবাদী বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, এবং আখ্যান এবং পুরাণে তাদের কাজের শিকড় প্রোথিত ছিল। আমেরিকান নব্যঅভিব্যক্তিবাদী শিল্পী জুলিয়ান শ্নাবেল (জন্ম ১৯৫১) এবং প্রতিকৃতির চিত্রশিল্পী লুসিয়ান ফ্রয়েডের (১৯২২-২০১১) সাথে ১৯৮১ সালে তারা “নিউ স্পিরিট ইন পেইন্টিং” শীর্ষক একটি প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন। মূলত সমকালীন চিত্রকর্মগুলো প্রদর্শন করতেই লন্ডনে রয়্যাল একাডেমি অব আর্টসে অনুষ্ঠিত এই বিশাল এবং প্রভাবশালী প্রদর্শনীটি পরিকল্পিত হয়েছিল। ওয়ারহোল, বেকন এবং পিকাসোসহ মোট আটত্রিশ শিল্পী এই প্রদর্শনীর সাথে যুক্ত ছিলেন। এই আটত্রিশ জন শিল্পীর সবাই পুরুষ ছিলেন, কোনো নারী শিল্পীকে সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি (এখন আপনি বুঝতে পারছেন কেন ‘গেরিলা গার্ল’ শিল্পীরা প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছিলেন)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জাতীয় অপরাধবোধের ভার বহন করে, কীভাবে জার্মান শিল্পীরা তাদের কাজ করা অব্যাহত রাখতে পারেন, কিফার সেই অন্তর্দ্বন্দ্বটি মূলত তার কাজে অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি সেই স্থাপত্যগুলো এঁকেছিলেন যা নাৎসি সমাবেশ আর মিছিলের সাথে জড়িত ছিল, এবং সেই রেলপথ এঁকেছিলেন, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে জোরপূর্বক বহু মিলিয়ন ইহুদীদের স্থানান্তরের ইতিহাস যা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। ১৯৮৬ সালে তার "আয়রন পাথ" চিত্রকর্মে আমরা দেখি একটি রেলপথ ক্যানভাসের ঠিক কেন্দ্র দিয়ে অতিক্রম করে গেছে বাম ও ডান দিক বরাবর দুই ভাগে বিভাজিত হয়ে, কোন পথটি মৃত্যু অভিমূখে আর কোনটি জীবন অভিমূখে? তা বলা অসম্ভব। কিফার ক্যানভাসের উপর এতো বেশি পরিমানে রঙ ও অন্য উপাদান চড়িয়েছিলেন যে এর উপরিতল ভাস্কর্যের মতো অনুভূত হয়। সত্যিকারের গাছের ডাল রেলপথের ওপর আটকে দেয়া হয়েছিল সীসার ফিতা ব্যবহার করে। তার চিত্রকর্মে আমরা পৃথিবীর গভীর ইতিহাস আর মাটির নীচে সমাহিত থাকা অস্থিগুলোকে অনুভব করি।

জার্মান শিল্পী গেরহার্ড রিখটারও (জন্ম ১৯৩২) 'নিউ স্পিরিট অব পেইন্টিং' প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তার চিত্রকর্মের সূচনা-বিন্দু হিসেবে তিনি সংগৃহীত আলোকচিত্র ব্যবহার করেছিলেন। তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন কীভাবে আলোকচিত্র কোনো একটি দৃশ্য অথবা কোনো একটি ব্যক্তিকে একটি পৃষ্ঠদেশে পরিণত করে, যার উপর চিত্রকর্ম সৃষ্টি করা সম্ভব। তাকে অনুসরণ করে ইউরোপীয় চিত্রকর্ম এর প্রকৃতিতে আরো 'কনসেপচুয়াল' বা ধারণাগত হয়ে উঠেছিল। ক্রমশ বহু শিল্পীই প্রকৃত জীবন থেকে নয় বরং খবরে কাগজে প্রকাশিত সমতল চিত্র থেকে এঁকেছিলেন। তারা চিত্রের শক্তি অনুসন্ধান করেছিলেন, তারা জানতে চেয়েছিলেন কীভাবে এই ক্ষমতার সৃষ্টি হয়, এবং কীভাবে এই চিত্রের অর্থ হস্তান্তরিত হয়। ১৯৮৬ সালে বেলজিয়ামের ল্যুক টাইমানস (জন্ম ১৯৫৮) মেঝের ঠিক মাঝখানে পানি সরে যাবার ড্রেইনসহ ক্ষুদ্র জানালাহীন একটি কক্ষ এঁকেছিলেন, এটি বৈশিষ্ট্যহীন, পুরানো আলোকচিত্রের মতো এর রং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, কিন্তু এটি অদ্ভুতভাবেই অস্বস্তিকর। শুধুমাত্র যখনই আমরা এর শিরোনামটি শুনি, '

গ্যাস চেম্বার’, এবং অনুধাবন করি এটির উৎস কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের একটি চিত্র, তখনই আমরা এটির ক্ষমতা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

নেদারল্যান্ডসে বসবাসরত দক্ষিণ আফ্রিকার মাররিনি ডুমাস (জন্ম ১৯৫৩) একই ভাবে অস্বস্তিকর কঠিন উৎস থেকে আসা ছবি নিয়ে কাজ করেছিলেন। টুইমানসের মতো তিনিও সংবাদপত্রের ছবি ব্যবহার করেছিলেন, এবং তিনি মৃতদেহ, অসুস্থ চেহারা, রাজনৈতিক বন্দী, যৌনকর্মী, জোর করে আটকে রাখা মানুষদের ছবি এঁকেছিলেন। চমৎকারভাবে সেটি আঁকা সত্ত্বেও তার চিত্রকর্মগুলোয় প্রায়শই বিষণ্ন আবেগের উপস্থিতি দর্শকদের আন্দোলিত করে।

১৯৮০-এর দশকেব্যাপী চিত্রশিল্পীরা সর্বত্র স্বীকৃতি অর্জন করতে শুরু করেছিলেন, আর্জেন্টিনার শিল্পী গিয়েরমো কুইটকা (জন্ম ১৯৬১) ম্যাট্রেসের উপর মানচিত্র এঁকেছিলেন, স্থান আর স্বগৃহ নিয়ে আমাদের বোঝাপড়াকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে। আমেরিকায় কেরি জেমস মার্শাল (জন্ম ১৯৫৫) আফ্রিকান-আমেরিকান জীবন ও কৃষ্ণাঙ্গদের ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছিলেন। ব্রিটেনে অবস্থানরত পর্তুগীজ শিল্পী পাউলা রেগো (জন্ম ১৯৩৫) তার চিত্রকর্মে মানুষের প্রত্যাশাগুলোকে আক্রমণ করতে ভালোবাসেন, প্রায়শই তার ক্যানভাসে অপ্রত্যাশিতভাবে মূখ্য ভূমিকা পালন করে নারীরা , কিন্তু কখনো তিনি তাদের জীবনকে সহজ হিসেবে উপস্থাপন করেন না। তিনি তাদের সব দৃঢ়তা, নমনীয়তা, শক্তি দিয়েই এঁকেছিলেন, এমনকি যখন সেখানে বর্ণিত ঘটনা অবৈধ গর্ভপাত কিংবা নারী-পাচার, যে ঘটনাগুলো তাদের ক্ষমতাহীন করে তুলতে ষড়যন্ত্র করে।

চীনে তাদের নিজেদের ইতিহাস বর্ণনা করতে শিল্পীরা পশ্চিমা শৈলীতে চিত্রকর্ম সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন । জ্যাং সিয়াওগ্যাঙ্গ (জন্ম ১৯৫৮) ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬ অবধি বিস্তৃত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠেছিলেন, এটি ছিল মাও জেদং-এর কমিউনিজমের আগ্রাসী পুনর্নবায়নের সেই সময়, যা বহু মিলিয়ন মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। তার চিত্রকর্মে জ্যাং পুরানো পারিবারিক আলোকচিত্র ব্যবহার করেছিলেন এই সময়টিকে অনুসন্ধান করতে। যদিও তার ফিগারগুলো শ্রমিকদের সমরূপী ইউনিফর্মে মানবিক এবং ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য বিবর্জিত, কিন্তু তারপরও যেন সেখানে উপচে পড়ছে আবদ্ধ করে রাখা আবেগ। প্রায়শই এই ছবির ফিগারগুলোর মধ্যে একটির রঙ লাল, চেয়ারম্যান মাওয়ের 'লিটল রেড বুক'-এর রং, জীবন যাপনের নির্দেশনায় যে বইটি পূর্ণ ছিল: ''সংকল্পবদ্ধ হও, কোনো বিসর্জনে ভয় পেয়ো না, প্রতিটি সমস্যা উত্তরণ করে বিজয় অর্জন করো''।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব সমাপ্ত হবার পরে, চীনা শিল্পীরা অন্য দেশের শিল্পকলা অধ্যয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং পশ্চিমা শিল্পকলার ইতিহাস তাদের কাজের ওপর বড় একটি

প্রভাব ফেলেছিল। ইউয়ে মিনজুন (জন্ম ১৯৬২) , তার চিত্রকর্মে প্রতিটি ফিগারের জন্য তার নিজের চেহারা ব্যবহার করেছিলেন - দৃঢ়ভাবে বন্ধ চোখ, উন্মত্তভাবে যিনি হাসছেন। এই পুনরাবৃত্তি অস্বস্তিকর, বিশেষ করে যখন এই ধরনের ফিগারের একটি গ্রুপ আপনার দিক বরাবর তাকিয়ে থাকবে, তীব্র হাসিতে উদ্বেল কিংবা ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখে। তার নিজের চিত্রকর্মে ইউয়ে প্রায়শই পশ্চিমা শিল্পকলার উপাদান-বিন্যাস ব্যবহার করেছিলেন। ক্যানভাসে চিত্রিত প্রতিটি চরিত্রকে প্রায় নগ্ন হাস্যরত ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করে তিনি প্রস্তাব করছেন, আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করা হয়েছে, শিল্পকলার ইতিহাস পুঁজিবাদী দাবার একটি বোড়ে পরিণত হয়েছে, এবং এর গভীর অর্থ বাণিজ্যিক লাভের জন্য হেরে গেছে।

বাসকিয়াতের ক্যানভাসগুলোর দুর্দমনীয় প্রাণশক্তি এবং রেগোর চিত্রকর্মগুলোর বিষণ্ন নৈরাশ্যের ক্ষমতা থেকে রিখটার আর টাইমানসের ধারণাগত অনুসন্ধানগুলো এবং জ্যাঙ আর কিফারের অস্বস্তিকর ইতিহাস - এইসব কিছুর ওপর ভর করেই পেইন্টিং বা চিত্রকর্ম ১৯৮০-এর দশকে দৃঢ়ভাবেই দর্শকের দৃষ্টিসীমায় ফিরে এসেছিল। কিন্তু শিল্পকলার স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বড় একটি সমস্যা ছিল, তারা যা কিছু সৃষ্টি করছেন সেগুলো আদৌ কীভাবে কেউ দেখতে সক্ষম হতে পারে। ব্রিটেনে উচ্চাকাঙ্ক্ষী একগুচ্ছ তরুণ শিল্পী এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে নিজেরাই উদ্যোগী হয়েছিলেন।

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে)

(১) Jane Dickson and Charlie Ahearn, Times Square Show 1980, Poster
(২) Jean-Michel Basquiat, Versus Medici/Flexible/Warrior
(৩) Keith Haring, Subway Drawing
(৪) Keith Haring, Ignorance = Fear
(৫) Jean-Michel Basquiat, Untitled

(৬) Guerrilla Girls, Do Women Have to Be Naked to Get Into the Met?, Poster
(৭) Adrian Piper, The Mythic Being: I Embody Everything You Most Hate
(৮) Carrie Mae Weems, Here I Saw What Happened and I Cried series
(৯) Paula Rego, *Sleeper (Dog Woman).* 1994. Pastel on canvas. Copyright
(১০) Zhang Xiaogang's Bloodline: Big Family No. 3
(১১) Yue Minjun, The Execution

অধ্যায় ৩৯ - বড় কিছু করো

১৯৯৩ সাল, ২৫ অক্টোবর, র‍্যাচেল হোয়াইটরিড বেশ কিছু উৎসাহী দর্শকের সাথে পূর্ব লন্ডনে একটি রাস্তার পাশে দাড়িয়ে ছিলেন। সেখানে এক সময় ছাদ-বারান্দাসহ সারিবদ্ধ বেশ কিছু ভিক্টোরিয় আমলে নির্মিত বাড়ি ছিল, কিন্তু একটি পার্ক তৈরি করতে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। বর্তমানে সেখানে কেবল একটি মাত্র বাড়ি দাড়িয়ে আছে, যে বাড়িটি ছিল মি. গেল নামক জনৈক ব্যক্তির। বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করার একেবারে শেষ মুহূর্ত অবধি তিনি এই বাড়ি ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেছিলেন। তবে ধ্বংস করা আগে এটিকে এযাবৎ করা তার সবচেয়ে বড় ভাস্কর্য নির্মাণে ব্যবহার করতে হোয়াইটরিড তার অনুমতি নিয়েছিলেন।

এই সময় অবধি হোয়াইটরিডের ভাস্কর্যগুলোর অধিকাংশই আসবাবপত্রের আকারের ছিল। তিনি পুরানো বাথটাব, চেয়ার আর বিছানা ভাস্কর্য তৈরি করার ছাচ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে প্লাস্টার ঢেলে দিয়ে এবং শক্ত হয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। এরপর তিনি আসবাবের সেই ছাচটি সতর্কভাবে সরিয়ে এর ভিতরে ধারণ করা শক্ত হয়ে যাওয়া প্লাস্টারের আকৃতিটি বের করে এনেছিলেন, সেগুলোর ইতিহাসে এ

দের ওপর ফেলে যাওয়া সব আঁচড় আর চিহ্নসহ। তিন বছর আগে তিনি একটি বাড়ির সম্পূর্ণ সামনের কক্ষের (ফ্রন্ট রুম) ভিতরটি ঢালাই করেছিলেন, আর এর পরিণতি ছিল ' ঘোষ্ট', ভঙ্গুর প্লাস্টার প্যানেল দিয়ে নির্মিত একটি নতুন 'কক্ষ', যা দরজা, জানালা, ফায়ার প্লেস, এবং লাইট সুইচের নেগেটিভ প্রিন্ট ধারণ করেছিল।

গ্যালারির বাইরে প্রদর্শিত তার প্রথম উন্মুক্ত ভাস্কর্যের জন্য তিনি মি. গেলের পুরো বাড়িটি ছাচ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। বড় মাত্রার শিল্পকর্ম প্রকল্প তৈরি করতে কারিগরী সহায়তা দেবার প্রতিষ্ঠান আর্টঅ্যাঞ্জেলের সাথে কাজ করে তিনি এবং তার সহকারীদের একটি দল প্রতিটি কক্ষে কংক্রিট স্প্রে করেছিল। তারপর একটা একটা করে ইট ধরে মূল বাসাটিকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, শুধু অবশিষ্ট ছিল ধূসর কংক্রিটের একটি 'কাস্ট'। এটি সম্পূর্ণ করতে তিন মাস সময় লেগেছিল এবং পরিণতি ছিল আসলেই বিস্ময়কর - 'ঘোস্ট' ভাস্কর্যটির মতো তার এই 'হাউজ' ভাস্কর্যটিও খুব অদ্ভুত- যেখানে সবকিছুই উলটো দিক বরাবর, নেগেটিভ। সামনের কক্ষের খোলা জায়গা, রান্নাঘর, হলওয়ে এখন সব ঘন, কিন্তু ঘন দেয়ালগুলো অপসারিত হয়েছে। হোয়াইটরিড উপরের তলার শোবার একটি ঘরে হলুদ রং দেখতে পেরেছিলেন, ফায়ারপ্লেস থেকে বেরিয়ে আসা ঝুল কংক্রিটে আটকে আছে। এটি দেখতে একটি বাড়ির মত – যদিও এমন একটি বাড়ি যার কোনো ছাদ নেই, কিন্তু এটি সেই সব কিছু যা বাড়ি কখনো হয় না, এই বাড়িটি একটি সমাধি, শতবর্ষের পারিবারিক ইতিহাসে পূর্ণ।

*

'হাউজ' অস্থায়ী একটি ভাস্কর্য হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছিল, কিন্তু তিন মাসের চেয়ে খানিকটা বেশি সময় অবধি এটি টিকে ছিল। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকাগুলো সমর্থক আর সমালোচকদের অসংখ্য মন্তব্য প্রতিবেদনে পূর্ণ হয়েছিল। কেউ কেউ চেয়েছিলেন এটি ধ্বংস করা হোক, আবার অনেকেই এটি রক্ষা করতে আহবান

জানিয়েছিলেন। একটি সংবাদপত্রের শিরোনাম ছিল এরকম: “ঐ কাজটি যদি শিল্পকলা হয়ে থাকে, তাহলে আমি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি !”। তবে অনেকেই ‘হাউজ’ ভাস্কর্যটিকে গভীরভাবে হৃদয়স্পর্শী একটি কাজ হিসেবে অনুধাবন করেছিলেন - কোন বিষয়গুলো কোনো বাড়িকে একটি ঘরে পরিণত করে - সেটি নিয়ে সময়োপযোগী একটি অনুশীলন হিসেবে এই কাজটিকে বিবেচনা করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে এর একপাশে একটি দেয়াল লিখন প্রশ্ন করেছিল, ‘কিসের জন্য’? এর কিছুদিন পরে এর ওপর আরেকজন এর উত্তর লিখেছিলেন, ‘কেন নয়’? ‘হাউস’ ভাস্কর্যটি তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও র‍্যাচেল হোয়াইটরিডের নামটি সুপরিচিত করে তুলেছিল, এবং তার প্রজন্মের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ কাজ সৃষ্টি করা শিল্পীদের অন্যতম হিসেবে তার অবস্থান নিশ্চিত করেছিল। এই প্রজন্মটিকে পরে নামকরণ করা হয়েছিল ‘ইয়ং ব্রিটিশ আর্টিস্টস’ অথবা ‘ওয়াইবিএ ’।

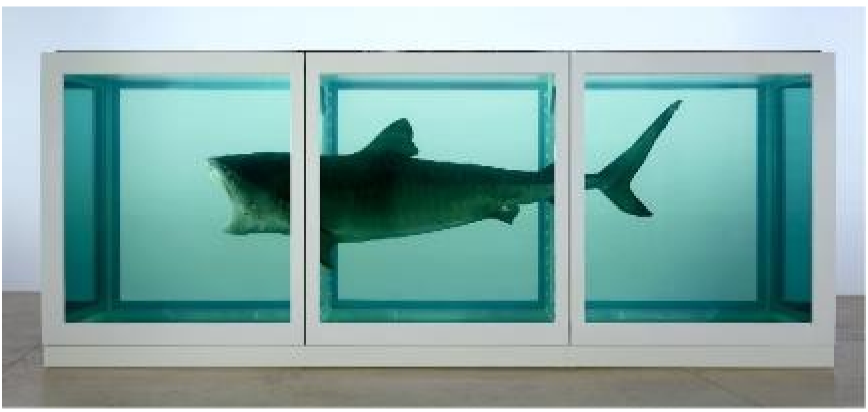

‘ওয়াইবিএ’ শিল্পীদের অনেকেই মাইকেল ক্রেইগ মার্টিনের (জন্ম ১৯৪১) অধীনে লন্ডনের গোল্ডস্মিথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলেন। ক্রেইগ মার্টিন ছিলেন একজন কনসেপচুয়াল বা ধারণাগত শিল্পকর্মের শিল্পী এবং তার শিক্ষা শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে ব্যবহৃত বহুবিধ উপাদানের মধ্যে প্রচলিত বিভাজনগুলো অপসারণ করেছিল। গোল্ডস্মিথে আপনাকে শুধু একজন চিত্রশিল্পী কিংবা একজন ভাস্কর হয়ে ওঠার দরকার নেই, আপনি যে-কোনো উপাদান ব্যবহার করতে পারবেন, এবং যে-কোনো কিছু করতে পারবেন। ১৯৮৮ সালে সেখানে ছাত্র থাকাকালীন ডেমিয়েন হার্স্ট (জন্ম ১৯৬৫) তার সহকর্মী শিক্ষার্থীদের কাজ প্রদর্শন করতে ‘ফ্রিজ’ শিরোনামে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ লন্ডনে অব্যবহৃত একটি ভবন ভাড়া করেছিলেন, এবং সেটিকে শিল্পকলা দিয়ে পূর্ণ করেছিলেন, এবং তারপর তিনি শিল্পসমালোচক, ব্যবসায়ী এবং গ্যালারী পরিচালকদের সেখানে আসতে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই প্রদর্শনীতে সারা লুকাস (জন্ম ১৯৬২), আনইয়া গালাচ্চিওও (জন্ম ১৯৬৩), মাইকেল লান্ডি (জন্ম ১৯৬৩) এবং আয়ান ড্যাভেনপোর্টের (জন্ম ১৯৬৬) শিল্পকর্ম

প্রদর্শিত হয়েছিল। আর অন্যরা যারা খুব দ্রুত 'ওয়াইবিএ' শিল্পীদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, তারা ছিলেন, ট্রেসি এমিন (জন্ম ১৯৬৩), ক্রিস অফিলি (জন্ম ১৯৬৮), স্টিভ ম্যাককুইন (জন্ম ১৯৬৯) এবং হোয়াইটরিড।

লন্ডনে যদিও সমকালীন শিল্পকলা গ্যালারির সংখ্যা পরবর্তী দশকে বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে সদ্য কলেজ থেকে বের হয়ে আসা শিল্পীদের নিজেদের কাজ প্রদর্শন করার কোনো জায়গা ছিল না। 'ওয়াইবিএ' শিল্পীরা পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে নিজেরই উদ্যোগী হয়েছিলেন। হার্স্ট প্রদর্শনী কক্ষ পূর্ণ করেছিলেন প্রায় ৯০০০ প্রজাপতি আর ফরমালডিহাইডপূর্ণ কাচের একটি বিশাল শো-কেসে রাখা একটি হাঙ্গর দিয়ে। ট্রেসি এমিন তার জীবনের নানা পর্বের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেছিলেন তার স্থাপনা শিল্পকর্মের অনুপ্রেরণা হিসেবে, এবং ম্যাককুইন স্বল্পদৈর্ঘ্য, তবে চিন্তা জাগানিয়া চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন। ড্যাভেনপোর্ট সাহসী বিমূর্ত শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছিলে ঘরে দেয়ালে ব্যবহৃত রং ঢেলে, ওফিলি হাতির মল দিয়ে তৈরি স্তনসহ কৃষ্ণাঙ্গ ম্যাডোনা এঁকেছিলেন, গ্যালাচ্চিও সদ্য কাটা ফুল দিয়ে ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন। এখানে কোনো বর্ণ বা লিঙ্গ সীমানা ছিল না, ছিল শুধু আত্মবিশ্বাস আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর শিল্পীরা। বিজ্ঞাপন জগতের ধনকুবের চার্লস সাচ্চি প্রদর্শনীর প্রতিটি শিল্পকর্ম কিনে নিয়েছিলেন, এবং উত্তর লন্ডনে বাউন্ডারি রোডে তার নিজের শিল্পকলা গ্যালারিতে নিয়মিত একটি প ্রদর্শনী হিসেবে এই শিল্পকর্মগুলো প্রদর্শন করেছিলেন। 'ওয়াইবিএ' শিল্পীরা প্রত্যেকেই পরবর্তীতে আন্তর্জাতিকভাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, এবং তাদের কাজ ১ ৯৯০-এর দশকে বিশ্ব ভ্রমণ করেছিল।

একই সময়ে ক্রমবর্ধমান উচ্চাভিলাষী মাত্রায় আমেরিকান শিল্পীরা 'আর্ট ফিল্ম

’ নির্মাণ করতে শুরু করেছিলেন। বিল ভাইয়োলা (জন্ম ১৯৫১) চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন যা প্রায়শই একাধিক পর্দায় প্রদর্শিত হয়, যেমন তার ‘নানটেস ট্রিপটিক’ (১৯৯২), যা ফ্রান্সের নানতেসে একটি চ্যাপেলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে ট্রিপটিক, অর্থাৎ তিনটি সংযুক্ত প্যানেলের কাজ মূলত ঐতিহাসিকভাবেই ধর্মীয় বিষয়ক চিত্রকর্মের জন্য সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু ভাইওলা এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছিলেন জীবন প্রদর্শন করতে। একটি প্রায় অন্ধকার কক্ষে আপনি চোখের সামনে জন্ম আর মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে দেখবেন। একটি শিশুর জন্ম হচ্ছে, একজন বৃদ্ধ রোগী (শিল্পীর মা) হাসপাতালের বিছানায় তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন, আর মধ্যবর্তী প্যানেলে আমরা দেখি একজন ব্যক্তি পানির নীচে ভাসছেন । একজন ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ এই চলচ্চিত্রের শব্দ হিসেবে যুক্ত করা হয়েছিল - জীবনের একটি স্মারক, যখন দুই পাশের পর্দাগুলো কোনো ব্যক্তির জীবনের সবচেয়ে ব্যক্তিগত এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোকে প্রদর্শন করছিল - তাদের জন্ম এবং তাদের মৃত্যু।

ম্যাথিউ বার্নি (জন্ম ১৯৬৭) পাঁচটি আর্ট ফিল্মের একটি ধারাবাহিক তৈরি করেছিলেন, ‘দ ্য ক্রেমাস্টার সাইকেল’, নয় ঘন্টাব্যাপী পুরুষত্বের পরাবাস্তববাদী একটি অনুসন্ধান, যেখানে আমরা মেয়েলি এবং পুরুষালী সমকামী, কোরাসে নৃত্যশিল্পী, নন-বাইনারী নগ্ন চরিত্রদের আবির্ভূত দেখি। প্রতিটি ফিল্মই ভিন্ন তবে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। ক্রেমাস্টার ৪, যে ফিল্মটি প্রথম নির্মিত হয়েছিল, আইলে অব ম্যানে ১৯৯৫ সালে সেটির চিত্রগ্রহন করা হয়েছিল, যা আবর্তিত হয়েছে একটি ‘ট্যাপ-ড্যান্সিং’ করা স্যাটাইরকে ঘিরে, বার্নি নিজেই যে ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এবং এছাড়াও দুটি সাইডকার রেসিং টিম অংশ নিয়েছিল। প্রতিটি ফিল্ম অনুসন্ধান করেছিল কীভাবে সামাজিক লিঙ্গ নির্ধারিত হয়, এছাড়া সেখানে যুক্ত করা হয়েছিল বড় মাত্রায় যৌনতা, সহিংসতা, মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম।

১৯৯০-এর দশকে বহু শিল্পী আলোকচিত্রকে তাদের শিল্পকলার মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রক্রিয়ার অগ্রগতি রঙ্গীন ও সিনেম্যাটিক মাত্রায় আলোকচিত্র পুনসৃষ্টি করার সুযোগ করে দিয়েছিল। জেফ ওয়াল (জন্ম ১৯৪৬) ছিলেন প্রথম সেই শিল্পীদের একজন যারা এভাবে আলোকচিত্র নিয়ে কাজ করেছিলেন জাদুঘরের দেয়ালের জন্য পূর্বপরিকল্পিত সাজানো বিশালাকার আলোকচিত্র সৃষ্টি করতে , যেমন 'এ সাডেন গাস্ট অব উইন্ড (আফটার হকুসাই)' (১৯৯৩)। তিনি হকুসাইয়ের একটি জাপানি প্রিন্ট পুনঃসৃষ্টি করেছিলেন যেন এটি চলচ্চিত্র থেকে ধারণ করা কোনো স্থিরচিত্র। আন্দ্রিয়াস গুরস্কি (জন্ম ১৯৫৫) তার 'পারি, মন্টপারনাস' (১৯৯৩) সিরিজে একই ভাবে নতুন এই বিশাল আকারের আলোকচিত্র ব্যবহার করে অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের দৃশ্যগুলোকে প্রায় বিমূর্ত চিত্রে পরিণত করেছিলেন।

অন্য শিল্পীরাও আলোকচিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কারণ ক্যামেরা বিষয়বস্তুর প্রতি বেশ সতর্ক হতে পারে এর উপস্থিতির গোপনীয়তা রক্ষা করে। আর ক্যামেরার বহনযোগ্য

একটি আকার অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলোর আলোকচিত্র ধারণ করার সুযোগ করে দিয়েছিল। নান গোল্ডিন (জন্ম ১৯৫৩) প্রাইড প্যারেডে যাওয়ার পথে তার বন্ধুদের আলোকচিত্র তুলেছিলেন। পুরো ড্র্যাগ বা জামজমকপূর্ণ পরিচ্ছদে যারা বাইসাইকেলে চড়ে নিউ ইয়র্কের ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে দ্রুত ধাবমান কিংবা মাদক গ্রহন করছেন অথবা এইডসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করছেন। সোফি কালে (জন্ম ১৯৫৩) তার 'প্রাইভেট গেম' ধারাবাহিকের মাধ্যম হিসেবে আলোকচিত্র ব্যবহার করেছিলেন একটি অনুসন্ধানী যাত্রা লিপিবদ্ধ করতে, যেখানে পক্ষকালব্যাপী আমরা তাকে প্যারিসের একটি পার্টি থেকে ভেনিস অবধি এক ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে দেখি, এবং তিনি সেই অজানা ব্যক্তির হোটেল কক্ষে থাকা নানা জিনিসগুলো আলোকচিত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন হোটেলের পরিচ্ছন্নতা-কর্মী হিসেবে কাজ করে। তিনি তার আবিষ্কারগুলো বই এবং ফ্রেমবন্দী আলোকচিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন, আকস্মিক একটি সাক্ষাৎ এবং অজ্ঞাতনামা একটি জীবন থেকে তিনি কাহিনি তৈরি করেছিলেন।

অন্য শিল্পীরা আলোকচিত্র ব্যবহার করেছিলেন এই মাধ্যমটির 'সত্য' লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতাকেই প্রশ্ন করতে। ১৯৯৮ সালে তার 'কাজার' ধারাবাহিকে শাদি ঘাদিরিয়ান (জন্ম ১৯৭৪) উনবিংশ শতকে ইরানী আলোকচিত্রীদের স্টুডিওতে তোলা আলোকচিত্র পুরানো পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য অনুসঙ্গ ব্যবহার করে চিত্রিত পটভূমিসহ পুনঃসৃষ্টি করেছিলেন। যদিও তার বাড়তি উপকরণ ছিল ক্যাসেট প্লেয়ার এবং ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এবং তার নারীরা ক্যান থেকেই পেপসি পান করছে, সাইকেল চালাচ্ছে এবং সানগ্লাস পরে আছে। তারা উনবিংশ শতকের নারী নয়, বরং সমকালীন ইরানীরা। ঘাদিরিয়ান, যিনি এখনো ইরানে বসবাস করেন, এবং শিরিন নেশাত (জন্ম ১৯৫৭), ইরান থেকে নির্বাসিত একজন, ইরানের ভিতরে এবং বাইরে কীভাবে ইরানী নারীদের দেখা হয় সেটি অনুসন্ধান করতে উত্তর-উপনিবেশিক এবং নারীবাদী তত্ত্ব ব্যবহার করেছিলেন।

১৯৭৯ সালে তৎকালীন ইরানি সরকারকে উৎখাত করা হয়েছিল, এবং একটি রক্ষণশীল

ধর্মীয় সরকার ক্ষমতা দখল করেছিল। আরো বহুবিধ নিষেধাজ্ঞাসহ নারীদের জন্য পর্দা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। নেশাত তখন আমেরিকায় পড়াশুনা করছেন, তিনি সেখানেই নির্বাসনে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তার সৃষ্টি করা 'উওমেন অব আল্লাহ' ধারাবাহিকটির জন্য নিজের ছবিসহ নারীদের আলোকচিত্র গ্রহন করেছিলেন, হিজাব (ধর্মীয় একটি পর্দা) পরিহিত ও একটি বন্দুকসহ । শহীদত্বের কবিতা, আর নারীবাদী লেখ্যাংশ ফার্সি ভাষায় নারীদের মুখের উপর লেখা হয়েছিল। বহু মানুষ যারা পশ্চিমে তার কাজ দেখেছিলেন, তাদের কাছে তার সেই বৈপ্লবিক কবিতাগুলো অপাঠযোগ্য রয়ে গিয়েছিল, একটি ক্যালিগ্রাফিক সংকতের মতো যা আলোকচিত্রে নারীদের চোয়াল ও চিবুক জুড়ে লেখা হয়েছিল। এই সিরিজের একটি অংশ, তার 'রেবেলিয়াস সাইলেন্স' আলোকচিত্র, আমরা নিশ্চিত নই এই নারীটি কী অন্য কাউকে হত্যা করতে রাইফেল ধরে আছেন, নাকি তিনি নিজেকে সুরক্ষা করতে চাইছেন। তিনি কী শহীদ (যেমন তার মুখ আবৃত করে রাখা কবিতাটি প্রস্তাব করছে, নাকি তিনি নিজেই সহিংসতার শিকার? এই চিত্রগুলো জটিল, আমাদের প্রশ্ন করতে প্ররোচিত করে আমরা কী দেখছি, আর আমাদেরকে এটি জানায় ইরানি নারীদের জীবন আদৌ সহজ নয়।

নেশাত তার পুরো পেশাগত জীবনই দেশের বাইরে কাটিয়েছেন নির্বাসনে, এবং ইরানের বাইরে শুধু তার কাজ প্রদর্শিত হয়, কিন্তু তারপরও ইরান তার কাজের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। 'প্রতিটি ইরানী শিল্পী, কোনো না কোনো একটি উপায়ে রাজনৈতিক', তিনি বলেছিলেন, 'রাজনীতি আমাদের জীবনকে সংজ্ঞায়িত করেছে। আপনি যদি ইরানে বসবাস করেন, আপনাকে অবশ্যই নিষেধাজ্ঞার অধীনে থাকতে হবে, নির্যাতন, গ্রেফতার , এবং কখনো মৃত্যুদণ্ডের শিকার হতে হবে। আর যদি আপনি দেশের বাইরে বসবাস

করেন, আমার মতো, তাহলে নির্বাসিতের জীবনের মুখোমুখি হতে হবে, পরিবার আর প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্নতা ও পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে’।

১৯৯০-এর দশকে নেশাত এবং ঘাদিরিয়ানের কাজ সংস্কৃতির মূলধারায় প্রবেশ করেছিল, মূলত মেগা-মিউজিয়াম আর নতুন গ্যালারি দ্রুত প্রতিষ্ঠা হবার কল্যাণে। ১৯৯৬ সালে গুগেনহাইম স্পেনের বিলবাওতে তাদের একটি শাখা খুলেছিল এবং লন্ডনে২০০০ সালে টেট মডার্নের উদ্বোধন হয়েছিল। আধুনিক এবং সমকালীন শিল্পকর্মের জন্য এইসব সুবিশাল পরিসর নিবেদিত হয়েছিল, এবং এগুলো সাংস্কৃতিক পর্যটনের আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর চত্বর, করিডোর আর অভ্যর্থনা কক্ষের জন্য প্রচুর পরিমানে শিল্পকলা কমিশন দেয়া হয়েছিল, বিশেষজ্ঞ নির্মাতা আর তাদের সহকারী বাহিনির সহায়তায় যা নির্মিত হয়েছিল। পিকাসো মাতিস, ইমপ্রেশনিস্ট আর সুরিয়ালিস্টদের কাজ নিয়ে ব্লকবাস্টার প্রদর্শনীগুলো ক্রমশ আরো বেশি সংখ্যক দর্শককে আকৃষ্ট করেছিল।

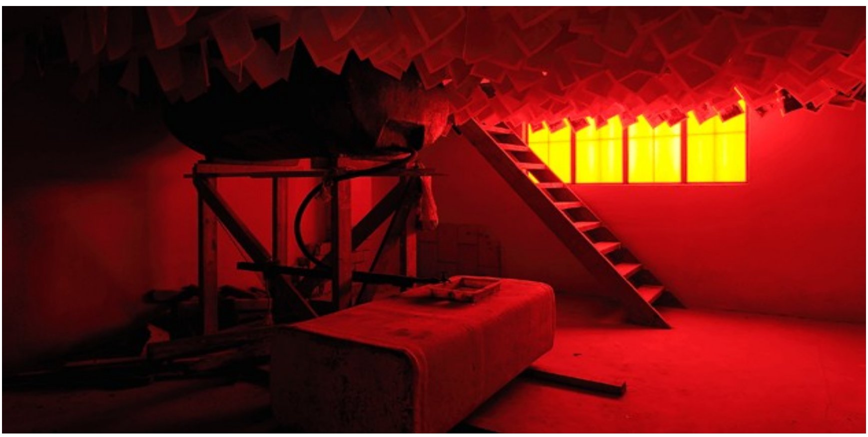

সাংস্কৃতিক পর্যটন বাইএনিয়ালস বা দ্বিবার্ষিক প্রদর্শনীগুলোর দ্রুত বিস্তারে সহায়তা করেছিল। এগুলো বড় মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন শিল্পকলা প্রদর্শনী, যা প্রতি দুই বছর ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়, এবং এই প্রদর্শনীতে কোনো একটি শহরে বহু মাস জুড়েই বহু জায়গায় শিল্পকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই বৈশ্বিক অনুষ্ঠানগুলো বিশ্বব্যাপী শিল্পী ও তাদের শিল্পকর্মগুলোকে একত্রিত করে উচ্চাকাঙ্ক্ষী যৌথ প্রদর্শনী এবং জাতীয় প্যাভিলনের মাধ্যমে। ১৮৯৫ সালে ভেনিস বাইএনাল ইটালিতে শুরু হয়েছিল, এবং ব্রাজিলে সাও পাওলো বাইএনাল শুরু হয়েছিল ১৯৫১ সালে। ১৯৫৫ সাল থেকে জার্মানিতে ডকুমেন্টার সূচনা হয়েছিল, এটি একটু ভিন্ন ছিল, কারণ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এটি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯০-এর দশকে আরো বহু বাইএনিয়ালের আয়োজন শুরু হয়েছিল , আরব আমিরাতে সারজাহ বাইএনিয়াল থেকে শুরু করে দক্ষিণ কোরিয়ায় গোয়াংজু বাইএনাল। বর্তমানে প্রায় ৩০০ বাইএনালের অস্তিত্ব আছে, সবচেয়ে জনপ্রিয়গুলোর প্রত্যেকটি অর্ধ মিলিয়ন থেকে এক মিলিয়ন দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে থাকে।

দ্বিবার্ষিক এই বাইএনিয়াল প্রদর্শনীগুলো সাধারণত বিশাল প্রদর্শনী কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ক্ষুদ্র মাত্রার চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, আলোকচিত্র আর ভিডিও আর্ট সহজে চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। এছাড়াও এই প্রদর্শনীগুলো বেশ আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাও পায় , এবং সেকারণে বিশাল নতুন কাজের কমিশন সেখানে পুরো কক্ষ পূর্ণ করে কিংবা আয়োজক শহরের উন্মুক্ত এলাকায় প্রদর্শিত হতে পারে। এ্ই জায়গাগুলো প্রায়শই সৃষ্টি করা হয় বিশেষভাবে সেই এলাকা-নির্দিষ্ট শিল্পকলা সৃষ্টি করতে। পরিণতিতে বহু শিল্পী যারা ১৯৯০-এর দশকে কাজ করেছিলেন তারা ক্রমশ বড় হতে থাকা একটি মাত্রায় কাজ করেছিলেন এই ধরনের প্রদর্শনী ভেন্যুগুলো পূর্ণ করতে।

স্থাপনা শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে শিল্পীদের ক্রমশ আরো বেশি স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল, যা পুরো জাতীয় প্যাভিলিয়ন জুড়ে বিস্তৃত হতে পারে, যার বাইরের দেয়ালে নিয়ন আলো আর দানবীয় আকারের পমপম দিয়ে আবৃত করা হতে পারে। এমন কক্ষের মধ্যে ভিডিও প্রদর্শন করা হতো যেগুলো দেখতে সিনেমার সেটের মতো। ভাস্কর্যগুলো বিশাল বাস আর চিত্রকর্মগুলো সিনেমার পর্দার মতো আকার নিয়েছিল। ২০০১ সালের ভেনিস বাইএনালে ব্রিটিশ শিল্পী মাইক নেলসন (জন্ম ১৯৬৭) ভেনিসের একটি অব্যবহৃত বিয়ার তৈরি কারখানাকে কক্ষ, করিডোর আর দরজার ল্যাবিরিন্থ বা গোলকধাঁধা বানিয়েছিলেন, যেখানে আপনার নিজেকেই আপনার পথ খুঁজে নিয়ে বের হতে হবে। (এক দশক পরে তিনি একই কাজ করেছিলেন এই বাইএনালের ব্রিটিশ প্যাভিলিয়নের জন্য)।

এছাড়াও ১৯৯০-এর দশকটি ছিল সুপার-কিউরেটরদের সময়। কিউরেটররা সাধারণ প্রথাগত অর্থে মিউজিয়ামের সংগ্রহগুলো দেখাশুনা করতেন, কিন্তু ক্রমশ তারা উচ্চাভিলাষী প্রদর্শনী আয়োজন করতে শুরু করেছিলেন আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম আর গ্যালারি থেকে চিত্রকর্ম সংগ্রহ করে। সুপার-কিউরেটররা বাইএনিয়ালগুলোকে এতো সুবিশালভাবে আয়োজন করতে শুরু করেছিলেন যে তারা আসলেই সবিশাল বিষয় নিয়ে প্রদর্শনী করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেমন, ‘ড্রিমস অ্যান্ড কনফ্লিক্টস’ এবং ‘অল দ্য ওয়ার্ল্ডস ফিউচার’। আন্তর্জাতিক শিল্পীরা এইসব নতুন মূল ভাবনার প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন । ইস্তাম্বুল বাইএনিয়ালে ২০০৩ সালে কলোম্বিয়ার শিল্পী ডরিস সালেসেডো (জন্ম ১৯৫৮) ১৫০০ কাঠের চেয়ার দুটি ভবনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে স্থাপন করেছিলেন। এই খালি চেয়ারগুলো ইঙ্গিত করে সেই সব বাড়িগুলো যেগুলো হারিয়ে গেছে, সেই জীবনগুলোকে, যেগুলোর শিকড় উপড়ে ফেলা হয়েছে, সেই মানুষগুলোকে, যারা চলে গেছে। এই চেয়ারগুলো একটি দেয়াল তৈরি করেছিল যেখানে একসময় একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবন, একটি সমাজ ছিল। সালসেদো এই শহর আর এর গ্রিক আর ইহুদী অধিবাসীর মধ্যে চলমান টানাপোড়েন স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যারা এই শহর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এই শূন্যস্থান সৃষ্টি করে।

ক্রমশ সমকালীন শিল্পীরা তাদের শিল্পকলাকে সামাজিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। তারা তাদের দেশে জীবন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক বিপর্যয়গুলো নিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলেন। আমরা এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে এই সব শিল্পীদের দেখবো। কিন্তু প্রথমে একবিংশ শতাব্দী অবধি পৌছানোর জন্য আসুন কিছু সঙ্গীত উপভোগ করা যাক ...

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবির তালিকা (ক্রমানুসারে)

(১) Rachel Whiteread, Ghost
(২) Rachel Whiteread, House
(৩) Damien Hirst,The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living
(৪) Tracey Emin, bed
(৫) Bill Viola,Nantes Triptych, https://www.youtube.com/watch?v=vz312dtUP5s
(৬) Jeff Wall, A Sudden Gust of Wind (after Hokusai)
(৭) Andreas Gursky, Montparnasse, Paris, Montparnasse
(৮) Shadi Ghadirian, From the Qajar series
(৯) Shirin Neshat, Rebellious Silence
(১০) Mike Nelson, Installation view of I, Impostor
(১১) Doris Salcedo, Untitled. 2003

অধ্যায় ৪০ - শিল্পকলার প্রতিরোধ

২০০৮ সা, মে মাসের শেষ সপ্তাহ। একই চিত্রকর্মের সামনে দাড়িয়ে থাকা শুধু দুই জন মানুষ ছাড়া গ্যালারি সম্পূর্ণ মানবশূন্য। আর চিত্রকর্মটি যে-কোনো চিত্রকর্ম নয়, এটি লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির মোনা লিসা, পৃথিবী সবচেয়ে বিখ্যাত চিত্রকর্মগুলোর একটি। আর এর সামনে দাড়িয়ে থাকা দুই জনও সাধারণ কোনো মানুষ নন, তারা হলেন, বিয়োন্সে এবং জে-জি, স্বামী ও স্ত্রী, এই গ্রহের সবচেয়ে বড় সঙ্গীতশিল্পীদের দুইজন।

সেই দিন প্যারিসের পুরো ল্যুভ মিউজিয়াম তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বেশ, তারা দুই জন ছাড়াও সংশ্লিষ্ট আরো আরো অনেকেই ছিলেন - নৃত্যশিল্পী, স্টাইলিস্ট, ভিডিও চিত্রগ্রাহক এবং পরিচালক। তারা তাদের সাম্প্রতিক সিঙ্গল 'এপশিট' গানটির জন্য একটি ভিডিও নির্মাণ করছিলেন। বিরতিহীনভাবেই তাদের পোষাক পরিবর্তন করতে হচ্ছিল, সেই সাথে নাচের রুটিনও, সঠিক শটটি পাবার জন্য বহু বার তাদের পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছিল। তারা প্রাচীন গ্রিক এবং মিসরীয় ভাস্কর্যগুলোর সামনে দাড়িয়েছিলেন - 'ভ িনাস দ্য মাইলো', এবং টেইনিসের গ্রেট স্ফিঙ্কস। বিয়োন্সে ডাভিডের 'করোনেশন অব এমপ্রেস জোসেফিন' চিত্রকর্মটির সামনে নেচেছিলেন, এবং জে-জি জেরিকোর র‍্যাফট অফ দ্য মেডুসা' চিত্রকর্মটির সামনে দাড়িয়ে র‍্যাপ করেছিলেন। ক্যামেরা কুশলীরা বেনোয়ার 'প্রোর্ট্রেট অব ম্যাডেলাইন' চিত্রকর্মটির চিত্রগ্রহন করেছিলেন, এবং পরিচালক কিছু দৃশ্যকল্প মঞ্চস্থ করেছিলেন যা রিংগোল্ড এবং উইমসের সাম্প্রতিক কিছু কাজের প্রতিধ্বনি ছিল।

এখন গোলাপী আর সবুজ স্যুট পরিহিত বিয়োন্সে এবং জে-জি - 'দ্য কার্টারস' - মোনা লিসার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাড়িয়ে আছেন, তাদের ভিডিওটির শেষ দৃশ্য চিত্রগ্রহন করা হচ্ছে। তারা সরাসরি আর শান্তভাবে ক্যামেরার দিকে তাকালেন, তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা আপনার দিক বরাবর তাদের দৃষ্টি। এরপর ধীরে তারা ঘুরে প্রথমের পরস্পরের দিকে, এবং তারপর মোনা লিসার দিকে তাকালেন। প্রতিদিন বহু সহস্র আলোকচিত্রের নায়িকা মোনা লিসার খ্যাতি এটিকে বুলেটপ্রুফ কাচের মধ্যে একটি আবদ্ধ জীবন কাটাকে বাধ্য করেছে।

তুলনামূলকভাবে 'দ্য কার্টারস' - বিয়োন্সে ও জে-জি দম্পতি তাদের খ্যাতির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন । এই ভিডিওটি তাদের অত্যন্ত ক্ষমতাশালী

হিসেবে উপস্থাপন করেছিল, যারা ল্যুভের মতো একটি জনাকীর্ণ গ্যালারী দর্শকশূন্য করার ক্ষমতা রাখেন এবং নিজেদের জন্য দাবি করতে পারেন। একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা ল্যুভের অমুল্য শিল্পকর্মগুলোর চিত্রগ্রহন করেছিলেন - ‘‘র‍্যাফট অব দ্য মেডুসা’র সবার ওপরে থাকা কৃষ্ণাঙ্গ নাবিক, বেনোয়ার প্রতিকৃতির সেই কৃষ্ণাঙ্গ নারী, আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা প্রাচীন মিসরীয় শিল্পকর্মগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। জোসেফাইনের নয় নেপোলিয়ন এখন রানি বেইকে মুকুট পরাচ্ছেন, জে-জি জেরিকোর ভেলায় তার জায়গা নিয়েছিলেন, এবং তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল। একটি নতুন শিল্পকলার ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

*

এই বইয়ের শেষ অধ্যায়টি কেন একটি পপ-ভিডিওর বিবরণ দিয়ে শুরু করা হলো? ‘দ্য কার্টারস’ শিল্পীযুগলের পুরষ্কার বিজয়ী এই ছয় মিনিটের ভিডিওচিত্রটি একবিংশ শতাব্দীতে শিল্পকলা আসলে মূলধারার কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে সেটি প্রদর্শন করেছিল। শিল্পকলার ইতিহাস কী হতে পারে এবং কী হওয়া উচিত সেই বিষয়ে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করতে তারা ল্যুভের সংগ্রহকে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং সেগুলো ব্যবহার করেছিলেন। ‘এপশিট’ মুক্তি পাওয়ার পরে ল্যুভে দর্শনার্থীদের সংখ্যা প্রায় পচিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং ভিডিওতে সবার দৃষ্টিগোচর করা শিল্পকলাগুলো দেখতে দর্শনার্থীরা তাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছিলেন (আমরাও এইসব কাজের অনেকগুলো নিয়ে এই বইয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা করে ফেলেছি, চৌদ্দতম অধ্যায়ে লিওনার্ডোর ‘মোনা লিসা’, এবং চব্বিশতম অধ্যায়ে বেনোয়ার প্রতিকৃতি এবং পঁচিশতম অধ্যায়ে জেরিকো ‘র‍্যাফট’ চিত্রকর্মের সাথে আমাদের দেখা হয়েছে)।

ত্বকের রঙের গাঢ়ত্বের নানা মাত্রাসহ নারী নৃত্যশিল্পীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ন্যুড লাইক্রা পরিহিত বিয়োন্সে কৃষ্ণাঙ্গ শরীরকে মিউজিয়ামের কেন্দ্রে পুনস্থাপন করেছিলেন। তিনি নতুন ‘ভেনাস দ্য মাইলোয়’ রূপান্তরিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার উপস্থিতি এবং আমরা

কীভাবে তাকে দেখছি, তিনি সক্রিয়ভাবেই তার নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের দাস কিংবা যৌনতার জন্য লভ্য বস্তু হিসেবে দেখার উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রত্যাখান করা হয়েছিল - নৃত্যশিল্পীরা এবং বিয়োন্সে কৃষ্ণাঙ্গ নারী শরীরকে পুনস্থাপন করেছিলেন - সক্রিয়, শক্তিশালী ও ক্ষমতাপূর্ণ।

এই বইয়ে আমরা পুরো পৃথিবীর বহু শিল্পকর্ম পর্যবেক্ষণ করেছি। আমরা সেই সব শিল্পীদের কথা বলেছি শিল্পকলার ইতিহাসের সাম্প্রতিক সংস্করণগুলোয় যারা উপেক্ষিত হয়েছেন এবং আমরা দেখেছি লেখকের বর্ণ আর লিঙ্গ কীভাবে সেই কাহিনিকে প্রভাবিত করেছে (চব্বিশতম অধ্যায় ভিঙ্কেলমান ও ক্ল্যাসিকাল পর্বের পুরুষ নগ্ন শিল্পকর্ম নিয়ে তার ভালোবাসার কথা স্মরণ করে দেখুন) 'গেরিলা গার্লস' শিল্পীগোষ্ঠী সম্প্রতি দাবি করেছিল, ''আমরা মনে করি, মিউজিয়ামগুলোর একটি কর্তব্য হচ্ছে শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ পুরুষ শিল্পীদের অংশ নয়, বরং শিল্পকলার ইতিহাসের প্রকৃত কাহিনি উপস্থাপন করা'। বিয়োন্সে ও জে-জি - 'দ্য কার্টারস' শিল্পীযুগল সেই কাহিনির আরো বিস্তৃত পুনর্কথনেরই একটি অংশ। এই বইটিও এর একটি অংশ।

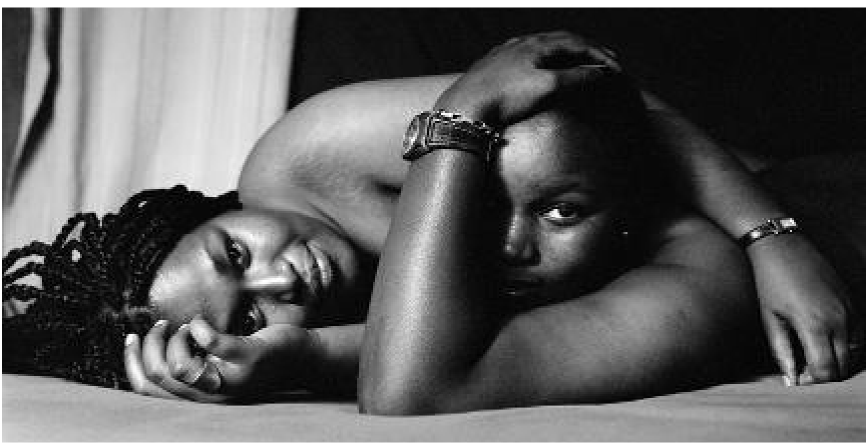

একবিংশ শতাব্দী সেই শিল্পীদের উত্থানের সাক্ষী, যারা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছিলেন। জানেলে মুহোলি (জন্ম ১৯৭২) এবং জারিনা ভিমজি (জন্ম ১৯৬৩) নির্যাতিত সমাজগোষ্ঠীগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাদের শিল্পকলা ব্যবহার করেছিলেন। তারা এই প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোকে কণ্ঠ দিতে চেয়েছেন। মুহোলি একজন শিল্পী সংক্রিয়কর্মী, যিনি নিজেকে নন-বাইনারি হিসেবে শনাক্ত করেন, এবং তার আলোকচিত্রে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সমকামী নারী ও রূপান্তরকামী গোষ্ঠীর সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও একটি নতুন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন। মুহোলি বলেছিলেন, ''আমি অন্যদেরকে দেখেছি আমাদের হয়ে সমকামী নারীদের পক্ষে কথা বলতে ও ছবি তুলতে, যেন আমরা অক্ষম এবং মুক। আমি অন্যদের বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে আর নীরব থাকতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম''।

ডকুমেন্টার কমিশনে নির্মিত ভিমজির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ 'আউট অব ব্লু' চলচ্চিত্রে, তিনি চল্লিশ বছর আগে উগান্ডা থেকে ইদি আমিন কর্তৃক এশিয় জনগোষ্ঠীকে (তার নিজের পরিবারসহ) জোরপূর্বক বহিষ্কার করার বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন। উগান্ডার বিভিন্ন জায়গায় চব্বিশ মিনিট দীর্ঘ এই সুন্দর চলচ্চিত্রটির চিত্রগ্রহন করা হয়, যেখানে ১৯৯৮ সালে তিনি প্রথম বারের মত ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি সেই সব জায়গায় গিয়েছিলেন যে জায়গাগুলো নিয়ে তার বাবা গল্প করতেন যখন তিনি ব্রিটেইনে নির্বাসিত জীবনে বড় হয়ে উঠছিলেন, কিন্তু ফিল্মে এইসব এলাকাগুলো বিষণ্নতা আর দুঃখে পরিপৃক্ত ছিল, যেখানে কোনো জীবন ছিল না। ভেঙ্গে পড়া সরকারী দালান, ক্ষয়ে যাওয়া কারাগার, পরিত্যক্ত বাড়ি ইত্যাদি যেগুলোর তিনি চিত্রগ্রহন করেছিলেন, সেখানে তখন শুধু মাকড়শাদের বসবাস।

চীনা শিল্পী আই ওয়েওয়ের (জন্ম ১৯৫৭) ইউরোপে নির্বাসিত জীবনযাপনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল তার শিল্পকলা। তার বাবা-মা দুজনেই কবি ছিলেন, এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তারা নির্যাতিত হয়েছিলেন। চীনের রাজনীতি সবসময়ই আই-এর কাজে সরাসরি প্রভাব ফেলেছিল: ''আমাকে আমার বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, আমি এই সমাজে বড় হয়েছিলাম। আমার বাবা, এবং পুরো একটি প্রজন্ম রাজনৈতিক ক্ষমতার সংগ্রামের শিকার হয়েছিলেন, এবং আজ আমি সেই নিপীড়নের শিকার অথবা অন্ততপক্ষে পরিস্থিতির কারণে সীমাবদ্ধ....সুতরাং এটি আমার নির্বাচন নয়, এটাই আমার জীবন এবং যদি এই জন্য আমাকে কিছু বিসর্জনও দিতে হয়, সেই বিষয়ে আমার কোনো অনুশোচনা নেই''। তার এই বিসর্জনগুলোর মধ্য একটি ছিল, ২০০৮ সালে ভয়াবহ সিচুয়ান ভূমিকম্পের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করার কারণে একাশি দিনের কারাবাস।

২০০৮ সালের ১২ মে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে একটি ভূমিকম্প প্রায় ৯০,০০০ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল ৫,০০০ স্কুলের শিশু, যাদের প্রাণ হারাবার মূল কারণ ছিল তাদের স্কুল ভবনগুলো খুবই অদক্ষতার সাথে নির্মাণ করা হয়েছিল। আই ভূমিকম্প এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এবং শোকাহত পিতামাতাদের সাথে কথা বলেছিলেন। নিহত প্রতিটি শিক্ষার্থীর নামসহ একটি তালিকা প্রকাশ করতে তিনি সেচ্ছাসেবীদের একটি দল সংগঠিত করেছিলেন। প্রতিটি ধাপেই সরকার তাকে বাধা দিয়েছিল। এই শিশুদের জন্য আই স্থায়ী একটি স্মৃতিস্মারক সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, এবং এর জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি গোপনে ১৫০ টন স্টিল রিবার (ইস্পাতের রিইনফোর্স বার) কিনেছিলেন, যেগুলো সিচুয়ান ভূমিকম্পের ধ্বংসবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। এই নিম্নমানের রিইনফোর্স লোহার বারগুলোই ভূমিকম্পে স্কুলভবনগুলো ধ্বসে পড়ার কারণ ছিল। ভূমিকম্পে বেঁকে যাওয়া প্রতিটি লোহার পাতকে হাত দিয়ে সোজা করতে তিনি সহকারীদের একটি বড় দলকে নিয়োগ দিয়েছিলেন, সময়কে উলটো দিক বরাবর পরিচালনা করার মতো যেন সেই পাতগুলো এর পূর্ববর্তী আকারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এরপর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিলেন, তিনি প্রায় তিন মাস একাকী অবস্থায় বন্দি ছিলেন। যখন অবশেষে মুক্তি পেয়ে তিনি স্টুডিওতে ফিরে দেখেছিলেন, তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, তার দলটি লোহার এই পাত সোজা করার কাজটি তার অনুপস্থিতিতেও অব্যাহত রেখেছিল।

২০১৩ সালে আই তার স্থাপনা শিল্পকর্ম ‘স্ট্রেইট’ প্রদর্শন করেছিলেন ভেনিস বাইএনালে। বহু সহস্র জং ধরা লোহার পাত ও দণ্ড একটির উপর একটি স্তূপ করে রাখা, দেখে মনে হতে পারে বাদামি মাটির বিস্তৃত পাহাড়ের সারি। যখন লন্ডনে রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব আর্টসে দুই বছর পরে এটি প্রদর্শিত হয়েছিল এটিকে ঘিরে ছিল সেই শিশুদের নাম যারা সেদিন প্রাণ হারিয়েছিল। বহু দর্শকই এটি দেখে কেদেছিলেন, কারণ এটি খুবই শক্তিশালী একটি স্থাপনা ছিল।

অন্তর্জাল ও সামাজিক মাধ্যমের মঞ্চগুলো আই-এর মতো শিল্পীদের সমর্থন সংগ্রহ ও তাদের বার্তা সম্প্রচার করার সুযোগ করে দিয়েছে। এইসব উন্মুক্ত মঞ্চগুলো শিল্পী ও সক্রিয়কর্মীদের সমানভাবে সহায়তা করেছিল। হিদার অ্যাকরয়েড ও ড্যান হার্ভে (উভয়ের জন্ম ১৯৫৯) যৌথভাবে জলবায়ু ও পরিবেশসংক্রান্ত নানা সমস্যাগুলো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন - জীবন্ত ঘাস ব্যবহার করে প্রতিকৃতি সৃষ্টি করা থেকে ইংল্যান্ডের উপকূলে ভেসে আসা তিমি হাড়ের স্ফটিকে উৎপাদন করা অবধি। বর্তমানে 'এক্সটিংশন রেবেলিয়ন' আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীরা তাদের ঘাসের কোট পরেন, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাদের কাজগুলো ইনস্টাগ্রামে অনুসারীদের সাথে ভাগাভাগি করেন।

২০১৪ সালে ওলাফুর এলিয়াসন (জন্ম ১৯৬৭) গ্রিনল্যান্ডের বরফের স্তর থেকে ভেঙ্গে যাওয়া মোট বারোটি বরফের খণ্ড স্থানান্তরিত করে কোপেনহেগেনে নিয়ে এসেছিলেন।, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গ্রিনল্যান্ড থেকে প্রতি সেকেন্ড ১০,০০০ টন বরফ হারিয়ে যাচ্ছে। 'আইস ওয়াচ' স্থাপনা শিল্পকর্মটি কোপেনহেগেন নগর কর্তৃপক্ষের কার্য্যালয়

চত্বরে একটি ঘড়ির মতো করে সাজানো হয়েছিল, যেখানে বরফের খণ্ডগুলো ধীরে ধীরে গলে গিয়েছিল - জলবায়ু পরিবর্তন মেরু এলাকায় কী ধরনের বড় পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে এটি ছিল তারই একটি স্মারক। সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বোচ্চ প্রচারণা নিশ্চিত করতে এই প্রদর্শনীটি জাতিসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত প্রতিবেদনটির সাথে একই সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ।

একবিংশ শতকে শিল্পীরা ইতিহাস পুনপর্যালোচনা এবং এর অসঙ্গতিগুলো উন্মোচন করা অব্যাহত রেখেছিলেন, যা বহুদিন ধরে পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গ দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। একজন ব্রিটিশ-নাইজেরিয়ান শিল্পী ইনকা শোনিবারে (জন্ম ১৯৬২) তার শিল্পকর্মের উৎস অনুপ্রেরণা হিসেবে ব্রিটিশ শিল্পকলা ও উপনিবেশিক ইতিহাসকে ব্যবহার করেছিলেন। সাহসী, বর্ণিল বাটিক কাপড় ব্যবহার করে তিনি ঐতিহাসিক ফিগার এবং পরিচ্ছদ পুনঃসৃষ্টি করেছিলেন, যা সাধারণত আমরা আফ্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট করে থাকি। কিন্তু মূলত একটি ডাচ কোম্পানির মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া থেকে এই কাপড়গুলো আফ্রিকায় আমদানী করা হযেছিল। ইতিহাসের বইগুলো সাধারণত আমাদের যা বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করে, পৃথিবী সবসময়ই তার চেয়ে আরো অনেক বেশি পরস্পরসংযুক্ত ছিল। তার স্থাপনা শিল্পকর্ম ‘স্ক্র্যাম্বল ফর আফ্রিকা’ (২০০৩) একটি টেবিলের চারপাশে বসে থাকা ভিক্টোরিয় ফ্রক-কোট আর গলাবন্ধনী পরিহিত চোদ্দটি মাথাহীন ম্যানিকিন (পোষাকাদি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পূর্ণদৈর্ঘ মানবমূর্তি) প্রদর্শন করেছিল। টেবিলের মধ্যে আফ্রিকার একটি মানচিত্র খোদাই করা ছিল। এই ম্যানিকিনগুলো ইউরোপীয় নেতাদের প্রতিনিধিত্ব করছে যারা ১৮৮৪-৮৫ সালে বার্লিন কনফারেন্সে একত্রিত হয়েছিলেন, যেখানে তারা আফ্রিকাকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোওয়ারা করে নিয়েছিলেন। আক্ষরিকভাবে লালসা আর লোভে তারা তাদের মাথাই

হারিয়ে ফেলেছিলেন।

অন্য উত্তর-উপনিবেশিক শিল্পীরা যেমন অস্ট্রেলিয়ার ট্রেসি মোফাট (জন্ম ১৯৬০) এবং নিউ জিল্যান্ডের লিসা রেইহানা (জন্ম ১৯৬৪), শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপনকারীরা কীভাবে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ইতিহাস দমন করে রেখেছিল সেটি অনুসন্ধান করেছিলেন। ২০১৭ সালে ভেনিস বাইএনালে মাওরি শিল্পী রেইহানা তার 'ইন পারস্যুট অব ভেনাস (ইনফেক্টেড) (২০১৭) চলচ্চিত্রটি প্রদর্শন করেছিলেন। তার ঘন্টাব্যাপী দীর্ঘ চলচ্চিত্রটি দশ বছর ধরে তিনি নির্মাণ করেছিলেন, এবং ২০ মিটার প্রশস্ত একটি পর্দায় এটি প্রদর্শিত হয়েছিল। সূচনা বিন্দু হিসেবে তিনি ১৮০৪ সালে প্রকাশিত "দ্য স্যাভেজেস অব প্যাসিফিক ওসিয়ান" নামে ফরাসী একটি প্যানোরামিক ওয়ালপেপার ব্যবহার করেছিলেন। এই ওয়ালপেপারটি তাহিতির অপূর্ব সবুজ প্রকৃতির পটভূমিতে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে সরল জীবন কাটানো হাস্যোজ্জ্বল দ্বীপবাসীদের প্রদর্শন করেছিল, ১৭৬৯ সালে এই দ্বীপে ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণ এই পোষ্টারটি অনুপ্রাণিত করেছিল। তার নিজের চিত্রে রেইহানা দেখার এই দৃষ্টিকোণটি পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। দ্বীপবাসীদের দৃষ্টিকোণ থেকে শুভেচ্ছা, বিনিময়, সহিংসতা, মৃত্যুর সত্তরটিরও বেশি দৃশ্য সেখানে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। আর দৃশ্যগুলো উপনিবেশবাদীদের সেই ওয়ালপেপারে চিত্রিত মূল 'কাহিনিটিকে' চ্যালেঞ্জ করেছিল। আমরা এখন বন্দুকসহ সৈন্য, ইউরোপীয় জাহাজ আর বাণিজ্যিক আদানপ্রদানগুলো ভিন্নভাবে দেখতে পাই। বেশ কিছু প্যাসিফিক ভাষায় বাদানুবাদের খণ্ডাংশ শুনতে পাই, কিন্তু কোনো ইংলিশ নয়।

আমেরিকান শিল্পীরা, যেমন কারা ওয়াকার (জন্ম ১৯৬৯) এবং থিয়াস্টার গেটস (জন্ম ১৯৭৩) আমেরিকার দাসত্বের ইতিহাস এবং বর্ণবৈষম্যের অবিচারগুলো অনুসন্ধান করেছিলেন। ২০১৪ সালে ওয়াকার আন্ট জেমাইমার মুখসহ বিশাল আকারের একটি স্ফিঙ্স তৈরি করেছিলেন ধবধবে সাদা চিনি ব্যবহার করে এবং এটি চিনির ইতিহাসকে সেই দাসদের সাথে যুক্ত করেছিল যারা এটি তৈরি করতো।

যুক্তরাষ্ট্রে মেইন অঙ্গরাজ্যের উপকূলের নিকটে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ মালাগার মিশ্রবর্ণের ইতিহাস নিয়ে ২০১৯ সালে গেটস একটি চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন (ড্যান্স অব মালাগা)। একটি সময় এই দ্বীপটি বহু বর্ণের মানুষের বাসস্থান ছিল, যারা সেখানে বসবাস করছিলেন পঞ্চাশ বছর ধরে, কিন্তু ১৯১২ সালে মেইনের তৎকালীন গভর্নর তাদেরকে সেই দ্বীপ থেকে উৎখাত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আজ অবধি এই দ্বীপটি মানবশূন্য

হয়ে আছে।

গেটস বেশ কৌতূহলোদ্দীপক একজন শিল্পী কারণ প্রায়শই তিনি কোনো শিল্পকলাই সৃষ্টি করেন না, অন্তত প্রথাগত অর্থে আমরা যেভাবে ভেবে থাকি। তার নিজের শহর শিকাগোতে তাকে প্রায়শই দেখা যায় পরিত্যক্ত আর ভঙ্গুর ভবন পুনসংস্কার করতে। তিনি যেমন স্টোনি আইল্যান্ড ব্যাংকের পরিত্যক্ত ভবনটিকে সংস্কার করেছিলেন এবং এটিকে একটি কমিউনিটি সেন্টারে পরিণত করেছিলেন, যেখানে মানুষ তাদের নিজেদের ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে পারবেন (বারাক ওবামা তার ইতিহাস বলেছিলেন, ২০১৬ সালে যখন তিনি ভবনটি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন)।

বহু ইতিহাসের সম্মিলনে গেটস 'ইতিহাসকে' আরো প্রশস্ত করতে চান, যেন অতীতকে নিয়ে আমরা পুনরায় নতুন করে ভাবতে পারি, এমন কিছু যা আমি এই বইয়ে করার চেষ্টা করেছি। চল্লিশটি অধ্যায়ে আমরা গুহায় দেয়ালে আঁকা চিত্রকর্ম থেকে পরিবর্তনের শক্তিশালী একটি মাধ্যম হিসেবে রূপান্তরিত হওয়া সমকালীন চিত্রকর্ম অবধি একত্রে অনুসন্ধান করেছি। আমরা বহু শিল্পীর কণ্ঠ শুনেছি, এবং আমাদের সাথে দেখা হওয়া প্রতিটি সমাজে শিল্পকলার অর্থ আসলে কী সেটি আমরা দেখেছি। আমরা শিল্পকলাকে একটি আচার থেকে ক্ষমতার বার্তা হিসেবে বিবর্তিত হতে দেখেছি। এটি ছিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিলাপ, বিশ্বাসের প্রকাশ, প্রকৃতির সাথে সংযোগের এতটি মাধ্যম, ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি প্রকাশের একটি উপায় । কিছু শিল্পী সমতল দেয়ালে জানালা দেখতে আমাদের চোখকে ফাকি দিয়েছিলেন, অন্যরা রহস্যময় অন্তর্জগত আর বিমূর্ততার গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। পশ্চিমা শিল্পকলার ওপর ক্ল্যাসিকাল ভাস্কর্য রেনেসাঁর প্রভাব আমরা দেখেছি, কিন্তু রাপা নুই দ্বীপের দানবীয় মূর্তি থেকে বেনিন ব্রোঞ্জ অবধি আমরা অন্য ইতিহাসেরও অনুসন্ধান করেছি।

পরবর্তীতে শিল্পকলা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? থিয়েস্টার গেটস একজন প্রভাবশালী শিল্পী, যিনি শিল্পকলা তৈরি আর শিল্পকলা নিয়ে নতুন করে ভাবার একটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করছেন। তার জন্য 'শিল্পকলা' হচ্ছে দর্শককে চূড়ান্ত অর্থে সক্রিয় করে তোলা, মানুষের একত্রিত হওয়া, এবং কথা বলা। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে, বহু ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আসা মানুষের সন্মিলনই তার শিল্পকলার মূল ভাবনা, যারা একটি সমষ্টিগত ভবিষ্যত সৃষ্টিতে নিজেদের কাহিনী ভাগাভাগি করে নেবে। কে ঐসব ভবিষ্যতের কাহিনীগুলো বলবে? আপনি কী সেই ভবিষ্যতের গল্পকার হবেন?

এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত ছবি তালিকা (ক্রমানুসারে)

(১) Beyoncé and Jay-Z (The Carters), Apeshit, https://www.youtube.com/watch?v=kbMqWXnpXcA
(২) Zanele Muholi, Apinda Mpako and Ayanda Magudulela from Being series
(৩) Zarina Bhimji, Still from her film Out of Blue, https://vimeo.com/412378465
(৪) Ai Weiwei, Straight
(৫) Heather Ackroyd and Dan Harvey. Myles, Basia, Nath and Alesha, Living portrait
(৬) Olafur Eliasson,Ice Watch
(৭) Yinka Shonibare, Scramble for Africa
(৮) Lisa Reihana, Installation view, In Pursuit of Venus [Infected], https://www.youtube.com/watch?v=WmMRF5nw9UI
(৯) Kara Walker, A Subtlety
(১০) Theaster Gates, Dance of Malaga
(১১) Theaster Gates, Stony Island Arts Bank.